ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

আনন্দমঠের সিদ্ধসাধক

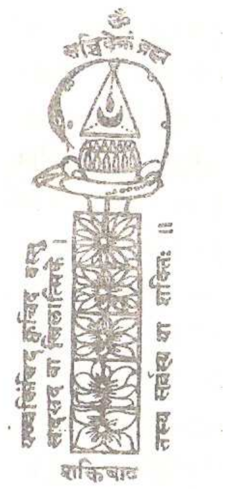

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রকাশক এবং পরিবেশক :
http://www.shaktibad.net

ইন্টারনেট সংস্করণ :
আগষ্ট ১৪, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশ :
১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ

এই পুস্তক সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত।
মূলকে বিকৃত না করে এর প্রচার সর্বথা প্রশংনীয়।

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর প্রবর্তিত শক্তিবাদ ধর্ম আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমরা বিশ্বাস করি, যদি ভারতকে আবার জগৎসভায় হৃত আসন ফিরে পেতে হয়, শক্তিবাদই একমাত্র পন্থা। তাই স্বামীজীর রচনাবলীর রক্ষণ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সামর্থ্যমত কাজ করে চলেছি এবং এই লক্ষ্যে তাঁর রচনাবলীর এক বিশুদ্ধ সংস্করণ আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই প্রয়াসেরই অঙ্গ আমাদের এই ‘‘আনন্দমঠের সিদ্ধসাধক’’ প্রকাশ।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আমাদের কাছে সাহিত্য গ্রন্থ বা নীতিকথার পাঠ নয়, বরং এক বিজ্ঞান - মানুষের বিকাশের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রন্থের মত এর প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা নিরীক্ষণপূর্বক মননই শক্তিবাদে প্রবেশের একমাত্র পথ। অবশ্যই মননের সীমারেখা আছে। তাই নিত্য ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদীয় উপাসনা এবং নিজের জীবনে অধীত সত্যকে প্রয়োগ করার নিরন্তর প্রয়াস না থাকলে একসময় শক্তিবাদ আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত হতে বাধ্য।

যেহেতু এ এক বিজ্ঞান গ্রন্থ, তাই প্রথাগত সাহিত্য-দৃষ্টিতে একে মার্জিত করার কোন প্রয়াস আমরা করি নি, বরং স্বামীজীর লিখনশৈলী ও ভাষা আমরা যথাসম্ভব অটুট রেখেছি। প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে স্বামীজীর ভাষার যে কোন বৈচিত্র্য আমরা ‘‘আর্ষপ্রয়োগ’’ হিসাবে মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কালের গহন গতিতে আজ যাচাই করা অসম্ভব, কোন্‌টা স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত ‘‘আর্ষপ্রয়োগ’’ আর কোন্‌টা বা ‘‘প্রেসের ভূত’’। তাই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা সামান্য পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছি। সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার সময় যথাসম্ভব কম কলম চালানোর নীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

সমস্ত তৎসম ও ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ভব শব্দের বানান মূলে অশুদ্ধ থাকলে, আমরা শুদ্ধ করে নিয়েছি। যেখানে বিভক্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝাচ্ছে বা অর্থহীন ঠেকছে সেখানে আমরা যথাযথ পরিবর্তন করেছি। সর্বনাম পদ বাংলায় সম্মানসূচক (যেমন - ইনি, ইঁহাদের) ও সাধারণ (যেমন - এরা, ইহাদের) এই দুই রকম হয়ে থাকে। ক্রিয়াপদও সেইমত গঠিত হয়। এই ব্যাপারে কোনও অসঙ্গতিকে আমরা যথাসম্ভব পরিমার্জিত করেছি। ক্রিয়াপদ যেখানে কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে কর্মবাচ্যে আছে বা কর্মবাচ্যের পরিবর্তে কর্তৃবাচ্যে আছে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিধায় কোন কোন স্থানে আমরা ব্যাকরণ মাফিক পরিমার্জন করেছি। কিছু স্থানে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এর বাইরে আমরা যে কোন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি, সবই পাদটীকায় ‘‘প্রকাশকের নিবেদন’’ বলে প্রকাশ করেছি। ‘‘প্রকাশকের নিবেদন’’ বলা না থাকলে সেই সব পাদটীকা মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শক্তিবাদ ভারতের বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। সহস্র বছরের অনাচার দগ্ধ ভারত আবার নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে। এই লক্ষ্যে যদি আমাদের প্রয়াস কণামাত্রও সাহায্য করে, আমরা আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত -
প্রকাশক

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুপূজা

বাবা! আজ গুরুপূর্ণিমার শুভদিনে, আপনার শ্রীচরণে মস্তকস্পর্শ প্রণাম। অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় সমাজের আজ ভয়ঙ্কর দুর্দিন। গুরুর আশীর্বাদ এবং শক্তিবাদীয় প্রেরণা, যোগ্য শিষ্যের মস্তকে বর্ষিত হইয়াই অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় ধর্মকে যুগ যুগ রক্ষা করিয়াছে। আজ ভারতের সমস্ত প্রকার লৌকিক এবং অলৌকিক বিদ্যা ও সাধনার গুরুগণ ও শিষ্যগণের মিলিত হইবার এবং আশীর্বাদ, সাধনা এবং প্রেরণা লইবার দিন। যবন ও ম্লেচ্ছগণ এবং যবনতোষক অদূরদর্শী মূর্খ নেতাগণের মূর্খতায় ভারত আজ খণ্ডিত, ছিন্নভিন্ন, ধর্মহীন, নীতিহীন, অন্নবস্ত্রহীন, গৃহহীন, ইহা ভিন্নও অনেক মহাসমস্যায় চরম দুর্দশাগ্রস্ত। দুই শত বৎসর ইংরেজ শাসন এবং চারি শত বৎসর মক্কাবাদী যবনের বর্বরতায় ভারতের যে দুর্দশা দেখা দেয় নাই, ষাট বৎসরের দুর্বলবাদী মূর্খদের মূর্খতায় ভারতের উহা হইতে শতগুণ অধিক দুর্দশা দেখা দিয়াছে। এ সব দুর্দশার লক্ষণ দেখিয়া ম্লেচ্ছ ও যবনগণ এবং যবনের দাস ও দেশের মোহগ্রস্ত নেতাগণ উল্লাসে উন্মত্ত হইয়াছেন, সেই সঙ্গে চিন্তাশীল ভারতহিতৈষী মানবগণ শঙ্কিত হইতেছেন। রামরাজ্যের নামে এ যেন ভারতব্যাপী বিকটাকার শ্মশান চিত্র। এই ভয়ঙ্কর শ্মশানের মধ্যে আপনার আশীর্বাদ ও স্নেহপুষ্ট সাধক আপন সাধনায় অটলই আছে। জীবনব্যাপী কেবল শ্মশানই দেখিলাম, বাবা, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যে ভয়ঙ্কর একক যুদ্ধের কাহিনীতে পরিপূর্ণ, উহাও মর্মে মর্মে বুঝিলাম। মনে হয়, ঢাল ও তরবারীরও বুঝি বিশ্রাম নাই। গীতায় বলিয়াছেন, ‘‘জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি’’ ‘‘আত্মাই জয় এবং আত্মাই অধ্যবসায়।’’ অধ্যবসায় তো সমস্ত জীবনই প্রত্যক্ষ করিলাম; জয়রূপী আত্মাকেও দর্শন করিব। এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াই প্রণতঃ হইলাম।

ইতি

গুরুপূর্ণিমা, বং ১৩৭২
ইং ১৯৬৫, কলের্গতাব্দা ৫০৬৬

প্রণতঃ
সত্যানন্দ

গ্রন্থকারস্য

জীবনযুদ্ধের সব কথাই সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল। যাঁহারা জীবনযুদ্ধের কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তাঁহারা হয়তো ইহার কোন কথাই জানিতে পারিলেন না। আমার জানাই ছিল না যে জীবনযুদ্ধের এ সব কথা লিখিবার চেষ্টা করা হইবে। ভারত ভাগ এবং বঙ্গদেশ ভঙ্গ হইয়া যে বিপর্যয় চক্ষের সামনে আসিয়া গিয়াছে, এখন সেই বিপর্যয় ভিন্ন আমার দৃষ্টির সামনে অন্য কোন ঘটনাই দৃশ্যমান হয় না। অনুসন্ধিৎসু সে সব মনুষ্য এখন কে কোথায় তাহাও জানা নাই। কংগ্রেস, মুসলমান এবং ইংরেজ অদ্যকার বিপর্যয়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কংগ্রেসের নেতাগণ, মুসলমান জনতা এবং ইংরেজ জাতি এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু ভারত এই বিপর্যয়ে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভারতের সীমানার মধ্যেই স্থায়ী বিক্ষোভ এবং চারিদিকের আক্রমণ। ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মেরুদণ্ডও ভগ্নপ্রায়। আমার জীবনটি এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের একজন নিশ্চল সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। কারণ, আমার জন্মকাল হইতেই সব ঘটনার সূত্রপাত ধরা যাইবে। গুরুগণের অসীম আশীর্বাদ, দেবতাগণের অসীম স্নেহ এবং মহাশক্তির সীমাহীন করুণা যে সত্যানন্দের আত্মবিকাশ আটকায় নাই। কাশীর স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মভূষণ মহাশয় আমাকে আমার ‘‘জীবন কথা’’ লিখিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার খুবই ইচ্ছা ছিল, আমি ষড়দর্শন বিষয়েও কিছু লিখি। এবং ক্রমবিকাশ গ্রন্থ খণ্ডগুলিকে এক খণ্ডে প্রকাশ করি। কিন্তু কতটা হইবে, জানি না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে সমবেত বহু বিদ্বানগণের মধ্যে বলিতেছিলেন ‘‘আমিই এই সাধুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি, আমিই বাহির করিয়াছি।’’ তিনি হয়তো আমার আরও খোঁজ পাইবার জন্যই আমাকে লেখনী ধারণ করিয়া জীবনকথাও লিখিতে বলিয়াছিলেন। আমার জীবনকথার বেশী কিছু গুরুদেবও জানিতেন না, তিনিই ডায়রী লিখিবার জন্য হাতে মসীসিক্ত লেখনী ধরাইয়া ঘাড় ধরিয়া লিখাইয়া ছিলেন। অতি গোপন জীবনকথার সবই সাধ্যমত প্রকাশ করিলাম। সবই সত্য বলা হইয়াছে। ১৮ বৎসর পূর্বে একদিন রাত্রি বারোটায় বিকট ‘‘পু’’ ধ্বনিতে ঘোষিত হইল ‘‘ভারত খণ্ডিত ও স্বাধীন হইল।’’ এই ধ্বনির সঙ্গে ঘনঘোর অন্ধকার শরীর ও মন প্রাণকে ঘেরিয়া ধরিল। নির্জন পাহাড়ে বন্যজন্তুর সামনে আশ্রমের গোধন রক্ষায় অগ্রসর হইবার সময়, আমার হৃদয় কম্পিত হয় নাই। শঙ্খচূড় সর্পকে ফণা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মতালুর উপর দংশনে উদ্যত দেখিয়াও আমার হৃদয় কম্পিত হয় নাই। কিন্তু খণ্ডিত ভারত এবং স্বাধীন ভারতের ‘‘পু’’ ধ্বনি আমার শরীর মন ও প্রাণকে ঘোর অন্ধকারে ঘেরিয়া ধরিয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডবগণ বারো বৎসর বনবাসী ছিলেন। তখন জতুগৃহদাহে পাণ্ডবগণের মৃত্যু ঘোষিত হইয়াছিল। তাহার পর, তাঁহারা অজ্ঞাতবাসে চলিয়া যান।

আজ ভারতের অধ্যাত্মবাদী জনতা, সকলেই যেন অজ্ঞাতবাসে চলিয়া গিয়াছেন। ষাট সত্তর বৎসরের অহিংসাবাদের পাপ ভারতকে আজ কিরূপ অপদার্থ করিয়াছে, উহা ভাবিতে আশ্চর্য হইতে হয়। যবন তোষণ, সাইমন বর্জন, কম্যুনেল অ্যাওয়ার্ড, প্রভিন্সিয়েল অটোনমী, ফেডারেশন, দেশ ভাগ, র‍্যাডক্লীপ বাঁটোয়ারা, বেরুবাড়ী, হিন্দীভাষা, জহর-জ্যোতি, জহর-ছাই, চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল, চীনের হিমালয় গ্রাস, কচ্ছের রান, একতরফা রিফিউজী, পাকিস্তানী মুসলমানদের ভারতে প্রবেশ, হিন্দীভাষা, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুদের সর্বনাশ, ইত্যাদি শত শত ঘটনার আমি সাক্ষী আছি। কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দন নাই। আমরা বলি দেশ ভাগ করিবার পর সম্পত্তি ও লোক বিনিময় করিলে কোটি কোটি জনতা যে বাঁচিয়া যাইত, ইহা বুঝিবার মত শক্তি ও নীতিজ্ঞানও কি তোমাদের ছিল না? পশ্চিমের মতবাদে দীক্ষিত দলগুলি আরও অপদার্থ ও মূর্খ। এবং প্রতি পদক্ষেপে ইহারা কি এক কাল্পনিক প্রগতির মূর্খতার প্রচার করে এবং ভারতকে দুঃখের মহাসাগরে ডুবাইতে বদ্ধপরিকর রহিয়াছে। সবই যেন ভারতের অধ্যাত্মবাদ রক্ষক হিন্দুজাতির সর্বনাশের জন্য পরিকল্পিত সর্বনাশের কঙ্কালমালা! যুধিষ্ঠিরবাদের তোষণনীতি পাণ্ডবগণকে কিরূপ ক্লীব করিয়াছিল, উহার শেষ অধ্যায় দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের রণে, অর্জুনের বিষাদ যোগ অধ্যায়ে। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছিলেন, দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিতে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন এবং আঠারো অধ্যায়ে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভারতব্যাপী আজ ভয়ঙ্কর দুর্দশা ও দুর্দিন চলিয়াছে। পথে-ঘাটে, রেলে, বাসে, খাদ্যে, বস্ত্রে, দুগ্ধে, ঘৃতে, তৈলে, আফিসে, কোর্টে, সর্বত্র দুর্নীতি ও অত্যাচার, কিন্তু কোথাও কোন প্রতিবাদ বা স্পন্দন নাই। শ্রীকৃষ্ণের গীতার শ্রোতা অর্জুন যেন আজও অজ্ঞাতবাসে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কম্যুনেল হইবার ভয়ে, হিন্দু জনতা যেন ভীত শঙ্কিত এবং স্তব্ধ। কংগ্রেস যে দিন মূর্খের মত সাইমন কমিসন বর্জন করিল সে দিন হইতেই ভারতের এবং হিন্দুদের দুর্দশার সূত্রপাত। ইহার শেষ পরিণতি ফেডারেশন বর্জনে ভারতভাগ রূপে দেখা দিল। আমরা বলি, এত সব বিরোধ করিলে, ভারত ভাগটা বিরোধ করিলে না কেন?

পাঠকগণকে বলিয়া রাখি, শিবপ্রবর্তিত ভারতের শক্তিসাধনার ফল্গু নদী আজও প্রবাহিত আছে। ভারতের আদি গুরু শিব হইতে আরম্ভ করিয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের ১৪১ সংখ্যক গুরুগণের পদতলে মস্তক নত করিয়া শক্তিবাদ সাধক সত্যানন্দ উহারও সাক্ষী আছে। শক্তিসাধনাই আমার জীবনের কথা এবং দুর্বলবাদ ও অসুরবাদকে ধ্বংস করিবার মনস্তত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্বই আমার শক্তিবাদ। এই গ্রন্থে আমার জীবন-কথা এবং আমার সাধনার সব কথাই বলিলাম। যদি একজনও, এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হয়, মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়, তবেই জানিব, শক্তিবাদের পাঞ্চজন্য আবার বাজিবে, গীতার শক্তিবাদ শুনিবার মত বীর অর্জুন একজনও ভারতের রণক্ষেত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইতি -

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মঠের সন্ধানে। প্রিয় ও পরিচিত তপঃভূমি। বাল্যকালের দুইটি স্বপ্ন : একটিতে তপস্যার বেশ অন্যটিতে সংসারের আকর্ষণ। গৃহত্যাগ ও গুরুলাভ । মায়ের কথা। যোগী সন্তান, সন্তান মোহ। নাগদেবতা। অমর্ত্য লোটা। মাঠের মহাপ্রস্থান। পাগলা গুরু।

বাল্যের প্রসঙ্গ। ঠাকুরমা, জটাধারী বালক, পাগলানাথ শিব, রতন কাকা, কেরাণী ও চাকর। ভিটার দাদা, নোংরা রীতি, সীতারাম। বিদ্যারম্ভ, ঠাকুরমামা, বাল্যের ধর্মশিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষা, পূজাপার্বণে পবিত্র পরিবেশ। অরুণবাবু, জায়গাজমি, রামপাল। মিরকাদিম, কমলাঘাট, নৈদীঘির পাথার, জায়গাজমি, সচ্ছল জীবন। মায়ের শ্মশানযাত্রা। সূর্যাস্ত ক্রন্দন, পশুদের মাতৃস্নেহ, ঢাকার নবাব, স্বরাজ ও উচ্ছৃঙ্খল যুবক।

বন্দেমাতরমের কথা। হিন্দু মুসলমান প্রীতির নামে মুসলমান তোষণ ও মুসলমানদের দুর্নীতি, রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা, জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী। স্বদেশভক্তি, বৈষ্ণবধর্ম।

প্রথম দীক্ষা। স্বপ্নদৃষ্ট মঠ ও গুরু, ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রম, সিদ্ধ শবাসন, মঠের রান্না, বাল্যের সাধনা ও বিভূতি। বেলুড় মঠ, চেতলা ভক্তাশ্রম, অভয়ানন্দ স্বামীজীর কাটোয়া আশ্রম।

দীক্ষার পর মধ্যজীবন। গুরুর আদেশ, কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানময় জীবন চাই। স্বরাজ আন্দোলন, খগেনবাবু, সি. আর. দাস, মুসলমান তোষণ, ভারত ভাগের পূর্বকথা, বন্যার জলে বিপন্ন জীবন। চুনারের আশ্রম, গুরুসেবা, গো-সেবা, যোগজীবন। আচার যুদ্ধে প্রথম টক্কর। ছোটকা বাবা, কালিকানন্দজী, সরলানন্দজী, সুরেশানন্দজী, জ্ঞানানন্দজী। আশ্রমের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গুরুদেবের সঙ্গে আচার টক্কর বিষয়ে লম্বা আলোচনা। কুম্ভমেলা, বিন্ধ্যাচল, ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ যুবকের সতেজ উক্তি। নিবারণ সাধু, গেরুয়া তলাও, হিন্দী পঠন ও বেতন কথা। পায়ে ঠেকিয়া অশুদ্ধ দ্রব্যের শুদ্ধিকরণ, অছুঁতের মন্দির প্রবেশ, বাসন স্পর্শ।

অভিষেক। পবিত্র পরিবেশ, কমলা মা, অভিষেক পূজা, নারীর সংস্পর্শ, তিলকাঞ্চন, শ্রাদ্ধ, অধিবাস, দীক্ষা। গেরুয়া ধারণে কমলা মায়ের আপত্তি, কমলা মায়ের স্বল্পজীবন ও মহাপ্রস্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চুনারের পাহাড়ে আনন্দাশ্রম। গুরুদেব চাষের পক্ষপাতী, আশ্রমের অনুষ্ঠানপত্র। সেবাসদন। সরস্বতী ভবন। গোশালা, বানপ্রস্থ পীঠ, ব্রহ্মচর্য আশ্রম। আশ্রমের বাড়িঘর, কষ্টদায়ক পরিকল্পনা। ডাঃ উপেনবাবু। গুরুদেবের উইলে শিষ্যদের অনধিকার নীতি, কাশীর বড় গণেশের আশ্রম। গুরুর স্নেহ ও উচ্চ প্রতিষ্ঠা দান। আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া

গুরুদেবের তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সমস্যা, ভবেশ্বরজী। দেহত্যাগের পরও গুরুর অসন্তুষ্টির ভাব ও মীমাংসা। শ্যামবাবু ও দুর্গাপ্রসাদজীর সঙ্গে আশ্রম বিষয়ে শেষ কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আনন্দাশ্রমে সাধুসঙ্গ। আর্যসমাজী সাধু, ইংরেজ ভদ্রলোক ও পুত্র, ধবলগিরি ও নক্ষত্রলোক লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তীর্থ, ‘‘সাধন সমরের’’ সাধুগণ, আনন্দময়ী মা, স্বামী পাগলানন্দ, ভারতধর্ম মহামণ্ডলের স্বামী বিবেকানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানানন্দজী, স্বরাজের আগমনে মানব চরিত্রের ভয়ঙ্কর অধঃপতন, চুনার পাহাড় ও তপঃভূমি।

চতুর্থ অধ্যায়। ব্রহ্মচর্যের কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাহাড়ের আশ্রমে গো-পালন। ভবেশ্বরজী। গাভীর মাতৃস্নেহ, শঙ্খচূড় সাপ, গোশালায় বন্যজন্তুর উপদ্রব, গো-জাতির আনুগত্য পরীক্ষা। আশ্রম ত্যাগ ও গিরিগুহায় আশ্রম।

ষষ্ঠ অধ্যায়, অসুখবিসুখ। জীবন একক।

সপ্তম অধ্যায়।

অবাধ্য ও নিয়ম লঙ্ঘনকারী সন্তানদের উপর কঠোরতা। কাক, হিংগুয়া, শিকারী, ঘুঘু। মহিষাসুর বধ। পশুর জন্মান্তর কথা। কুকুর জন্ম।

অষ্টম অধ্যায়, সাধনা ও অনুভূতি।

বাল্যকালের সাধনা ও দর্শনাদি। দীক্ষা ও গুরুপাদুকা ধ্যান। চিদাকাশ, আরুণি ক্রিয়া, নাদানুভূতি, কুণ্ডলিনী জাগরণ। মধ্যরাত্রিকৃত্য, মহাসন্ধ্যা। স্থূল ভূতশুদ্ধি। বন্ধনত্রয় প্রাণায়াম। মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ। মহাবেধ। নাভিক্রিয়া। যোনিমুদ্রা। পেশন ক্রিয়া, বিপরীতকারিণী, সর্পমুদ্রা, কাকচঞ্চু, শ্বাসমুদ্রা। সূক্ষ্ম ভূতশুদ্ধি; কুণ্ডলিনী পূজা। ২নং ভূতশুদ্ধি। সহজোলী, অমরোলী, বজ্রোলী মুদ্রা। মানস জপ। মানস হোম। মধ্যরাত্রি কৃত্যের পরিশিষ্ট। ব্রাহ্মমুহূর্ত কৃত্য। অজপা জপ সমর্পণ।

নবম অধ্যায়, গ্রন্থিভেদের কথা।

মাতৃস্নেহ। মন্ত্রযোগ সাধনা। নিত্যপূজায় অনুভূতি। আমার জপের মালা।

দশম অধ্যায়, রাজযোগের সাধনা।

সপ্ত যোগভূমি। সপ্ত জ্ঞানভূমি। ষোড়শাঙ্গ রাজযোগ, সরস্বতী। (১) শাস্ত্রজ্ঞান শ্রবণ মনন, (২) যম, (৩) নিয়ম, (৪) ত্যাগ, (৫) মৌন, (৬) দেশ, (৭) কাল, (৮) আসন, (৯) মুখবন্ধ, (১০) দেহ সাম্য, (১১) দৃকস্থিতি, (১২) প্রাণসংযম, (১৩) প্রত্যাহার, (১৪) ধারণা, (১৫) আত্মধ্যান, (১৬) সমাধি, অজপা।

একাদশ অধ্যায়, মঠরহস্য।

চারটি ব্যক্ত মঠ, চারটি অব্যক্ত মঠ, তিনটি স্থূল অব্যক্ত মঠ, তিনটি সূক্ষ্ম অব্যক্ত মঠ। সাতটি মঠ, মঠাম্নায় গ্রন্থ। দশনামী সন্ন্যাসী তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। কৌপীন পঞ্চক। হস্তলিখিত তন্ত্র গ্রন্থাবলী, গরীবপুর আশ্রম। শঙ্করাচার্যের জীবনকথা। সুধন্বার তাম্রশাসন। শক্তিবাদ প্রবর্তন। বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী। 'সন্ন্যাস ও সরস্বতী' সম্বন্ধে গুরুদেবের আদেশ। ''ওঁ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।'' ''ওঁ হং সঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।'' আনন্দমঠের সরস্বতী। আদি গুরু ও আদি জ্ঞানী শিব। শক্তিমান গুরুগণ। গৌরপাদ লিখিত গ্রন্থাবলী। প্রস্থান ত্রয়। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী। গুরুদেব কর্তৃক লোহার মানুষ গঠনের পরিকল্পনা।

দ্বাদশ অধ্যায়, সদ্গুরু প্রসঙ্গ।

আমার গুরু সচ্চিদানন্দ মহারাজের জীবন কথা। সরস্বতী ও সত্যানন্দ। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল। কঠোর জীবন। পাহাড়ের মঠে দুর্গাপূজা। রান্না। কাশীধামে গুরুদেব কর্তৃক যজ্ঞ ও বৃক্ষের পূর্ণাহুতির জন্য বেল দান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী। অন্তিম সময়, আত্মানন্দজী। গরীবপুরের মঠ। ভৈরবীমার স্নেহ ও আশীর্বাদ। স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী। ২৯ বৎসরে কঠোর তপস্যা। রঘুবীর সহায় ভার্গব। জগদীশ নারায়ণ শ্রীবাস্তব। কাশীর ভাস্করানন্দ সমাধিস্থান। গুরু প্রসঙ্গ, দেবু মা। আমার গুহার জীবনের সুখদুঃখ কথা। ক্রমবিকাশ বই লেখা। আকাশবৃত্তি। গুরুদেবের সঙ্গে শেষ দেখা। গুরুদেবের সঙ্গে মিথ্যা কথন বিষয়ে আলোচনা। শেষ কয়েকদিন গুরুদেবের আহার গ্রহণে সত্যানন্দের নীতি গ্রহণ। গুরুদেবের দেহত্যাগ ও হিন্দী আজ পত্রিকা। ১৯৩২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে শরীর ত্যাগ। গড়িয়া শক্তিবাদ মঠে গুরুদেবের জন্মোৎসব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়, প্রারব্ধ।

ক্রিয়মান, সঞ্চিত, প্রারব্ধ কর্মের দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান। জন্মজন্মান্তর কথা ও আঘাত প্রতিঘাত। ফলাফল।

চতুর্দশ অধ্যায়, নানাস্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

চুনারের ভৈরবগুহা সিদ্ধ তপঃভূমি। যোগীরাজ মহারাজ ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরির রাজ্য ত্যাগ ও যোগীজীবন। অমর ফল কথা। চুনারের প্রাচীন ইতিহাস। ত্রিকোণ গ্রামের অপভ্রংশ টিকোর। সংস্কৃত পাঠশালার অব্যবস্থা, সংশোধন কথা। কংগ্রেস রাজ্যে পুলিসের নির্দেশ। সাধুর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার। ইংরেজ শাসনকালের অভিজ্ঞতার

দৃষ্টিতে কংগ্রেস পুলিসের ভয়ঙ্কর অধঃপতন। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ ও বঙ্গভঙ্গ। মুসলমানের দুর্নীতি। আলমোড়া ভ্রমণ। পুরীধাম। মুক্তাগাছা, আহারান্তে মাতৃস্মরণ, প্রতিমাদেবীর ভ্রাতৃলাভ। ব্রহ্মদেশের কথা। হিন্দুলামা। বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মে বৃহদাকার মসজিদ্ ও খ্রীষ্টানদের মঠ। ব্রহ্মের জাতীয়দেবতা। ব্রহ্মের একটিমাত্র সংগীত স্বর। খড়ম সমস্যা। ব্রহ্মদেশের রাজনীতি, নেতাদের কথা। আমেরিকার বিদ্বান রাষ্ট্রদূত সেক্রেটারী। ব্রহ্মদেশে আমার অনেক বক্তৃতা। Durgapuja is not for the Buddhists। Durgapuja and philosophy of Shakti cult। Durgapuja। Shaktibad। দার্জিলিং। লামার বৌদ্ধবাদ মন্ত্রের দীক্ষা। কেদার ও বদ্রীনারায়ণ ভ্রমণ। রমেন্দ্র মল্লিক। ধর্মশালা। তীর্থস্থানে মক্কাবাদীদের বর্বরতা। হৃষীকেশ স্বর্গাশ্রম। কংগ্রেসের রামরাজ্য। রামচটি ও শিবস্থানের দৈবী প্রভাব। ত্রিযুগী নারায়ণ, শিবপার্বতীর বিবাহ অগ্নি। পার্বতীর তপঃভূমি গৌরীকুণ্ড। তুঙ্গনাথ। কেদারনাথ ও মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড। বদ্রিনারায়ণ। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বন্দীদশা ও হত্যা।

পঞ্চদশ অধ্যায়, পথেঘাটে।

(১) স্বদেশভক্তি। (২) নেপালীদের প্রভুভক্তি। (৩) দার্জিলিঙে বর্ধমান রাজ-ভবন। (৪) পূজারীর যজমানের উপর ক্রোধ ও শাপ দান। (৫) কোতোয়ালের রামভক্তি। (৬) পাহাড়ের মঠে চাকরের চুরির প্রতিফল। (৭) মঘা নক্ষত্র। (৮) অতুলবাবু ও গুরুদেব। (৯) মূর্তিতে শক্তি আছে কি? (১০) কংগ্রেসী উকিলের সাধু-বিদ্বেষ। (১১) বান্দর ও গাভী গড্ কিনা? (১২) গড্ কি ঈশ্বর? (১৩) দেশের দুর্দশা। (১৪) মাস্টার মহাশয়ের অবিচার। (১৫) শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধ। (১৬) সাধু ও নারী। (১৭) ভারত ভাগের পূর্ব কথা, আজাদ সাহেব। (১৮) দুধে জল ও প্রতিশোধ। (১৯) ভারত কল্যাণ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। (২০) ছোট ভাই বড় ভাই। (২১) নেহরুর পর শাস্ত্রীজী। (২২) নবীন মুসলমান। মক্কাবাদী নেমাজ। (২৩) ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। (২৪) শক্তিবাদের প্রভাব। (২৫) ভারতের প্রধানমন্ত্রী। (২৬) রাষ্ট্রভাষা। (২৭) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। (২৮) সুভাষচন্দ্র জীবিত কিনা। শক্তিবাদ মঠ। বিদ্যার্থী ভবন ও মন্দির। মঠে মূর্তি স্থাপনা। ১৯৬৩ সনের ২রা সেপ্টেম্বর মঠের সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়, আমার শক্তিসাধনা।

দশমহাবিদ্যা ও জাগ্রত দেবতা। ব্রহ্মনাড়ী ও সূর্যদেবতাই সাধনার মূল। বৌদ্ধবাদ এবং শক্তিবাদ ধর্মের পতন। কালী মন্ত্র। শ্মশান সাধনা। কালীমূর্তি শিবমূর্তি। কালীমূর্তিই ব্রহ্ম। কালীর মূর্তি দর্শন। কালী ও ব্রহ্মসূত্র। কালী ধ্যানের শক্তিবাদ ভাষ্য। গান্ধীজীর মক্কাবাদ তোষণ ও ভারতের সর্বনাশ। আচার্য শঙ্করের কালী স্তুতি। তারা সাধনা। তারা ধ্যানের শক্তিবাদ ভাষ্য। ত্রিপুরা সাধনা। পঞ্চকূটের দীক্ষা মন্ত্র। তারা ন্যাসের মর্মকথা। ত্রিপুরা সাধনায় ন্যাস। ত্রিপুরা ধ্যান।

শ্রীবিদ্যাযন্ত্র ধ্যান রহস্য। পীঠপূজা। কামনাসিদ্ধি আরত্রিক। মুদ্রা। সিদ্ধির লক্ষণ। মহাবিদ্যার সাধনাই উন্নত শক্তিসাধনা ও বগলা। ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, ম্লেচ্ছ ও যবন হইতে ভারতের মুক্তি।

সপ্তদশ অধ্যায়, আমার ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা।

মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা, অর্ধনারীশ্বর। হিন্দুধর্ম কি ত্যাগেরই ধর্ম, হংসপীঠ। গুরু পাদুকা অবলম্বনে সাধনার আরম্ভ ও শেষ পর্যন্ত নানা স্তরের কথা। যোগদীক্ষার প্রথম দীক্ষা। পঞ্চানন মহাদেব পঞ্চতন্মাত্রা। যোগদীক্ষার দ্বিতীয় ক্রম। প্রাতঃস্মরণে গুরুস্তোত্র, যোগদীক্ষার তৃতীয়ক্রম। চতুর্থ ও পঞ্চমক্রম। চারিপ্রকার সাধক লক্ষণ, আচার্য শঙ্কর ও যোগদীক্ষা, শঙ্করের যোগতারাবলী। আমার ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার শেষ দীক্ষা, মহাপূর্ণ দীক্ষা। অর্ধনারীশ্বর যোগে "ওঁ হ্রীঁ" "হংসঃ" "হেসৌ" ইত্যাদি। সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম, সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, সচ্চিদেকং অহং ব্রহ্ম। শিব কি মানব। সিদ্ধদশায় সীমাহীন কর্মশক্তি। সাধনার পক্ষে দীক্ষার প্রয়োজন। সমাজের জন্য সহজ ও এক উপাসনার গায়ত্রী ব্রহ্মস্তোত্রম্, মহামন্ত্রম্ ও ব্যাখ্যা।

অষ্টাদশ অধ্যায়, জন্মকুণ্ডলী।

জন্মাঙ্ক, যোগবল, প্রবজ্যাযোগ। শক্তিবাদ সাধনার মনোগ্রাম ব্যাখ্যা। গ্রন্থ সমাপ্তি।

প্রথম অধ্যায়

মঠের সন্ধানে। বাল্যকালেই মঠের সন্ধানে মন আলোড়িত হইতে লাগিল - গুরু চাই; সাধনার নিয়ম জানিবার অদম্য স্পৃহা মনের মধ্যে সর্বদা জাগ্রত। মনের কথা মনেই থাকে। এই অবস্থা কিছুদিন চলিয়াছিল।

পাশাপাশি দুইটি পাহাড়। মধ্য দিয়া একটি ছোট ঝরনা প্রবাহিত। উহারই একটি পাহাড়ের ধার দিয়া একটি পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথ। ছোট ছোট গাছে পাহাড় দুইটি ঢাকা আছে। পবিত্র ও মিষ্ট হালকা বাতাস। পথ অবশ্যই রহিয়াছে, কাজেই লোকজনের যাতায়াতও ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমার মানসচক্ষে কোন লোকেরই যাতায়াত দেখা যায় নাই। পাহাড় দুইটি উত্তর দক্ষিণে বিলম্বিত, কাজেই একটি পাহাড় ঝরনার পূর্ব দিকে এবং অন্যটি পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। পশ্চিম দিকের পাহাড়ে আমার মানস-তপঃভূমি। হয়তো কোনও জন্মে আমি এই স্থানেই তপস্বী ছিলাম। আমার পরিধানে গৈরিক বসন, পায়ে কাঠের খড়ম। আমার মনের মধ্যে দিন রাত এই স্বপ্নময় দৃশ্য ভাসমান থাকে। আমার বাল্যকালের ইচ্ছাই আমার প্রধান মনস্তত্ত্ব। আমি কাহাকেও আমার ওই পবিত্র তপঃভূমির কথা জানাই নাই। আমার তপঃস্থানের কথা কেহই জানে নাই। আমি ওই মানসদৃশ্যে সর্বদাই মুগ্ধ; ইহা স্বপ্ন, কি জাগরণ, কি ইহা বাস্তব কোন দৃশ্য, তখনও আমি উহা বিচার করিতে শিখি নাই। খড়ম ও গৈরিক বস্ত্র পরিহিত অত্যন্ত সরল ও সহজ জীবনে অভ্যস্ত আমি ওই স্থানে বিচরণ করিতেছি প্রায় সময়ই দেখিতে পাই। এক যুগের মানসদৃশ্য অন্য যুগের বাস্তবরূপে স্থানটি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সেই স্থানটি এখনও আছে। তবে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। ওই পথটি একযুগে যাহা পশ্চিম দিকের পাহাড়ের পাশ ধরিয়া চলিয়াছিল এখন তাহা পাহাড়ের পূর্ব দিক ধরিয়া অবস্থিত। হয়তো কয়েক শত বৎসর পূর্বে ওই পথটি পশ্চিম দিকস্থিত পাহাড়ের ধার ধরিয়াই অবস্থিত ছিল। কালের গতিতে ইহা এখন পূর্বদিকে আসিয়াছে। অথবা ঝরনার দুই দিকেই দুইটি পথ ছিল। এখন একটি আছে, অন্যটি অস্তিত্বহীন হইয়া গিয়াছে। আমিও কোন জন্মে বাল্যযোগী অবস্থায় ওই পাহাড়ী পথের ধারেই তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। ওই পবিত্র স্থানটি হইতে চুনারের প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ি মন্দির দেড় ফারলং উত্তর দিকে বর্তমান। আমি স্থানটি অনেক বার দেখিয়াছি। নিরালা নির্জনে ওই স্থানে শত শত দিন প্রভাতে ঊষাকালে ভ্রমণ করিয়াছি, ময়ূরের নৃত্য দর্শন করিয়াছি। হরিণের দলগুলিকে বিস্ময়ে অবলোকন করিয়াছি। অতীতের বাল্যকালের দৃশ্য ও এ জন্মের বাস্তব রূপ আমাকে আজও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

গুরুদেবের আশ্রম ত্যাগ করিবার পর আমি পতিতপাবনী মা গঙ্গার ধারে ধারে বহুস্থানে অবস্থান করিয়াছি। ভগ্নদশাগ্রস্ত মন্দির, উন্মুক্ত গঙ্গাতট, গিরি-গুহা এবং নির্জন পাহাড় আমার নিবাসস্থল ছিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় প্রতিদিন ওই তপঃভূমিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছি।

জীবনে দেশ-বিদেশ, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছি। আবার ফিরিয়া চুনারে আসিয়াছি এবং ওই প্রিয় স্থান দর্শন করিয়াছি। আমার সমস্ত জীবনের পবিত্র অনুভূতি, স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি আজও আমার প্রাণকে ডাকে। উহারা যেন আমায় নিজের স্নেহের কোলে পাইতে চায়। আমাকে জড়াইয়া রাখিতে চায়। সন্দেহ নাই, ইহা রসহীন শুষ্ক পাহাড়ভূমি; কিন্তু ইহা অত্যন্ত পবিত্র তপঃভূমি। ওগো পাথরের দেশ, প্রস্তরময় বনভূমি, প্রস্তরের গুহা, পাথরের মধ্যে পরিবর্ধিত অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু বৃক্ষ ও লতাবর্গ! তোমাদের স্নেহ আদর আমি ভুলি নাই। আজও লোকের নিকট ইহা বিস্ময়কর ঘটনা, যে পাহাড়, জঙ্গল, পাথর ও নির্জন ঝরনা কি ভাবে একজন অন্নহীন বস্ত্রহীন বালক মানুষকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে? কিন্তু আমার নিকট ইহা বাস্তব সত্য যে ইহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আদরের কোলে আশ্রয় দান করে, ইহাদের স্নেহ আদরের মধ্যেই নিশ্চিন্ত ভাবে আত্মরসে মজিয়া থাকি। তপস্যাই আমার বাল্যজীবনের খেলার সাথী, তপস্যাই আমার যৌবনে জীবনীশক্তি, তপস্যাই আমাকে আজও মায়ের মত ঘেরিয়া থাকে। বনের পশু, সর্প, পক্ষী ও শ্বাপদগণ আমাকে বিস্ময়ে দর্শন করিয়াছে, আপন করিয়া লইয়াছে।

মানুষ মানুষের মধ্যেই স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা পাইতে চায়। কিন্তু আমার জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে নিশ্চয়ই করিয়াই বলিতে পারি, মানুষের স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা অত্যন্ত চঞ্চল। এ জন্য ইহা ছলনাময়। মানুষ আত্মজ্ঞানের খুব নিকটস্থ জীব, এ জন্য মানুষ মানুষের মধ্যেই স্নেহ ও ভালবাসা আহরণ করিয়া তৃপ্তি পাইতে চায়। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত জীবে স্নেহ ভালবাসার স্পর্শ না পাইলে মানুষ ভালবাসার প্রকৃত মাধুর্য অনুধাবন করিতে পারে না। বাল্যের মনস্তত্ত্বই আমাকে তপস্বী ও নিরালা বনচারী তপস্বী করিয়াছে। আমার আহার নিদ্রা বা লোকের সাহায্যের কথা বা সেরূপ কোন দিকেই আকর্ষণ ছিল না, লোকের স্নেহ ও শ্রদ্ধাকেও আমি কোনও দিন মূল্য দিতে শিক্ষা করি নাই। ইহার প্রধান কারণ আমার তপস্যাকালীন জীবনধারা বাল্যকালের মনস্তত্ত্বের যথাযথ বাস্তব রূপ ছিল।

বাল্যকালের দুইটি স্বপ্ন। বাল্যকালের মনস্তত্ত্বের মূলকথা আমি বলিলাম। এবার বাল্যের দুইটি স্বপ্নের কথা বলিব। আমার জীবনকথার প্রধান অংশ আমার বাল্যের মনস্তত্ত্ব। ওই মনস্তত্ত্বই আমাকে গৃহত্যাগী করিয়াছে, দিব্যাচারী সাধনার পথে নামাইয়া দিয়াছে ও কঠোর তপস্বী ও যোগী করিয়াছে। মানুষ যাহাকে কঠিন মনে করে, অবাস্তব বলিয়া ভাবে, অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে, সেই সব পরিস্থিতি আমাকে মোটেই অসম্ভব বলিয়া মনে করায় নাই। প্রকৃতি আমাকে শুষ্ক পর্বতে প্রচুর স্নেহ ও তৃপ্তির রস আহরণ করিবার শক্তি দ্বারা বাল্যকালের মনস্তত্ত্বই ঢালিয়া দিয়াছে। ভয় ভাবনা সঙ্কোচ আমাতে দেখা দেয় নাই। আকাশ, বাতাস, ধরিত্রী, বন, জঙ্গল, পশু, পাখী এ সব লইয়াই আমার বাল্য ও যৌবনলীলা।

তের বৎসর বয়সে স্বপ্ন দেখিলাম। অনেক ভ্রমণের পর আমি একটি প্রাচীন ও ভগ্নদশাগ্রস্ত মঠে প্রবেশ করিয়াছি। সেখানে একজন মহাপুরুষ বারান্দায় পাকা মেঝের উপর মাদুরে বিশ্রামের অবস্থায় আছেন। আমি সেখানে মহাপুরুষকে দর্শন করিবামাত্র প্রণাম করিলাম। প্রণত হইবার পরই মাথা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ আমার বুকের

উপর তাঁহার দক্ষিণ পদ স্থাপনা করিলেন এবং একটু ধ্যানবিভোর হইয়া আত্মপরায়ণ হইলেন। এই অবস্থায়ই আমার স্বপ্ন শেষ হইল। বুঝিলাম ইনিই আমার গুরুদেব। তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ কেশ, গোঁফদাড়িও আধপাকা। মনে হইল ছেচল্লিশ বৎসর বয়স হইবে।

এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পরই আমি বুঝিলাম, আমার আর বেশীদিন সংসারে থাকা চলিবে না। স্বপ্নদর্শনের পর ওই সব পাহাড় ও বনজঙ্গলের কথা বেশ কমিয়া গেল, এবং মনে মনে স্থির করিলাম, গুরুদেবের খোঁজে বাহির হইতে হইবে।

বাল্যের দ্বিতীয় স্বপ্নটির কথাও বলা প্রয়োজন। একটি হাটের মধ্যস্থানে একটি গৃহ। গৃহটির চারিদিকে চারিটি বারান্দা। প্রত্যেকটি বারান্দাই তিন দিকে বেশ শক্ত লোহার সিকে বেশ ভাল ভাবে আবদ্ধ। আমি উহারই একটি বারান্দায় পায়চারি করিতেছি। হঠাৎ দেখা গেল সেখানে একটি ফ্রক-পরা মেয়ে। এগারো বারো বৎসর বয়স হইবে। সেও আমার পিছনে পিছনে বেড়াইতেছে। মেয়েটির দৃঢ় বিশ্বাস সে তাহার স্বামীকে বশীভূত করিয়া ভবের হাটে আটকাইবে। মেয়েটি অতীব সুন্দরী, সাদা লাল এবং হলুদ রঙ মিশ্রিত নানা রঙের সুন্দর পরিষ্কার ফ্রকটি সে পরিধান করিয়াছে। তাহার চক্ষের সাদা রঙ এবং চক্ষের জমি দুইটি কৃষ্ণবর্ণ। মুখে প্রসন্ন ভাব, সরল চাহনী, হৃদয়ভরা ভালবাসা। তাহার ধারণা স্বামীকে সে বশীভূত করিতে সক্ষম। স্বামী যদি সংসার না করে, তবে সে স্বামীর সঙ্গে যাইবে। স্বামীও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে সে সংসারে আর থাকিবে না, তপস্যার জীবনে স্ত্রীকেও সঙ্গে রাখিবে না। কিন্তু পালাইবার পথ নাই। বারান্দাটা চারিদিকেই লোহার গরাদে বেশ শক্তভাবেই বদ্ধ। বালক স্বামী এতক্ষণ একাকী ভ্রমণ করিতেছিল এবং মেয়েটিকে দেখিয়া সে একটু চিন্তিত হইল। মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণ করে এবং সুবিধা পাইলেই স্বামীর দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে মুখ ফিরায়। চার চক্ষের মিলন হইলেই স্বামীর হৃদয় কম্পিত হয়। হঠাৎ দেখা গেল বন্ধ বারান্দাটিতে একটি ছোট খিড়কীদ্বার রহিয়াছে। স্বামী ভাবিল, এই ছোট দ্বারপথে সে চলিয়া যাইবে, মেয়েটিকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া সে পলায়ন করিবে। মেয়েটি ঠিক ছায়ার মত স্বামীকে অনুসরণ করিতেছিল। মেয়েটি স্বামীর মনোভাব সবই বুঝিতেছিল এবং সেও দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হইতেছিল। হঠাৎ স্বামী খিড়কীদ্বার খুলিয়া অন্য বারান্দায় প্রবেশ করিল, এবং অতি শীঘ্র খিড়কীদ্বারটি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটি অস্বাভাবিক চতুর। সে ঠিক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই অন্য বারান্দায় আসিয়া গিয়াছে। সে স্বামীর দিকে তাকাইয়া স্বামীকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া অতিশয় তৃপ্তির আনন্দে স্বামীর দিকে তাকাইল। স্বামী গভীর ভাবে আবার পথ খুঁজিতেছে। প্রথম বার খিড়কীটি এমন ভাবে বন্ধ হইয়া গেল যে উহা যে কখনও দ্বার ছিল, তাহার চিহ্ন রহিল না। একই ভাবে স্বামী তিনটি বারান্দা অতিক্রম করিল, মেয়েটিও স্বামীকে অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করিল। প্রত্যেক বারই মেয়েটির চালচলন হাবভাব একই রকম হইতেছিল। চতুর্থ বারান্দায় স্বামী সত্যই বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু মেয়েটি শেষ বারান্দায় আটকাইয়া গেল। স্বামী মেয়েটির কথা কোনও প্রকার বিবেচনা না করিয়া তপস্যায় চলিয়া গেল। স্বামীর তপোভূমিটি শুষ্ক দেশ। ঘাসগুলি শুষ্ক হইয়াছে। ছোট ছোট জংলী ফুলগাছগুলি ফুল ফলে পরিপূর্ণ। মেয়েটির সরল ভালবাসা এবং তাহার উপর এই নিষ্ঠুর আচরণ আমার মনে একটু দাগ

কাটিল। আমি মেয়েটির ভালবাসা ভুলি নাই, তাহার উপর নিষ্ঠুরতাও আমার মনে গভীর ভাবেই অঙ্কিত রহিল। আমার তপস্যার বেগ অত্যন্ত প্রবল; সংসার, ভালবাসা ও মিলনে আমার কোনই আকর্ষণ নাই। দ্বিতীয় স্বপ্নটি যে ভয়ঙ্কর ইহাতে সন্দেহ নাই। একটি মেয়ের আকর্ষণে যে বাস্তবজীবনে একজন সাধককে সংসারে আবদ্ধ করিতে সক্ষম, ইহার প্রমাণ তো আমি নিজেই দেখিলাম। ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য-জীবনের কল্পনা আমার খুবই ভাল লাগে, পবিত্র মনে হয়। আর সংসার এবং নারীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন আমি চক্ষের সামনে লক্ষ লক্ষ দেখিতেছি উহাতে আমার এক বিন্দুও আকর্ষণ নাই।

বাড়িঘর, সংসার, স্ত্রী, ভালবাসাময় সংসারজীবন আমার সামনেই রহিয়াছে। আবার তপস্যায় পবিত্র চিত্ত এবং সিদ্ধগুরুর কৃপা ও স্নেহও আমার মনে দাগ কাটিয়াছে। ইহা সত্য ঘটনা যে, স্বপ্নকালে আমি মেয়েটির সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। ইহা সত্য ঘটনা যে, নারীর ভালবাসার মধ্যে যে প্রচুর রস আছে উহারও আভাস স্বপ্নের মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছি। আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারি, নারীর ভালবাসার পরিণতি অতীব ভয়ঙ্কর এবং অতীব জটিল। ওই ভালবাসাটুকুই সুন্দর, কিন্তু উহার পরিণতিতে যাহা লাভ হয় উহাতে কোনও রস নাই। উহা রসহীন এবং আনন্দহীন কঙ্কাল জীবন। ওই স্বপ্ন বিষয়ে আমি স্থানান্তরে আবার আলোচনা করিব। স্বপ্নটি আমাকে সংসার ত্যাগেরই প্রেরণা দিয়াছিল। কারণ আমি শুনিয়াছিলাম, মেয়েরা নাকি পুরুষগণকে সংসারী করিয়া দিতে সক্ষম।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমি সত্যই গৃহত্যাগ করিলাম এবং বহুস্থান ভ্রমণের পর ষোল বৎসর বয়সে চুনারের গঙ্গাতটে গুরুদেবের আশ্রম এবং গুরুদেবকে পাইলাম। সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাত্মা, সেই স্বপ্নদৃষ্ট প্রাচীন মঠ। আমি অভিভূত হইলাম।

বাল্যে আমার মনের মধ্যে তপঃভূমির কাল্পনিক চিত্র এবং স্বপ্ন দুইটির প্রভাব যে মনকে অন্য রকমে গড়িয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগ করিব, বনজঙ্গলের তপস্বী হইব - ইহা একদিন কল্পনামাত্র ছিল। কিন্তু স্বপ্ন দুইটি যে আমাকে সেই তপস্যার দিকে বাস্তব মন গঠনে প্রধান কারণ হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। বাড়িতে গাভী ও বাচ্চাগুলি ছিল। আমি তাহাদিগকে ভালবাসিতাম, যত্ন করিতাম, সেবা করিয়া আনন্দ পাইতাম। আমি তাহাদের উপর কর্তব্যহীন হই নাই, ইহা সত্য ঘটনা; কিন্তু আমার মনে ওই সব কাজে আর কোনই রস ছিল না। সংসারের সব কাজই আমি অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতাম। কিন্তু ওই স্বপ্ন দুইটির পর আমার কোন কার্যই ভাল লাগিত না। বাড়ির পূজাপাঠ ও উৎসবাদিতে আমার আনন্দ ও সেবা প্রচুর ছিল, কিন্তু ওই আনন্দও যে আমি আর বেশীদিন গ্রহণ করিতে পারিব না, ইহা ভাবিয়া আমার কান্না পাইত। মনোজগতের পরিবর্তনের দরুন আমার লেখাপড়ায় ক্ষতি হইল। আমি সবই বুঝিতাম কিন্তু আমার মন সংসার ব্যাপারে একদম রসহীন হইয়া গিয়াছে। বাল্যখেলায় কালীমূর্তি গড়িয়া পূজা খেলার কথা আমার বেশ মনে আছে। যে কোন পুতুল খেলার উপাদান ছিল ফুল বেলপাতা এবং সব খেলার মধ্যেই আমার প্রচুর আনন্দ ছিল। বাড়ির দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, শিবরাত্রি, সমস্ত পূজা ব্রত ও ধর্মকার্যে আমার উৎসাহ ও সেবা কিরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, সবই আমার মনে

আছে। কিন্তু মনের পরিবর্তনের পথে আমি অন্যরকম মানুষ হইয়া গেলাম। গৃহত্যাগ ভিন্ন আমার জন্য আর কি পথ খোলা থাকিতে পারে? একজন চোদ্দ বৎসরের বালক একটা স্বপ্নের মোহে গৃহত্যাগ করিল। সেই বালককে লোকে পাগল না বলিয়া কি বলিবে? আমি মনের কোন কথাই আলোচনা করিতাম না। কিন্তু এই ভাবেই মঠের সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। গুরুর দর্শনও লাভ করিলাম। ইহা যে আমার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর ও জটিল অধ্যায়, ইহাতে আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে? যে স্থানে গুরুদর্শন হইল সেস্থান হইতে আমার কাল্পনিক তপঃস্থান দুই মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত।

আমি ট্রেনে গিয়াছিলাম। রাত্রিকালে গাড়ি হইতে স্টেশনে নামিলাম। স্টেশনের শুষ্ক ও মিষ্ট বাতাসের স্পর্শ পাইয়াই বুঝিলাম, আমি সেই ভূমির নিকট হইয়াছি, যে ভূমির নিকটে আমার তপস্যার স্থান অবস্থিত। এবং ইহা নিশ্চয়ই সেই দেশ যে স্থানে আমি গুরুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম। এবং ইহা নিশ্চয়ই সেই দেশ যেখানে আমি ভবের হাটের বন্ধন অতিক্রম করিয়া তপস্যায় চলিয়া গিয়াছিলাম। স্টেশনের চারিদিকে নিম ও অশ্বত্থ বৃক্ষগুলিতে হাওয়া লাগিতেছে, রসহীন সবুজ পাতাগুলিতে সেই বায়ুপ্রবাহ দুলিয়া দুলিয়া সন্ সন্ শব্দ ঘোষণা করিতেছিল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। রাত্রিকালটুকু স্টেশনে কাটাইয়া সকালবেলা গুরুর সন্ধানে বাহির হইলাম। বেশ সহজেই গুরুর দর্শন লাভ করিলাম।

মায়ের কথা। আমার তেরো বৎসর বয়সে আমার মা মারা যান। তখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের আরম্ভ, আমি বৈকালবেলা বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া ‘আহার করিব’ বলিয়া মাকে খোঁজ করি। তিনি তখন রান্নাঘরের পিছনে কলতলায় অশক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছেন। আমাকে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, “আমি অনেকটা পায়খানা করিয়াছি, এখন আর উঠিতে পারি না।” আমি তখন সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং উঠাইতে চেষ্টা করিলাম। উঠাইতে পারিলাম না, কিন্তু বসাইয়া দিলাম। মা বসিতে পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন। বলিলেন, “ঠাকুরমাকে ডাক।” আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরমাকে ডাকিয়া আনিলাম। এবং দুইজনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া মায়ের বিশাল শরীরখানাকে আমাদের বাড়ির বড় ঘরে বহন করিয়া আনিলাম।

বাড়িতে অনেক হিস্যা। এবং অনেকগুলি বড় বড় টিনের ঘর। আমাদের দিকেই পাঁচখানা ঘর। ইহার মধ্যে রান্নাঘর, নিরামিষ রান্নার ঘর ও বড় ঘর ভিন্ন আর সব ঘরগুলি বারো মাস নিরালায় পড়িয়াই থাকে। ইহা ভিন্নও দুর্গামণ্ডপের বাড়িতে মণ্ডপঘর এবং বৈঠকখানার ঘর আছে। আমি সেই দিকে থাকি। বড় বাড়ি। অনেক হিস্যা। একদিকে কোন ঘটনা ঘটিলে অন্যদিকে সেই সংবাদ যাইতে বেশ সময় লাগে। মাকে বড় ঘরের মেঝের উপর বিছানায় শয়ন করাইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। পল্লীর এবং বাড়ির মেয়েরা প্রচুর সাহায্যের মনোভাব লইয়া নিকটে আসিলেন।

ঠাকুরমার কথায় বুঝিলাম, মায়ের কলেরা রোগ হইয়াছে। মায়ের শরীর শীতল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহার হাত পা মুড়িয়া যাইতেছে। বড় ঘর, খুব উঁচু চালা। আমি মধ্য গৃহে বড় আগুন জ্বালিলাম। কুড়ি পঁচিশখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বালিশ

নামাইলাম। আগত মহিলারা আমাকে বালিশগুলি গরম করিয়া দিতে লাগিল। আমি মায়ের হাত পা ও শরীর সেঁক দিতে লাগিলাম। মা যখনই বলিতেন "আমার হাত মুড়িয়া গেল, পা মুড়িয়া গেল, শীঘ্র সোজা কর" - আমি তৎক্ষণাৎ গরম বালিশের সাহায্যে তাঁহার পা এবং হাত আমার বুকে রাখিতাম এবং বুক ও হাত এবং বাহুর শক্তি প্রয়োগ করিয়া হাত পা সোজা করিতে লাগিলাম। এ ভাবে কিছুক্ষণ চলিবার পর মা একটু আরাম পাইলেন। পিতা বাড়িতে নাই। বাড়ির কোন সদাশয় যুবকও বাড়ি নাই। আমাদের কেরানীটিও বাড়ি নাই। চাকরটিও বাড়িতে নাই। বড়দাদা বিদেশে চাকুরী করেন। আমার বড় বোনের মাত্র দুইদিন পূর্বে একটি বাচ্চা জন্মিয়াছে। তিনি আঁতুড় ঘরে। তিনি অশক্ত। গরুগুলি গোশালায়। তাহারা তৃণহীন ও দিনান্তে জনহীন অবস্থায় রহিয়াছে। মাকে একটু সুস্থ দেখিয়া আমি গোশালায় প্রবেশ করিলাম এবং তাহাদিগকে খাদ্য ও জল পান করাইয়া পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে মাকে ঘরে আনিবার পর মা মাত্র দুইবার দাস্ত করিলেন এবং রাত্রি দশটায় শরীর ছাড়িলেন। মাকে কখনও কম শ্রদ্ধা করি নাই। তাঁহাকে প্রাণ দিয়াই ভালবাসিতাম। তবুও তিনি চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্বদিনই তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তিনি আর এ সংসারে থাকিবেন না।" মার ক্লান্তিমাখা সাদা মনখানা আমার এখনও মনে আছে। তাঁহার শ্রান্ত চক্ষু দুইটির চারিদিক ঘেরিয়া কালো রঙ ধরিয়া গিয়াছিল। তিনি প্রায় দুই দিন বড়দিদির সন্তান প্রসব ঘটনায় অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই শ্রান্তি না লইতেই মহাকাল তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন। আমারও "মা" বলিয়া আবদার শেষ হইল। এই সময় মায়ের বয়স চুয়াল্লিস বৎসর হইয়াছে। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তিনি আপার প্রাইমারী পাস করিয়াছেন। সংসার করতে আসিয়া তিনি অনেক সন্তানের মা হইয়াছেন, তাহাতেই হয়তো তাঁহার মাতৃতৃষ্ণা মেটে নাই। পিসীমারা দুজনেই অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তান সংখ্যা মোট চারটি। মা তাহাদিগকেও পালন করিয়াছেন। ভাগিনেয়দের সন্তান হওয়া কালে মায়ের আশ্রয়েই আসিতেন। তিনি বলিতেন ঘরে ছোট বাচ্চা কান্নাকটি না করিলে তাঁহার মন খালি লাগে। তিনি কখনও সাজগোজ করিতেন না। গহনাও পরিতেন না। তীর্থযাত্রার কথা কেহ বলিলে তিনি বলিতেন বাচ্চারাই তাঁহার তীর্থ। গহনার কথা ঠাকরমা বলিলে, বলিতেন, বাচ্চারাই তাঁহার গহনা। তিনি সকলের উপর স্নেহশীলা ছিলেন। বাড়ির সব ছেলেমেয়েগণের উপর তাঁহার স্নেহ ছিল। পাড়ার মেয়ে এবং ছেলেদের উপরও তাঁহার স্নেহ ছিল। সন্তানগণের লোভ, চৌর্য এবং মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস যাহাতে স্থান না পায় সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও কড়া শাসন ছিল। তিনি এবং পিতা বাল্যকালেই বংশের গুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী কুলদেবতা ছিলেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার ইষ্টমন্ত্র স্মরণ আছে কি না? মা বলিলেন, হ্যাঁ, মনে আছে। মহিলা বলিলেন তবে জপ কর। মা "আচ্ছা" বলিলেন এবং একটু মোড়া খাইলেন এবং চলিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার শেষ কথা।

আমার বিষয়ে মায়ের একটু অসাধারণ ধারণা ছিল। তিনি বলিতেন, তাঁহার এই ছেলে যোগী হইবে, তবে তিনি উহা দেখিতে পাইবেন না, এই কথাও তিনি দৃঢ়তার সহিত

বলিতেন। বারদীর নাগবাবুদের ঝি সরমা একসময় মাকে বলিয়াছিলেন, মা ঐ মা! তোমাদের সঙ্গে আমরা আবার সম্বন্ধ করিব। তোমার এই ছেলে বড় হইলেই আমরা প্রস্তাব করিব। আমি তখন উলঙ্গ, নিকটেই খেলা করিতেছি। মা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন - তোমরা এ ছেলের বিবাহের কথা বলিও না, এ ছেলে যোগী হইবে, তবে আমি দেখিব না। আর সকলে দেখিবে। মায়ের হয়তো ধারণা ছিল যে ছেলেকে বিবাহের কথা বলিলেই সে গৃহত্যাগ করিবে। এজন্য তিনি প্রসঙ্গ উঠিলেই বলিতেন, বিবাহের কথা এঁকে বলিও না। আমার দ্বিতীয় স্বপ্নটি মায়ের ধারণার একটি সাক্ষী।

কালা জ্যাঠাইমার ধারণা আমি ভাল গৃহস্থ হইব। কারণ বাল্যকাল থেকেই আমি সংসারের সমস্ত কাজে নিপুণ ও অনলস ছিলাম। পাড়ার মহিলারাও আমার দ্বারা বহু কাজ করাইয়া লইতেন। জ্যাঠাইমা আমার সামনে মাকে বলেন, তোর এই ছেলে ভাল ও নিপুণ সংসারী হইবে। মা তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, ‘‘তোমরা ঐরূপ বলিও না দিদি, আমার এই ছেলে যোগী হইবে, তবে আমি এতদিন বাঁচিব না। তোমরা দেখিবে।’’

মায়ের বাচ্চাদের ওপর একটু অস্বাভাবিক মোহ ছিল। কোন ছেলে মারা যাইব, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে রাজী নহেন। পূর্ববঙ্গে ঝড়ের আস্ফালন একটু বেশী। ঝড় উঠিলেই মা সব ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি ডাকিয়া ঘরে আনিতেন এবং বাহিরে উঠানে একখানা পীঁড়ি বিছাইয়া ঘরে আসিতেন। এবং দেবতাদের নাম করিয়া নানাপ্রকার প্রার্থনা করিতেন। বলিতেন, পবন, পবন ঠাকুর বস, পবন ঠাকুর শান্ত হও। ইত্যাদি।

মায়ের নিকট দুইটি নাগদেবতা আসিতেন। ইহাদের একজন নাগ, অন্যজন নাগদেবী। এঁরা মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেন। এবং কোলে চড়িয়া স্নেহ আদর লইবার জন্য বায়না করিতেন। স্তন্যপান করিতে চাহিতেন। মায়ের এঁদের ওপর খুবই স্নেহভক্তি ছিল। এঁরা কোলে চড়িয়া স্তন্যপান করিবেন এবং ইঁহাদের জন্য ঠাকুরঘর করিতে হইবে এই ছিল তাঁদের আবদার। ইহাতে তিনি রাজী হন নাই। ইঁহারা নিত্য আসিয়া বায়না ধরিতেন। বায়না না শোনায় একদিন পায়ের আঙ্গুল কামড়াইয়া দেন, এর পরই মা অসুস্থ হন। মা তাহাতেও রাজী হন নাই। মা এঁদের কথা কাহাকেও বলিতেন না। কিন্তু নানারকমে অসুস্থ থাকিতেন। চিকিৎসায় ফল হইত না! ঠাকুরদাদা গ্রামের এক বৈরাগী বাবাজীকে ওইসব অসুখের কথা বলেন। তিনি বলিলেন, কোন দেবতার নজর আছে। আপনি পূজা ও আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমি শিবের পূজা করিব। এবং শিবের আদেশ হইলে, তখন আপনারা সব জানিতে পারিবেন। শিবের পূজা দিবার পর বৈরাগী বাবাজী সব বলিয়া দেন। ঠাকুরদাদা ও বৈরাগী বাবাজী মাকে স্তন্য দিতে এবং নাগদেবতার মন্দির করিয়া দিতে রাজী হইতে বলেন। মা রাজী হন নাই। মায়ের ধারণা, এসব দেবতাদের আশ্রয় দিলে সন্তান মারা যাইবে। শেষ পর্যন্ত ইহাই স্থির হইল যে দুর্গামণ্ডপের বেদীতে নাগগণ অবস্থান করিবেন এবং নিত্যসন্ধ্যা দীপকালে অন্য মণ্ডপে লইয়া স্তন্য টিপিয়া ওদের দুগ্ধ পান করাইবেন। ঠাকুরদাদা একটু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। নাগ দুইটি কালো রঙের ছিল। এবং লম্বায় একবিঘৎ ছিল। দুর্গাপূজার বেদীতে যেখানে মায়ের ঘটস্থাপনা হইত সেইস্থানে খুব ছোট দুইটি গর্ত ছিল, তাঁহারা ওই স্থানে অবস্থান করিতেন। আমার অন্নপ্রাশনের পূর্বদিন পর্যন্তও নাগগণ আসিতেন। কিন্তু অন্নপ্রাশনের পূর্বদিন আমার একটি নাম দান করিয়া তাঁহারা অন্তর্হিত হন। মা আমার নিকট

অনেকবার নাগদেবতাদের কথা বলিয়াছেন। বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতেন। বলিতেন, ওঁদের কথা মনে হইলে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়। ওঁরা অর্থ ও ঐশ্বর্য দিবার কথা বলিতেন। মা বলিতেন, আমার বাচ্চারা বাঁচিয়া থাকুক, আর কিছুই চাই না। আমার মনে হয় আমার যোগী জীবন সম্বন্ধে মায়ের যে সব ধারণা ছিল, উহার মূলে হয়তো নাগদেবতাদের কোন নির্দেশ আছে। আমার উপর নাগদের আশীর্বাদ আছে। আমি সর্পসঙ্কুল বনভূমিতে জীবন কাটাইয়াছি। অনেক বিষধরের সম্মুখীন হইয়াছি। সাক্ষাৎ যম গোক্ষুর সাপের উপর অলক্ষ্যে পা দিয়াছি। কিন্তু তাহারা কোনই অনিষ্ট করে নাই।

অমর্ত্য লোটা। আমাদের রান্নাঘরের পেছন বেশ লম্বা এবং গভীর গর্ত ছিল। ওই গর্তে প্রায় বারো মাসই জল থাকিত। বর্ষাকালে গর্তটায় জল বৃদ্ধি হইত। ওই গর্তের চারিদিকে বিষকচুর বন ছিল এবং বেতের জঙ্গল ছিল। উহার পশ্চিম ধারটায় অনেকগুলি বাঁশ ঝাড় ছিল। ওই স্থান মোটামুটি অগম্যই ছিল। ওই গর্তের আশপাশে একটি অমর্ত্য লোটা থাকিত। দিনরাতের মধ্যে প্রায় শতবার ওই লোটাটি (ছোট ঘটি) ঘুরিয়া বেড়াইত। আমরা রাত্রিতে আহার করিতে বসিয়াছি, সেই সময়টুকুর মধ্যে ওই লোটাটি হয়তো তিন চারবার ঝপ করিয়া জলে ঝাঁপ দিত এবং বুগ্ বুগ্ আওয়াজে তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া ডুব দিত। মা ইহাকে ‘‘ছিটালিয়া লোটা’’ বলিতেন। সে গড়াইয়া গড়াইয়া চলে, গাছে চড়ে গড়াইয়া গড়াইয়া সাঁতার কাটে। মা ওকে বহুবার দেখিয়াছেন। আমি কখনও দেখি নাই। ঠাকুরমাও অনেক দেখিয়াছেন। তাহার সব ইন্দ্রিয়শক্তিই ছিল, তবে গমনশক্তি ও শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। একদিন সেই ঘটিটি গর্তের ধারে আসিয়াছিল, মা তাহাকে দেখিতে পাইয়া ঠাকুরমাকে আঙুল দিয়া দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে অতিদ্রুত গড়াইয়া জলে চলিয়া যায়। মা বলিতেন, অমর্ত্য লোটায় কতগুলি কানাকড়ি আছে। উহা কোন লোকের সঞ্চিত ধন। ধনলোভে এবং ধনরক্ষার জন্য সেই বেচারা মৃত্যুর পর প্রেত অবস্থায় উহাতে আশ্রয় লইয়াছে। এবং সেই লোটা লইয়া ঘোরাফেরা করে। এ সব ধনে লোভ করিতে নাই। এ সব ধন স্পর্শ করিলে মানুষ মারা যায় বা সন্তান মারা যায়। আমার কিন্তু মনে হইত ওই লোটায় মূল্যবান ধন আছে। কানাকড়ি সঞ্চয় করিয়া মানুষের এত কি লোভ যে উহাকে আশ্রয় করিয়া যুগ যুগ প্রেত হইয়া জলে জঙ্গলে পায়খানার ধারে গাছে ও বাঁশের ঝাড়ে বেড়াইবে! মার ভীষণ ভয় যদি আমাদের ধনলোভ হয়, উহারই খোঁজ করিয়া প্রাণ হারাই। এই জন্যই হয়তো বলিতেন, উহাতে ‘‘কাণা কড়ি আছে।’’ মা বলিতেন, লোটাটায় শেওলা ধরিয়া গিয়াছে, বিশ্রী রঙ হইয়াছে। মা বলিতেন, অনেকসময় মানুষ মাটির নীচে ধনভাণ্ডার পায়, স্বপ্ন পায়, উহার লোভ করিলে, স্পর্শ করিলে মানুষ মারা যায়। সংসার ছাড়িবার পর অমর্ত্য লোটার কোন সংবাদই আমি শুনি নাই। জিজ্ঞাসাও করি নাই।

মায়ের মৃত্যুর পর বড় জ্যাঠাইমা মায়ের মুখের নিকট মুখ রাখিয়া বলিতেছিলেন, চিরজীবন বাচ্চা বাচ্চা করিয়া হয়রান হইলি এবং শেষকালে বাচ্চা রাখিয়া নিজেই চলিয়া গেলি! আমিও ভাবি, সন্তানস্নেহে আত্মহারা মা সমস্ত লৌকিক সম্পদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আজ ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে মহাপ্রস্থান বরণ করিলেন।

বাবা ও মায়ের গুরুদেব এক পাগলা ঠাকুর ছিলেন। পাগলা ঠাকুর বংশগত গুরুবংশের লোক ছিলেন। বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই আমাদের বাড়িতে থাকিতেন।

এবং মাঝে মাঝে পাগলামি করিতেন। কিন্তু অত্যন্ত স্নেহশীল এবং ভালমানুষ ছিলেন। আমি ও মেজদিদি অনেক সময়ই তাঁহার নিকট থাকিতাম এবং তাঁহার আজগুবী গল্প ও কথা শুনিতাম। মা বাবা এবং ঠাকুরমার এই পাগলা ঠাকুরের উপর অসীম শ্রদ্ধা ও সেবা ছিল। সেই যুগের গুরু শিষ্যের স্নেহ ও সেবাসূত্র কত গভীর ছিল, তাহা এই পাগলা ঠাকুরের আচরণে বুঝা যায়। তিনি নিত্যনিয়মিত সন্ধ্যাপূজা করিতেন, এবং নিজে রান্না করিয়া আহার করিতেন। মা সব যোগাড় করিয়া দিতেন। দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্বে পাগলা ঠাকুরের পাগলামী বৃদ্ধি পায়। তিনি বাড়ি চলিয়া যান। বাড়িতে গিয়াই তিনি পরলোকগমন করেন। পাগলা ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মা বাবা এবং বাড়ির অন্যান্য শিষ্যদের মুখের উপর যেরূপ বেদনার ছায়া পড়িয়াছিল তাহাতে মনে হইত, তাঁহারা সত্যই পিতৃহীন হইয়াছেন। তাঁহারা পাগলা ঠাকুরের শ্রাদ্ধের জন্য অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন এবং ঠাকুরবাড়ি যাইলেন।

বাল্যের প্রসঙ্গ

খুব বাল্যের কথা আমার মনে নাই। হয়তো কাহারও বাল্যকথা বেশী মনে থাকে না। সামান্য কয়েকটি কথাই আমার মনে আছে।

পাগলনাথ। আড়াই বৎসর বয়সে আমি ‘‘পাগলনাথ’’ গিয়াছিলাম। পাগলনাথের অন্য নাম ‘‘পাগলা’’। ইহা ঢাকার নিকটবর্তী ফতুল্লা নামক স্থানের নিকটস্থিত একটি সিদ্ধ পীঠস্থান। এখানে খোলা বৃক্ষতলে অবস্থিত একটি শিবলিঙ্গ আছে। পাগলায় আমার মুণ্ডন সংস্কার হইয়াছিল। ঠাকুরমার মানত ছিল, পাগলনাথে গিয়া মুণ্ডন করা হইবে। পাগলনাথের শিব এবং সেই স্থানের সমস্ত পরিবেশের কথা আমার আজ পর্যন্ত একই ভাবে মনে রহিয়াছে। যখন আমার বয়স সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ তখন আমার ইচ্ছা হইল পাগলনাথে যাইব এবং মনের ঘটনার কথা মিলাইব। যাইয়া দেখিলাম, বাবা পাগলনাথ ঠিক সেইরূপই আছেন, সেই বিশাল বৃক্ষতল, সেই শিবলিঙ্গ, স্নানের সেই ঘাট, যেখানে আমার গা হলুদ মাখাইয়া স্নান করানো হইয়াছিল। সবই একই রকম রহিয়াছে। জীবনে কত অসুখ বিসুখ হইয়াছে, কত পরিবর্তন, কত বাসস্থানের অদল বদল হইয়াছে। এই শরীর ও মনের উপর দিয়া কত ঝড় ঝঞ্ঝাট বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য আমার অন্তরের পাগলনাথ একইরূপ রহিয়া গেলেন!

পাগলনাথের নামে চুল মানত হইবার পর, আমার মাথার জটা হইয়াছিল। মাথার চারিদিকে চারটি এবং মধ্যমাথায় একটি। এইভাবে পাঁচটি বড় জটা হইয়া উহার আয়তন হাঁটু পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। একে তো সরল বালক মূর্তি তাহার জটার সৌন্দর্য, সুতরাং বাল্যের রূপটি সকলের চক্ষে দিব্য ভাব জাগাইতে ছিল। পাঁচটি জটা হয়তো পঞ্চমুখ শিবের প্রতীক ছিল। কোন কারণে বিরক্তি হইলে আমি জটা ধরিয়া টানিতাম এবং ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতাম এবং কাঁদিতে থাকিতাম। আমার শরীর ও মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত। ঠাকুরমা তৎক্ষণাৎ ঘটি করিয়া জল আনিয়া ‘‘জয় পাগলানাথ’’, ‘‘জয় বিশ্বনাথ’’ বলিয়া মাথায় জল ঢালিয়া দিতেন। আমি তৎক্ষণাৎ শান্ত হইতাম। ধনী গরিব

উচ্চ নীচ হিন্দু মুসলমান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে আমাকে স্নেহ করিত। কোনও সময় খেলিতে খেলিতে বাড়ির বাহিরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কেহ না কেহ কোলে তুলিয়া গ্রামান্তরে এবং দূরে দূরে লইয়া যাইতেন এবং অনেকক্ষণ পর ফিরাইয়া দিয়া যাইতেন। ইহাতে ঠাকুরমা ভীষণ ব্যস্ত হইতেন এবং কান্নাকাটি করিতেন। মা কখনও আমার জন্য ব্যস্ততা দেখাইতেন না। বাবা, রতনকাকা এবং ঠাকুরমা সর্বদা খেয়াল রাখিতেন, যাহাতে আমি বাড়ির বাহিরে না আসি। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা ছিল। কাজেই কেহ আমাকে লইয়া গেলে, কেহ না কেহ তাহা দেখিতেই পাইত। এবং বাড়িতে সংবাদ দিত। ভোলানাথের কৃপায় আমার কোনই বিকার ছিল না। কেহ আপন করিয়া লইলে, আমি তাহারই আপনার হইয়া যাইতাম এবং নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

রতনকাকা আমাদের বাড়িতে কেরানীর কার্য করিতেন; জমি-জমা ও তালুকের কাগজপত্র লিখিতেন। বাড়িতে সেই সময় দুই-তিনজন কেরানীও থাকিতেন। কেরানীদের মধ্যে রতনকাকা ও দেবেনদাদার কথা আমার খুবই মনে জাগে। রতনকাকা আমার জন্মের পূর্বে আমাদের বাড়িতে আসেন এবং আমার সাত-আট বৎসর বয়স পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। চাকুরী ছাড়িয়া দিবার পরও রতনকাকা সর্বদা আমাদের বাড়িতে আসিতেন এবং বাড়ির বড় বড় পূজা পার্বণ এবং উৎসবাদিতে যোগ দিতেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে আমি সন্ন্যাসীর বেশে নারায়ণগঞ্জ গিয়াছিলাম। তিনি সংবাদ পাইয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি সেই দিন মৌনী ছিলাম। কোন কথাই হয় নাই। বাল্যকালের বহু স্মৃতিজড়িত রতনকাকাকে দেখিলাম এবং বেদনাজড়িত হৃদয়ে তাঁহার কথা অনেকক্ষণ ভাবিলাম। রতনকাকার নাম ছিল রতনমণি দত্ত। টঙ্গীবাড়ির নিকট রোয়াইল নামক গ্রামে তাঁহার বাড়ি ছিল। এঁরা জাতিতে বারুই ছিলেন। আমার স্মৃতিতে তিনি আজও পবিত্ররূপেই বিদ্যমান।

দেবেনদাদার নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এঁদের বাড়ি ছিল লজারিয়া নামক গ্রামে। আমাদের বাড়িতে থাকিতেই এঁর কলেরা হয় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে নৌকায় করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে পাঠানো হয়। বাড়িতে যাইবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। মা তাঁহার জন্য কান্নাকাটি করিতেন। মাকে তিনি "মাসীমা" ডাকিতেন। বাল্যের কথা মনে করিয়া আমার সেই যুগের সমাজ-জীবনের বহু কথা ভাবিতে পারি। তাঁহারা ছিলেন কেরানী, কিন্তু তাঁহারা অন্য পরিবারের লোকের মতন ছিলেন না। এঁরা ভিন্নও বারো মাস বাইরের কাজের জন্য মুসলমান চাকর থাকিত। এত বড় পরিবার, এত লোকজন, কিন্তু মা'র রান্নার কার্যে চাকর বা ঝি থাকিত না। রান্নাবাড়া, জলতোলা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য মা নিজের হাতে করিতেন। এ যুগের তুলনায় মা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা এবং দেবী ছিলেন। ইহা ভিন্নও ক্ষেতখামারের শস্য বিষয়েই বারো মাস বাড়িতে প্রচুর কার্য ছিল। মা ও ঠাকুরমা সবই করিতেন। কখনও কখনও অবশ্যই দূরস্থিত মহিলা আত্মীয়াগণও তাঁহাদের কার্যের সহায়তা করিতেন। তাঁহারা এত পরিশ্রম কি ভাবে করিতেন, সেটা অদ্যকার যুগের সমাজে দাঁড়াইয়া স্বপ্নবৎ চিন্তা করিতেছি মাত্র। আতপ চাউল ভানা, মুড়ির চাউল করা, মুড়ি করা, চিড়া কুটা সবই তো বাড়িতেই হইত। এই সব বস্তু বাজারের খরিদা চলিত না। একটু বয়স হইলে পর, দেখা গেল, বাড়ির কাজকর্ম কিছুটা

কমিয়াছে এবং বাজারে খরিদ করা অনেক দ্রব্যদ্বারা সংসার নির্বাহের নীতি আরম্ভ হইয়াছে।

কেহ আমাকে কোন স্থানে লইয়া গেলে ঠাকুরমা অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেন। শেষকালে বাবা যখন জায়গা জমি ও কাজকর্মে বাহিরে যাইতেন, তখন অনেক সময় তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আমি সীতারামের কাঁধে বসিয়া বাবার সঙ্গে যাইতাম। সীতারাম আমাকে কাঁধে লইত এবং তাহার হাতে কাগজপত্রের বাণ্ডিল থাকিত। সীতারাম আমার বাল্যকালেই মারা যায়। সে হিন্দীভাষী* ছিল, অত্যন্ত ভাল মানুষ। এইরূপ স্থির ধীর বিশ্বাসী এবং বালকপ্রিয় স্নেহশীল মানুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুণ্ডনের পরে, আমার স্বভাবের উগ্রতা কমিয়া গিয়াছিল এবং বাল্যের শিক্ষার সময় আরম্ভ হইল। কে আমাকে প্রথম হাতেখড়ি দিয়াছিলেন উহা আমার মনে নাই। মা, মামা এবং রতনকাকা আমার বাল্যশিক্ষার গুরু ছিলেন। ঠাকুরমা রামায়ণ মহাভারত শুনিতেন, নিত্য সন্ধ্যা, শিব পূজা করিতেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিতেন না। শেষ রাত্রে তিনি নিত্য প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র খুব স্পষ্ট ভাষায় পাঠ করিতেন। আহারকালেও বিধিমত গণ্ডুষ করিয়া আহার করিতেন। সবই তিনি মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বেই আমাকে ‘‘হাসিখুশী’’ বই দেওয়া হইয়াছিল। ছবি দেখিয়া বইয়ের বিষয় আয়ত্ত করিয়াছিলাম ইহা সত্য কথা; কিন্তু আমি একটি অক্ষরও চিনিতাম না। স্বরব্যঞ্জন ও গণিত শিক্ষার এই অভিনব পুস্তকখানি কি ভাবে একটি বালকের মনকে শিক্ষার দিকে টানিয়া আনে, ইহা আমি আজ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারি। আমার লেখাপড়া আরম্ভ হয় মায়ের তত্ত্বাবধানে। মা নয় বৎসর বয়সে বিবাহিতা ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি মধ্যপ্রাইমারী পাস করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি আর লেখাপড়া করেন নাই। তিনি এবং বাবা উভয়েই বাল্যকালে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। শ্রীমহালক্ষ্মী আমাদের কুলের দেবী ছিলেন। মাকে আমি কখনও প্রাতঃস্মরণীয় স্তোত্র পাঠ করিতে শুনি নাই। ঠাকুরমার অসুস্থকালে মা শিবপূজা করিতেন। মা নিত্যনিয়মিত সন্ধ্যা করিতেন। মা সময় পাইলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন। বাবা, মা ও ঠাকুরমা সকলেই বংশগত গুরুদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বংশীয় গুরুদেব অনেককে আমি দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও নাম বা বাড়ির ঠিকানা আমার মনে নেই।

বাল্যপাঠের নিয়মে আসিবার পর, আমি বেশ কঠোর শাসনের মধ্যে আসিলাম। আমি নিত্য কলাপাতায় লিখিতাম। ভীটার দাদা আমাকে প্রায়ই কলাপাতা আনিয়া দিতেন। একখানা বড় চৌকির উপর বসিয়া আমি কলাপাতায় লিখিতাম। লিখিত পাতাগুলি সাজাইয়া চৌকিখানা ভরিয়া যাইত। লেখাপড়াকে কেন্দ্র করিয়া আমাকে অকারণ শাসন এবং অত্যাচার করা হইত। ইহা বোধ হয় ওই যুগের নীতি ছিল যে বালককে লেখাপড়ার নাম করিয়া উৎপীড়ন করা হইত। ভীটার দাদা মুসলমান ছিলেন। তিনি আমাদের পুকুরের ধারের জমিগুলিতে চাষ করিতেন। খুব ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ি আমি বহুবার গিয়াছি। খুব হৃদ্যতা ছিল। এঁরা বিছানায় বসিয়া আহার

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ‘‘হিন্দুভাষী’ স্থলে ‘‘হিন্দীভাষী’ গৃহীত হল।

করিতেন। ইহা দেখিয়া আমি ওঁদের বিছানায় আর বসিতাম না। এঁরা ভাতের হাঁড়ি হইতে এঁটো হাতেই ভাত লইয়া আহার করিতেন। আহারের পর ওই হাঁড়িতেই হাত ধুইতেন এবং সেই জলেই হাঁড়িটা ধুইয়া উপুড় করিয়া মাটিতে রাখিতেন। এ সব অনাচার আমার ভাল লাগিত না।

বাল্যশিক্ষার পাঠ আরম্ভ হইবার পরই ইংরেজী শিক্ষারও সময় আসিল। এখন মামাই শিক্ষকের স্থানে আসিলেন। শিক্ষা বিষয়ে ইনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। রতনকাকা মামাকে "স্বরেন ঠাকুরতা" ডাকিতেন। এঁদের বাড়ি বানরীপাড়া। ইনি ৺রাধাচরণ ঠাকুরতার পুত্র ছিলেন। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ইনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসিতেন এবং কয়েক মাস করিয়া থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। ঠাকুরমা মামাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দেশে এঁদের খামার ছিল। মোটা অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। মামার প্রথম বিবাহের স্ত্রী মারা যান। মামীকে আমি দেখিয়াছি। দিদিমাকেও আমি দেখিয়াছি। দিদিমার শরীর তুলার মত নরম ছিল। খুব সুন্দর পাতলা ও সাম্যমূর্তি ছিল। তিনি আমাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসেন এবং কলেরা হইয়া মারা যান। প্রথম বিবাহের পর মামা আবার বিবাহ করেন। বিবাহের পর মামা আমাদের বাড়িতে আসেন। মামা আমাদের দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। অত্যন্ত স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। আমাদের বাড়িতে আসিয়া তিনি কেরানীদের অনেক কাজ করিয়া দিতেন। এবং দিনের বেশীর ভাগ সময় ওই সব কার্যেই নিযুক্ত থাকিতেন। বিবাহের পর মামা নিজের সংসার ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বাড়িতে থাকেন, ইহা মা পছন্দ করিতেন না। মায়ের চাপে মামা কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় খুব কাঁদিলেন। তিনি কলিকাতায় যাইবেন, ইহা ভাবিতে আমার ভাল লাগে নাই। কিন্তু শিশু বা বালকের মনের বেদনা কে জানে? শিশু নিজের জীবনে যে কত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে, কে তাহার হিসাব রাখে? ঘাত-প্রতিঘাত হয়তো ঈশ্বরীয় নিয়ম। নয়তো শিশু নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যাইত। আমার পড়ার অত্যন্ত ক্ষতি হইল। আমাকে পড়া দেখাইবার লোক ছিল না। বালককে পড়ার সাহায্য করিবার লোক নিশ্চয়ই রাখা কর্তব্য। নয়তো বালকের পাঠ-প্রতিভা বিকশিত হয় না। এ বিষয়ে পিতামাতা ও অভিভাবকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। কলিকাতা হইতে মামা বানরীপাড়া যান এবং কলেরায় মারা যান। আমি মা এবং প্রসন্নকাকা অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়াই বানরীপাড়া গিয়াছিলাম। পৌঁছিবার পূর্বদিনই মামা মারা যান। আমি মামার চিতাভস্ম ও শ্মশান দেখিলাম। প্রসন্নকাকা আমাদের বাড়ির শিকদার ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীকে আমরা খুড়িমা ডাকিতাম। বাড়ির শিকদার হইলেও এঁদের সম্মান করা আমাদের শিক্ষার নীতি ছিল। মামার শিক্ষা, মামার স্নেহ এবং অভাব আমার হৃদয়ে শেলের মতন বিদ্ধ হইয়া রহিল। তাঁহার বরিশালের ভাষার স্বরটুকু আমার খুব ভাল লাগিত। মনে হয় সেই স্বর এখনও আমার অন্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে। মামার পর আমার লেখাপড়ায় আর কাহারও সাহায্য পাই নাই। আমি নিজে নিজেই পড়িতাম, এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়িতাম। অনেকক্ষণ লেখাপড়া করিলেও বাড়ির বহু কাজকর্ম আমি নিষ্ঠার সহিত করিতাম।

পাঠে মন বসিবার পূর্ব পর্যন্ত আমার যতটা ভালবাসা ঠাকুরমার উপর বেশি ছিল, সেটা বেশ কমিয়া গেল। এবং সেই ভালবাসাটা চাপা পড়িল এবং যাঁহারা পাঠ শিক্ষা

দিতেন, তাঁহারা কঠোর হইলেও তাঁহাদের উপর মনের আকর্ষণ বৃদ্ধি হইল। আমি মনের এই পরিবর্তনটা বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

বাল্যের ধর্মশিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষা। আমার মনে হয় বাল্যের ধর্মশিক্ষাই ঠিক ঠিক ধর্মশিক্ষা। সত্য বলা, নির্লোভ হওয়া, সম্মানিত লোকের সম্মান করা, চুরি না করা, উচ্ছিষ্ট বিষয়ে পবিত্র হিন্দু আচার পালন করা, কাহারও গৃহে প্রবেশ না করা - ধর্মের এই সব মূলগত শিক্ষার গুরু আমার মা। আমার মনে হয় মা যদি এ সব ধর্মের সঙ্গে আমাকে উপাসনা শিক্ষা দিতেন তবে আমি অধিক উপকৃত হইতাম। প্রত্যেক পিতামাতারই নিত্য উপাসনা করা এবং নিত্য সন্তানগণকে উপাসনা করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। আমাদের বাড়িতে বারো মাস ধর্মানুষ্ঠান হইত। চণ্ডীপাঠ, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শীতলা পূজা, মনসা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, শান্তি, নারায়ণ অভিষেক এবং অনেক ব্রতাদির অনুষ্ঠান হইত। আমার ওই সব পূজাপাঠ খুব ভাল লাগিত। সমস্ত পূজা-কার্যেই আমি বাড়িতে একটা পবিত্র পরিবেশ লক্ষ্য করিতাম। এই সব পরিবেশ আমার অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিত। আমি যেন দেখিতেই পাইতাম বাড়িঘর, আকাশ-বাতাস একটা হালকা সোনালী রঙের মূর্তি ধারণ করিয়াছে। ওই রঙের দর্শনটাকে আমার আটকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু ওই সোনালী রঙ দুই-চারদিনের মধ্যেই মিটিয়া যাইত।

মায়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি যোগী হইব। কাজেই মা আমাকে ওই ভাবেই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন এবং রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতে উৎসাহ দিতেন। আমি বাল্যকালেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করিয়াছিলাম।

মায়ের মনে আমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ধারণা থাকিলেও বাড়ির অন্যান্যদের ধারণা ছিল, আমিই সংসারের কার্যে বেশী যোগ্য হইব। আমার চালচলনে একটু উদাসীন ভাব ছিল। ইহা অনেকের মনকে বিচলিত করিয়াছিল। কাজেই, সংসারের নানা প্রকার কাজে আমাকে একটু একটু করিয়া আকর্ষণ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই চেষ্টাশীল হইয়াছিলেন। এখানে বলাই প্রয়োজন যে আমি সংসারের কোন কার্যেই অমনোযোগী ছিলাম না। আমার ইহা স্বাভাবিক জানা কথা যে শরীর ধারণের জন্য অন্ন বস্ত্র গৃহ চাই। ইহা পাইতে হইলে পরিশ্রমও করা প্রয়োজন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, অন্ন, বস্ত্র ও গৃহ বিষয়ক পরিশ্রম আমাকে নিশ্চয়ই করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, আমি ঐসব বস্তু কিছুতেই গ্রহণ করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী নই।

রতনকাকা চলিয়া যাইবার পর বাড়িতে কেরানীর কাজে অনেক লোকই আসিয়াছিলেন এবং অনেকেই চলিয়া গিয়াছিলেন। শেষকালে অরুণবাবু আসেন। এঁর নাম ছিল অরুণকুমার দে। বাড়ি ষোলঘরের নিকট কোন গ্রামে। ইনি প্রায় প্রতিদিন বৈকাল বেলা ঠাকুরমাকে রামায়ণ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং বেশ বিতর্কমূলক আলোচনা করিতেন।

আরুণবাবু আমাকে অনেক সময় জমিজমা তালুক হাট-বাজার ও সম্পত্তি বিষয়ে নানা কথা বলিতেন। কোথায় কিরূপ আয়, কি ব্যয়, কি সুবিধা, কি অসুবিধা; কোথায় কিভাবে ও সহজে দুই পয়সা আসে ও জায়গাজমি হস্তান্তর কালে কিভাবে জমিদার তালুকদার ও জোতদারের আয় হয় এবং কিভাবে জমি খরিদ ও বিক্রয় করাইবার সাহায্য করিলে আয় হয় সব বিষয়েই তিনি বিশদ আলোচনা করিতেন। আমি সব কথাই

মন দিয়া শুনিতাম, যেখানে লইয়া যাইতেন সেখানেই যাইতাম। কিন্তু সব শোনার মধ্যে এবং সব স্থানে যাওয়ার মধ্যেও আমার মনে একটা উদাসীন ভাব থাকিত। আমি জানিতাম, বেশীদিন আমাকে এসব লইয়া আর নাড়াচাড়া করিতে হইবে না। মামলা মোকদ্দমার বিষয়ও অরুণবাবু বলিতেন।

তেলী বন্দরের জমিতে আমাদের খাস চাষে চারখানা ছিল, ইহা ভিন্ন অন্যান্য বহু জমির খাজানা পাওয়া যাইত। অরুণবাবু বলিতেন, এ সব জমি অত্যন্ত উর্বরা। এখানে মাত্র এক ঘর তেলীকে আমি দেখিয়াছি। আর সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে কে জানে। এখানে গরুর ঘানি চলিত, কাজেই গোবরে ও খোলে স্থানটি অসাধারণ উর্বরা ছিল। তেলী বন্দরের জমিগুলিতে বারো মাস তরকারীর চাষ হইত। আমরা প্রায়ই তেলী বন্দরের জমি হইতে প্রচুর পরিমাণে তরকারী আনিতাম। তেলী বন্দর হয়তো অদূর অতীতে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখন ধলেশ্বরী নদী ঐস্থান হইতে দেড়-দুই মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। এসব তেলী বংশধরগণ হয়তো রাষ্ট্রবিপ্লবে বা মহামারীতে স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। দেখিলেই আমার বুকে অস্বস্তি হইত এবং মনে নানা কথা জাগিত। এখান হইতে চার মাইল দূরে রামপাল নামক স্থান। রাজা বল্লালসেন এখানে রাজত্ব করিতেন। স্থানগুলি যে বিপ্লব এবং করুণ ইতিহাস জড়িত, ইহাতে সন্দেহ নাই। তেলী বন্দরের দক্ষিণ দিকে, খালের অন্য পাড়ে মিরকাদিমের হাট। এই হাটে আমাদের তালুকদারীর অংশ এক-আনা। হাটে অনেক দোকানবাড়ি ছিল যেগুলি আমাদের খাস ছিল। মিরকাদিম সমস্ত বিক্রমপুরের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং উন্নতমুখী ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানকার দোকানবাড়ি যখনই হস্তান্তর হইত তখনই ভাল আয় হইত।

মিরকাদিম হাটটি মুরমা মৌজার একটি অংশ ছিল। এই মৌজা মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ছিল। মুন্সিগঞ্জ, মিরকাদিম, সব নামগুলি মুসলমানদেরই নাম। হয়তো মুসলমানদের দ্বারা সেন বংশের পতন কালে এসব স্থানে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুরমা মৌজা আমাদের গ্রামের নাম। এই গ্রামে বিশ ত্রিশ ঘর হিন্দু এবং বিশ ত্রিশ ঘর মুসলমান বাস করে। আর বাকী জমিতে চাষ হয়। মুরমা মৌজায় আমাদের অনেক ধান ও পাট চাষের জমি ছিল। ইহা ভিন্নও অনেক ভিটা জমি ছিল। এসব ভিটা জমিগুলির নাম ছিল। সে সব নামগুলি দেখিলেও মনে হয় এ সব বিপ্লব ইতিহাসজড়িত স্থান। রাষ্ট্রবিপ্লব বা মহামারীর প্রকোপে এসব ভিটাগুলি আমাদের পূর্বজদের অধিকারে আসে। সব ভিটার নামগুলি আমার মনে নাই, কিছু কিছু নাম আমার মনে আছে। বোরাইনার ভিটা, সাউধার ভিটা, মুদীর ভিটা, গোলকার বাড়ি, ড্যাংড়ার বাড়ি, দবার বাড়ি, রঞ্জিত রামের বাড়ি, ভূইমালীর বাড়ি, কাঙ্গবাইলার বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। অরুণবাবু যখনই এ সব জায়গাজমির কথা আমাকে বুঝাইতেন তখনই সংসারের মধ্যে মানুষের অনিত্যতার কথাই আমার মনে বেশী জাগিত। মনে হইত, এ সব লইয়া জীবন কাটাইয়া দিলে, ফলে কি দাঁড়াইবে! মানুষের জীবন কিরূপ ভীষণ অনিত্য! জায়গাজমিগুলি কিরূপ ভীষণভাবে মানবজীবনের অনিত্যতার সাক্ষী দিতেছে!

কমলাঘাট। ইহা বিখ্যাত ষ্টীমারঘাট। ইহা তীলর্দি চরের এক অংশ। ইহা ধীরে ধীরে ভাল বন্দরে পরিণত হয়। কমলাঘাটের নাম মীরকাদিম ঘাট। তীলর্দি ও কমলাঘাটে আমাদের তালুকদারীর অংশ আছে। এখানে কয়েকখানা দোকান ভিটাও আমাদের

আছে। খুব ভাল আয়ের স্থান। আমার গৃহত্যাগের পর এই কমলাঘাট বন্দরটি মুসলমানদের দ্বারা তিন চার বার লুট হয় এবং আগুন দ্বারা পোড়ানো হয়। কমলাঘাটের নিকটই রিকারী বাজার – এই উভয় স্থানের মধ্যে লম্বা-চওড়া খালি চরভূমি আছে। এই চরভূমিও তীলর্দি চরের অন্তর্গত। মুসলমানেরা এ সব স্থান একপ্রকার জবরদখল করিয়া ভোগ করিত। পরে কি হইয়াছে, আমার জানা নাই। কমলাঘাটের প্রায় সব ব্যবসায়ীরাই হিন্দু ছিল, কাজেই মুসলমানদের চক্ষে উহা সহ্য হয় নাই। এজন্যই এই বন্দর বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দেড় হাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে, মক্কাবাদের বিদ্বেষ হিংসা এবং বর্বরতা একই ভাবে চলিয়াছে। এই বিশ্বে এই ভয়ঙ্কর বর্বরতার প্রতিশোধে দৈবমানবের রোষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে কিনা কে জানে?

কমলাঘাট হইতে মীরকাদিম হাট পর্যন্ত এক মাইলের বেশী স্থান। এই স্থানের খালের ধারে পূর্ব পারে যত জমি সবই এক সময়ে আমাদের খাস চাষের অন্তর্গত ছিল। এখন উহার সামান্য কয়েক খণ্ড ভিন্ন সবই প্রজাপত্তন করা হইয়াছে। উহাতে মাত্র খাজানা পাওয়া যায়। এ সব জমি অসাধারণ উর্বরাশক্তিসম্পন্ন এবং রত্নপ্রসবা। এই খালের পশ্চিম পাড়েরও অনেক জায়গাজমি আমাদের খাস চাষের অন্তর্গত আছে।

এ সব আলোচনার পর অরুণবাবু নৈদিঘীর পাথারের কথা বলেন। ইহা একটি প্রাচীন দীঘি। ইহাতে ষোল সতের বিঘা জমি আছে। ইহা একসময় আমাদের খাস চাষের অন্তর্গত ছিল। এখন রিকারী বাজারের বিখ্যাত ধনী পালেদের নিকট ইহা মাত্র ষাট টাকা খাজানায় প্রজাপত্তন করা আছে।

আমাদের দেশের দূর দূর পর্যন্ত সমস্ত জায়গাজমি ঢাকা কলতা বাজারের তাঁতী জমিদারদের জমিদারী ছিল। এই জমিদারীতে আমাদের এক-আনা অংশ ছিল। কালক্রমে এ সব সম্পত্তির ভাগ হয়। ভাগে হাট বাজার ও বন্দরগুলি যেমন সকলের ছিল, সেইরূপ সকলেরই রহিল। আমাদের ভাগে মাত্র মুরমা মৌজাটুকু পড়িয়াছিল। অরুণবাবু বলিতেন, এই ভাগে আমাদের ক্ষতি। কারণ, আমরা দূরদূরান্তরের উপর কর্তৃত্ব ও আয়ের ভিত্তি হারাইলাম। অরুণবাবু সব কথায়ই যেন নিজেদের সম্পত্তির কথা হইতেছে, এইরূপ ভাবে কথা বলিতেন। তিনি আবদুল্লাপুর বাজারের নিকটস্থ একটি মৌজার কথা বলেন। ঐ মৌজাটি আমাদের নিজেদের ছিল। কর্তারা গৃহিণীদের প্রভাবে পড়িয়া চার টাকা খাজানা জমা না দিবার দরুন উহা সূর্যাস্ত আইনে নিলাম হইয়া যায়। এই দুর্ঘটনার পর বাবা সাবধান হইয়া যান, এবং যাহাতে সূর্যাস্ত আইনে কোন সম্পত্তি নিলাম হইয়া না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। অরুণবাবু এ সব কারণে বাবার খুব প্রশংসা করিতেন। বলিতেন - তিনি পিতৃপুরুষের প্রভাব ও সম্মান রক্ষা করিতেছেন এবং ধর্ম ও ন্যায়কে ভিত্তি করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন।

ঠাকুরদাদারা তিন ভাই। চন্দ্রমাধব সরকার, শ্যামসুন্দর সরকার এবং কালাচাঁদ সরকার। ঠাকুরদাদার একমাত্র পুত্র আমার পিতা রাজকুমার সরকার। ঠাকুরদাদাদের পিতা ছিলেন রণজিতরাম সরকার। জায়গাজমি বিষয়ে তিনিই প্রথম প্রবর্তক ছিলেন, অথবা তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র সরকার প্রবর্তক ছিলেন, ইহা আমার জানা ছিল না। তবে রণজিতরাম সরকারের নামের সঙ্গে অনেক তালুকের নাম জড়িত ছিল, ইহা আমি কাগজপত্রে দেখিয়াছি। ইহার পূর্বে হয়তো ওই দেশের অনেক স্থানই মুসলমানদের

কর্তৃত্বে ছিল। যাহা হউক, কয়েক পুরুষ পূর্বে এই সম্মানিত সরকার বংশের যিনি একা পরিচালক ছিলেন তিনি কি ভাবিতে পারিতেন যে চার টাকার জন্য একটা সম্পত্তি নিলামে দিতে তাঁহার বংশধরগণ প্রস্তুত হইবেন? অরুণবাবু অল্পবয়সী হইলেও তাঁহার মনে এ সব ঘটনা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

অরুণবাবু মামাসার ও আষাড়িয়া চর তালুকের কথা বলিতেন। এই তালুক দুইটি ঠাকুরমা ইন্দ্রমণি সরকারের নামে ছিল। ইহা ভাল আয়ের সম্পত্তি ছিল এবং এই দুইখানা তালুকে শত শত ধান চাষের খাস জমি ছিল। ইহা ভিন্ন আমাদের ছুটকা ছাটকা জায়গা জমি প্রচুর ছিল। মিরকাদিমের হাট ও কমলাঘাটের বন্দর হইতে প্রচুর আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও কমলালেবু তোলায় আসিত। ইহা ভিন্ন বাগান পুকুর ও ফলের বৃক্ষাদি আমাদের প্রচুর ছিল। বাড়িতে সাধারণতঃ তিনটি গাভী ছিল। প্রচুর দুধ হইত। দুধ ও সরের প্রধান আহারকর্তা আমি ছিলাম। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বলিতেন, ‘‘তুমি যদি এত দুধ ও সরের আহারকর্তা হইয়াও ভাল জ্ঞানী ও বিদ্বান না হও, তবে জানিব এ সব দুধ ও সার খাওয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবং শাস্ত্রও মিথ্যা হইয়াছে।’’ বাবার অনুমান সত্য হইয়াছে কি মিথ্যা হইয়াছে উহা আমি জানি না, কিন্তু ইহা আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা যে আমি অন্ন দুগ্ধ ও ফলের ব্যাপারে চিরজীবনই সচ্ছলতায় ছিলাম।

মার নাম ছিল জলদাসুন্দরী। বাবার দুই বোন ছিল। ঠাকুরদাদা পুত্র কন্যা তিনজনকেই বিবাহ দেন। এক কন্যাকে বিবাহ দেন নরোত্তমপুরের ঘোষ রায়দের বাড়িতে। অন্য কন্যাকে বিবাহ দেন নয়নগড়ের বসুদের বাড়িতে। বাবার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা সকলেই উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বাবার ভাগ্নী কোটীপতি ছিলেন। সকলেই ধার্মিক ন্যায়নিষ্ঠ দাতা ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। পিসীমারা দুইজনেই ছোট ছোট বাচ্চাগণকে রাখিয়া মারা যান। মা ও ঠাকুরমা এ সব বাচ্চাগণকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ছিলেন আমাদের অগ্রবর্তী ভাই বোন। মা’র সকলের উপর সমান বাৎসল্য ছিল। একটা বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আমরা মানুষ হইয়াছি। এই পরিবারে কোনও দিন কোনও প্রকার অশান্তি বা কলহ ছিল না। আমার বাল্যজীবন খুবই সচ্ছলতার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আমার মনে তপস্যার ভাব থাকিলেও আমি কোনও প্রকার ত্যাগ বা বৈরাগ্যের ভাব দেখাই নাই। আমার ইহা জীবনেরই জন্মগত নীতি ছিল যে যেখানেই থাকি না কেন, সেখানের সমস্তপ্রকার কাজকর্মে জড়িত থাকিয়া তপস্বী হইতে হইবে; আমি মহাভারতের ঋষিগণের শিষ্যের স্বভাবে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। অরুণবাবু আমাকে বৈষয়িক শিক্ষার সবপ্রকারে সহায়ক হইয়াছিলেন। অরুণবাবুর লক্ষ্য ছিল, আমাকে সংসারী করা, কিন্তু তাঁহার দেওয়া শিক্ষা চিরকর্মী স্বভাব বালকের তপস্যার জীবনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। আমার গুরুদেব যখন নির্জন পাহাড়ে প্রকাণ্ড জমি সংগ্রহ করিয়া আশ্রম গঠনে মন দেন তখন আমিই সেই গঠনকার্যে সর্বেসর্বা হইয়াছিলাম। আমার অভিজ্ঞতায় বাড়িঘর জায়গাজমি এবং বহুপ্রকারের কর্মদক্ষতা ছিল বলিয়াই আমি গুরুদেবের প্রিয়তম শিষ্যস্থান অধিকার করিয়াছিলাম। সংসার-লিপ্ততা আমার ছিল না, আশ্রম-লিপ্ততাও আমার ছিল না। আমার অন্তর ছিল

তপস্যায় মগ্ন। আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি, কর্মদক্ষতা এবং সততাই তপস্যা-জীবনের ভিত্তি। সংসারের কেহই আপন নয়, কোন বস্তুই আপন নয়। মানুষ এ সবের অবলম্বনে নিজেকে গড়িয়া তোলে মাত্র। সংসারজীবন আমার খুবই সামান্য, কিন্তু ঐ সংসারে আমি নিত্য যাহা পরিশ্রম করিয়াছি উহার সীমা করা যায় না।

মায়ের মৃত্যুর সময় আমার বয়স তের হইবে। রাত্রি দশটায় তিনি চলিয়া যান। কিছুক্ষণ পরই দীনবন্ধু জ্যাঠামহাশাই আসিলেন। তিনি এবং আমি মাকে কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া চলিলাম। আমাদের পুকুরের পাড়েই বাড়ির শ্মশানস্থান ছিল। পাড়ার মধ্য দিয়া পথ। কিন্তু সেই পথে শবযাত্রা হয় না। আমি ও দীনবন্ধু জ্যাঠামহাশাই সংলগ্ন বাড়ির ধার দিয়া জল ও কেয়া জঙ্গল ভেদ করিয়া শ্মশানে চলিলাম। দীনবন্ধু (কুণ্ডু) জ্যাঠামহাশাই আমাদের প্রতিবেশী। তাঁহারা আমাদের সমস্ত কাজকর্মে এবং সুখেদুঃখে সহায়ক থাকিতেন। এঁরা সব আমাদের গ্রাম্য আত্মীয়, আপন না হইলেও ঘনিষ্ঠ আপনার লোক। মা'র শবদেহের পায়ের দিকটা আমার কাঁধে ছিল। মাথার দিকটা দীনবন্ধু জ্যাঠামহাশয়ের কাঁধে ছিল। কেয়া কাঁটায় আমার পা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। আমি কিছু বলিলাম না। মায়ের শবযাত্রার পর আরও কত লোক আমার চক্ষের সামনেই মারা গিয়াছে, কারণ জ্ঞাতিবর্গ সহ ইহা এক প্রকাণ্ড পরিবার ছিল। আমি সকলকে বহন করিয়াছি। কিন্তু সে সব শবযাত্রা গ্রামের উপর দিয়াই যাইত। তবে গ্রামের উপর দিয়া শবযাত্রা কালে "হরিধ্বনি" করা হইত না। মানুষ জীবিতকালে যে পথে যাতায়াত করিবে মৃত্যুকালে সে পথে তাহাকে নেওয়া চলিবে না, ইহা গ্রাম্যাচার হইলেও ইহা সভ্যতার নিদর্শন নহে। আমার চক্ষের সামনেই ইহার প্রতিকার দেখিলাম, ইহা আমার সৌভাগ্য।

সূর্যাস্ত দর্শনে কান্না। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে আমাদেরই বাঁশবন। এই বনের নাম ভুইমালীর বাড়ি। নিত্য এই বাঁশ বনের মধ্য দিয়া সূর্য অস্ত যাইতেন। অস্তকালে সূর্যদেব রক্তাভ গেরুয়া রঙের লহর আমার প্রাণে ঢালিতেন, আমার অন্তরে কি এক উদাসীন ভাব জাগিত। আমার ভীষণ কান্না আসিত। আমার বুকটা খালি হইয়া যাইত। যতক্ষণ মা বা ঠাকুরমা আমার গায়ে প্রচুর জল না ঢালিতেন এবং কোলে তুলিয়া ঐ গেরুয়া প্রভাব না মিটাইতেন ততক্ষণ আমার কান্না যাইত না। শরীরে প্রচুর জল ঢালিবার পর আমার শরীর শীতল হইত এবং আমি সবই ভুলিয়া যাইতাম। এ সব হইতে হইতে সূর্যদেব চলিয়া যাইতেন। ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিত। আমি আবার চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সংসার ও মাতৃরসের মধ্যে আত্মহারা হইতাম। কিছু বয়স হইবার পর আমি সূর্যাস্ত রং দেখিয়া কাঁদিতাম না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু আমার মন ম্রিয়মাণ হইত এবং আমি উদাসীন হইয়া যাইতাম। আমার বুক যেন কাহার জন্য ভাঙিয়া যাইত।

সূর্যাস্ত কান্না সম্বন্ধে ঠাকুরমার অন্য রকম ধারণা ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল "ছেলে ধূলায় খেলা করিবার দরুন গায়ে ময়লা লাগে এবং পরিচ্ছন্ন হইবার জন্য কান্নাকাটি করে।"

সূর্যদেব! তুমিই না আমার আত্মসূর্য! তুমিই না সকালে সৃষ্টির রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া বিশ্বকে ভুলাইয়া জগৎখেলায় মত্ত করাও? তুমিই না মধ্যাহ্ন রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া বিশ্বকে পালনের কার্যে তৎপর করাও? হে আত্মসূর্য! হে আমার প্রাণ! তুমি কি আমার জন্মজন্মান্তরের সন্ন্যাস সংস্কার আমার অলক্ষ্যে আমার অন্তরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত করিয়া গভীর অন্ধকারে ডুব দিতেছিলে? হে সূর্যদেব! হে আমার প্রাণ! হে বিশ্বপ্রাণ! তোমার এ কি খেলা নাথ! তুমি আমার মা ও ঠাকুরমার প্রাণে কত স্নেহরস ঢালিয়াছিলে যে তাঁহারা আমাকে আমার অন্তরে জাগ্রত অস্পষ্ট সন্ন্যাস রঙকে ভুলাইয়া দিয়া আবার সংসারলীলায় টানিয়া আনিতে সক্ষম হইতেন! ধন্য মায়ের স্নেহ, ধন্য আমার মা, যিনি আমার মত বহু বহু জন্মের সন্ন্যাস সংস্কার সংস্কৃত সন্তানকে সৃষ্টিচক্রে টানিয়া আনিয়াছিলেন। অতীতে এইরূপ কত সন্তান পৃথিবীতে আসিয়াছেন। কত বুদ্ধ, কত শঙ্কর, কত মহাপুরুষকে মাতৃস্নেহ এই বিশ্বচক্রে টানিয়া আনিয়াছেন, ইহা হিসাব কে করিবে?

আজকাল পথেঘাটে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবকগণকে মেয়েদের দর্শনে পশুর মত কথাবার্তা ও আচরণ করিতে দেখা যায়। সেই পশু-মানব এবং সাক্ষাৎ-পশুতে ভেদ কি? পশুরা মাতৃস্নেহ ভুলিয়া যায়। মাতৃভাবে এবং স্ত্রী-ভাবে ভেদ করিতে পারে না। শুনিয়াছি, মহিষদের নাকি মাতৃভাব ও স্ত্রীভাব ভেদ স্মরণ থাকে। মক্কাবাদীদের মধ্যে এই পশুভাবই প্রধানতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মানব-সমাজকে বলি, তোমরা উচ্চ নীচ ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত যাহাই হও না মাতৃত্বের মধ্য দিয়াই তোমরা এই বিশ্বে আসিয়াছ। ওই মাতৃস্নেহ ক্ষেত্র প্রত্যেক নারীতে বিদ্যমান। এই স্নেহ এত শক্তিশালী যে একজন তপস্বীর আত্মাকেও সংসারে আনিতে সক্ষম। নারীকে দেখিয়া পশুলীলায় মত্ত হওয়া সভ্যতা নয়। মানবে ইহাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং শ্রেষ্ঠ মানবতা যে মানব নারীদর্শনে পশুভাব মনে জাগ্রত না করিয়া মাতৃস্নেহকেই মনে স্থান দিবে এবং নারীকে মাতৃত্বের সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিবে। এই প্রসঙ্গে আমি বাল্যকালের একটি সত্য কথা বলিতেছি। জমিদার কর্মচারীদের সঙ্গে অন্য জমিদারদের আলাপ আলোচনা হয়। আমি সেইরূপ এক ঘটনায় বাক্যালাপে উপস্থিত ছিলাম। ঢাকার নবাবকে তাঁহার মুসলমান স্তাবকগণ একদিন বলেন - ‘‘আপনার জমিদারীতে হিন্দুগণকে নিয়োগ না করিয়া মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা কর্তব্য।’’ উত্তরে তিনি বলেন - ‘‘এটা সত্য ঘটনা যে আমি হিন্দু কর্মচারীকে বেশি বিশ্বাস করি। ইহার মূল কারণ তোমাদের জানা কর্তব্য। আজ আমি জীবিত আছি। আমি যদি মারা যাই, কালই আমার মুসলমান কর্মচারীরা আমার স্ত্রীকে নিকা করিবার চেষ্টা করিবে। সুবিধা পাইলে আজই তাহারা আমার স্ত্রীর অন্তরে পশুবৃত্তি জাগ্রত করিবে এবং তাঁহার সম্মানহানি করিবে। কিন্তু হিন্দু কর্মচারীরা আমার স্ত্রীতে এখনও মা বলিয়া সম্মান করে, ভবিষ্যতেও করিবে। এবং তাঁহার সম্মান যাহাতে উচ্চ থাকে চিরকাল সেই চেষ্টা করিবে।’’

স্বরাজ হইবার পর আমি যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও কথা অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মক্কাবাদ ও মস্কোবাদ কংগ্রেসবাদী মহামূর্খগণ যে এই হীনতার জন্য দায়ী ইহা আমি নির্ভয়েই বলিতে পারি। আমার একান্ত অনুরোধ মাতৃত্বের মধ্য দিয়া এ বিশ্বে আসিয়া মাতৃত্বের সম্মান রক্ষায় তোমরা সংযত আচরণের অভ্যাস করিবে। ইহাই

ভারতীয়, মানবীয় এবং অধ্যাত্ম সভ্যতার মূল নীতি। যাহা হউক, আমি মাতৃস্নেহের কথা স্মরণ করিতে করিতে কয়েকটি নীরস কথার অবতারণা করিলাম, মা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মাতৃঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি রাখি না। মাকে স্বর্গে পাঠাইবার জন্য দান দক্ষিণাতেও আমার বিশ্বাস খুব বেশি নাই। পথেঘাটে মাতৃজাতির অপমান ও অপ্রতিষ্ঠা আমাকে পীড়া দেয়, মানুষের সীমাহীন এই যে পশুবৃত্তি, আমার ইহা ভাল লাগে না। ইহা মানব-সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা। অন্ততঃ ভারত রাষ্ট্রে ইহার জন্য কঠোর দণ্ডবিধি এবং সমাজে এই সব পশুগণকে রাস্তাঘাটে জুতাইয়া সোজা করিবার মনোবলে বলবান অনেক মানুষ থাকা একান্ত কর্তব্য। একজন বেশ্যাও যদি পথে বাহির হয়, তাহাকেও মাতৃত্বের সম্মান দিতে হইবে ইহা আমার দৃঢ় মত। আমার মনে হয় মাতৃঋণ শোধের ইহাই প্রাথমিক ধাপ।

বন্দেমাতরমের কথা

তখন আমার পাঁচ বৎসর বয়স হইবে। মনাকাকাদের বাড়িতে আমি দাঁড়াইয়া আছি। গ্রামের চৌকীদার মদন আসিয়া বলিল, "আপনারা আর 'বন্দেমাতরম্' বলিতে পারিবেন না। সরকারের আদেশে আমরা প্রত্যেক বাড়ি যাইয়া ইহা বলিতেছি।" মনাকাকা বলিলেন, "তোমরা আমাদিগকে বন্দেমাতরম্ও বলিতে দিবে না?" বন্দেমাতরমের কথা আমি প্রথম শুনিলাম। ইহার কি অর্থ বা কি উদ্দেশ্য কিছুই আমি জানি না। আবার অনেক দিন পর একদিন সকালবেলা টোকনাদাদা একটা কালা রঙের লুঙ্গী পরিধান করিয়া ঠাকুরমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরমা ঘৃণার সুরে মৃদু তিরস্কার করিলেন। টোকনাদাদা বলিলেন, "দেখো দিদিমা, আমাদের এখন মুসলমানদের সঙ্গে হৃদ্যতা করিতেই হইবে, কাজেই লুঙ্গী পরা প্রয়োজন হইয়াছে।" ঠাকুরমা অত্যন্ত শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিতেন। তিনি কখনও আমিষ ছুঁইতেন না। আমাদের আমিষ রান্নাঘরে তিনি প্রবেশ করিতেন না। আমাদের আমিষ রান্নার খাদ্য আহারকালে তিনি প্রয়োজন হইলে নিকটে বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কখনও স্পর্শ করিতেন না। ঠাকুরমা টোকনাদাদাকে বলিলেন, "হিন্দু-মুসলমানের অমিল তো আমি কোনদিনই জানি না। আমার চরের প্রজারা তো সকলেই মুসলমান। তাহারা তো আমায় মার মতনই শ্রদ্ধা করে। আমারও স্নেহ কম নাই তাহাদের উপর। নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা ষোল আনা না রক্ষা করিয়া মিলনের চেষ্টা ক্ষতির কারণ হইবে।" কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, পাড়ার সব যুবক ব্যায়াম, লাঠিখেলা ও স্বদেশী গানে মত্ত হইয়াছেন। ক্ষুদীরাম ও কানাইলালের ফাঁসীর কথা ঘরে ঘরেই আলোচনা চলিয়াছে। তাহারা আমাদের আমবাগানের মধ্যে "বন্দেমাতরম্" বেদী প্রস্তুত করিয়াছে। বেদীর মধ্যে "বন্দেমাতরম্" লিখিয়াছে। বেদীর উপর পতাকা উড়াইয়াছে। নারীদেরও মাতৃ-সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে। সবই ভাল, কিন্তু যুবকরা "বন্দেমাতরম্" বেদী প্রস্তুত করিবার জন্য ইট চুরি করিয়াছে, ইহা আমার মনে ভাল ঠেকে নাই। এর মধ্যে শুনিলাম, আবদুল্লাপুর গ্রামের বিখ্যাত ধনী

ঈশ্বর মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে। সেই বাড়ীর ছেলে আমাদের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়িত। কাজেই আমি সবই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমার মনে হইত, চুরি-ডাকাতি এবং মুসলমান তোষণের মধ্যে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের কাজই বেশী রহিয়াছে। তবে আমি দেখিতাম ও শুনিতাম; কিন্তু বিশেষ কিছু বলিতাম না। আমার বলিবার মত কিছু থাকিতে পারে না, কারণ আমি বালক।

ক্রমেই দেখা যাইতে লাগিল, মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। আমাদের গ্রামের পূর্বদিকে অনেক মুসলমানের বাড়ি। এ সব গ্রামে ভাল পুকুর নাই। এরা সকলেই আমাদের পুকুরে স্নান ও জল পান করিত। সেই বৎসর বর্ষাকালে আমাদের পুকুরের পাড়গুলি ডুবিয়া গিয়াছে। অনেকটা দূরে মুসলমানদের বাড়ির ধারে একটা ডোবা ছিল। অনেক মুসলমান সেখানে একত্র হইয়াছে। চৌদ্দ পনেরখানা ছোট ছোট নৌকাও সেখানে রহিয়াছে। তাহারা সেই সব নৌকার সাহায্যে তাহাদের ডোবার কচুরীপানাগুলি নৌকায় ঠেলিয়া আমাদের পুকুরে আনিতে লাগিল। শত শত মুসলমান সেই ডোবার ধারে দাঁড়াইয়া হৈহুল্লোড় করিতেছে। আমি তখন বেশ বালক। আমি বাড়ির নৌকা চালাইয়া ঐখানে গেলাম এবং বলিলাম, ‘‘এরূপ করা ঠিক নয়।’’ সেখানে যাঁহারা একত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধও রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমি চিনি। তাঁহারা বলিলেন, ‘‘বাড়ি যাও, দেখো না, আমাদের পুকুরটা কচুরীপানায় খারাপ হইয়া রহিয়াছে।’’ আমি বলিলাম, ‘‘যত লোক জমিয়াছেন, সকলে একটু পরিশ্রম করিলে দুই ঘণ্টায়ই কচুরীপানাগুলি উপরে তুলিয়া দেওয়া যায়, এবং সেটা ঠিক কার্য।’’ বৃদ্ধরা বলিলেন, ‘‘বাড়ি যাও, নয় তো খুন হইয়া যাইবে।’’ চিরদিন যাহাদের সঙ্গে সৎভাব হঠাৎ তাহাদের এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখিয়া আমি একটু অবাক হইলাম। হিন্দু নেতা ও হিন্দু যুবকরাই হিন্দুর শত্রু হইয়াছেন। মুসলমান তোষণ করাই ইঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছে। বাংলার সর্বনাশ অতি নিকটে, ইহা বাল্যকালেই বুঝিলাম। এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে, কর্তারা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। ইহারা কেহই আমাদের প্রজা ছিল না। এ সব পল্লীর গরীবরা আমাদের বাগানে বারো মাস কাঠ সংগ্রহ করিত। ভিক্ষুকরা আমাদের গ্রামে বারো মাস ভিক্ষা করিত। গ্রামের অনেক লোক আমাদের বাড়ির অন্যান্য হিস্যায় চাকর ছিল। ‘‘বন্দেমাতরম্’’-এর পর্দার আড়ালে কি যে সর্বনাশের ঘুণ ধরিয়াছে, ইহা আমি বাল্যকালেই মর্মে মর্মে বুঝিলাম। রাত্রে কর্তারা বাড়িতে আসিলেন, সবই শুনিলেন। কিন্তু তাঁহারা ‘‘দেখি নাই শুনি নাই’’-এর ভান করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবক নির্বিশেষে শত শত লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত একটা সঙ্ঘবদ্ধ দুষ্কার্যকে আমি সামান্য ঘটনা মনে করি নাই। ইহা যে ভবিষ্যতে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপক রূপ ধরিবার পূর্বাবস্থা, ইহা নেতারা কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই। যখনই দেখা গেল ইংরেজ মক্কাবাদী বর্বরগণকে হাতে করিয়া দেশের সর্বনাশ করিবার জন্য দাবার চাল চালিয়াছে তখন সমস্ত রাজনীতির চাল বদলাইয়া দেওয়া কর্তব্য ছিল। অন্ততঃ বঙ্গদেশের নেতাগণের পরিস্থিতি অনুসারে রাজনীতিতে নামা কর্তব্য ছিল। সাধু, সন্ন্যাসী, জোতদার, জমিদার, রাজা ও ধনী ও ব্যবসায়ীদের হাতে রাখিয়া বাংলায় নূতন ভাবে স্বরাজ আন্দোলনের ভিত্তি দেওয়া আবশ্যক ছিল। রামদাসের মত গুরু এবং

শিবাজীর মত শক্তিসম্পন্ন নেতা সমস্ত ভারতে বা অন্ততঃ বাংলার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। বাল্যকালে ইহাই আমার রাজনীতির শিক্ষা। “বন্দেমাতরম্”-এর আড়ালে আমার মনে যেরূপ চিন্তা দানা বাঁধিয়াছিল উহার স্বরূপ আমি বলিলাম।

সংসারের কোন শিক্ষাতেই আমি আকৃষ্ট ছিলাম না। কিন্তু সংসার আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে। যাঁহারা ভাল করিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংসার এবং সন্ন্যাস সব শিক্ষারই যে ভিত্তি প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এ দিকে মাও চলিয়া গিয়াছেন, আমিও কি ভাবে তপস্যার জীবনে ঝাঁপ দিব সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। সত্য সত্যই আমি একদিন সংসারের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

সংসারের দিকে আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে অরুণবাবু আমাকে সংসারের কথা এবং জায়গাজমির কথা বলিতেন ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। তিনি বলিলেও বা শিক্ষা দিলেও, পারিপার্শ্বিক লোকদের জীবনযাত্রা দেখিয়াই বুঝিলাম, আমরা সম্মানিত এবং সচ্ছলতার মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। প্রতিভাসম্পন্ন সন্তানগণ যদি সংসারের বাহিরে চলিয়া যায় তবে সংসারের প্রতিষ্ঠা খর্ব হয় এবং উচ্চ প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের ধারা ব্যাহত হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও যশ যে সব সন্তানগণকে কেন্দ্র করিয়া বেশী পুষ্টির আশা করা যায়, সেই সব বংশজগণকে গড়িবার দিকে অভিভাবকদের বেশী দৃষ্টি থাকে। আমি মুখে না বলিলেও আমার মনের বৈরাগ্য ভাব অনেকের মনকে চঞ্চল করিয়াছিল। সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে আমার মনকে সংসারমুখী করা যায়। এই চেষ্টা যে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন। এ সব ঘটনায় পিতৃদেব একটু অন্য উপায় বাহির করিলেন। তিনি এক জ্যোতির্বিদের নিকট গিয়া সব বলেন, জ্যোতিষী মহাশয় আমাকে দেখিতে চাহেন। জ্যোতিষী মহাশয় হয়তো কোন উপদেবতার উপাসক ছিলেন। সেই দেবতাই নাকি জ্যোতিষী মহাশয়কে অনেক কথা বলিয়া গিতেন। কতকটা জ্যোতিষ বিদ্যা, কতকটা দৈব-কৃপা, এবং কতকটা হরিনাম করিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। পাতলা সুন্দর চেহারা এবং মাথায় বড় চুল ছিল। তাঁহার কথার মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল, তিনি ছলনার কথা কমই বলিতেন। কেহ বেশী বিরক্ত করিলে বেশ ভদ্রভাবে কড়া উত্তর দিতেন; বলিতেন, যতটুকু বলা যায়, বলিয়াছি; উহাতে যাহা বুঝিবার বুঝুন, বেশী জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ নাই। আমি তাঁহার কথার মধ্যে সততা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

বাবা আমাকে “এক জায়গায় যাইতেছি সঙ্গে চল” বলিয়া সঙ্গে লইয়া সেখানে যান। তখন বর্ষাকাল। বাড়ির নৌকা, সঙ্গে চাকর ছিল। বাবা আমাকে একটি কথাও বলিলেন না। সেখানে গিয়া বাবা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, আমিও প্রণাম করিলাম।

তিনি আমাকে দেখিতেছিলেন এবং উপরের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, কোন উপদেবতার নির্দেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন। যাহা হউক, তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, “আপনি একে আটকাইয়া রাখিতে পারিবেন না, আপনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া এই বালক সংসারের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং ভারত ও বিশ্বকল্যাণের এক মহৎ কার্য সম্পন্ন করিবে। এর পিছনে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, এবং ভগবানের আশীর্বাদ আছে।”

তিনি তখন আমাকে একা ঘরে রাখিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা আমার সঙ্গে কথা বলিলেন। তিনি আমার জীবনে ঘটিত অনেক দৈবী ঘটনা এবং অনেক স্বপ্নের কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন। এ সব সত্য কি না? আমি ‘‘হ্যাঁ’’ বলিলাম। তিনি আমাকে অনেক সৎ উপদেশ দিলেন, এবং দ্বার খুলিয়া দিলেন। বাবাকে বলিলেন, ‘‘একে আর বাধা দিবেন না। আপনার এই ছেলে বিখ্যাত মহাপুরুষ হইবেন।’’ তাঁহার এ সব কথায় আমার কোনই উৎসাহ উল্লাস বা আনন্দ হইল না। জ্যোতিষীর ঠিকানা আমার মনে নাই। তিনি ত্রিপুরা জেলার লোক ছিলেন। তাঁহার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কথা আমার মনে আছে।

এ ঘটনার পর বাবা নিশ্চিন্ত হইলেন। আমার বিষয়ে আর কোন কথাই বলিলেন না। ছেলে তপস্বী বা সন্ন্যাসী হইবে, এ বিষয়ে কোন হিন্দুই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিন্তু ছেলে তপস্বী হইবার পথে নির্গত হইয়া কেবল ভিক্ষাজীবী বা ভণ্ডামির বা মিথ্যা কথার দোকান পাতিয়া জীবন কাটাইবে, ইহা কেহই চায় না। এ বিষয়ে আমার পিসতুতো ভাইরাও আমাকে অনেক বুঝাইয়াছেন। আমি নীরবে সব কথাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং কোন কথারই উত্তর প্রত্যুত্তর করি নাই।

এইদিকে ‘বন্দেমাতরম্’বাদীরাও আমার সাধুজীবনের বিরুদ্ধে আমাকে বুঝাইতেছিলেন। অনেক সময় তাঁহারা নিজেদের কল্পনার মতই কথা বলিতেন এবং আমার কথায় সায় দিয়া নিজেদের দলে টানিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা কোন কথারই ভাল উত্তর দিতে পারিতেন না। তাঁহাদের ধারণাও স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু এঁদের মধ্যে যে পরিমাণ ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধর্মনিষ্ঠা ছিল উহা আমি কখনও ভুলিতে পারি না। ইঁহারা ছিলেন অল্প বিকশিত অতিমানব। আফ্রিকায় গান্ধীজীর কথা, শ্রীঅরবিন্দের সাধনার কথা, রামকৃষ্ণবাদীদের সেবাধর্ম ও রামকৃষ্ণ পূজার মারফত দেশ স্বাধীন হইবার কথা, সবই আমি শুনিতাম। কিন্তু মুসলমানেরা যে ব্যাপক গুণ্ডামির জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোনই উত্তর দিতে পারিতেন না। আমি দৃঢ়তার সহিতই জানিতাম, তপস্যাই আমার জীবনের নীতি, তবুও সকলের কথা মন দিয়া শোনা এবং সংক্ষেপে আমার কথা জিজ্ঞাসা করা আমার বিবেকের নির্দেশ ছিল।

বাল্যকালে আমাকে অনেকে অনেক নামে ডাকিতেন। সেই সব বিশেষ নামে তাঁহারা চিরদিনই আমাকে স্নেহসূচক ব্যবহার করিতেন। অনেকে আমাকে নবীন সন্ন্যাসী রূপে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন। আমি সেই সব কথা এখানে আলোচনা করিতে বিরত হইলাম।

গৃহত্যাগের পূর্বে আমি বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে অনেক ঘোরাফেরা করিয়াছি। তাঁহাদের স্নেহভালবাসা কৃত্রিমতাহীন ছিল। লীলা, প্রেম, ভাবরস তাঁহাদের সর্বদা আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু আমার উহাতে আকর্ষণ ছিল না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে ইষ্টপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহারা বলিতেন। ইঁহারা কখনও আমাকে কঠোর তপঃজীবনের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না। ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমি তপস্যায় কৃতকার্য হইব এবং ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন। বন্দেমাতরম্‌বাদীরা প্রায় সকলেই কালীভক্ত ছিলেন, কেহ কেহ হরিনামও করিতেন। এ সব ভক্তগণ সকলেই গীতাপাঠ ও ব্যায়ামাদি করিতেন এবং ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সেই সময় দেশের মধ্যে

বেশ ধর্মভাব ছিল। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত ঘরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য পালনের বেশ একটা চিন্তাধারা ছিল। সেই সঙ্গে সকলের মধ্যেই ইহা একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে বিবাহিত জীবন ধর্মের অনুকূল হয় না। ব্রহ্মচর্য-জীবনকে ভিত্তি করিয়া যেরূপ চিন্তাধারা তখন প্রবল ছিল, গৃহস্থ-জীবনকে কেন্দ্র করিয়াও ধর্মজীবন কি ভাবে গড়িয়া উঠা প্রয়োজন, এ সম্বন্ধেও একটা আলোচনার ধারা সমাজে থাকিলে বাংলার উপকার হইত। যেটা তখনও ছিল না। এখনও গড়িয়া উঠে নাই। বাড়ির বালক বৃদ্ধ একই উপাসনা করিবে এবং শক্তিবাদ ধর্ম বুঝিবে। এ ভাবে ধর্মের ভিত্তি দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

প্রথম দীক্ষা

ষোল বৎসর বয়সে আমার গুরুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন চুনারের গঙ্গাতটে একটি প্রাচীন ভগ্নদশাগ্রস্ত আশ্রমে থাকিতেন। ওই আশ্রম এবং ওই পূজ্য মহাপুরুষকে আমি তের বৎসর বয়সে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই আশ্রম, সেই স্থান এবং সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া আমি অভিভূত হইলাম। কয়েকদিন তাঁহার নিকট অবস্থানের পর তিনি আমাকে ব্রহ্মমন্ত্রের দীক্ষা দিলেন। ব্রহ্মমন্ত্র, ব্রহ্মগায়ত্রী এবং মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে সহস্রদল কমলের মধ্যস্থলে দ্বাদশদল কমলের কোরকের মধ্যে শ্বেত, শান্ত ও স্নিগ্ধ গুরুধ্যান করিতে বলিলেন। সেই গুরুস্থান হইতে শান্ত ও স্নিগ্ধ শ্বেতজ্যোতি মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর পথে হৃদয় পর্যন্ত নামিয়া আসিতেছে, এইরূপ ধ্যানসহ জপ করিতে বলিলেন। মূলবদ্ধ, জালন্ধরবদ্ধ ও উড্ডীয়ানবদ্ধ শিক্ষা দিলেন এবং এই বন্ধনত্রয় সহযোগে কাকচঞ্চু মুদ্রায় প্রাণায়াম করিতে বলিলেন। প্রাণায়াম সম্বন্ধে বলিলেন, পূরক ৪, কুম্ভক ১৬ এবং রেচক ৮ মাত্রায় হইবে। বৎসরে এক মাত্রা করিয়া বৃদ্ধি করিয়া এই ৪ মাত্রাকে ১৬ করা চলিবে। এবং সেই অনুপাতে কুম্ভক এবং রেচকেরও মাত্রা বৃদ্ধি হইবে। তিনি বলিয়া দিলেন, সিদ্ধাসনে বসিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হইবে এবং একাসনে এক সময় তিনটি প্রাণায়াম করিলেই চলিবে। বেশী প্রাণায়াম বা বেশী সংখ্যক করিবার প্রয়োজন হইবে না।

আশ্রমটি গঙ্গার উপর অবস্থিত। স্থানটি একটি ছোট পাহাড়ের টিলার মতন। তখন প্রবল বর্ষাকাল। ওপারের বহুদূরস্থিত বৃক্ষের মাথাগুলি দেখা যায়। দৃশ্য অত্যন্ত পরিপূর্ণ। পতিতপাবনা মা গঙ্গা স্ফীত হইয়া আশ্রমটিকে প্রায় চারিদিকেই ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন। আশ্রমটি একদিকে ব্রহ্মগঞ্জ গ্রামের সঙ্গে ভূমি সংযুক্ত এবং বাকী তিন দিকটা জলময়। মা গঙ্গা হরিদ্রাভ লাল কাদাজলে নিজের নির্মল রূপকে বিলীন করিয়াছেন। নিকটেই এক মাইল দূরে চুনারের কেল্লা। মা অত্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিতা। সেই জলরাশি কেল্লার পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে উত্তরবাহিনী হইয়া কাশীর দিকে দৌড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে জলের উপর ঘূর্ণিপাক এবং মাঝে মাঝে একখানা কাষ্ঠখণ্ড স্রোতজল বহন করিয়া আনিতেছে। জলে প্রায় আর কিছুই দেখা যায় না।

কখনও কখনও একখানা পাথর বা কাষ্ঠ বোঝাই নৌকা অতি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকার মাঝিরা অতি দ্রুত দাঁড় টানিয়া নৌকাখানাকে কেল্লার পাহাড়ের ধাক্কা হইতে বাঁচাইবার জন্য পশ্চিম দিকে দাঁড় টানিতেছে। আশ্রমটিতে অনেক বৃক্ষ। গঙ্গায় নামিবার জন্য পাথরে নির্মিত ঘাট। নিকটেই শ্মশান। গ্রীষ্ম ও শীতকালে গঙ্গার ধারে আশ্রমের নিকটেই শ্মশানের দাহকার্য চলে – এখন শ্মশান উঁচুভূমিতে আসিয়াছে। এখন ঘাটে নামিবার সিঁড়িগুলি প্রায় সবটাই জলে নিমগ্ন হইয়াছে। আশ্রমের দক্ষিণ দিকে একটি পাহাড়ী ঝরনার স্রোত একটি শাখা নদীর মতন গঙ্গায় আসিয়া মিলিয়াছে। বর্ষার জলে এখন সেও পূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। সকালবেলা সূর্যদেব এই শাখা নদীটির উপর পূর্বদিকে উদিত হন এবং বৈকালবেলা গঙ্গার পশ্চিম তটে সাজানো বৃক্ষ শ্রেণীর আড়ালে গঙ্গার উপরে ও আশ্রমে প্রচুর গেরুয়া-রক্ত রঙ ঢালিয়া অস্তমিত হন। বর্ষার দরুন এ সময় মা গঙ্গা অত্যধিক চওড়া হইয়াছেন এবং খরস্রোতা হইয়াছেন। এ সময় গঙ্গায় কেহ নামিলে তাহাকে রক্ষা করা অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে সেই মুহূর্তে সে যে কোথায় চলিয়া যাইবে উহার ঠিকানা নাই। মা গঙ্গাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি সমুদ্রে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি স্নেহমমতা সব ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি কাহারও জন্য ভাবিতে এবং বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন। আমি গুরুকে দেখি, এবং মা গঙ্গাকে দেখি। আর দেখি, আশ্রমের দীর্ঘ দেওয়ালখানা তাহাতে বহু দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে। গুরু গঙ্গা শ্মশান সবই আমার চারিদিকে। আশ্রমের বাইরে গঙ্গার উপর ছোট একটি শিবের কবুতারা। আশ্রমের ভিতরে একটি ছোট হনুমানজীর মন্দির। আশ্রমে দুইখানা গৃহ। উহার একখানাতে গুরুদেব থাকেন। অন্যখানাতে একটি মহাত্মার সমাধি। কাজেই ইহা সিদ্ধ সাধনার স্থান ইহাতে আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে? আশ্রমটি আমার বাল্যকালের স্বপ্নদৃষ্ট, এবং এই আশ্রমেই একদিন সমাধি সমন্বিত গৃহখানিতে আবার কুণ্ডলিনী জাগরণ হইয়াছিল। কাজেই এই পবিত্রভূমির কথা আমার অন্তরে চিরজীবনের সিদ্ধ-তীর্থ সংস্কারেই অঙ্কিত রহিয়াছে। কোথাও লোকজনের অস্তিত্ব নাই, বাড়িঘরও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই এই স্থানের তুলনা দিবার মত স্থান আমার নিকট আর নাই।

যে গৃহটিতে সমাধি রহিয়াছে উহাই আয়তনে বড়। উহার মধ্যে আলো নাই বলিলেই চলে। ছোট একটি খিড়কী রহিয়াছে। গৃহগুলির দ্বার অত্যন্ত ছোট। সাবধানে প্রবেশ না করিলে নিশ্চয়ই মাথার পাথরের সঙ্গে টক্কর লাগিবে। এও এক ভয়ঙ্কর সমস্যার কথা। আমি ইহাতে বহুবার ভয়ঙ্কর আঘাত খাইয়াছি। গৃহের ভিতরটা অত্যন্ত শুষ্ক এবং রুক্ষ মনে হয়। একমাত্র শীতকালে এই সমাধি-গৃহে অবস্থান করা যায়। অন্য সময় ইহাতে প্রবেশ করিতেই ইচ্ছা হয় না। মনে হয় পাঁউরুটির উনানে প্রবেশ করিলাম। গুরুদেব বলিলেন, প্রায় তিনশো বৎসর পূর্বে এই আশ্রমটি প্রস্তুত হইয়াছিল। সমাধির স্থানটা খুব বিস্তৃত ছিল কিন্তু উহার চারিদিকটা কাটিয়া ছোট করা হইয়াছে উহা দেখিলেই বুঝা যায়। আমি একবার শীতকালে দুই-চারদিনের জন্য এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম এবং এই সমাধির উপর বসিয়া যোগাভ্যাস করিতেছিলাম। এই অবস্থায় আমার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। কাজেই আমার নিকট ইহা সিদ্ধ শবাসন। ইহা আমার স্বপ্নদৃষ্ট সিদ্ধস্থান, ইহা আমার দীক্ষাস্থান। ইহা আমার কুণ্ডলিনী জাগরণভূমি, ইহা শ্মশান, ইহা শবাসন, ইহা মা

গঙ্গার কোলে আমার প্রথম গুরু দর্শনস্থান। মনে হয় এখনও আমি স্নেহময়ী জননীর কোলেই খেলা করিতেছি।

দীক্ষার সময় গুরুদেব বলিলেন, তোমাকে উচ্চ দীক্ষা দিলাম। মানবজীবনের যাহা শেষ লক্ষ্য ইহা সেই দীক্ষা। ব্রহ্মমন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রী তিনি লিখিয়াও দিলেন। মস্তিষ্কে গুরু-পাদুকার কেন্দ্রে গুরুস্থান, কণ্ঠে বিশুদ্ধাখ্য স্থানে মন্ত্রস্থান এবং হৃদয়ে অনাহত কেন্দ্রে দেবতার স্থান। গুরুস্থান, মন্ত্রস্থান এবং হৃদয়স্থান ব্যাপ্ত একটি স্নিগ্ধ জ্যোতিধারা ধ্যান করিয়া জপাদি করিবে। গুরুমন্ত্র ও দেবতা তত্ত্বতঃ এক, ইহা অনুভবে আসিবে, ইহার নাম মন্ত্রচৈতন্য। গুরুস্থান হইতেই জ্যোতিধারা নামিয়া কণ্ঠস্থান এবং হৃদয়স্থানে নামিয়া আসে, এইভাবেই ধ্যান আরম্ভ করিতে হয়।

দীক্ষার পর কয়েকদিন অবস্থানের পরই বুঝিলাম, মনের স্থিতি এখনও এতটা শক্তিশালী হয় নাই, যাহাতে চব্বিশ ঘণ্টা কেবল সাধন-তপস্যায়ই কাটানো যায়। আশ্রমে কোনই কাজকর্মের ব্যবস্থা ছিল না। এইভাবে দিন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দীক্ষা হইবার দুই-একদিনের মধ্যেই গুরুদেব কাশী চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন, যতদিন ভাল লাগে থাক, অথবা অন্যত্র গিয়াও থাকিতে পার।

গৃহত্যাগের পর গুরুর সন্ধানে বাহির হইবার পর, আমি অনেকস্থানে গমন করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ফরিদপুর জগদ্বন্ধু প্রভুর আশ্রম, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, চেতলার ভক্তাশ্রম এবং কাটোয়ার অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারীর আনন্দমঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চেতলার ভক্তাশ্রমে এবং বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠে সেবারূপ কর্মযোগের ব্যবস্থা আছে। ফরিদপুর জগদ্বন্ধু আশ্রমের যুবকগণ জগদ্বন্ধু প্রভুর নামকীর্তন করেন এবং বৈকালবেলা প্রভুকে রিক্‌শা গাড়িতে বসাইয়া পথ ভ্রমণ করেন, দেখিয়াছি। কোন আশ্রমের কার্যধারাই আমার অনুকূল ছিল না। ইহা আমি পূর্বেই জানিয়াছিলাম। অনেক বিবেচনার পর আমি স্বরাজ ও অহিংসপন্থীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্র করিয়া লইয়া সাধনায় মন দিব স্থির করিলাম। নাম জাহির করা, আইন অমান্য করা বা জেলযাত্রার কর্মযোগ আমার মনঃপূত ছিল না। অবশ্যই কর্মচক্রে আসিলে আমি সব করিতেই প্রস্তুত ছিলাম। আমি এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটাইয়া লইলাম। ইহার ফলে, আমি বেশ উপকৃত হইলাম; কিন্তু ইহাতে আমার জীবনলক্ষ্যে বেশী কাজ দিবে না, সহজেই উহা বুঝিলাম।

বাল্যকাল হইতেই আমার নিত্যকর্ম ব্রহ্মচর্যানুকূল ছিল। সাধনাও আমি বাল্যকাল হইতেই করিয়া আসিতেছিলাম। তবে সেটা ছিল গুরুর সঙ্গে সংযোগহীন সাধনা। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ, শৌচাদি, স্নান, নিত্যনিয়মিত সাধনায় বসা, ধ্যানাদি করা, নিরামিষ আহার, ভোজনকালে মৌন থাকা, ব্রহ্মচারীর নিয়মে যথাবিধি পঞ্চপ্রাণকে আহুতি দান করিয়া গণ্ডুষ করা এবং স্বপাকে পরিমিত ভোজন করা ইহা আমার বাল্যকালের অভ্যাস। আমি আশ্রমে যে ক'দিন ছিলাম সেখানেও দেখিলাম, সরলানন্দজী ও পরমানন্দজী সেসব নিয়মই পালন করেন। গুরুদেব নিত্য রাত্রি দুইটায় আসনে বসিতেন। তিনি সমস্ত দিন বেশ শান্ত ভাবে থাকিয়া অল্প অল্প লেখাপড়া ও সামান্য কাজকর্ম করিতেন। আশ্রমের নিত্য কর্মের মধ্যে কোনই সংসার ভাব ছিল না। একটা কুকার ছিল, উহাতে ডাল-চাল এবং তরকারী সিদ্ধ হইত এবং ইহাই আহার্য ছিল। বৈকালবেলায় রুটি হইত, সাধুরাই উহা প্রস্তুত করিতেন। বিশ্বনাথ নামক একজন চাকর

বাসন মাজিয়া দিত এবং আশ্রমের ঝাড়ু দিত এবং বৈকালে রুটির আটা মাখিয়া দিত। কাজেই দেখা যায়, আশ্রমে কোনই কাজকর্ম ছিল না। এ ভাবে জীবন যাপন করা আমার পক্ষে সমস্যার বিষয় হইয়াছিল।

ব্রহ্মগঞ্জের গঙ্গাতট সংলগ্ন গুরুদেবের আশ্রমটি আমার বাল্যকালের স্বতঃস্ফূর্ত কোন জন্মের সাধনা ভূমি হইতে প্রায় আড়াই মাইল পশ্চিম দিকে হইবে। উহা এখনও জনমানবহীন বনশোভিত পর্বতগাত্র।

গৃহত্যাগের পূর্বে অতি সামান্য সাধনা যাহা আমি করিয়াছি, উহার ফলে আমার কিছু কিছু শক্তি আয়ত্ত হইয়াছিল। আমি দূরস্থিত বহু ঘটনা বলিয়া দিতে পারিতাম। কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দুই-চার মিনিটে সুস্থ করিতে পারিতাম। ইহা কালীমার ধ্যানের ফল। মা আমার চিরজাগ্রতা মহাশক্তি। যখন গৃহত্যাগ করি, তখন পথে এক রাত্রিতে এক আত্মীয়দের বাড়ি আশ্রয় লইয়াছিলাম। তাঁহারা জানিতেন না যে আমি সংসারের বাহিরে চলিয়া যাইতেছি। রাত্রিতে এক বাতরোগী অত্যন্ত করুণ চিৎকার করিতেছিলেন। প্রাতঃকালে আমি সব জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ভদ্রলোক অসুস্থ এবং আর্থিক দুর্দশায় জর্জরিত। আমি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম এবং সেখানে নীত হইলাম। দরজার সামনে তাঁহার বড় কন্যাটি একটি শত ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়াছিল। আমি গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া রোগীকে বলিলাম, ''আপনি উঠুন।'' তিনি বলিলেন, ''দুই বৎসর কাল শুইয়াই আছি। উঠিবার শক্তি নাই।'' আমি বলিলাম, ''আর কতদিন শুইয়া থাকিবেন, এবার উঠুন।'' আশ্চর্য যে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াই তিনি কাঁপিতে লাগিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন, ''শীঘ্র ধরুন।'' আমি অগ্রসর হইয়াই ধরিলাম। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। আমি বলিলাম, ''এইবার বাহিরে আসুন।'' তিনি বাহিরে আসিলেন এবং রোগহীন সাধারণ মানুষে পরিণত হইলেন। ইহার পরই কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার আর্থিক দুর্দশা মিটিয়া যায়। তিনি নগণ্য দরিদ্রদশা অতিক্রম করিয়া লক্ষপতি হইলেন। গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি, পথে একটা দাগ রাখিয়া যাওয়া কর্তব্য মনে করিয়া এ ঘটনা ঘটাইয়া আমি সেইদিনই আহারান্তে চলিয়া গেলাম। আমি প্রায় দেড়শত মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিলাম। এ পথ অতিক্রম করিতে আমি অনেক নদী এবং নালা ও খাল পার হইয়াছিলাম। তখন মনে কত বল ও বিশ্বাস ছিল, আজ সে সব ভাবিতে বিস্ময় মনে হয়। পথে বহু স্থানেই স্থানীয় লোক আমাকে সাধু ও যোগীদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। কোন সাধু তাঁহাদের দেশে মাটির নীচে গুহা কাটিয়া, খড়ের চাল বাঁধিয়া বা বৃক্ষতলে কাটাইয়া নাম যশ অর্জন করিয়াছেন, জীবনে সফলতা অর্জন করিয়াছেন, এ সব কথা অনেক শুনিলাম। এবং একবেলা বা দুইবেলা অবস্থানের পর অগ্রসর হইয়া চলিলাম।

যাহা হউক, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে আশ্রয় লওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে আমার দেবেন মহারাজের সঙ্গে আলোচনা হইল। তাঁহার বলিষ্ঠ শরীর এবং গোলগাল চেহারা দেখিয়া আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। জীবনের লক্ষ্য যে সাধনা ও তপস্যা এই কথা তাঁহাকে বলিলাম এবং ইহাও বলিলাম কিছুদিন মঠে আশ্রয় লইয়া গুরুর খোঁজ করিব এবং চলিয়া যাইব। তিনি বুঝাইয়া দিলেন, মঠে আশ্রয় লইলে জীবনের সব নীতি গোলাইয়া

যাইবে। ইহা বড় মঠ ও বড় প্রতিষ্ঠান, একবার প্রবেশ করিলে আর ছাড়িবার শক্তি থাকিবে না। বেশ মোটা মণ্ডা মিঠাই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমি চলিয়া গেলাম।

চেতলা (শ্রীরামপুর) ভক্তাশ্রমে আমি কয়েকদিন ছিলাম। ইহাও সেবাশ্রম। খুব ছোট একটি ঠাকুরঘর আছে, উহাতে একটি সুন্দর ওঁকারের চিত্র সাজানো আছে। গঙ্গার উপরে ছোট এবং সুন্দর স্থান। স্বামীজী গৃহী সাধু। যোগের ক্রিয়াদির দীক্ষা দেন। বেশ মানুষ। নিকটেই তাঁহার বাড়ি আছে। বেশ সম্পন্ন ঘর, বাড়ির পরিপাটি দেখিলেই বুঝা যায়। সেখানে একবেলা আমি নিমন্ত্রিত হইয়া আহারাদি করিয়াছিলাম। তাঁহার একটি সুন্দর যুবক ছেলে ছিল। মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিত। খুব বিলাসিতার ছাপ। খুব হাসিখুশী ভাব। পান খাইয়া মুখ লাল করিয়াই রাখিতেন। বয়স সতেরো-আঠারো হইবে। ভক্তাশ্রমে রান্নার ঠাকুর চাকর ছিল, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংস্কৃত পড়াইতেন। নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী এখানের প্রিয় এবং কর্মঠ যুবক শিষ্য। খুব সুন্দর শরীর, মিষ্ট ব্যবহার। এঁদের শহরে মুষ্টিভিক্ষা ও চান্দা আছে। আশ্রমে ঔষধ দেওয়া হয়। কয়েকজন কর্মহীন ও অলস বৃদ্ধ আশ্রমের আশ্রিত আছে। এরা এত অলস যে বিছানায় বসিয়াই রাত্রিকালের লঘুশংকার কর্মটি সম্পন্ন করিত। চেতলা আশ্রমটি আমার বেশ অনুকূল ছিল। নিত্যানন্দজী আমাকে সঙ্গে লইয়া শহরে বাহির হইতেন। স্বামীজীর খুব স্নেহ ছিল। কিন্তু মশা ও ছাড়পোকার এত ভীষণ উপদ্রব যে আমার পক্ষে অবস্থান অসম্ভব হইল। আশ্রমটি একটি ছাড়পোকার ডিপো ছিল। পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত অভাব। আমার মশারীর ব্যবস্থা না থাকায় এখানে থাকা আরও অসম্ভব হইল। নিত্যানন্দ ও স্বামীজীকে না বলিয়া, কেবল ঠাকুর চাকরকে বলিয়া আমি এ স্থান ত্যাগ করিলাম। আমি অসুবিধার কথা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তাঁহারা স্বীকার করিয়াও ব্যবস্থা করিলেন না।

কাটোয়াস্থিত অভয়ানন্দ স্বামীজীর আনন্দমঠ আশ্রমে আমি অনেকদিন ছিলাম। স্বামীজী সস্ত্রীক সাধু। উভয়েই স্নেহশীল। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কোনই অসুবিধা ছিল না। এখানে অনেকদিন ছিলাম। থাকা, আচার-ব্যবহার, সাধনা-পূজা, কীর্তন সবই এখানের বেশ ভাল ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখানকার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এখানে থাকাকালেই আমার ম্যালেরিয়া জ্বর আরম্ভ হয় এবং জীবন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে থাকিতেই আমি গুরুদেবের সন্ধান করিয়া চলিয়া যাই। এখানের সেবানন্দ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ভাল মানুষ ছিলেন।

গৃহত্যাগ করিবার পর গৃহস্থ ও সাধু আশ্রমের বিষয়ে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছে। তাহাতে আমি ইহাই বুঝিয়াছি, কোন গৃহস্থই সাধুজীবন সম্বন্ধে খুব ভাল অভিজ্ঞতা রাখেন না। যাহারা সাধুজীবন লক্ষ্যে বাহির হয়, তাহাদের প্রয়োজন হইলে, সাধুদের আশ্রমেই আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। দেশ ভাগের পর ভারতে আশ্রয়প্রাপ্তির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। সে সঙ্গে সাধুতার লক্ষ্যসম্পন্ন লোকের সংখ্যাও অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে। এজন্য অনেক স্থানেই আশ্রয়দানের সুফল পাওয়া যায় না। আমি যখনই যেখানে থাকিয়াছি, সেইখানের কর্মব্যবস্থায় আমি উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছি। আমার যদি তপস্যা ও সাধনার লক্ষ্য না থাকিত এবং কেবল সাধারণ সাধুর বেশভূষা আশ্রম-কর্ম এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য থাকিত তবে আমি যে কোন স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইবার ভাল ব্যবস্থাই করিতে পারিতাম। কর্মে যাঁহার উৎসাহ ও

আনন্দ আছে, পৃথিবীর কোন স্থানেই তাঁহার অসুবিধা হইবার কারণ নাই। এ তো সাধক-দশার কথা; সিদ্ধ-দশায় আশ্রয়, সাহায্য এবং কর্মক্ষেত্র যে কোন স্থানে গড়িয়া লওয়া যায়। ইহার কারণ, মানুষের মনোজগতের দৈন্য ও উহার পুষ্টির সব কথাই সিদ্ধসাধকের জানা থাকে। মানুষ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে যতটা উপকৃত ও শান্তি এবং আনন্দ পায়, সেটা অন্য কোথাও পাইতে পারে না।

দীক্ষার পরে মধ্যজীবন

গৃহত্যাগের কয়েকটা দিনেই বুঝিলাম; স্নেহভালবাসা ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়রূপ সংসার-জীবন আমার শেষ হইয়াছে। আমি যে নিরাশ্রয় এবং নিরালম্ব ইহা আমি ভালই বুঝিতাম, কিন্তু ঈশ্বরের উপর আমার সীমাহীন নিষ্ঠা এবং সীমাহীন বিশ্বাস ছিল। আমি সাধনা করিব, কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিব এবং সেইজন্য অনুকূল পরিস্থিতি এবং অনুকূল পরিবেশ চাই। দীক্ষাহীন, গুরুহীন এবং সাধনাহীন নিরলস জীবন আমি দুই বৎসর অতিবাহিত করিলাম। গুরু লাভ এবং দীক্ষালাভের পর কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিলাম, কর্মহীন সাধনার জীবন আমার চলিবে না। আমাকে কর্মাবলম্বনে সাধনার পথে চলিতে হইবে। আমি স্বরাজপন্থীদের সঙ্গে মিশিলাম এবং কর্ম ও সাধনা করিয়া চলিলাম। আমাকে লম্বা লম্বা বক্তৃতা প্রায়ই দিতে হইত। কাজেই অনেক লেখাপড়াও করিতে হইত। আমি অহিংসাবাদ বুঝিবার জন্য গান্ধীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নিয়মিত পাঠ করিতাম। ভারতকে কেন্দ্র করিয়া যে আত্মহত্যাকর রাজনীতি চলিয়াছে ইহা বুঝিতে আমার বেশীদিন লাগিল না। লণ্ডন, দিল্লী, কলিকাতা এবং মুসলমানদের চিন্তাধারা আমি ভালভাবেই বুঝিতাম। ইংরেজকে তাড়াইবার নামে হিন্দু ও ভারতের সর্বনাশ এবং মুসলমান তোষণ পলিটিক্স আমার ভাল লাগিত না। দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি প্রকৃত সর্বনাশকে সর্বদা ঢাকা দিয়া চলিত। ইহাও আমি স্পষ্ট বুঝিতাম। একদিন আমি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীখগেশ দাশগুপ্তকে সি. আর. দাশের মুসলমান তোষণ বিষয়ক কয়েকটি ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমাদিগকে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র করিয়া দিতেই হইবে। ইহার কারণ, তাহাদের সভ্যতা অন্য রকমের।" আমি অনেক সভায় সোয়া দুই ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিতাম। খগেনবাবুর সঙ্গে কথা হইবার পর আমি আর বক্তৃতা করি নাই। মানুষকে মিথ্যা কথা বলিয়া ধাপ্পা দেওয়া কোন সাধুর কর্মনীতি হইতে পারে না। আমি কয়েক মাস আমার পরিস্থিতির কথা খুবই ভাবিলাম। আমি বুঝিলাম, মুসলমানেরা ভারতের জন্য যতটা বিপজ্জনক কংগ্রেসপন্থীরা উহা হইতেও শতগুণ অধিক বিপজ্জনক। ইঁহাদের সংস্পর্শে আমার আর অবস্থান চলিতে পারে না। প্রতি শত আশীজন হিন্দু জনতাকে প্রতি শত বিশজন মুসলমানের পদতলে বিক্রয় করা যাঁহাদের নীতি, সেখানের কর্মে লিপ্ত থাকা চলিতে পারে না। রাজনীতি করা যদি আমার জীবনের লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে আমি অন্য দল বা অন্য নেতা খুঁজিতাম, কিন্তু আমার

জীবন লক্ষ্য তপস্যা ও আত্মজ্ঞান লাভ; কাজেই আমি বুঝিলাম আমাকে চলিয়া যাইতেই হইবে।

গুরুদেব বলিয়াছিলেন, "কর্ম উপাসনা এবং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুশীলনহীন জীবন আত্মজ্ঞানের সহায়ক হয় না।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, "যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টাস্য কর্মস্থ, যুক্ত স্বপ্ন বোধস্য চ, যোগো ভবতি দুঃখ হা।" "পরিমিত আহার, পরিমিত বিহার, পরিমিত কর্ম চেষ্টা, পরিমিত নিদ্রা এবং পরিমিত জাগরণশীল ব্যক্তির যোগাভ্যাস দুঃখনাশক হইয়া থাকে।" কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের অনুশীলন সম্বন্ধেও গীতায় স্পষ্ট নির্দেশ আছে। গীতা দুর্বল কর্ম ও অস্থর কর্ম সমর্থন করে নাই। কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম বিষয়েও গীতায় আদেশ স্পষ্ট। বিকর্ম এবং অকর্ম করিয়া, কর্মের সুফল পাওয়া যাইবে, ইহা আশা করা যায় না। কর্মের গতি, বিকর্মের গতি এবং অকর্মের গতি এক হইতেই পারে না। আমি যতদিন স্বরাজবাদীদের সংস্পর্শে ছিলাম ততদিন খুব পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠ সততার সহিত কর্ম করিয়াছি। তাহার পর যখন বুঝিলাম, এঁদের কর্ম ভারতের ভয়ঙ্কর সর্বনাশ আনিবে, তখন আমি চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

খগেনবাবুর সঙ্গে আমার কথা হইবার প্রায় এক বৎসর পরই দিল্লীর দাঙ্গা হইল। গান্ধিজী একুশ দিন উপবাস করিয়া হিন্দুদের চিন্তাকে বাস্তবমুখী হইবার রাস্তাও বন্ধ করিলেন। সেই সময়ের অনেক পূর্বেই আমি চুনারের পাহাড়ে গুরুসেবা এবং সাধন তপস্যায় মনপ্রাণ ঢালিয়াছি। দিল্লীর দাঙ্গার অনেক পূর্বেই গুরুদেব চুনারের পাহাড়ে আশ্রম করিবার জন্য জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সময় আমারও মনে বিবেকের আঘাত আসিয়া গিয়াছে। মনের এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইলাম।

আমি ও আমার এক সঙ্গী উত্তরবঙ্গের কোন একটি পাহাড়ী নদী পার হইতে ছিলাম। নদীটিতে প্রায় সব সময়ই অল্প জল থাকিত। বর্ষাকালে ইহা খুব বেগবতী হইত এবং বৃহদাকার ধারণ করিত। আমরা প্রায় সময়ই ইহা পায়ে হাঁটিয়া পার হইয়া যাইতাম। যে দিন দেখা গেল জল একটু স্ফীত হইয়াছে আমি ও সঙ্গিটি গামছা পরিধান করিয়া হাতে কাপড় লইয়া অন্য পারের দিকে চলিলাম। সঙ্গিটি অগ্রবর্তী আমি ঠিক তাঁহার পেছনে পেছনে চলিতেছি। হঠাৎ এক বৃহদাকার শীতল জলের বন্যা আসিল। সঙ্গি পার হইয়াছেন; কিন্তু আমি সামান্য দূরে। আমি বন্যার চাপে অসহায় হইলাম। আমার হাত পা মুহূর্তে শীতল ও আড়ষ্ট হইল। সঙ্গিটি বিপদ বুঝিলেন। তিনি হাতে বস্ত্রখানা তাড়াতাড়ি খুলিয়া একদিকটা নিজে খুব শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং অন্য দিকটা আমাকে ধরিতে বলিলেন। আমি খুব শক্ত করিয়া ধরিলাম। বিপদ বুঝিয়া আমি পূর্বেই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলাম। সেই মুহূর্তেই সঙ্গির সুবুদ্ধি হইয়া আমার জীবন রক্ষা হইল। আমার পায়ের তলায় মনে হইতেছিল বালির বন্যা চলিয়াছে। উহার উপর দাঁড়াইবার কোনই উপায় নাই। বৃহদাকারে বালির স্তূপ জলের নিম্নে দৌড়াইয়া চলিয়াছে। উপরে জলের স্রোত এবং নিম্নে বালির স্রোত। সঙ্গিটি বস্ত্রখানার একদিক খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া নদীর ধার দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। এর মধ্যে নদীর একটা বাঁক আসিল এবং আমি পার পাইলাম। জীবনদাতা সঙ্গিটির নাম আমার মনে নাই। জীবনে হয়তো তাঁহাকে আর

দেখিব না। দেখিলেও চিনিব না। তাঁহার স্মৃতি আমার স্পষ্ট ভাবেই মনে আছে। সেই দিনই আমি গুরুদেবের একখানা পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি একা আছেন এবং অসুবিধায় আছেন। আমি দুই-চারি দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া গুরুদেবের নিকট চলিয়া আসিলাম। আমার জীবনের আরও একটা অধ্যায় শেষ হইল।

চুনারের পাহাড়ে আসিয়া আমি এখন গুরুসেবা, গোসেবা, জনসেবা, আশ্রমের নানা প্রকার কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতাম। আবার রাত্রি দেড়টা দুইটা হইতে আরম্ভ করিয়া ভোর পর্যন্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতাম। এই দেড়টা হইতে ভোর পর্যন্ত কঠোর সাধনার কালটিও পরমাত্মা আমার জন্য কর্ম্মহীন করিলেন না। অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের পর আমি এবার যাহা পাইলাম, ভালই পাইলাম; কারণ ইহা ছিল গুরুসেবা এবং ইহা ছিল সাধনা এবং যোগাভ্যাস। আমি গুরুসেবা এবং কঠোর সাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলাম। সমস্তটা দিনই আমার কঠোর কর্ম্ম-সম্ভার জড়িত থাকিত। হাত পা মন চক্ষু কর্ণ কেহই খালি থাকিত না। সব সময় নিজে করা এবং অন্যকে দিয়া অন্য কর্ম করানো আমার নিত্যকর্মে দাঁড়াইল। আমি কখনও সেবক, কখনও গোয়ালা, কখনও চিকিৎসক, কখনও কম্পাউণ্ডার, কখনও কৃষক, কখনও মজুর, কখনও পশু-চিকিৎসক, কখনও পূজারী, কখনও রাঁধুনী, কখনও অতিথি সেবক, কখনও শিক্ষক, কখনও ছাত্র, কখনও বন্য-জন্তু বিতাড়ক, কখনও বন্যজন্তুর মিত্র, কখনও পাথর মিস্ত্রী, কখনও রাজমিস্ত্রী, কখনও কাঠমিস্ত্রী, কখনও লৌহ মিস্ত্রী, কখনও ইঞ্জিনিয়ার, কখনও ওভারসিয়ার, কখনও কলকব্জার আবিষ্কারক। প্রতিদিনই আমি বহুরূপী কর্মী হইলাম। নিত্য পূজা, নিত্য সন্ধ্যা, নিত্য গীতা চণ্ডী ও উপনিষদ কিছু কিছু পাঠ করায় আমার কখনও অনিয়ম হইত না। পাঁচ ঘণ্টার বেশী নিদ্রার সুযোগ আমার হইত না। কোনদিন রাত্রি এগারোটায় শয়ন করিলেও আমি ঠিক দেড়টা দুইটায় উঠিয়া বসিতাম। হিন্দী পত্রিকাকে বাংলা ভাষায় পড়িয়া শোনানো এবং বাংলা কাগজকে হিন্দী ভাষায় অনর্গল পড়িয়া যাওয়া আমার প্রায় প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। রোদ বৃষ্টি আমার গায়ে লাগিত না। বন্য কণ্টকে সদাসর্বদা আমার পা দুইখানা ক্ষতবিক্ষত থাকিত। খুব বর্ষাকালে যদি সময় থাকিত তবে আমি সরস্বতীভবনে প্রবেশ করিতাম এবং প্রয়োজনমত গ্রন্থাদি পাঠ করিতাম। কোন বই বা কোন বিষয় একবার পাঠই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

পিতা, মাতা, আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর স্নেহ আদরে পরিপুষ্ট আমার বাল্যজীবন। আমার অতি ক্ষুদ্র পাঠ্য জীবন, গুরুর সন্ধানে আমার উন্মনা জীবন। গুরুর সংস্পর্শ লাভ করিবার পর আমার মধ্যজীবন অতিক্রান্ত করার পর, আজ আমার সাধক ও তপস্যার জীবন আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকটি জীবনের সীমারেখা এবং ভেদ কোথায় উহা আমার ধারণায় স্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এখন আমার নিকট কোনই মতবাদ নাই। কি ভাল বা কি মন্দ, ইহা আমার ধারণার বিষয় নহে। কারণ, এখন আমার সমস্ত কর্মই গুরুসেবা মাত্র। আমার এখন আর বক্তৃতা দিবার বা প্রচার করিবার কিছুই নাই। গুরু ভাল কি মন্দ ইহাও আমার বলিবার নাই। এই আশ্রম বা এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ ইহাও আমার বিচারের বিষয় নয়। আমি কি বুঝি বা বুঝি না উহা এখন যুক্তিতর্কের বাইরে। আমি পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুমাই

না। এবং ঊনিশ ঘণ্টার কম কাজ করি না। আমার জীবন নীরব গম্ভীর এবং আনন্দময়। গুরুর আশ্রয়ে আমি জীবনধারণের জন্য মোটা অন্নবস্ত্র পাইয়াছি, আমার জন্য আর কি চাই? আমি অফুরন্ত কর্ম পাইয়াছি, রাত্রি দেড়টা হইতে ভোর পর্যন্ত অফুরন্ত সাধনার সময়ও পাইয়াছি, আজ আমি তপোভূমির প্রাকৃতিক জীব ও বন্য জন্তুর সমান হইয়া গিয়াছি। পশুপক্ষী জীবজন্তুদিগকে আমি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপেই পাইয়াছি। উহাদের মধ্যে আমার কোনই ভয় বা সংকোচ নাই। আমার মাথার উপর মুক্ত উদার ও মহান আকাশ, পায়ের নিম্নে অনন্ত সহিষ্ণু সুন্দর ঘাস। পাহাড়ে বাতাস সর্বদা বহন করিতেছে গ্রীষ্মদগ্ধ মৃত্তিকা সংস্পর্শে সুগন্ধযুক্ত মিষ্ট বায়ু। গ্রীষ্মকাল মাটিকে এতটা দগ্ধ করে যে ঐখানের মাটির রং গেরুয়া রং ধারণ করিয়াছে। এই মহানভূমি তপঃভূমি, ত্যাগভূমি, চিরসন্ন্যাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই মহান তপঃভূমি গুরুদেব আমার জন্যই গড়িয়াছিলেন, কারণ আমার ঐ স্থান পরিত্যাগের পর উহা আবার বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই পুণ্য ভূমিতে আমি দিবাচর কর্মী ও গুরুসেবক এবং নিশাচর সাধক।

জীবনকথার মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহার কারণ, অনেকের মনে ইহা লইয়া সংশয় থাকিবার কথা। আমিও গুরুদেবের শরীরত্যাগের পর বহু স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেগুলি গুরুদেবের মনে সংশয়ের চিহ্নরূপে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। গুরুদেবের নিকট আসিয়াই আমি বুঝিলাম যে তিনি কৃতশ্রাদ্ধপিণ্ড এবং বিরজা সংস্কারে সংস্কৃত পরমহংস সন্ন্যাসী। ইহা স্বাভাবিক যে এ স্তরের মহাপুরুষদের কোনও প্রকার জাতিভেদ, লোকভেদ, আচারভেদ আদি থাকে না। এই রূপ উন্নত স্তরের মহাপুরুষ হইলেও গুরুদেব অব্রাহ্মণের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গুরুদেবের মনে একটা সংশয় ছিল যে আমি (সত্যানন্দ) ঐরূপ নিয়ম পালন করা কোনও পরমহংসের প্রয়োজন আছে বলিয়া মানি না। এ কথা তিনি কোথা হইতে শিখিলেন, উহা আমি জানি না। ইহা সত্য ঘটনা যে আমার মনে ইহা লইয়া কোনই সংশয় ছিল না। গুরুদেব যেমন ইচ্ছা করিবেন, তাহাতে আমার কি বলিবার বা ভাবিবার থাকিতে পারে? আমার মনে হয়, তাঁহার মনে সংশয় আনিবার জন্য তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাগণ তাঁহাকে হয়তো আমাকে জড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

"পরমহংস সন্ন্যাসীগণ শুধু ব্রাহ্মণদের বাড়িতে মাধুকরী করেন।" ইহা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি। কারণ ব্রাহ্মণদের আচারবিচার উন্নত এবং তাঁহারা বঙ্গদেশ ভিন্ন প্রায় সর্বত্র নিরামিষভোজী।

গুরুদেবের কিরূপ নিয়মপালন করা কর্তব্য সে বিচার করা আমার অনধিকারচর্চা। তবুও গুরুদেবের যে কোন বিষয়ে আমাকে কেন্দ্র করিয়া সংশয় ছিল, ইহা বুঝা যাইত। মনে হইত তিনি অসন্তুষ্ট। এই অসন্তুষ্টির ভাব প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ, হিন্দুদের ইহা একটা স্বাভাবিক সংস্কার যে ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণদের ছোঁয়া খায় না, এইরূপ সব জাতই কোন না কোন জাতের ছোঁয়া অন্ন খায় না। এইরূপ সংস্কার হইতে তুমিও মুক্ত নও। কারণ এক মাস পূর্বে তুমি অমুকের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আহার কর নাই।" ("অমুক" লোকটির নাম আমার মনে নাই, তিনি গেরুয়াধারী, নমঃশূদ্র জাতীয় লোক, তিনি দীক্ষিতও ছিলেন না বা সন্ন্যাসীও

ছিলেন না।) আমি বলিলাম, ‘‘আমি তো আশ্রমে সাধারণতঃ কাহারও সঙ্গেই আহারাদি করি না। নিজে কোনও প্রকারে সিদ্ধ করিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া আহার করি। তবে কেহ অতিথি হইয়া আশ্রমে আসিলে, তাঁহার সৎকারের জন্য আমার যাহা করা সম্ভব, আমি করিয়া থাকি। আমি আপনার আশ্রমে আসিয়াছি। আমি বিনা কারণে এবং অজ্ঞতাবশতঃ অনেক বিরক্তিকর ব্যবহারের সম্মুখীন হইয়াছি। আমি কেবল বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি যে আপনারা আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া কি বস্তুটা চালাইতে চান। সেটা আমি যতটা জানিতে পারিতেছি, আমি ততটা নিশ্চয়ই পালন করিয়া চলিয়াছি। এখানকার আশ্রমের আচার, বিচার ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমি একদম উদাসীন আছি। আমি নিজের মতন সিদ্ধ করি এবং আহার করি। আপনার শিষ্য এবং শিষ্যারা আমার উপর দিয়া কি যেন একটা চালাইতে চান, সে সবেরই অধিকাংশেরই কোন যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কারণ নাই। বৈজ্ঞানিক কারণ নাই বলিয়াই আপনি আমাকে বহু ব্যাপারে ভুল বুঝিয়াছেন এবং অসন্তুষ্ট হইয়াই চলিয়াছেন। আপনাদের বুঝা প্রয়োজন যে সবটা কাজই আমাকে করিতে হয় এবং প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে কোনও প্রকার ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন সংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া আমাকে যতটা সম্ভব অপ্রস্তুতও করা হয়। সমাজজীবনের উচ্চ বা হীন প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণেই বিচার হয় না। ইহাতে আরও অন্যান্য কথাও থাকিতে পারে। সন্ন্যাসজীবনে জন্ম ও শরীর বিচার অপেক্ষা মন এবং আত্মার বিচারই শ্রেষ্ঠ মানা কর্তব্য। আমি ঐ সব লইয়া এখানে কোন যুক্তিবিচার প্রয়োজন মনে করি না। আমি সেবা দিতে চাই। যতটা সম্ভব নিতে পারেন। আপনার ভালভাবেই বুঝা প্রয়োজন যে আমি পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পূর্ববঙ্গের সকড়ি সংস্কার ও পশ্চিমবঙ্গের সকড়ি সংস্কার একপ্রকার নয়। ইউ, পির সংস্কার আরও অন্য প্রকারের। আমি হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের মানুষরূপে গড়িয়া উঠিতে পারি না। পূর্ববঙ্গে তরকারী, রুটি, লুচি, খৈ, মুড়ি এ সব সকড়ি পর্যায়ে আসে না।’’ সেইদিন গুরুদেব আমার সঙ্গে এইরূপ অনেক কথারই আলোচনা করিয়াছিলেন। আমিও খুব সংযতভাবে উত্তর দিয়াছিলাম। এ সব হওয়া সত্ত্বেও অনেক কথা আছে, যাহার লক্ষ্য আমি বুঝিতে পারি নাই। ইহা স্পষ্টভাবেই বলা ভাল যে, ‘‘আমি গুরুদেবের নিকট অলৌকিক বা দৈব প্রভাবেই আসিয়াছি, আমার জীবনের লক্ষ্য সাধনা ও তপস্যা। গুরুসেবা আমার প্রধান তপস্যা। আমি এখানে জাত-পাত বা প্রতিষ্ঠা ফলাতে আসি নাই। ইহা আমি ভালভাবেই জানি।’’

একবার দুর্গাপূজার সময়, পূজায় নৈবেদ্য এবং দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিয়া আমি পূজায় তন্ত্রধারকের আসনে বসিয়াছি। পূজার ভোগে অনেক দ্রব্যাদি দানের সঙ্গে সন্দেশ এবং মুড়কী দেওয়া হইয়াছিল। বাসন দুইটা লাগিয়া গিয়াছিল। দেবুর মা কাশী হইতে পূজায় আসিয়াছেন। পূজার রান্নায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পূজা আরম্ভের পর তিনি একবার মন্দিরে আসেন এবং সন্দেশ ও মুড়কীর বাসন দুইটা স্পর্শ করিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি আমাকে মনের সুখে তিরস্কার করিলেন এবং শন শন করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখনও বুঝিলাম না, সন্দেশ ও মুড়কী ছুঁইয়া গেলে সেটা ভাতের সমান হয় কিভাবে। যাহা হউক, তিরস্কার আমার মনে কোনই দাগ কাটিল না। আমি কাউকে কোন কথা

জিজ্ঞাসাও করিলাম না। অনেক দিন পরে জানিলাম, সন্দেশে জল থাকে এবং খৈতে জল লাগিলে সেটা নাকি ভাতের সামিল হয় এবং সকড়ি হয়। ইহাতে আমার মীমাংসা হইল না। কারণ মুড়কী তো চিনি বা গুড় পাক করিয়া প্রস্তুত হয়। জল না মিশাইলে চিনি বা গুড় পাক হইতে পারে না। সন্দেশের জলকেও জল বলা যায় না। কারণ উহা দুধে প্রস্তুত হয়। গুরুদেব বলিতেন, লুচি ভাতের সমান, কারণ আটা জলে মাখা হয়। তবে আটাকে জলে না মাখিয়া দুধে মাখিলে সেই লুচি অব্রাহ্মণে করিয়া দিলেও আহার করা চলে। এ জন্য গুরুদেব দুধে মাখা আটার লুচি অব্রাহ্মণের হাতে প্রস্তুত হইলেও আহার করিতেন।

একদিন মুড়কীর সঙ্গে সন্দেশ গুরুদেবকে জলখাবার দিয়াছিলাম। তিনি উহা আহার করিলেন না। কিছু বলিলেনও না। আমিও কিছু বুঝিলাম না।

বিশ্বনাথ বিন্দ নামক একজন ভক্ত - ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমের নিকট বাড়ি - মাঝে মাঝে পাহাড়ের আশ্রমে আসিত। সে আহার করিতেছিল ও কমলা-মা তাহাকে আহার্য দিতেছিলেন। তাহার জলের প্রয়োজন হওয়ায় আমাকে বলিল, ‘‘ছোট স্বামী! আমাকে একটু জল দিন।’’ ইহাতে কমলা-মা আমাকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। কারণ বিশ্বনাথ ‘‘ছোট স্বামী’’ আমাকে কেন বলিল। কমলা-মার তিরস্কার শ্রবণ করিয়া গুরুদেবও পেছনে পেছনে আসিলেন। দুই চার কথা তিনিও বর্ষণ করিলেন। আমি কোন কথাই বলিলাম না। কেহ আমাকে ‘ছোটকা বাবা’ বা ‘ছোটস্বামী’ বলিলে সেটা যে বলে তাহার দোষ, এবং আমি প্রতিবাদ না করিলে আমারও নাকি দোষ। এই কথাও আমি তিন চার বৎসরের মধ্যে আজই নূতন শুনিলাম। এর পর আর কখনও ঐরূপ কথা শুনি নাই। যাহা হউক, বিশ্বনাথ বিন্দ বেচারা মাথা নত করিয়া আহার করিয়া চলিয়া গেল। আমি বালক সাধু, এ জন্য সকলেই আমাকে ‘ছোটকা বাবা’ বা ‘ছোট স্বামী’ বলে।

এই ঘটনায়ও আমি কিছু বুঝিলাম না। হইতে পারে, কমলা মা, গুরুর তুষ্টির জন্য শ্যামবাবুর জন্য আশ্রমে ‘ছোট স্বামী’র পদটি এখন হইতে রিজার্ভ রাখিবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইলেন।

আশ্রমে ব্রহ্মচারী ও সাধুতার জীবনলক্ষ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কালিকানন্দজী সরলানন্দজী স্থরেশ্বরানন্দজী (স্থরেশ চক্রবর্তী), জ্ঞানানন্দজী (বেণীমাধব চক্রবর্তী) এবং অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবহার মনুষ্যজনোচিত ছিল। পরমানন্দজী, ভবেশ্বরজী ও ধীরানন্দজীর ব্যবহার অত্যন্ত হীন স্তরের ছিল। সকলেই জানিতেন, আশ্রমের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তা বলিয়া কি সত্যানন্দও সাধনা তপস্যার পথে আসিয়া কুকুর বিড়ালের জীবন যাপন করিবে? প্রত্যেকটি গৃহী শিষ্য এবং মহিলা শিষ্যা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের এবং গুরুদেবের আমার উপর উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহাদের আশীর্বাদ যুগাযুগান্তর ধরিয়া আমার মস্তকে বর্ষিত হউক, অন্তরাত্মার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা রহিল। গুরুদেবের বহু শিষ্যকে আমি গুরুদেবের আদেশে সন্ধ্যা, পূজা ও যোগের ক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছি। গুরুদেব প্রত্যেককে বলিতেন, যদি পার সত্যানন্দের নিকট হইতে কিছু আদায় কর। কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে অনাত্মভাবের

প্রাবল্য দেখিয়া কোন ইশারা ইঙ্গিতই দিতাম না। যাঁহারা সিদ্ধ গুরুর নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ মানুষ কি দিতে পারে?

গুরুদেব আবার বলিলেন, ‘‘তিন বৎসর পূর্বে তুমি আমার রান্নার কুকার ছুঁইয়া দিয়াছিলে।’’ আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, ‘‘ইহা হইতেই পারে না। আপনি যাহা ‘ধর্ম্মরক্ষা’ মনে করেন, আমি কিছুতেই উহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পারি না।’’

প্রশ্ন : তাহা হইলে, তুমি, তোমাকে কুকার জ্বলিতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি ভাবে বলিয়াছিলে, ‘‘কুকার গরম আছে?’’

উত্তর : উহা বলা সহজ, কুকারে হাত না দিয়াও বলা যায় কুকার গরম কি শীতল। কুকারের নিকট হাত রাখিলেই বুঝা যায়। ছুঁইবার প্রয়োজন হয় না।

একসময় জনার্দন পাঁড়ে নামক এক যুবক গুরুদেবের পাচক নিযুক্ত হন। তাঁহার হাতে সিফিলিটিক ঘা ছিল। তাঁহাকে দেখিলে আমার ঘৃণা হইত। আমি গুরুদেবকে সব গুছাইয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, ‘‘তুমি আটাটা মাখিয়া দিবে ও বেলিয়া দিবে, সে সেঁকিয়া দিবে।’’ আমি বলিলাম, ‘‘যেমন বলেন করিয়া দিব, কিন্তু হাতে না ধরিয়া রুটি করা যায় না।’’ যাহা হউক, পরে গুরুদেব নিজেই বুঝিলেন এবং জনার্দনকে ছাড়াইয়া দিলেন।

ঐ দিন গুরুদেব বহু কথা তুলিলেন। আমি সব কথারই ভাল উত্তর দিলাম। তাঁহার মনের সব সংশয় শেষ হইল। তিনি জীবনে আর কোন কথাই এ বিষয়ে তোলেন নাই। এ সব শুনিয়া শেষ পর্যন্ত বলিলেন, ‘‘তুমি উকিলের মতই আজ আমার সঙ্গে কথা বলিলে, ইহা অদ্ভুত কথা!’’

এসব ঘটনার কথাকে কেন্দ্র করিয়া আরও সব ঘটনা আছে, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে অন্য প্রকারের সংশয় ছিল, সেসম্বন্ধে আমি পরে বলিব।

আশ্রমের মধ্যে আমাকে কেন্দ্র করিয়া, এ সব অতি নিষ্ঠার সাজসজ্জা দেখিয়া আমি ভাল ভাবেই বুঝিলাম, আশ্রম করা এদের লক্ষ্য নয়। কতগুলি নারী সংস্কারকে একজন সাধকের ঘাড়ে চাপাইয়া, নিজেরা যে মহান, ইহাই ফলাইতে চাহেন। ইহার প্রতিক্রিয়া গুরুদেবের শিষ্যভক্তগণে কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমি বহু ঘটনা জানি। দুই একটি মাত্র ঘটনা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। আমি ইহাই বুঝিলাম, অব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সাধুদের আত্মোন্নতি এ ভাবে জটিল করা ঠিক হইল না। আমি কিন্তু এ সব হীন ব্যাপারে আত্মরক্ষামূলক কথাও বলিতাম না।

আমি ও পরমানন্দজী এলাহাবাদে অর্ধকুম্ভ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে, বিন্ধ্যাচলে নামিলাম এবং এক ধর্মশালায় উঠিলাম। সেখানে এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে মিশিলেন। অতি সুন্দর চেহারা, ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ, বয়স পঁয়ত্রিশ হইবে। তিনি আমার সঙ্গে ধর্ম, সাধনা ও যোগধারা সম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তি ও সমালোচনাপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাদের সাধনার উপর এবং সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার মনে গভীর শ্রদ্ধা ও উচ্চ সংস্কার স্থান পাইল। ইতিমধ্যে তিনি বাজারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ইহা দেখিয়া, আমার সঙ্গী পরমানন্দজীও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, ‘‘দেখুন, কোন সাধকের যদি অব্রাহ্মণের শরীর হয়, তাহাতে

কিছু আসে যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের সমকক্ষ সাধুকে আমি কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রদ্ধা করে। আমি আপনার সঙ্গী সাধুটির কথায় ও অসূয়াপূর্ণ আলোচনায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমি এখানে বলিয়া যাইতেছি, আমি আপনাকে গভীরভাবেই শ্রদ্ধা করি এবং আপনার সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমার শাস্ত্রে ও ঈশ্বরে গভীর শ্রদ্ধা হইয়াছে।"

আমি কোন কথারই উত্তর দিলাম না।

গুরুদেব সেদিন বেশ লম্বা আলোচনাই করিলেন এবং ভালোভাবেই বুঝিলেন, পরমহংসের বা কোন লোকের আচার-বিচার লইয়া সত্যানন্দের কোনই মাথাব্যথা বা সংশয় নাই। সে গুরুসেবায় সর্বপ্রকারে প্রস্তুত আছে। আমাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনোবিজ্ঞানের একটা বিচিত্র অধ্যায় শেষ হইল। তিনি রক্ষা পাইলেন কি আমি রক্ষা পাইলাম, সে বিচারের বা আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। পরমানন্দজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু নিবারণ সাধু। চট্টগ্রামের দিকে ইঁহার জন্মস্থান। খুব ভাল মানুষ এবং ত্যাগী পুরুষ। মাঝে মাঝে আমাদের আশ্রমে আসিতেন এবং পাঁচ-দশ দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। নিবারণ সাধুর নাম 'নিবারণ সরকার'। তিনি চাকুরী করিতেন এবং সঙ্গে দুই হাজার টাকা লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসেন। কোমরে নোটের তাড়া ছিল। টাকা রক্ষা করিয়া চলাফেরা তাঁহার পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হয়। তিনি সেই টাকা ভাঙাইয়া এক টাকা করিয়া লন। কাশীর ঘাটে বসিয়া দুই হাজার টাকা দান করিয়া তিনি নিঃস্ব হন। তিনি বিন্ধ্যাচলের নিকট গেরুয়া তলায় যাইয়া থাকিতেন। সেখানে এক নির্জন পুকুর এবং হনুমানের মন্দির আছে। কিছু দূরে গ্রাম ছিল। তিনি মাসে একবার গ্রামে যাইতেন এবং গ্রামবাসীরা তাঁহাকে এক মাসের মতন ডাল চাল আটা ভিক্ষা দিতেন। ইহা ভিন্নও কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা সাহায্য করিতেন। তিনি অব্রাহ্মণ (কায়স্থ বংশীয়) সাধু ছিলেন। গেরুয়া তলাতেও কতগুলি বদমাইস ও যুবতীর লীলাকেন্দ্র ছিল। সেখানে নিবারণ সাধু থাকিবার দরুন তাহাদের অসুবিধা হইত। একদিন নিবারণ সাধুকে তাহারা প্রহার করে এবং প্রতিজ্ঞা করায় যে তিনি আর গেরুয়া তলাতে থাকিবেন না। এই ঘটনার পর তিনি আমার নিকট আসেন এবং আশ্রমকে আবশ্যক সংশোধনের প্রস্তাব করেন। আমি বলিলাম, গুরুদেবকে বলুন। তিনি বলিলেন, আপনি শক্ত হইলে সব ঠিক হয়, আপনিই তো সব ধরিয়া রাখিয়াছেন। আপনি এত নত হইয়া থাকেন কেন? আপনি প্রতি মাসে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড হইতে ৮টাকা বেতন পান, এখানে পাঠশালার মাষ্টারী করেন বলিয়া। আপনার শরীর রক্ষায় এই ৮ টাকা যথেষ্ট। সেই টাকা কি হয়? আমি বলিলাম, আমি প্রতিমাসে বিলটি সই করিয়া দিই এবং মণিঅর্ডারে টাকা আসিলে সেক্রেটারীকে দিয়া থাকি, ইহার পর শুনিয়াছি সেই টাকা D.B. এর নামে আশ্রম ভাণ্ডারে জমা হয়। "ইহা লইয়া আপনি প্রতিবাদ করিবেন কিনা কারণ সেটা আপনার নামে জমা হওয়া কর্তব্য।" নিবারণ সাধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম, গুরুদেব যাহা করেন, উহার উপর আমার কিছুই বলিবার নাই। ইহার পর তিনি আবার বলিলেন, এবার দুর্গা পূজার পর একাদশী রাত্রির ঘটনার কথা তিনি তোলেন। আমি তাঁহাকে যাহা বলিবার বলিতে বলিলাম। তিনি পরমানন্দজীর নিকট যেমন শুনিয়াছেন, সব বলিলেন। তাহার

পর আমার কথা আরম্ভ করিলাম। কমলা-মাকে অপদস্থ করিয়া তিনি কথা বলিলেও আমি ধীর ভাবেই বলিলাম। সে সময় আশ্রমে শ্যামবাবু (গুরুদেবের ভাই), দুর্গাপ্রসাদ ক্ষেত্রী, ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের প্রেরিত একজন M.A. পাস বিদ্বান সাধু, পরমানন্দজী, সরলানন্দজী, কমলা-মা এবং আরও অনেক গৃহস্থ ও সাধু ছিলেন। ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের সাধুকে আমি গুরুদেবের পাশের ঘরে শয়ন করিবার স্থান করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া গুরুদেব আমাকে গভীর রাত্রে তিরস্কার করেন। ওই ঘরখানায় এবার কমলা-মা অবস্থান করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরুদেব বলিলেন, উহাতে শ্যাম আসিলে থাকিবে, ওই ঘর তাহার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। গুরুদেব কমলা-মাকে আমার সঙ্গে মন্দিরে যেমন সব দিন থাকেন, সেইরূপ থাকিতে বলেন। রাত্রি তখন এগারটা। আমি ও কমলা-মা সকলের আহারাদির পর আহার করিয়াছি। কে কোথায় শয়ন করিবে, আমি সেই ব্যবস্থায় চলিলাম। দেখিলাম গুরুদেব নিদ্রিত। শ্যামবাবু বলিলেন, আমরা নিজেদের সব ব্যবস্থা করিয়াছি, তুমি ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের সাধুটির ব্যবস্থা করিয়া দাও। আমি শ্যামবাবুকে তাঁহার জন্য সংরক্ষিত ঘরে শয়ন করিতে বলিলাম। কারণ আর কোন ঘরই খালি নাই। তিনি বলিলেন, ওই ঘরেই ওই সাধুকে ব্যবস্থা করিয়া দাও। রাত্রিকালে সাধু নাক ডাকিয়া গোংড়াইতে ছিলেন। তখন গুরুদেব উঠিয়া বসিয়াছেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ওই ঘরে কে? আমি সব বলিলাম। তিনি আমাকে ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া তিরস্কার করিলেন এবং সাধুকে অন্য যে কোন স্থানে ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। আমি শ্যামবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া সাধুর ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। কমলা-মা বলিলেন, জান সত্যানন্দ, বাবা আজ যে ছেলেমানুষী করিলেন, সে বলিবার নয়। আমার আর আশ্রমে থাকা চলে না। আমি বলিলাম, ধমক তো খাইলাম আমি, কিন্তু পালাতে চান আপনি। কমলা-মা বলিলেন, তুমি ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝ না। তোমাকে বলাই বৃথা। আমি বলিলাম, যান মা জপে বসুন গিয়ে। পরদিন সকাল বেলা, সেই সাধু পরমানন্দজী সরলানন্দজী সাজিয়া গুজিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, আমি জানি না। নিবারণ সাধু বলিলেন, এসব আপনার কাছে সব বিপরীত কথাই শুনিলাম। নিবারণ সাধু এবার অন্য কথা তুলিলেন। আমি বলিলাম, আশ্রম বিষয়ে আমার কোনই প্ল্যান নাই, সব গুরুদেবকে বলুন।

একদিন গুরুদেব বলিলেন, এই স্থরাইটাতে আর জল দিও না; ওটা পরমানন্দের পায়ে ঠেকিয়াছে। আমি তখনই জিজ্ঞাসা করিলাম, সর্বদা কাছাকাছি থাকি। কখন কোন বস্তু পায়ে ঠেকে, ঠিক নাই, এ ভাবে কত বস্তু আমি ফেলিয়া দিব? গুরুদেব বলিলেন, যদি কখনও কোন বস্তু পায়ে ঠেকিয়া যায়, সেটা তখনই মাথায় ঠেকাইয়া লইবে, তাহা হইলেই উহা শুদ্ধ হইল, জানিবে।

দেশাচারের ভিত্তিতে নানাপ্রকার সংস্কার সব দেশেই কিছু না কিছু থাকে। একবার আমি বহুদিন বাহিরে অবস্থানের পর আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছি। আশ্রমের সম্মুখে মঠের মধ্যে দুইটা লোহার ঘড়ায় জল রহিয়াছে। গুরুদেব আশ্রমের বারান্দায় একা বসিয়া রহিয়াছেন। আমার পায়ে কাদা ছিল। আমি বড় ঘড়ার জলে হাত পা ধুইলাম। গুরুদেব বলিলেন, ওই ঘড়াটা চামার ছুঁইয়া দিয়াছে। আমি ইহার কোন অর্থই বুঝিলাম না।

কয়েক দিন বাদে জানিলাম চামার কোন বাসন ছুঁইলে সেটা নাকি অছুঁ্যত হয়। অবশ্যই গুরুদেব উহা লইয়া আর কোন কথাই বলেন নাই।

জঙ্গলের মধ্যে আশ্রম। নিকটে লোক জনতার বাড়িঘর নাই। বনের ধারে পাহাড়ের পাশে দুই চার ঘর চামার বাস করে। ওরা বনের কাঠ কাটে, পাঁচ সাত মাইল দূরে যাইয়া চুনার বাজারে বিক্রয় করে এবং পেট পালে। এরাই আশ্রমের কাজকর্ম করে, মজুরী লয়। ক্রমাগত কয়েক বৎসর কাটিবার পর বাসন মাজার কাজে চামার নিযুক্ত করিলাম। ফলে একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সম্মুখীন হইলাম। গুরুদেব আশ্রমে আসিলে, ইহা লইয়া খুব হট্টগোল আরম্ভ হইল। গুরুদেব আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, এরা কি বলে, শোন। ওই দেশী ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, চামার বাসন স্পর্শ করিলে উহা অছুঁ্যত হয়, এবং সেই সব বাসন আর কোন উচ্চশ্রেণীর কাজে আসে না। এ ভাবে আশ্রমের বাসন অছুঁ্যত করিলে, আমরা কি ভাবে আশ্রমে আহারাদি করি বলুন। আমি বলিলাম, আশ্রমের কয়েকখানা মাত্র বাসন, সেইগুলি বেশীর ভাগই আমার ব্যবহারের বাসন, চামার মাজিয়া দেয়। এখানে দশ বারটা ঘটি, দশ বারটা ঘড়া, দশ বারটা থালা, এইরূপ প্রত্যেকটা বাসনই দশ বার সেট এখানে রহিয়াছে। সেইগুলি তোলাই থাকে। আপনারা সেইগুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন। সেইগুলি ব্যবহারের পর মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে আমি সেইগুলিকে তুলিয়া রাখিব। আপনাদের কোনই অসুবিধার কারণ নাই। আপনারা যাহা ধর্ম মনে করেন, আমি উহা নষ্ট করিব না। তাঁহারা এখন আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিলেন, আপনি ব্রহ্মচারী হইয়া অনাচার করিতে পারেন না। আমি বলিলাম, আমি ব্রহ্মচর্যকেই আচার এবং একমাত্র তপস্যা মনে করি। আমি দক্ষিণাচার অনুসরণ না করিয়া যদি কোন কোন বিষয়ে বামাচার অনুসরণ করি, তাহাতে আমার সাধনার ক্ষতি হয় না। এ বিষয়ে আপনারা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করুন। আমাকে জলচল জাতের চাকর দিন, আমিও এ সব কাজে চামার নিযুক্ত করিব না, জানিবেন। ধনী ও ভদ্রলোকেরা আশ্রমে আসিয়া পোড়া বাসন মাজিবে, ইহা দেখিতে আমার ভাল লাগে না। ওইরূপ বলিয়া আমি অন্য কাজে চলিয়া গেলাম। শুনিলাম, আমার চলিয়া যাইবার পর, গুরুদেব বলিলেন, "হিন্দু জাতের সামনে যে সব সমস্যা আসিয়াছে, তাহাতে সত্যানন্দকে সমর্থন করা যায়। পূর্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন সব জাতের লোকেরাই বাড়ির কাজকর্ম করিত। এখন কেহই করে না। কিন্তু ইহা বুঝা প্রয়োজন যে সব কাজের সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। কাজেই চামারদের মধ্য হইতে যদি কাজের লোক সংগ্রহ করা হয় সেটা সমর্থন করা ভাল। একদিন হয়তো চামাররাও বাড়ির কাজে আসিবে না, তখন অহিন্দুগণকে শুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে লোক লইতে হইবে।" ইহার পর হট্টগোল শেষ হইল। ব্রাহ্মণগণ আশ্রমে আহারাদি করিয়া বাসন মাজিয়া দিলে আমি তুলিয়া রাখিতাম। এ ভাবে পাঁচ ছয় মাস চলিবার পর শুদ্ধাচারীগণ আর বাসন মাজিতেন না। চামার চাকরই পরিষ্কার ভাবে বাসন মাজিয়া দিত।

আশ্রমের জমি সংগ্রহ হইবার পর যখন মন্দিরাদি নির্মাণ হয় নাই, তখন প্রকাণ্ড অশ্বত্থমূলে আমি সকাল সন্ধ্যা মধ্য ও শেষরাত্রে বসিয়া সন্ধ্যাপূজা ও জপ সাধনাদি করিতাম। প্রথমে ওইস্থানে তিনদিক সম্পূর্ণ খোলা এক ফাঁকা মন্দির হইল। আমি ওইখানেই থাকিতাম এবং সাধনাদি করিতাম। তাহার পর গুরুদেব ওইস্থানে পাকা

মন্দির নির্মাণ করিলেন। তখন আমি ওই মন্দিরেই অবস্থান করিতাম। গুরুদেব বলিতেন, "মন্দিরে সত্যানন্দ থাকিবে।" কখনও কখনও মন্দিরে চামাররাও প্রবেশ করিত। ইহা লইয়া গুরুদেবের নিকট নালিশ হইল। গুরুদেব আমাকে ডাকিলেন। আমি বলিলাম, "কেহ ভক্তিবশে মন্দিরে প্রবেশ করিলে আমি কি বলিতে পারি? কোন ভক্তিমানের মনে আঘাত দেওয়া ঠিক নহে। জঙ্গলের মধ্যে মঠ, এখানে কখনও কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিলে, ইহা লইয়া হট্টগোল না করাই ভাল, আমার ইহাই মত।"

গুরুদেব আশ্রমে প্রায়ই থাকিতেন না, আমিই থাকিতাম। আশ্রম ও দ্রব্যাদি আমিই রক্ষা করিতাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সবকিছুই নিজের সুবিধামত দেখিতেন। একটি ছোট টিনের কৌটার মধ্যে দশ পনেরোটি কিসমিস ছিল। তিনি খুলিয়া দেখিয়া আমাকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসমিস কটা পচিল কেন?" আমি কোনই উত্তর দিলাম না, কারণ উত্তর দিবার মত কোন উপাদান আমার নিকট ছিল না। তিনি বলিলেন, হয় রক্ষা করিতে হইবে, অথবা খাইয়া ফেলিতে হইবে। আমি বুঝিলাম, কোন বস্তুই খাইয়া ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। গুরুদেব যাহা রাখিয়া গিয়াছেন আমাকেও উহা রক্ষাই করিতে হইবে। তবে কিসমিস বেশীদিন রক্ষণীয় বস্তু নয়।

অভিষেক

এখন গুরুদেব পাহাড়ের আশ্রমে আছেন। সেখানে পুকুরের ধারে তিনটি ক্ষুদ্র পাতার ছাপ্পর করা হইয়াছে। উত্তর প্রদেশের গ্রাম্য ভাষায় ইহার নাম মড়াই। ইহার একখানা মড়াইতে গুরুদেব থাকেন। সেখানাকে চটের আবরণ দেওয়া হইয়াছে। আর দুইখানা এখনও খোলাই আছে। উহার একটিতে গরু থাকে, সঙ্গে মঙ্গরু নামক এক অতিবৃদ্ধ চাকর থাকে। অন্যখানাতে আমি থাকি। আমি ধীরে ধীরে নিজের মড়াইখানাকেও চটের আবরণ দিলাম। পরমানন্দজী ও সরলানন্দজী কয়েক দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন আমি এবং গুরুদেব মাত্র রহিয়াছি। আমি গুরুদেবের নিকট অভিষেকের প্রস্তাব করিলাম। তিনি বলিলেন, কেহ পূজা করিবার মত লোক না আসিলে অভিষেক হইবে না।

কয়েকদিন ধরিয়া যেমন বৃষ্টি তেমনই বাতাস চলিয়াছে। পুকুরের এক ধারে তিনটি মড়াই রহিয়াছে। পুকুরটি জলে ভরপুর। চারিদিকে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নিম্ববৃক্ষ। একদিকে দুইটি সুন্দর মহুয়া গাছ এবং বৃহৎ আম্রবৃক্ষ রহিয়াছে, তাল ও বৃহৎ কুলবৃক্ষও রহিয়াছে। গেরুয়া বস্ত্রধারী গুরুদেব, এই পবিত্র স্থানের উপর চলাফেরা করেন। না দেখিলে সেই শোভার বর্ণনা করা যায় না। চারিদিকে হালকা রঙের সবুজ ঘাস। হরিণের দল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। গরুর পাল চারিদিকেই চরিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষীকুল আকাশে এবং বৃক্ষে বৃক্ষে নানাপ্রকার ধ্বনি করিতেছে। পুকুরের পারগুলি রক্তবর্ণের কঙ্করে পরিবেষ্টিত। সেইসব কঙ্করশ্রেণী ভেদ করিয়া পাতলা পাতলা ঘাস ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। এ যে মানস সরোবরের ধারে ব্রহ্মানন্দ মগ্ন এবং মূর্তিমান ব্রহ্ম,

স্বয়ং শিবের ধাম। আমি গুরুদেবের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। দেখিতেছি, বনভূমির মধ্য দিয়া মাথার উপর চূড়া বাঁধা এক সাধু আসিতেছেন। আমি গুরুদেবকে ইহা বলিলে তিনিও দেখিলেন এবং বলিলেন, "কমলা আসিতেছে।" অল্প সময়ের মধ্যেই কমলা-মা আসিলেন এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। কমলা-মাকে আমি জোড় হাতে প্রণাম জানাইলাম।

আমার অভিষেকের সব ব্যবস্থা হইল। কমলা-মা পূজা করিবেন। আমি যতটা পারিলাম দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম এবং বাজার হইতেও আনিলাম। আমার ঠিক তারিখ বা সন মনে নাই, তবে যতটা মনে হয় আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা অর্থাৎ গুরুপূর্ণিমাতেই অভিষেক হইয়াছিল। গুরুদেব বলিয়াছিলেন, শুক্লপক্ষে এবং পরিপুষ্ট তিথিতে অভিষেক করা প্রয়োজন। তখন আষাঢ় মাস, উত্তরপ্রদেশে বর্ষা আরম্ভেরই সময়। আমার মনে খুবই তৃপ্তি যে অভিষেক গ্রহণ করিয়া এবার সাধনায় প্রবেশ করিব। রাত্রে কমলা-মা স্বপ্ন দেখিলেন, সকালবেলা সেই স্বপ্ন-কথা গুরুদেবকে বলিলেন। গুরুদেব স্বপ্নের কথা আমাকে বলিতে নিষেধ করিলেন। কমলা-মা সংক্ষেপে বলিলেন, "তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। মা তোমার উপর ভালভাবেই কৃপা রাখেন। মা আমাকে সব দেখাইয়াছেন, কিন্তু গুরুদেব বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।" কমলা-মার স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমার হেমবাবুর কথা মনে হইল। আমাদের স্কুলের সহকারী হেডমাস্টার হেমবাবুকে আমি খুব ভক্তি করিতাম। তিনি তখন আটত্রিশ বৎসর বয়সেও বিবাহ করেন নাই। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে খুব ভক্তি করিতেন। গৃহত্যাগের পূর্বদিন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। প্রণাম করিবার পরই বলিলেন, "তুমি ভগবানের ইঙ্গিত করা মানুষ, তোমার ভয় নাই।" আমি তাঁহাকে কিছুই বলি নাই, তাঁহার অযাচিত অভয়বাণী আমার অন্তরে অঙ্কিত রহিল।

কমলা-মা অভিষেকের পূজা করিলেন। গুরুদেব তন্ত্রধারক হইলেন। পাহাড়ের আশ্রমে ইহাই প্রথম পূজা। এবং কমলা-মার জীবনে ইহাই প্রথম অভিষেক পূজা। আশ্রমে তখন আর কেহই ছিলেন না। নির্জন পাহাড়ের উপর অভিষেক পূজা গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিল। পূজার শেষে কমলা-মা অনেকক্ষণ জপ করিলেন এবং চক্ষের জলে ভাসিলেন। গুরুদেবকে বলিলেন, "জীবনে পূজায় এমন আনন্দ আর পাই নাই।" গুরুদেব বলিলেন, "মা যে ওর উপর স্নেহ রাখেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। নয়তো তোমার মত উন্নত স্তরের সাধিকা এর অভিষেক পূজা কেন করিবে? আমাদের মধ্যে সাধিকার অভিষেকপূজা ইহাই প্রথম।"

আশ্রম জীবনে নারীর সংস্পর্শ আমার জীবনলক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংসার ছাড়িবার পূর্বে আমি নারী সংস্পর্শের স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, আমার এখনই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া কর্তব্য। আশ্রম-জীবনে প্রবেশের প্রাক্কালে দেখিলাম, কমলা-মা, মায়ের আসন গ্রহণ করিয়া, আমার মাতৃপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন। কমলা-মাকে যখন আমি প্রথম আশ্রমে দেখিয়াছিলাম, তখন বেশ শঙ্কিত হইয়াছিলাম। কারণ, বিরুদ্ধবাদীরা আশ্রমে নারীর প্রবেশকে কেন্দ্র করিয়া বৃথা নিন্দা করিবার সুযোগ পায়। আমার অন্তর মাতৃরসে পরিপূর্ণ। মা, ঠাকুরমা, মাসীমা, পিসীমা, মামীমা, কাকীমা, বড়মা, আমার

নিকট অত্যন্ত আদরের সম্পদ। আমি মা বলিয়া ডাকিয়া যে কত আনন্দ পাই, উহার তুলনা নাই। কমলা-মাকে সকলে কমলা-মা সম্বোধন করেন। কিন্তু আমি কমলা-মাকে মা বলিতাম। মা ডাকিবার সঙ্গে স্নেহময়ী কমলা-মা আমায় স্নেহসূচক সম্মতি দিয়া উত্তর দিতেন, আমি মুগ্ধই ছিলাম। গুরুদেব অভিষেকের পরই বলিয়া দিলেন। কমলা, সত্যানন্দ তোমাকে মা ডাকে, ঐ মা ডাকায় কোন কৃত্রিমতা নাই, তোমারও যদি সন্তান থাকিত, তবে তাহারও বয়স এর সমান হইত। মায়ের সাধনা করিতে নামিয়া আমি সাক্ষাৎ মা পাইলাম। ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গর্বের ও তৃপ্তির কথা। আমার আদর্শবাদীয় ধর্মবুদ্ধিতে মহাশক্তি মা আজ ভালভাবেই বজ্রাঘাত করিলেন। আমি নূতন ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিলাম। জনসাধারণ একজন শক্তি-সাধককে কি ভাবে বা কি বলে, উহা লইয়া মাথা ঘামানো শক্তি-সাধকের প্রয়োজন নাই। নারীতে মাতৃভাব এবং স্ত্রীভাব দুই-ই প্রবল। শক্তিসাধনায় দুই-ই গৃহীত হইয়াছে। দিব্যাচারে মাতৃভাবকে কেন্দ্র করিতে হয়। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। আশ্রমজীবনে নারী-আতঙ্ক অতিক্রম করিয়া মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠা পাইয়া আমি নিশ্চয়ই সুখী হইলাম।

গুরুদেব যথাবিধি তিল-কাঞ্চন ও পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি আমাকে দিয়া করাইলেন এবং অধিবাস করিয়া অভিষেক করিয়া দিলেন। অভিষেকের পরই দীক্ষা। শাক্তাভিষেক ও পূর্ণাভিষেক যথাবিধি হইবার পর একাক্ষরী বীজমন্ত্র এবং মালামন্ত্র এবং কালীর গায়ত্রী দীক্ষা হইল। গুরুপাদুকার মন্ত্র ও ক্রিয়া ও উপদেশ দিলেন। ব্রহ্মমন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রীর দীক্ষা পূর্বেই হইয়াছিল। অভিষেকের পর আবার সে সব দীক্ষাও দিলেন।

দীক্ষার পর কমলা-মার ইচ্ছা আমি গেরুয়া ছাড়িয়া দিয়া আবার সাদা বস্ত্র পরিধান করি। আমি রাজী হইলাম না। তিনি আমাকে গুরুদেবের মত জানিতে পরামর্শ দিলেন। আমি সে বিষয়েও রাজী হইলাম না। তিনি গুরুদেবকে বলিলেন, ওকে এখনই সন্ন্যাস বেশে না রাখিয়া সাদা বস্ত্র ধারণ করিতে বলুন। গুরুদেব কিছুই বলিলেন না। কমলা-মা বলিলেন, অত্যন্ত বালক, তুমি এ সময়ই সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিবে? আমি বলিলাম, এতদিন ছিলাম গৃহী ও সন্ন্যাস জীবনের মধ্যস্থলে। এখন অভিষেক হইয়া গিয়াছে। এখন আমার সাধক ও সিদ্ধ জীবনের মধ্যস্থলে থাকাই প্রয়োজন। আমি সন্ন্যাস বেশ ত্যাগ করিব না। কমলা-মার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি আমার উপর ছিল। তিনি হয়তো সন্তানকে সন্ন্যাস বেশে দেখিতে পছন্দ করিতেন না। অথবা অন্য কোন রহস্য অন্য জন্ম বিষয়ে ছিল, যাহা আমার অজ্ঞাত ছিল। তিনি আমার গেরুয়া ধারণের বেশ বিরুদ্ধে ছিলেন। আমার যখন তেইশ বৎসর বয়স তখন তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি কাশীতে থাকিতেন। প্রতি বৎসর দুই এক বার তিনি পাহাড়ের আশ্রমে আসিতেন। তিনি সত্যই সাধিকা ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব দিবস, কোন পরিচিত ভদ্রলোক, তাঁহাকে অপমান করিয়া কয়েকটি কথা বলেন। ভদ্রলোকের বাড়িতে অন্নপ্রাশন উৎসব ছিল। তাঁহাকে বাড়ির কাজকর্মে সাহায্য করিবার জন্য সকালবেলা ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠান, কমলা-মাকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। নিমন্ত্রণ না করিয়া, কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজকর্মের জন্য ডাকিয়া পাঠানো তিনি ভদ্রোচিত কার্য মনে করেন নাই। কমলা-মা উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা ছিলেন। উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি বাল্যকালেই বিধবা হন। অসহায়া হইয়া তিনি কাশীতে চলিয়া আসেন। এবং আট আনায় ঘর ভাড়া

করিয়া অনেক অসহায়া বিধবাদের সঙ্গে একটা বাড়িতে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন গত হইলে গুরুদেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর তাঁহার জীবন সাধনার দিকে ঝুঁকিয়া যায়। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে বুঝা যাইত, তিনি সন্ন্যাস-জীবন হইতেও প্রতিষ্ঠিত ও সম্পন্ন গৃহস্থ-জীবন বেশী ভাল মনে করেন। প্রকৃতি তাঁহাকে বলপূর্বক সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন। তিনি নিত্য বৈকালবেলা অন্নপূর্ণা মন্দিরে একটি বারান্দায় বসিয়া জপ করিতেন। জপে তিনি আরাম ও আনন্দ পাইতেন। তিনি জপ করিতেছিলেন, সেই সময় সেই অন্নপ্রাশন কর্তা ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসেন এবং দম্ভযুক্ত ভাষায় কমলা-মাকে তিরস্কার করেন। কমলা-মা ইহাতে বিশেষ অপমান বোধ করেন। তিনি অপমানে বজ্রাহত হইয়া মন্দিরেই বলিয়া আসিলেন যে তিনি এই অপমানের শরীর আর রাখিবেন না। মা যেন কমলা-মায়ের মনের ব্যথা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। পরদিন সকাল দশটায় কমলা-মার কলেরা হয়, বৈকাল চারটায় তিনি চলিয়া যান।

পাহাড়ের আশ্রমে আমার অভিষেক হইবার পর, বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় কাঁচা মাটির বাড়ি প্রস্তুত হয়। বাড়িটার মধ্যস্থলে তিন দিক খোলা মন্দির গৃহ এবং মন্দিরের দুইদিকে দুইখানা করিয়া ছোট গৃহ। কেবলমাত্র গুরুদেবের অবস্থান গৃহটিতে দরজা ছিল। আর সব গৃহই দরজাহীন এবং খোলা। কমলা-মা অভিষেকের কয়েক মাস পরে যখন আসেন তখন একটা দরজাহীন গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা হয়। তিনি আর সেখানে থাকিলেন না। মন্দিরের ঘরে, সেটা তিনদিকে খোলা, আসিয়া রহিলেন। বলিলেন, রাত্রে বন্য জন্তু চিৎকার করে, তাঁহার ভয় হয়। যাহা হউক ইহার পর তিনি যতদিন আসিতেন এবং যতবার আশ্রমে আসিয়াছেন, ততবার আমার নিকটে মন্দিরেই অবস্থান করিতেন। গুরুদেব মাঝে মাঝে কাশী যাইতেন এবং বড় গণেশ নামক স্থানে নিজের আশ্রমে অবস্থান করিতেন। মঠে একটা অন্য ঘরে পরমানন্দজী ও সরলানন্দজী থাকিতেন। গুরুদেব বড় গণেশ আসিলে কমলা-মাও আশ্রমেই থাকিতেন। সেই আশ্রমে একটা ছোট ও প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে একদিকে তিনি শয়ন করিতেন, অন্য দিকে, আমি কখনও কাশী গেলে, অবস্থান করিতাম। এ ভাবে আমার বয়স তেইশ বৎসর আসিল। আমার ধারণা তাঁহার বয়স এতদিনে পঞ্চান্ন অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানা উৎসাহ ও অভয়প্রদ এবং স্নেহের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি গুরুদেবকে শিমলায় একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, পত্রখানা বহু আর্তনাদপূর্ণ এবং 'বাবা গো', 'বাবা গো' বলিয়া কান্নার সুরে পরিপূর্ণ। গুরুদেব শিমলা হইতে আসিয়া সেই পত্রখানা আমাকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পথে কমলা ভালই চলিয়া গেল। বয়সও বেশী হয় নাই, মাত্র ছত্রিশ বৎসর। বয়সের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, কমলা-মা তো আমাকে যে বয়সের কথা বলিয়াছেন সেই হিসাবে এখন পঞ্চান্ন বৎসরের বেশী; তবে কি তিনি মিথ্যা কথা বলিতেন? গুরুদেব বলিলেন, মেয়েরা অনেক সময় এইরূপ বলে। কিন্তু সেটাও বুঝিয়া লইতে হয়।

কমলা-মার মৃত্যুর পর আমি কমলা-মাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। সে কথা সবই গুরুদেবকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, কমলা তোমার নিকট খুব বাল্যকালেই আসিবে।

ওর উপর খেয়াল রাখিও। তোমার উপর তাহার গভীর টান ছিল। কমলা-মার প্রথম আবির্ভাব আমাকে একটু নারী-আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছিল ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাঁহার বিচ্ছেদ আমাকে বেশ শোকান্বিত করিয়াছিল। গুরুদেবের নিকট যখন তিনি আসিয়াছিলেন, তখন নিরক্ষরা ছিলেন। তিনি গুরুদেবের যত্নে বাংলা ও হিন্দী পড়িতে শিক্ষা করেন। তিনি বেশ পরিষ্কারভাবে গীতা, চণ্ডী পাঠ করিতেন এবং বাংলা ও হিন্দী ভাষায় চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিয়া হোমিও ঔষধ দিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চুনার পাহাড়ে আনন্দ আশ্রম

মঠ করিবার জন্য গুরুদেব প্রকাণ্ড জমি খরিদ করিয়াছেন, এই জমির নাম গোঁসাইপুরা নামক মৌজা। এই মৌজা চুনার বাজার এবং গঙ্গাতট হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গল এবং পাথরের খনিই প্রধান সম্পদ। এখানে ছাগল এবং ভেড়ারও পালনকার্য ব্যাপকভাবে চলে। গোঁসাইপুরা মৌজাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে অনেকগুলি মৌজা রহিয়াছে। বড়েগাও, রোহিলাপুর, বল্লিপুর, বারাডী, দুর্গাখো, বুন্দা, বিজুরিহী, ধাওহাঁ, কুশুমী, চুড়িয়াবাবা, কানোহী, কানোহা ইত্যাদি। এ সব পাহাড়ী ভূমির অতি সামান্য অংশই চাষের কার্যে ব্যবহার হয়। সামান্য দুই-দশ ঘর গৃহস্থ কোন কোন মৌজায় বাস করে। আর সব খালি। আনন্দাশ্রমের নিকটে কোন বস্তি নাই। বর্ষা ও শীতকালে এ সব পাহাড়গুলি এত সুন্দর হয় যে উহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা যায় না। গৃহী এবং সাধু সকলেই এই সব স্থানে অবস্থান করিয়া জীবন কাটাইতে পারিলে নিজেরা ধন্য মনে করিবে। কিছুদিন অবস্থান করিবার পরই এ স্থানের ভূমি ও সৌন্দর্যসম্পদের বিরুদ্ধ দিকটাও অভিজ্ঞতার নিকট স্পষ্ট হইবে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা, এখানে বর্ষাকাল অত্যন্ত স্বল্প। বৎসরে সাতাশ আটাশ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিই হয় না। বর্ষার জল বাঁধিয়া রাখিয়া এবং কূপের জল তুলিয়া সামান্য চাষ করা যায়; কিন্তু বন্যপশুর এত উপদ্রব যে চাষাবাদ অসম্ভব। গোপালনও অসম্ভব। কারণ গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া কঠিন। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস পর্যন্ত পাহাড়টা একেবারে ঘাসশূন্য হইয়া যায়। তাহার উপর চিতা ও বাঘের উপদ্রবও লাগিয়াই থাকে। গরু মহিষরা সংঘবদ্ধ ভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে যদি সঙ্গে সাহসী লোক থাকে। সঙ্গে লোক না থাকিলে বন্যপশু হইতে পালিত পশুদের আত্মরক্ষা অসম্ভব। ছাগল ভেড়াগণ বন্যপশু হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম নহে। ইহাদিগকে সন্ধ্যার পূর্বেই গৃহের মধ্যে স্থান করিয়া দিতে হয়। ছাগল ও ভেড়ার প্রধান শত্রু নেকড়ে বাঘ। পাহাড়ে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। চাষের ফসল বন্য শুকর এবং হরিণ বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ধ্বংস করে।

গুরুদেব চাষের পক্ষপাতী। ব্রহ্মচারীরা চাষাবাদ করিবে, অন্ন উৎপাদন করিবে এবং সাধক ও শান্ত জীবন অতিবাহিত করিবে। সেই অনুসারে তিনি হাল বলদ সবই কিনিয়াছেন, লোক নিযুক্ত করিয়া চাষাবাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চাকররা দিনের বেলা ঘণ্টা ধরিয়া চাষ করে, তাহার পর বাড়ি চলিয়া যায়। বীজ হইতে চারা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে বন্যপশুর উপদ্রব আরম্ভ হয়। আমি সমস্তটা দিন নানপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য করি। রাত্রির এক অংশ নিদ্রায় থাকি এবং বাকী অংশ সাধনায় আত্মনিয়োগ করি। এখন বন্যপশু ভাগানোও আমার সাধনার অঙ্গরূপে পরিণত হইল। গুরুদেব রাত্রি দুইটার সময়ই সাধনায় বসেন। রাত্রিতে বন্যপশুর আবির্ভাবে নানারকম শব্দ হয়, উহা শুনিলেই

তিনি বাহিরে আসেন। প্রথম দিন আমি সাধনার আসন হইতে উঠিব কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কিন্তু আমি বুঝিলাম ইতস্ততঃ করিয়া লাভ নাই। আমার বন্যপশু তাড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আসনে বসাই ঠিক হইবে। বাতি দেখিলে ও হাই হুই করিলে বা টিন পিটাইলেও বন্যপশুরা চলিয়া যাইত, কিন্তু উহারা আবার আসিত। আমি এখন দিনের বেলায় দিবাচর এবং রাত্রিবেলায় ভাল ভাবেই নিশাচর হইলাম। গুরুদেব নিত্য রাত্রি দুইটায় উঠিতেন এবং সাধনায় বসিয়াছি কিনা সংবাদ লইতেন। আমি দেড়টায় উঠিতাম কারণ বন্যজন্তু তাড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় আরও আধঘণ্টা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মনে করিলাম। জপ ও সাধনায় আমার খুব নেশা লাগিত, আমি বন্যজন্তু তাড়াইয়া কখনও হাত ধুইতাম না, সেইভাবেই যাইয়াই আসনে বসিতাম। অবস্থা বুঝিয়া গুরুদেব বন্য কাঁটার ডাল সংগ্রহ করিয়া বেড়া দেওয়ারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু দিনের বেলা পালিত পশু এবং রাত্রির বন্যপশু সে সব ঘেরাকে ভ্রূক্ষেপও করিত না। তাহারা সহজেই বেড়া ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিত এবং শস্য নষ্ট করিত। আমি রাত্রির সাধনার মধ্যে দুই হইতে পাঁচ বার ঘুরিয়া আসিতাম। ইহাতে আমার সাধনার কোনই ক্ষতি হইত না। কারণ ইহা দ্বারা মনের মধ্য হইতে সাধনার আমেজ ভাঙিয়া যাইত না। ব্রহ্মচারী একজনাও নাই, কিন্তু তাহাদের জন্য চাষ বলদ লাঙ্গল শস্য সবই চলিয়াছে। আমার পা দুইখানা বন্য কণ্টকে চালুনিতে পরিণত হইয়াই থাকিত। প্রথম বৎসর শস্য ফলাতে গুরুদেব প্রায় ২০০ টাকা ব্যয় করিলেন এবং ফসল পাইলেন দশ সের চাল। আমার পায়ের তলায় একটা মোটা চামড়ার আবরণ পড়িয়া গিয়াছিল, আমি যখন পুরীর সমুদ্রতটে থাকিতাম তখন নোনা জলের উপর সকাল বৈকাল বেড়াইতাম। সেই সময় সেই মোটা চামড়াখানা আপনিই খসিয়া পড়িয়াছিল।

আনন্দমঠ পরিচালনার ভিত্তিস্বরূপ গুরুদেব অনুষ্ঠানপত্র হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ছাপিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম, সেবাসদন, গোশালা, বানপ্রস্থপীঠ এবং সরস্বতী ভবন।

আমি পাহাড়ী বালকগণকে হিন্দী পড়াইতাম। তাহারা সকলে খুব অনুগত ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটি ব্রাহ্মণ বালক এবং ষোল সতেরোটি অব্রাহ্মণ বালক ছিল। আমার মতে ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই ব্রহ্মচর্য আশ্রম পরিচালনা করা কর্তব্য ছিল। ইহাদিগকে একটু উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া দিলে আর কোনই অসুবিধার কোনই কারণ ছিল না। মায়ের মন্দিরে নিত্য উপাসনা করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলে কোনই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু গুরুদেব সেই পথে গেলেন না। আসল কথা, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ বালককে একই ধর্মশিক্ষার ভিত্তি দিতে হয়তো তিনি ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। তাঁহার ধারণা শ্রাবণের বৃষ্টির ধারার মত ব্রাহ্মণ বালকগণ তাঁহার আশ্রমে সমবেত হইবে এবং ব্রহ্মচর্য শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিবে। ওই পাহাড়ে আমিই প্রথম শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলাম। এই শিক্ষার সঙ্গে শক্তিবিষয়ক একটি স্তোত্র ও ব্রহ্মস্তোত্রটি প্রবর্তন করিলে ভালই হইত। পাহাড়ে আমাদের প্রবর্তিত এই শিক্ষা সর্বত্র সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। এই সঙ্গে ইহাতে ধর্মশিক্ষার সংযোগ করিয়া দিলে বিদ্যালয়টি ভাল হইতে পারিত। হিন্দী শিক্ষার দরুণ ডিস্ট্রিক্টবোর্ড আমাকে আট টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিত। সেই সময় চুনারের বিখ্যাত ধনী ও রসিক শ্রীবিন্ধ্বেশ্বরীপ্রসাদ আগরওয়ালা ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সভাপতি, তিনি আমাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং গুরুদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন। গুরুদেব সোজা

ধর্মশিক্ষার পথে না যাইয়া শস্য ফলাইয়া গোলাজাত করিয়া অজ্ঞাত স্বর্গদূত ব্রাহ্মণ বালকগণকে আশ্রয় দিয়া আবার সনাতন ধর্মকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ পরিকল্পনা করিলেন এবং মজুরের সাহায্যে চাষাবাদে মন দিলেন।

এইভাবে শস্য গোলাজাত হইবে, গোশালার গাভীগণ প্রচুর দুগ্ধ দিবে এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ খাদ্য ও সচ্ছলতার মধ্যে আসিয়া শেষজীবন ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করিবেন। ইঁহাদের সেবকেরও অভাব হইবে না, কারণ ব্রহ্মচারী বালকগণকে ইঁহারা শিক্ষা দিবেন, এবং বিনিময়ে তাহাদের সেবা পাইবেন। ইহাই গুরুদেবের বানপ্রস্থ পীঠ পরিকল্পনা।

সেবাসদন। যে কোন আশ্রমেই সেবাসদন থাকা প্রয়োজন। সেবাসদন মানে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। আনন্দশ্রমের সেবাসদন খুব সুনাম অর্জন করিয়াছিল। গুরুদেব আমাকে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে আমি পরে বলিতেছি।

গোশালা পরিকল্পনাটির পক্ষে চুনার পাহাড় যোগ্যস্থান নহে কারণ ঐখানে ছয় মাস জল পাওয়া যায় না এবং ছয় মাস ঘাস থাকে না। গোপালন এবং গোরক্ষা অতীব দুরূহ কার্য। এ সম্বন্ধে পরে বলিব।

সরস্বতীভবন। মানে লাইব্রেরী। এখানে গুরুদেব বহু শাস্ত্র এবং বহু বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যতদিন আমি ছিলাম, সব গ্রন্থই রক্ষিত হইয়াছিল। আমার ওই স্থান ত্যাগের পর উই এবং বৃষ্টির জল সমস্ত গ্রন্থসম্পদকে ধ্বংস করিয়াছিল। একটা শিক্ষিত সাধকের আশ্রমে গ্রন্থসম্পদ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। কিন্তু উহাদের রক্ষা এবং উহাদের দ্বারা কাজ নেওয়ার মত উচ্চ লক্ষ্য সম্পন্ন সাধক না থাকিলে সেই জ্ঞানসম্পদ ধ্বংস বরণ করিবেই।

রোগীর সেবা। গুরুদেব ভাল চিকিৎসা জানিতেন। তিনি নিত্য সকালবেলা বিনামূল্যে হোমিও ঔষধ বিতরণ করিতেন। এখন আমাকে কিছু কিছু চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। আমি ঠিক আটটার মধ্যে শৌচাদি, দাঁতুন, গোশালার কাজ, দোহন, স্নান, সন্ধ্যাপূজা শেষ করিয়া ঔষধের ঠাট লইয়া বসিতাম। গুরুদেবও নিকটে একখানা আরাম-কেদারায় বসিতেন। ২৫০ শিশির একটি চিকিৎসার বাক্স, আরও একটি ব্যাক ডাইলুইসন বাক্স, একটি রেকটিফাইড স্পিরিটের বোতল, চার পাঁচখানা ভাল হোমিও চিকিৎসার বই, রোগীদের বোতল ধুইবার জন্য এক বোতল সোডা নিকটেই থাকিত। মানুষ রোগীকে যেমন ঔষধ দেওয়া হইত পশুদিগকে ঔষধ দিবারও তেমনই ব্যবস্থা থাকিত। পশুচিকিৎসার কার্য সবসময় থাকিত না। বর্ষাকালে পশুদের বেশী অসুখ ও মড়ক দেখা দিত। খাঙ গোঁয়া (এসে ঘা), মাতা (বসন্ত), পেটের অসুখ ও ক্ষতরোগ পশুদের বেশী হইত। মানুষ রোগীর রেজিস্ট্রার রাখা হইত কিন্তু পশু রোগীর রেজিস্ট্রার রাখা হইত না। পশু চিকিৎসায় ফেনাইল, সরিষার তৈল, কার্বলিক অ্যাসিড, এবং কিছু কিছু হোমিও ঔষধ ব্যবহার করা হইত। পশু চিকিৎসায় আমরা প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোটা করিয়া হোমিও ঔষধ দিতাম। বেশ ফল পাওয়া যাইত। তবে দশ পাঁচটা ঔষধের মধ্যেই ওদের চিকিৎসা সীমাবদ্ধ থাকিত। দাঁত ব্যথার জন্য অনেক বাহ্যপ্রয়োগের ঔষধ ছিল। টিনচার আয়োডিন, কার্বলিক, পোড়া ঘায়ের জন্য নারিকেল তেল ও ঘৃতকুমারীর রস ব্যবহার করা হইত, বৃশ্চিক দংশনে ঝাড়ফুঁক, সর্পদংশনে জড়িবুটির ব্যবহার বেশ

ভালভাবেই ছিল। ডাক্তারী, হোমিও এবং কবিরাজী চিকিৎসার ঔষধ প্রচুর সংগ্রহ ছিল। সাধারণ ফোড়া কাটিবার মত অস্ত্রও ব্যবহার হইত। মেটেরিয়া মেডিকা, অর্গানন্, চিকিৎসা, ফর্মা কপিয়া, এনাটমী ও বিশেষ বিশেষ স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগের গ্রন্থাদিও পড়িতে হইত। উগ্রগন্ধযুক্ত ডাক্তারী ঔষধ এবং হোমিও ঔষধ একস্থানে রাখা সম্ভব হইত না। অনেক প্রকারের কবিরাজী এবং ডাক্তারী ঔষধেরও সংগ্রহ থাকিত। সাবুদানা, মিশ্রী প্রভৃতিও রাখা হইত। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বই প্রায় দুই শত ছিল। মাসিক হ্যানিম্যানও প্রতি মাসে আসিত। প্রথমটায় নিজেদের খরচায়ই ঔষধাদি ক্রয় করা হইত কিন্তু পরে হ্যানিম্যান পাবলিশিং এবং বেঙ্গল কেমিক্যালও অনেক ঔষধ বিনামূল্যে দান করিত।

ঔষধ বিতরণের মত সব দ্রব্যাদি জুটাইয়া আমি একটি বড় কুশাসনে রাখিতাম এবং আরও একটি কুশাসনে ঔষধ থাকিত, ঔষধ দিবার জন্য টাটকা শুদ্ধ জল ঘড়ার মধ্যে নিকটেই থাকিত। ঔষধ বিতরণের পর আবার সব দ্রব্যাদি গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতাম। সমস্তটা দিনই অসময়ে দুই-একজন করিয়া রোগী আসিত। সময় সময় খুব জটিল রোগীরাও আসিত। সেই সময় রাত্রিতে অনেক পড়িতেও হইত।

গুরুদেব একটি একটি করিয়া রোগীর রোগ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং সেইগুলি রেজিস্ট্রারে নিজে লিখিতেন বা আমাকে লিখিতে বলিতেন। লক্ষণ লেখা হইলেই তিনি চিকিৎসা বইতে সেই রোগ অধ্যায় পাঠ করিতে বলিতেন এবং কোন বিশেষ অধ্যায় সম্বন্ধে মেটেরিয়া মেডিকা পাঠ করিতে বলিতেন। এই ভাবে ঔষধ নির্ণয় করিয়া রেজিস্ট্রারে নোট করিয়া ঔষধ দিতে হইত। এই ভাবে কয়েক মাস চলিবার পরই আমার চিকিৎসা বিষয়ে প্রাথমিক অভ্যাস আয়ত্তে আসিল। তখন গুরুদেব আর ঔষধ বিতরণ কালে নিকটে বসিতেন না। রোগীরা দূর দূরান্তর হইতে আসিত। অনেক সময় এক দুই মাস পর্যন্ত আশ্রমে অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াও চলিয়া আসিত এবং বেশ সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিত। জটিল জটিল রোগীদিগকে খাটে শোয়াইয়া আনা হইত। কোন রোগীর নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইত না। এ বিষয়ে আমরা খুবই একনিষ্ঠ ছিলাম। গলতা ঘা, প্লীহা, যকৃৎ, বাগী, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, বাত, স্ত্রীরোগ, প্লুরুসী, সিফিলিস, গণোরিয়া, ম্যালেরিয়া, টায়ফয়েড প্রভৃতি রোগীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল। প্লীহা রোগীরা চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে আসিত; দুই তিন মাস আশ্রমে অবস্থানের পর হালকা শরীর হইয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইত। চিকিৎসায় প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম মানুষের মনোবিকারগুলি রোগ লক্ষণ মাত্র। কাজেই আমার বুদ্ধি ও ব্যবহার আরও মার্জিত হইল। গুরুদেব যদি চাষবাস ও গোশালা পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া কেবল রোগীর সেবাকে কেন্দ্র করিয়া সাধনা ও জনসেবার ভিত্তিদান করিতেন তবে আজ চুনারের আনন্দাশ্রম একটা বিখ্যাত ও আদর্শ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া যাইত।

আশ্রমের বাড়িঘর

আমি দুই তিন মাস আশ্রমে ছিলাম না। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আশ্রমগৃহ গুরুদেব নির্মাণ করাইয়াছেন। প্রকাণ্ড পরিকল্পনা। খোলার চালা, মাটির দেওয়াল, বাঁশের ঠাট।

আসিবার দিনই রাত্রিতে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুঠরী মোট চার খানা। ইহা ছাড়া মধ্যস্থলে মন্দিরের চালা। গুরুদেবের ঘরখানায় দরজা আছে, উপরে পাথরের সিল্লী বিছাইয়া ছাদ করা হইয়াছে। ঘরখানার মধ্যে আবার একটা গুহাও রহিয়াছে। গ্রীষ্ম হইতে আত্মরক্ষার জন্য এ সব ব্যবস্থা। কিন্তু গুহার মধ্যে গ্রীষ্মকালে থাকা যায় না। অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়। কারণ প্রবাহিত বায়ু প্রবেশের কোনই সুবিধা নাই। বৃষ্টির জলে সমস্ত বাড়িটা ভাসিয়া যাইতেছে। কারণ বাঁশের ঠাটে খোলা যে ভাবে রাখা হইয়াছিল সেভাবে অবস্থান করে না। বৃষ্টির জলে খোলার ওজন বৃদ্ধি হয় এবং বাঁশের ঠাট দুলিয়া যায়। কাজেই সমস্ত বাড়িটাই নিবাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। গুরুদেবের ঘরে তাঁহার ছাদ চুঁয়াইয়া সমানে জল পড়িতেছে। গুরুদেব আমাকে ডাকিয়া সব দেখাইলেন এবং বলিলেন এখনই বাড়ি ধসিয়া যাইবে। আমি হামাগুড়ি দিয়া অতিকষ্টে ছাদে চড়িলাম, কারণ উপরের চালা এবং ছাদের মধ্যস্থানে প্রবেশের মত যথেষ্ট স্থান নাই। আমি থালা ঘটি বাটি কড়া যাহাই পাইলাম সব উপরে তুলিলাম এবং বারিপাতের স্থান দেখিয়া দেখিয়া সব বাসন বিছাইয়া দিলাম। এবং দশ পনের মিনিট পর পর ঘড়া করিয়া সে সব জল সংগ্রহ করিয়া বাহিরে ফেলিতে লাগিলাম; এ ভাবে সমস্ত রাত্রি গুরুদেবের ঘরখানা রক্ষা করা হইল। প্রাতঃকালে গুরুদেব মজুরের নাম, গ্রামের নাম এবং দিক নির্ণয় করিয়া আমাকে মজুরের জন্য পাঠাইলেন। আমি হিন্দী জানি না। তাহার উপর গ্রাম্য হিন্দী আরও জটিল। আমি কোনও রকমে সব কথাই বুঝাইলাম। ওরা বলিল, বাঁশের ঠাট, যত বর্ষা হইবে তত দুলিবে এবং খোলা সরিয়া যাইবে, জল পড়া বন্ধ করা কঠিন। আমি গুরুদেবের কথা বলিয়া দুইজনকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। তাহারা রোজই আসে, রোজই মেরামত করে আবার রোজই জল টপকায়। এ ভাবে ছাদের জল সেচিয়া বর্ষা কাটিল। অন্যান্য ঘরগুলিতে খোলার ছাওয়া থাকিলেও ছাদ দেওয়া ছিল না, কাজেই জল টপকাইতে থাকিলেও ক্ষতিকর হইল না। এ দিকে মাটির দেওয়ালগুলি ঠিক কচুরীর মত ফাঁপিয়া উঠিল। পাহাড়ী লোকের নিকট শুনিলাম, ঐ স্থানের মাটিই গৃহ নির্মাণের উপযুক্ত নহে। সেই সব দেওয়ালে একটু জল লাগিলেই ধসিয়া যায়। বৃষ্টির ছাঁটে দেওয়ালগুলি আত্মরক্ষায় অশক্ত। এদিকে জঙ্গলের মধ্যে মঠ। কোথাও বাড়িঘর বা আশ্রয় নাই। গুরুদেব বলিলেন এ সব গৃহ এখনকার মতন রক্ষা করিতেই হইবে। এর পর পাকাবাড়ি করা হইবে।

বর্ষা কমিলে আমি কিছু টাকা লইয়া মির্জাপুর শহরে গেলাম। চুনারে তখনও টিন পাওয়া যায় না। মির্জাপুরের বিখ্যাত ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুদেবের শিষ্য। তাঁহার সাহায্যে টিন খরিদ করিয়া সহজেই রেলে বুক করিয়া চূনারে পাঠাইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। টিন আসিল, আমি সেই সব টিন দ্বারা নিজের হাতে গুরুদেবের ঘর ও বারান্দাগুলি সেই বাঁশের ঠাটের উপরই ছাইয়া দিলাম। আশ্রমের একটা দিক বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু দেওয়ালগুলি রক্ষার ব্যবস্থায় আমি অন্য উপায় ধরিলাম। পাথরের ঢোফা (ঢেলা) পাহাড় হইতে জুটাইয়া সে সব দ্বারা দেওয়ালের বাহিরের দিকে ছিলকা গাঁথুনি দিয়া দিলাম। এই ভাবে একদিক রক্ষা হইল এবং এক বৎসর চলিল। অন্যদিকও এ ভাবে ছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে হওয়ায় পরের বৎসর আবার টাকা সংগ্রহ করিয়া মির্জাপুর গেলাম। ডাঃ উপেনবাবুকে সব বলিলাম। তিনি

এক্কা ভাড়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া টিনের দোকানে গেলেন। ডাক্তারবাবু মির্জাপুরে বিখ্যাত এবং প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক।

টিনের দোকানের সামনে গিয়াই আমাকে বলিলেন, টিন তো কিনিয়া দিব। কিন্তু সাধনার কথা কিছু বলুন। আমি বলিলাম, হ্যঁা, কিছু তো করিতেছি। তিনি বলিলেন, কিছু আরাম পান? আমি বলিলাম, বহুদিন কিছুই পাই নাই। সাধনায় খাটিয়া মরিতাম। এখন খুব আরাম ও শান্তি পাই। খুব ভাল ও তৃপ্ত আছি। তিনি বলিলেন, আমি কিছুই শান্তি পাই নাই, তাই শ্রীঅরবিন্দের নিকট দুই বৎসর ছিলাম। সেখানে প্রথমটায় বেশ ভালই মনে হইত, পরে আর কিছুই পাই না। তাই চলিয়া আসিয়াছি, সংসারের ব্যবস্থা করিয়া আবার একদিকে যাইব। ওই দিকে বিশেষ কিছু পাইবার আর নাই। ডাঃ উপেনবাবু গুরুদেবের নিকট আবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুদেব বিশেষ আমল দেন নাই। ডাঃ উপেনবাবু পরবর্তী জীবনে ঢাকার আনন্দময়ী মায়ের নিকট থাকিতেন। সে সম্বন্ধেও আমি ডাঃ উপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, মায়ের সংস্পর্শে থাকিলে একটা স্নেহের ফ্ল্যাশ বুঝা যায়। কিন্তু সেটাও বেশী তৃপ্তি দেয় না। গুরুদেবের শরীর ত্যাগের পর ডাঃ উপেনবাবুর সঙ্গে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমার নিকট হইতে 'ক্রমবিকাশের পথে' বইখানা পড়িবার জন্য লইয়া যান। পরে বলিলেন, এই বইগুলি আমি রাখিব, কিন্তু মূল্য? আমি বলিলাম, আমি বইগুলি আপনাকে দান করিয়াছি। যদি গ্রহণ করেন স্থখী হইব। তিনি আবার সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার শক্তিস্তরের কথা সবই ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু এসব শক্তিকে পরিচালনা করিবার মত কোন সত্তা আছে কি না? আমি বলিলাম, ওই শক্তিগুলির মধ্যে একটির নাম বিজ্ঞান শক্তি, অন্যটির নাম জ্ঞান শক্তি। এঁরাই সব নিয়মিত করিয়া থাকেন। আর সমষ্টি শক্তির উপর অন্য কোন সত্তার প্রয়োজন হয় না। সমষ্টি শক্তিই একাধারে চেতনা, স্রষ্টা এবং দৃশ্য ও সৃষ্টির উপাদানভূত মহাশক্তি। ডাঃ উপেনবাবু ভাল সাধু ছিলেন। তিনি উমেশানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।

যাহা হউক, উপেনবাবু টিনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি সে সব টিনের সাহায্যে নিজের হাতে সবটা ঘর ছাইয়া দিলাম। বেশ কিছুদিন চলিল। কারণ দেওয়ালগুলিও প্রয়োজনবোধে ছিলকা আবরণ করা হইয়াছিল।

হঠাৎ দেখা গেল সম্পূর্ণ চালাখানা ঘূর্ণি বাতাসে উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি আবার সে সব টিন সংগ্রহ করিলাম। বাঁশের সঙ্গে মাটির দেওয়ালগুলিকে পাথর ও তারের বন্ধনে শক্ত করিয়া আটকাইয়া দিলাম। আবার কিছুদিন চলিল। একদিন রাত্রি নয়টায় ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি বাতাস আসিয়া সম্পূর্ণ চালাখানাকে উচ্চ আকাশে তুলিল এবং টিনগুলি ছিতরাইয়া পাহাড়ের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমি পরের দিন মজুরের সাহায্যে আবার সব সংগ্রহ করিলাম। মাটির দেওয়ালের সঙ্গে সংঘবদ্ধ বাঁশগুলি ঠিকই ছিল। কিন্তু উপরের ঠাটগুলি সহ সব চালাখানা উড়িয়া গিয়াছিল। আমি সে সময় মোটা করিয়া কম্বল গায়ে ও মাথায় আবরণ দিয়া একটা দরজার লিণ্টেলের নিম্নে দাঁড়াইয়া ছিলাম। বাঁশের টুকরাগুলি আমার চারিদিকে ধুপ-ধাপ পড়িতেছিল, আমার গায়ে কোনই আঘাত লাগে নাই। আমি রাত্রে ওই ভাবে বাহিরে রহিলাম, সঙ্গে কেহই ছিল না। পরদিন কর্মসম্ভার আবার আরম্ভ হইল। এবার ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকাল, দিনরাত লু চলিয়াছে। এই

গরমেই আমাকে আবার ছাইতে হইবে। এখন না ছাইলে এক মাসের মধ্যেই বর্ষায় সব বাড়িটাই ধসিয়া যাইবে। শীতকালে যখন ছাইয়াছিলাম তখন গুরুদেব আশ্রমে ছিলেন না, এখন গ্রীষ্মকালে ছাইতেছি, এখনও গুরুদেব বাইরে আছেন। আমাকে এ সব কাজে সাহায্য করিবার জন্য একজন মজুর লইতে হইত। এরা টিন ছাইবার কোন কাজই বুঝিত না। এদিকে ধীরে ধীরে গুরুদেবের অবস্থানের গৃহ সরস্বতী ভবনও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। এবং পুরাতন মন্দিরও আর জোড়াতালি দিয়া চলিতেছিল না। ইহা এখন বিদায় লইতেই চলিয়াছে। এই গৃহটির মোট আয়তন প্রায় আশি ফুট লম্বা এবং প্রায় ছত্রিশ সাঁইত্রিশ ফুট চওড়া ছিল।

পাকা বাড়ি। গুরুদেব এবার পাকা বাড়ি করিবার দিকে মন দিলেন। পাকা বাড়ি প্রস্তুতের জন্য মাটির কাদা এবং পাথরের টুকরা জুটাইয়া গাঁথুনি করা ভিন্ন পথ নাই। চুনার শহরেও ওই ভাবে বাড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাটির মসলা এবং পাথরের ঢোফা জুড়িয়া দেওয়াল গাঁথিয়া বালি চুনা বা বালি সিমেণ্ট দ্বারা জোড়স্থানগুলি পাকা করিয়া দিতে হয়। ওই দেশে সাধারণতঃ ইহাই পাকা বাড়ি। এ সব বাড়িতে যদি জল না লাগে তবে দুই পাঁচ শত বৎসরেও নষ্ট হয় না। আশ্রমের চারিদিকে দেড় দুই মাইলের মধ্যে শত শত পাথরের খনি বিদ্যমান। সেখান হইতে ঢোফা সংগ্রহ করিতে হইবে। গুরুদেব একখানা গরুর গাড়ি প্রস্তুত করাইলেন। গাড়িখানা বিশ পঁচিশদিন চলিবার পরই ভাঙিয়া গেল। গুরুদেব আবার একখানা ছোট গাড়ি প্রস্তুত করাইলেন, সেখানাও দুই তিন মাস চলিবার পর ভাঙিয়া গেল। ইহার পর আমিই নিজের হাতে পাথর ও কাঠের সংযোগে পাথরের চাকা প্রস্তুত করিলাম। প্রতি দুই তিন মাস পরই উহাতে মেরামতের প্রয়োজন হইত। আমি নিজেই সে সব সংশোধন করিয়া দিতাম। এ ভাবে গাড়ির সমস্যা মিটিল, প্রচুর ঢোফা আসিল। এবার আমি পাথরের ঘেরা করিবার ব্যবস্থা করিলাম। পাথরের খনি হইতে ঢোফা সংগ্রহ করিয়া বাড়িঘর হইল এবং শিল্পী সংগ্রহ করিয়া স্থায়ী ঘেরা প্রস্তুত হইল। আমি বাংলাদেশের হিসাবে পঞ্চাশ বিঘা জমি ঘেরিয়া দুইখানা অবরুদ্ধ প্রস্তুত করিলাম। চাকর বা মজুর না থাকিলে সেই সব ঘেরার মধ্যে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা তৃপ্তির সহিত আহার করিতে পাইত। এভাবে ঘেরা আশ্রমের একটা প্রয়োজনীয় দিক সমাধান করিল। ইহা ভিন্নও বাগান ও শস্য করিবার পক্ষে এই ঘেরা বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। আমি যে বৎসর আশ্রম ছাড়িয়া ভৈরব গুহায় চলিয়া যাই সেই বৎসর আমি একশত সাতচল্লিশ মণ রবিশস্য উৎপন্ন করিয়াছিলাম। ঘেরাগুলি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল একভাবেই আশ্রমকে সেবা দিয়াছিল। ইহার পর কোন দুষ্ট লোকের হাতে আশ্রমের কর্তৃত্ব যায় এবং সে সেই সব ঘেরাগুলি স্থায়ী চাষী আইনের মধ্যে আনিয়া নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিবার লোভে সবগুলি ঘেরা ভাঙিয়া দেয়। স্বার্থপর মানুষ যে কত বড় অস্থর এবং কত বড় অধার্মিক হয় উহার তুলনা নাই। এই লোকটাই নাকি আশ্রমের পূজারী হইয়াছিল। স্বার্থপর লোকের ধর্ম তো বাহ্যিক সং মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এ সব দুরাচারীরা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হইয়া থাকে।

সরস্বতী ভবন প্রস্তুত হইবার পরও গৃহসমস্যা মিটিল না। ইহার কারণ ঐ স্থানের মাটিটাই গৃহ নির্মাণের প্রতিকূল। গ্রীষ্মকালে মাটিটা প্রতি দশ ফুট পর পূর্ব পশ্চিমে ফাটিয়া যায়। সেই কারণে সেই ভূমির উপর নির্মিত পাকা বাড়িও ফাটিয়া যায়। কাজেই

সরস্বতী ভবন প্রতি বৎসরই ফাটিতে থাকিত এবং উহাতে দ্রব্যাদি রক্ষা করা বিপজ্জনক হইয়াছিল। এখন ঐ সরস্বতী ভবন অস্তিত্বহীন হইয়া গিয়াছে। সরস্বতী ভবনের যাবতীয় কাজ আমার দৃষ্টিকোণে এবং আমার শারীরিক পরিশ্রমে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে নিবাসযোগ্য বারো-চোদ্দখানা কুঠরী ছিল। ইহার এই ভয়ঙ্কর দুর্দশা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি আশ্রম ত্যাগ করিবার পর গুরুদেব কাশী হইতে ভাল মিস্ত্রী আনাইয়া মায়ের মন্দির করেন। উহা গঠনের সময় আমি গুরুদেবকে চারখানা রেলের লাইন সংগ্রহ করিয়া কোণা চারটিতে বাঁধিয়া তাহার উপর মন্দির নির্মাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। গুরুদেব বলিলেন, "এমনই মন্দির রক্ষা পাইবে। লোহার উপর গাঁথুনি দিবার প্রয়োজন নাই।" এখন মন্দিরও ধ্বংসের পথে। বহু বৎসর পর আশ্রমের কি দশা, ইহা দেখিবার জন্য আমি চুনার পাহাড়ে গিয়াছিলাম, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলি এবং ঢোফা পাথরগুলি এখন বড়কা বাবা (আমার গুরুদেব) এবং ছোটকা বাবার বেদনাদায়ক স্মৃতিমাত্র বহন করিতেছে, এই স্মৃতিও আর বেশীদিন থাকিবে না।

প্রথম যখন আশ্রমের জমি সংগ্রহ করা হইল তখন আমি গুরুদেবের নিকটে ছিলাম। দলিল রেজিস্টারী হইবার পূর্বেই গুরুদেব ঐস্থানে আসিয়া বসিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল, অনেক কথা কাটাকাটি হইল। সব কথাই আমি জানি, কারণ দুই পক্ষের সমস্তগুলি পত্রের নকল আমার হাতে হইয়াছিল। কোন বাঙালী অ্যাটর্নির নিকট হইতে গুরুদেব নিজের নামে এই জমি সংগ্রহ করেন। ২১০ বিঘা জমি (বাংলা হিসাবে ৪২০ বিঘা) ৫০০ টাকা মূল্যে এবং ১৫০ টাকা বার্ষিক খাজনার শর্তে খরিদ করা হইয়াছিল। এই ৫০০ টাকা শ্যামবাবু দিয়াছিলেন। শ্যামবাবু গুরুদেবের গৃহস্থাশ্রমের সম্বন্ধে ভাই ছিলেন।

জমি ও আশ্রম ব্যাপারে পরমানন্দজী, সরলানন্দজী ও কমলা-মা সব সময়ই বিরুদ্ধ ও সন্দেহমূলক সমালোচনা করিতেন। তাঁহাদের ধারণা, এই আশ্রম শ্যামবাবুর হইবে। আমি শুনিতাম, কিন্তু কখনও কোন কথাই বলিতাম না। আশ্রম গুরুদেবের, কি শ্যামবাবুর কি ঈশ্বরের বা কোন দেবতার সম্পত্তি, ইহা লইয়া মাথা চালনা করা আমার নীতি নহে। আমার জীবনের নীতি, সাধনা, তপস্যা, গুরুসেবা, শান্তি ও আত্মজ্ঞান।

একদিন গুরুদেব আমাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আশ্রম সম্বন্ধে শিষ্যদের ধারণা যে "ইহা শ্যামলালের, এই বিষয়ে তোমার মত কি?" আমি বলিলাম, আশ্রম সম্বন্ধে আমার কোন মত নাই। আমি আপনার সেবা করিব ও সাধনা করিব এবং সাধনার শেষে এখান হইতে চলিয়া যাইব। ইহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

আমি জানিতাম, আশ্রমের ভবিষ্যৎ বেশ অন্ধকার। ইহাতে আমার কোনই ক্ষতি নাই, বরং আমার খুব সুবিধা হইয়াছে। আমার কর্মক্ষেত্র গুরুসেবায় সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি কোনদিনই আশ্রমের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথাই কাউকে বলিতাম না। জনতার সামনে ঢাক পিটানো এবং বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা আমার প্রচুর ছিল, লোককে স্বমতে আনয়ন করার মত শক্তিও আমার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেখানে মূলে গোলমাল এবং বিরুদ্ধবাদী রহিয়াছে, সেখানে কে যাইবে গোলমালে জড়াইতে!

দেহত্যাগের পূর্বে গুরুদেব পর পর তিনখানা উইল করেন। তিনখানাতেই শিষ্যদের সম্বন্ধে পাকাপাকি বহিষ্কার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। "None of my disciples shall

have any concern or interest on any properties left behind me." শেষ উইলে, প্রথমেই সমস্ত সম্পত্তির সোল একজিকিউটিভ অধিকার শ্যামবাবুকে দেওয়া আছে। এবং আশ্রম সম্বন্ধে একটা ট্রাস্ট বডিও করা হইয়াছে, সেটাও শ্যামবাবু করিয়া দিবেন। সম্পত্তির প্রোবেড শ্যামবাবু লইবেন। ট্রাস্টীরাও সাত দেশের সাত ব্যক্তি, কাজেই শেষ পর্যন্ত ইহা ধ্বংসের হাতে যাইতে বাধ্য। মির্জাপুর কোর্টের (চুনারের লোক) এক উকিল উইলের সাক্ষী ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি দাঁড়ান, আমরা মামলা করি, উইল টিকিতে পারে না, উহা স্বামীজীকে পড়িয়া শোনানো হয় নাই। আমি বলিলাম, আমি ঐ সবে নাই, আপনারাও যদি মামলা করেন নিশ্চয়ই হারিবেন। আমি শ্যামবাবুর হস্তগত অন্য দুইটি উইলের কথা বলিলাম না। গুরুদেবের দেহত্যাগের পর শ্যামবাবু আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, গুরুদেব যাহা করিয়াছেন, এখন তাহাই হইবে। আমি এতে থাকিব না।

গুরুদেবের দেহত্যাগের কয়েকমাস পূর্ব হইতেই তিনি কাশী ছিলেন। তাঁহাকে আর কাশীর আনন্দাশ্রমে (বড় গণেশে) অবস্থান করিতে দেখা গেল না। ওই বাড়ি কাশীনাথ বরাট নামক এক ব্যক্তি গুরুদেবকে ক্রয় করিয়া দেন। সেই জমি রেজিস্ট্রেশনের সময়ে গুরুদেব কালীবাবুর নামে রেজিস্ট্রেশন করিতে বলেন। তিনি বলিলেন, যদি কখনও মামলা মোকদ্দমা হয় তখন কালীবাবুই করিতে পারিবে। তাঁহাকে আর কোর্টে যাইতে হইবে না। গুরুদেব আমাকে বহুবার কাশীতে একটা আশ্রম করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন; আমি বুঝিতাম না, বড় গণেশে অমন সুন্দর আশ্রম থাকিতে আবার আশ্রম কেন?

গুরুদেব বড় গণেশের আশ্রমে সমাধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহাকে অতিসত্বর গঙ্গা সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। শেষ সময়, তিনি কালীবাবুর বাড়ি সন্নিহিত এক বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই ভাবে থাকার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ শিষ্যরাই গুরু সেবার জন্য লোক ও অর্থের প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গুরুদেব আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি অনেক সময় আমাকে কোলে করিয়া আদর করিতেন। আমার সাধনা তপস্যা যাহাতে ভাল ভাবে সম্পন্ন হয়, এজন্য সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের গুরুপরম্পরা নির্দিষ্ট সমস্ত সাধনা তিনি আমাকে অতি সন্তর্পণে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার অভিষেক, আমার উন্নত অভিষেক, উপনয়ন, যজ্ঞোপবীত দান, গায়ত্রী দীক্ষা, সমস্ত বিষয়েই তিনি শাস্ত্র ও বিধিবৎ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার উপর সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি প্রথমটায় পূজা যজ্ঞাদিতে নিজেই তন্ত্রধারক হইতেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত পূজা ও যজ্ঞাদিতে তন্ত্রধারকের কার্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেন। তিনি আমাকে প্রচুর দিয়াছেন - উচ্চ সম্মান, উচ্চ প্রতিষ্ঠা, উচ্চ ধারণা, উচ্চ সাধনার ধারা, সবই তিনি আমাকে দিয়াছেন। গুরুদেবের নিজের ব্যবহারের একখানা গেরুয়া কাপড়-মোড়া কালো ছাতা ছিল। এই ছাতাখানা খৈড়ীগড় রাজ্যের রাণীমা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। এই ছাতাখানা বেশ পাতলা গেরুয়া বস্ত্রে মোড়া ছিল। এই ছাতাখানা আমি বহু বৎসর ব্যবহার করিয়াছি। এই ছাতার অবসান ঘটিবার পর আমি অনেক বৎসর আর ছাতা ব্যবহার করি নাই। গুরুর দান, ছাতাটিকে আমি খুবই যত্নে

রাখিতাম। ছাতাটি আমার মস্তকে গুরুর আশীর্বাদ রূপেই শোভায়মান ছিল। তাঁহার সমস্ত আশীর্বাদ আমি নিত্যই অনুভব করি। তিনি বলিতেন, তোমার অভাব হইবে না, মা তোমাকে প্রচুর দিবেন, তোমাকে হাত পাতিতে হইবে না, চাঁন্দা করিতে হইবে না, মাথা নত করিতে হইবে না। তিনি বলিতেন, মুরারী, কমলা ও সত্যানন্দকে সব সাধনাই দেওয়া হইয়াছে। এই তিনজনেই সাধনাসম্পদ ভাল ফুটিয়াছে।

আচার বিচার লইয়া আমার ও গুরুদেবের সঙ্গে কখনও কোনও প্রকার মতভেদ ছিল না। আমাকে তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত রাখিয়াছেন, এজন্য আমি সদাই সুখী। আশ্রমের জায়গা জমি সম্বন্ধেও তিনি আমাকে সর্বতোভাবে মুক্তি দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার চরণে বার বার নতশিরে প্রণাম জানাই। তিনি মহান, তিনি আমার বিচারের ঊর্ধ্বে, তিনি ধন-সম্পত্তি ও জায়গা-জমির ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি আমাকেও সেই স্তরে প্রতিষ্ঠা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে সাধনা ও তপস্যার ধারা যখন যেমন প্রয়োজন, সবই ডাকিয়া এবং আদরের সহিত দিয়াছেন। তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য, তাঁহার শরীরের মিষ্ট ঘ্রাণ, তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠে সত্যানন্দ ডাক, আমি আকাশে বাতাসে সর্বত্র দেখিতে পাই, শুনিতে পাই এবং আজও অনুভব করিয়া থাকি। আচার অনাচার, জায়গা সম্পত্তি, যাহাদের প্রয়োজন তাহারা উহা লইয়া থাকুক। গুরু আমাকে স্নেহ, আদর, সাধনা, উচ্চ প্রতিষ্ঠা, শান্তি, জ্ঞান, সরলতা ও গাম্ভীর্য, আত্মবিশ্বাস ও অনুভূতি প্রচুর দিয়াছেন। আমার আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই।

ইহা সত্য ঘটনা যে চিরজীবন আশ্রমে থাকার রুটিন আমার ছিল না। তাহা হইলেও গুরুদেবের জীবদ্দশায় আশ্রম ত্যাগ করার ইচ্ছাও আমার ছিল না। আমি আটাশ ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে আশ্রম ত্যাগ করি। তখন গুরুদেব মাদ্রাজে ছিলেন। আমার শরীর তখন অত্যন্ত অপটু হইয়াছে, মস্তিষ্ক দুর্বল, শরীর প্রায় অচল। ক্ষেতে প্রচুর পাকা রবিশস্য। লোক নিযুক্ত করিয়া সে সব কাটিয়া শস্য মাড়াইয়া গোলায় তুলিতেই হইল। গুরুদেবের শিষ্য ভবেশ্বরজী বহুদিন হইতেই আশ্রমের কর্তৃত্ব হাতে লইবার জন্য অত্যন্ত কুৎসিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমাকে ভয়ঙ্কর ভাবে অত্যাচার ও অনাচারের স্রোতে ফেলিয়া তিনি আশ্রম হাতে লইতে চাহেন। পাকা শস্যগুলি কাটিবার জন্য লোক পাওয়া কঠিন। তবুও আমি কয়েকজনকে ধরিয়া উহা কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি সেই সব লোককে মারিবার ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতেন। আমি এভাবে বার বার লোক নিযুক্ত করি, একটু সরিয়া গেলেই তিনি তাহাদিগকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করেন। একটা বাচ্চা চাকর ছিল, তাহাকেও তিনি কয়েকবার মারিয়া তাড়াইয়া দেন। আমি আবার চেষ্টা করিয়া চাকরকে ঠিক করি। শেষ পর্যন্ত ঐ একটা চাকরের উপর নির্ভর করিয়াই আমি শস্য কাটাইলাম এবং পাহাড়ের লোক ধরিয়া শস্যগুলি মাড়াইয়া ঝাড়াইয়া গোলাজাত করিলাম। এদিকে গুরুদেবের ধারণা আমার দোষেই নাকি আশ্রমে লোক থাকে না। এ কথা আমি বিশেষ বিশ্বস্তসূত্রে কয়েকজনের নিকটই শুনিলাম। আমি বুঝিলাম, এভাবে আশ্রমে থাকিলে গুরুদেবের অপ্রিয় হইতে হইবে। চলিয়া গেলেও গুরুদেব অসন্তুষ্ট হইবেন। দুইটি অসন্তুষ্টির মধ্যে আমি তপস্যায় চলিয়া যাওয়া স্থির মনে করিলাম। সাধনার ক্রমও প্রায় দুই বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছে। এখন তপস্যাই করিতে হইবে। আর আমি এ স্থান ত্যাগ করিলেও যে আশ্রম নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে ইহাতে

সন্দেহ নাই। ভবেশ্বরজীর অত্যাচার এতটা হীন ও অবুঝ হইয়াছে যে আশ্রম রক্ষা করা আমার মত অপটু শরীরে অসম্ভব। আমি আশ্রমের সেক্রেটারী শীতলপ্রসাদজীকে সব বলিলাম এবং হিসাবপত্র ও গোলার শস্য সব তাঁহার হাতে দিয়া চারখানা মাত্র পোস্টকার্ড (মূল্য দু-আনা) সঙ্গে লইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলাম। চারখানা পোস্টকার্ড চারজনকে লিখিলাম যে কেহ যেন আমাকে পত্র না দেয়, আমার হাতে অর্থ নাই, আমি আর উত্তর দিতে পারিব না। চারখানার মধ্যে একখানা লিখিলাম গুরুদেবকে। গুরুদেব লিখিলেন, ''তুমি যাহা ভাল মনে কর, করিবে। তবে আশ্রম ত্যাগ কেন করিলে সেটা তোমার মনেই রহিয়া গেল।'' উত্তরে আমি সমস্ত কারণই লিখিলাম; ভবেশ্বরজীর অবুঝ কার্যকলাপের কথাও লিখিলাম। আমি স্পষ্টই লিখিলাম, ''আমার স্বাস্থ্য অত্যন্ত প্রতিকূল, মস্তিষ্ক শুষ্ক মনে হয়, দুর্বল বোধ করি। এই ভাবে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং এত গরমে এত বড় দায়িত্ব বহন অসম্ভব।'' সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল, আমি গুরুদেবের দুষ্ট শিষ্যদের বহু অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছি। কোন দিন আমি সে সব কথা কাউকেই বলি নাই। ভবেশ্বরজী আশ্রম রক্ষা করিতে সক্ষম, এইরূপ ধারণা হয়তো সেক্রেটারীরও ছিল। কাজেই আমি চলিয়া আসিলেও বিশেষ কোন বাদপ্রতিবাদ দেখা দেয় নাই। ইহাও শুভ লক্ষণ। আমি গুরুদেবকে লিখিলাম, আমি তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলাম। আপনি আশীর্বাদ করুন। আমি আর আশ্রমে ফিরিব না।

এই ঘটনায় গুরুদেব আমার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, মুখে তিনি যাহাই বলুন। আশ্রম তিনি শিষ্যদের জন্য গড়েন নাই। ইহা তিনি জানিতেন। তিনি কোন মতবাদ পরিচালনা করিবার জন্যও আশ্রম করেন নাই। তাঁহার যদি শিষ্য ও মতবাদ লক্ষ্য থাকিত, তবে তিনি জীবনে যে তিনখানা উইল করিয়াছেন, উহার প্রত্যেকটিতে শিষ্যদের বিরুদ্ধে এতটা ভয়ঙ্কর কথা লিখিতে পারিতেন না। গুরুদেবের উইলে ওরূপ কথা থাকিলে, শিষ্যরা যে অনধিকার প্রবেশ এবং অনধিকার অবস্থানরূপ পুলিস আইনে ''ট্রেসপাস'' হয় সেটা তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন। আমি জানিতাম, তাঁহার অসন্তুষ্টির মূলে কোনই কারণ নাই। সাক্ষাৎ হইবার পর একবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর বৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেবা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বলিলাম, আমি ইহা মানি, আপনি চলুন কোন নির্জন স্থানে, আপনার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। গুরুদেবের শরীর ত্যাগের সময়* পর্যন্ত আশ্রমে জ্ঞানানন্দজী ও কালিকানন্দজী ছিলেন, তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। তাঁহারা দুইজনেই ভাল মানুষ ছিলেন। গুরুর সেবা, গুরুর মতবাদ এবং গুরুর আশ্রম রক্ষা করা, শিষ্যমাত্রেরই কর্তব্য। নয়তো ভারতবর্ষে ধর্ম ও সাধনা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইত। মতবাদ এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ধর্মরক্ষা। দুই এক জন গৃহী সাধু ঘরে বসিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যার আবরণে থাকিয়া ধর্মপ্রচার করিলে, সেই ধর্মে একটা ব্যাপক সমাজ রক্ষা হয় না। ব্যাপক কিছু করিতে হইলে ত্যাগী শিষ্য ও মঠের প্রয়োজন।

গুরুদেবের অসন্তুষ্টির কোন কারণই ছিল না। তাঁহার শরীর ত্যাগের পর, আমি বহুদিন তাঁহার অসন্তোষ ভাব, স্বপ্নে দেখিয়াছি। একবার আমি স্বপ্নেই তাঁহাকে ওইরূপ

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ''সময়'' শব্দটি স্বচ্ছতার খাতিরে আমাদের সংযোজন।

দেখিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, ‘‘আপনি বিনা কারণে ওইরূপ করিতেছেন। ইহা আপনার শোভা পায় না। ভাবিয়া দেখুন।’’

একদিন (পূর্ব ঘটনার দুই বৎসর বাদে) স্বপ্ন দেখিলাম, পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া একটা বাসের মত গাড়িতে চড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। বলিলেন, ‘‘শ্যামলাল হীন কার্য করিয়াছে। চল, তুমি আমি চলিয়া যাই।’’ গুরুদেবের শেষ উইলখানার নির্দেশটি আমি দেখিয়াছি। সেই নির্দেশ অনুসারে যে উইল হইয়াছিল উহাও আমি দেখিয়াছি। উহাতে শিষ্যদের বিরুদ্ধে কোন কথাই ছিল না। শ্যামবাবুকে সোল একজিকিউটিভ পাওয়ার দেওয়া ছিল না। বড় গণেশ আশ্রমে সমাধি করিবার কথা ছিল। বইগুলির আয়ের কিছু অংশ আশ্রমকে দিবার কথা ছিল।

এদিকে (প্রায় ৫৮ বৎসর বয়সে) এক স্বপ্ন দেখিলাম। ‘‘আমি আহার করিতেছি। তিনি হঠাৎ আমার সঙ্গে বসিয়া আমার থালায় এক সঙ্গে আহার করিলেন। আমি বলিলাম, আপনার এসব করিবার কি প্রয়োজন ছিল? দেখিলাম, তাঁহার মধ্যে আর কোনই অমিল নাই, মতভেদও নাই।’’ এখন স্বপ্নেও আর মতভেদ দেখি নাই। আমি যতদিন আশ্রম করি নাই, ততদিন তাঁহাকে অসন্তুষ্ট মনে হইত। আশ্রম করিবার পরও কিছুদিন ওই ভাব ছিল। আমি ভাল ভাবে জানিতাম, এইরূপ অসন্তুষ্টির মূলে কোন কারণই নাই। ইহা করিয়া তাঁহারও কোন লাভ নাই। সময় হইলেই তিনি বুঝিবেন। এখন মনে হয়, তিনি শক্তিবাদ মঠেই আছেন। এই মঠের উপর অন্যান্য গুরুগণেরও আন্তরিক আশীর্বাদ রহিয়াছে।

গুরুদেবের দেহত্যাগের পর শ্যামবাবু আমার নিকট আসিয়াছিলেন, আশ্রমটা যেন আমি দেখি, বলিবার জন্য। আমি বলিলাম, গুরুদেব আপনাকে সমস্তটাই দিয়া গিয়াছেন। আপনি এখন দেখুন। আমাদের সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, উহাই আমরা করিব। ইহার অন্যথা হইবে না। কিছুদিন বাদ দুর্গাপ্রসাদজীও আসিলেন, তিনিও বলিলেন, আশ্রমটা দেখুন। আমি বলিলাম, এখন উইল না মানিয়া চলা ভিন্ন পন্থা নাই। আপনি এতদিন গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন, এখন শ্যামবাবুর শিষ্য হইয়াছেন, আপনি দেখুন, আপনার অসুবিধা হইবে না। তিনি বলিলেন, আপনারও অসুবিধা হইবে না। আপনি চলুন। আমি বলিলাম, ওই ভাবে উইল করিয়া আমার নিকট আসিবার লক্ষ্য আছে। আপনারা চান, যেমন আমি বার বৎসর গুরুসেবা করিয়াছি, এবার বার বৎসর গুরুপত্নীর সেবা করি, ইহার পর বার বৎসর গুরুপুত্রের সেবা করি, কিন্তু একজন সাধুর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। দুর্গাপ্রসাদজী বলিলেন, হ্যাঁ জিনিসটা এখন ওই অবস্থায়ই আসিয়া গিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

আনন্দাশ্রমে সাধুসঙ্গ

আশ্রমে নানা রকমের লোক আসিতেন এবং অবস্থানও করিতেন। যোগানন্দ স্বামীজী নামক একজন সাধু আসিয়াছিলেন। তিনি তিন মাস ছিলেন। ইনি কোন হিন্দুস্থানী সাধুর শিষ্য ছিলেন। সব সময় তিনি ধূনী জ্বালিয়া থাকিতেন এবং "সীতারাম" গান গাহিতেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের মতন ছিল। তাঁহার লিখিত ভজন গানের ছোট বই ছিল। তিনি সেই স্তুতি নিত্য গাহিতেন। আমাকে খুব ভালবাসিতেন, তিনি বলিতেন, "আমি সীতারামের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনি মোহান্ত না হন।" তাঁহার ধারণা, মোহান্ত না হইলেই আমার জীবন মহান থাকিয়া যাইবে।

একজন আর্য-সমাজী সাদা বস্ত্রধারী সাধু লক্ষ্ণৌ হইতে আসিতেন। তাঁহার নাম আমার মনে নাই। প্রথম প্রথম সাধু সন্ন্যাসী ও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কথা তুলিতেন এবং তর্ক-বিতর্ক করিতে চেষ্টা করিতেন। আমি খুব কমই উত্তর দিতাম। প্রায় সময়ই আমার পেছনে পেছনে ঘুরিতেন। আমার মুখে কথা শুনিতে তিনি ভালোবাসেন। তিনি আমাকে সদা গম্ভীর, নীরব, প্রফুল্ল, উৎসাহী এবং নীরব কর্মী বলিয়া খুবই প্রশংসা করিতেন। কোন রকমে আমার মুখে কথা ফুটিলেই তিনি উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিতেন, "বাহ্ বাহ্ ব্রহ্মচারীজী কা মুহ্ খুল গয়া, কমল খিল গয়া।" তিনি অবিবাহিত ছিলেন। আমার নিরালা স্বভাবকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অন্তরে সুন্দর স্নেহ ফুটিয়া উঠিত। তিনি বহুবার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। জীবনে খণ্ডন মণ্ডন অনেক করিয়াছেন। আমার নিকট আসিয়া তাঁহার অন্তরে স্নেহরস জাগ্রত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক শেষ হয়।

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রসহ আমাদের আশ্রমে আসিতেন। তিনি যোগ সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন, এবং সাধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে গুরুদেবের সঙ্গে কখনও আলোচনা করিতে দেখি নাই। তিনি বলিলেন, তাঁহার পুত্র I.C.S. পাস করিয়াছেন। শীঘ্রই চাকুরি লইবেন। তিনি এ দেশের সাধু-সন্ন্যাসী এবং রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি নিজেও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে বলিতেন, তোমাকে দেখিলে মনে হয় তুমি এক সময় ভাল সাধু হইবে। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি অত্যন্ত কর্মী-প্রকৃতির মানুষ এবং খুব ভাল কর্মক্ষেত্র পাইয়াছ। শুনিয়াছি, তাঁহার বই ছাপা হইয়াছে, উহাতে চূনার পাহাড়ের বালক সাধুর বিষয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণার কথা লিখিত আছে।

একজন সাধু আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ চৈতন্য তীর্থ। তিনি "ধবলগিরি ও নক্ষত্রলোক" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় টোপাঃফুলা ছিল, তিনি ব্যথায় সমস্ত রাত্রি চিৎকার করিতেন। আমি তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিয়াছিলাম। তিনি নুন খাইতেন না।

তাঁহাকে যাহা কিছু আহার করিতে দিতাম সবই নুন ছাড়া রান্না করিয়া দিতাম। তিন মাস এভাবে আশ্রমে অবস্থান করিয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চলিয়া যান। নিত্যস্বরূপ এবং সত্যস্বরূপ তাঁহার দুই শিষ্য ছিলেন। স্বামীজী ধবলগিরির পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি ভেড়াওয়ালাদের সঙ্গে তাহাদের দেওয়া খাদ্য আহার করিতে করিতে অনেক দূর গিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ভয়ঙ্কর জোঁকের দেশে গিয়া পড়েন। তিনি বলিতেন, জোঁকরা গাছের উপর অবস্থান করে, তলা দিয়া মানুষ বা ভেড়ার পাল চলিতে থাকিলে তাহাদের উপর হইতে টপকাইয়া পড়ে। তিনি ইহাতে ভয় পাইয়া ছিলেন। প্রধানতঃ এই দুইটি কারণেই তিনি ফেরত চলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তাঁহার শিষ্য নিত্যস্বরূপ ধবলগিরির লক্ষ্যে রওনা হইয়া যায়, তিনি তখনও ফিরেন নাই। স্বামীজীর সাদা জীবন ও সরল বিশ্বাস আমার ভাল লাগিত, কিন্তু তাঁহার এ সব ধবলগিরি পরিকল্পনা আমার অবাস্তব মনে হইত। এজন্য আমি কোন দিন তাঁহাকে ওই সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতাম না। গুরুর উপর বিশ্বাসেই যে নিত্যস্বরূপ ধবলগিরির পথে গিয়াছেন, ইহা আমি বুঝিতাম। কিন্তু আমার মনে হইত গুরুদের খুব সাবধানে কথা বলা প্রয়োজন। ভক্তিমান শিষ্যকে এতটা প্রেরণা দেওয়া ঠিক হয় নাই। একনিষ্ঠ শিষ্যরাও গুরুকে কিরূপ বিশ্বাস করেন, এই ঘটনায় আমি মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ই সেই কথা ভাবিতাম।

সাধন সমর গ্রন্থের লেখক শ্রীসত্যদেব মহারাজের কয়েকজন শিষ্য আমাদের আশ্রমে অনেক দিন ছিলেন। এঁরা সকলেই সাধন ভজন লইয়াই থাকিতেন। স্বাস্থ্য কাহারও তেমন ভাল ছিল না। ইঁহাদের সঙ্গ আমার জীবনের উপকারে আসিয়াছিল। ইঁহাদের দেওয়া সাধন সমর গ্রন্থাবলী আমি পাঠ করিয়াছি। ইঁহাদের সাধনার ধারা অত্যধিক ভাবপ্রবণ মনে হইত। শুনিয়াছি হাওড়া নিবাসী শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় শ্রীসত্যদেবের গুরু ছিলেন। বিজয় ঠাকুর শ্রীস্বামী বশিষ্টানন্দ স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীবশিষ্টানন্দ স্বামীজী আমাদের আনন্দমঠের ধারায় একজন গুরু ছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, এঁরা সকলেই আনন্দমঠের ধারারই শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহাদের মধ্যে প্রাথমিক দীক্ষা ভিন্ন অন্য কোন দীক্ষার প্রচলন ছিল না। এ জন্যই বোধ হয় এঁদের সাধনার ধারায় ভাবপ্রবণতার প্রভাব বেশী ছিল। শ্রীসত্যদেব মহারাজের সঙ্গে আমি বেশ অন্তরঙ্গ ভাবেই মিশিয়া ছিলাম। তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। শ্রী অরুণা মা অত্যন্ত স্নেহশীলা মহাত্মা ছিলেন। তিনি আমাকে একখণ্ড উপনিষদ দান করিয়াছিলেন। মায়ের দেওয়া এই ব্রহ্মজ্ঞানমূলক গ্রন্থ আমি নিত্য পাঠ্য গ্রন্থরূপে রাখিয়াছি। একদিন যতিরাজজী আমাকে বলেন, "আমি আপনাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি। আপনি পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে আসিয়াছেন। আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা। আপনি বালক বলিয়া যাহাতে আমরা আপনাকে অবজ্ঞা না করি, মা ইহা দেখাইয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন।" এই কথায় আমিও কিছু নূতন কথা বুঝিলাম। আমি জীবনে বহু সাধু এবং সন্ন্যাসী মহাত্মার সঙ্গে অবস্থান করিয়াছি। প্রায় সকলেই আমার সম্বন্ধে কিছু না কিছু অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন। ভক্তকে ভগবান সাবধান করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। এইরূপ স্বপ্নকথা আমি বাল্যকাল হইতেই অনেকের নিকট শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু এসব স্বপ্ন আমাকে কোনই প্রভাব দিত

না। বিশ্বরঞ্জন, যতিরাজ, নরেশব্রহ্মচারী, অরুণা মা, প্রিয়লাল, এঁরা সকলেই প্রতিভাবান সাধু। ইঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে আমি অনেক বিষয়েই উপকৃত।

আনন্দময়ী মা। এই মহিলাকে আমি প্রথম একদিন আমার গুরুদেবের সঙ্গে পাহাড়ের আশ্রমে কথা বলিতে দেখিয়াছিলাম। আমি কার্য উপলক্ষে অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়াই দেখি, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমি গুরুদেবকে বলিলাম, এই মহিলার খুব আকর্ষণ-শক্তি, এক সময় খুব নামী মহাত্মা হইবেন। তাঁহার কপালে মোটা বড় সিন্দুরের ফোঁটা, পরিধানে লাল পাড়ের স্ুন্দর শাড়ির কথা আমার আজও মনে আছে। তাঁহার স্নেহমাখা নির্মল মুখখানা আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। বৎসর খানেক বাদ, তিনি আবার পাহাড়ের আশ্রমে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী ভোলানাথ এবং মরণী নাম্নী একটি বালিকা ছিল। তিনি আশ্রমে চার দিন ছিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে, খুব স্নেহশীলা ছিলেন। যে কদিন আশ্রমে ছিলেন, নিত্য রান্না করিয়া আহার করাইতেন। ক্ষীণ শরীর, কিন্তু সদা হাস্যময়ী; আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। আজ তিনি বিশ্বখ্যাত মহাত্মা।

পাহাড়ের আশ্রমে গুরুদেবের নিকট দুইজন শঙ্করপন্থী সাধু আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের নাম আমার মনে নাই। পরিচ্ছন্ন বেশ, হাতে কমণ্ডলু। বেশীর ভাগ সময় পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াইতেন। গুরুদেবের সঙ্গে প্রথমটায় বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা করিতেন। পরে তাঁহারা যোগ ও যোগের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলিতেন, আমরা এক সমুদ্রের নিকটস্থ হইয়াছি। যে বিষয়েই আলোচনা করা যায়, মনে হয় অনন্ত সমুদ্র। আমরা এখান হইতে কিছুটা গ্রহণ করিয়াই লইব। তাঁহারা কিছু কিছু যোগের ক্রিয়া শিক্ষা করিয়া চলিয়া যান। শঙ্করপন্থী সাধুদের সরল বেশভূষা এবং ত্যাগের আদর্শ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আমার খুবই ভাল লাগিত। মনে হইত, ইঁহারাই ঠিক ঠিক দিব্যাচারী।

স্বামী পাগলানন্দজী। ইনি বহু বৎসর চুনারে ছিলেন। খুব নির্জনপ্রিয় ত্যাগী সাধু। কৌপীন এবং মাটির হাঁড়ি ভিন্ন সঙ্গে অন্য কিছুই রাখিতেন না। টাকা-পয়সা স্পর্শ করিতেন না, মেয়েদিগকে দেখিলেই তাড়াইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, টাকা এবং নারীই সংসার এবং এই দুইটি না থাকাই সন্ন্যাস। শেষের দিকে তিনি আর চূনারে থাকিতেন না। এলাহাবাদের নিকট পাশুড়ী সাওয়ার নামক এক গ্রামে থাকিতেন। তিনি প্রতি বৎসর চুনারে আসিতেন এবং এক মাস মাত্র চুনারে অবস্থান করিতেন। সেই এক মাসের মধ্যে তিনি একবার মাত্র সিদ্ধনাথ নামক স্থানে যাইতেন। সিদ্ধনাথ আমাদের পাহাড়ের আশ্রম হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ঝরনার ধারে একটি পাহাড়ী গুহা। সিদ্ধনাথ নামক কোন তপস্বী মহাত্মা এই গুহায় নিবাস করিতেন। আমি সিদ্ধনাথ গিয়াছি। অতীব পবিত্র তপঃভূমি। গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পবিত্র গুহাটির মধ্যে এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। বেশ বড় প্রদীপটি, তেলে পরিপূর্ণ। চার-পাঁচটি সলিতা একত্র জ্বলিতেছে। এই মাত্র কোন ভক্ত সেখানে দর্শন করিতে আসিয়া জল, ফুল ও বাতি দান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথাও লোকজনের অস্তিত্ব নাই। তপস্বীর তপঃপ্রতিভা যেন ঐ দীপটিকে কেন্দ্র করিয়া দিগন্ত বনভূমিকে একাগ্র করিয়া বিরাজমান।

স্বামী পাগলানন্দজী সিদ্ধনাথ হইতে ফিরিবার পথে আমাদের পাহাড়ের আশ্রমে আসেন। সেই সময় গুরুদেব আশ্রমে ছিলেন। তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি চেয়ার দেওয়া হইল। কৌপীনমাত্র পরিহিত বিরাট শরীরটা সেই চেয়ারে বসিলেন। মোটেই যেন মানাইতেছিল না। ত্যাগ ও তপস্যামণ্ডিত নগ্ন দেহটিকে বহন করিয়া চেয়ারটি যেন সুখী ছিল না। দশ-পনেরো মিনিট অবস্থানের পরই পাগলানন্দজী চলিয়া গেলেন।

পাগলানন্দজী আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি যখনই চুনারে আসিতেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে দর্শন করিতাম। তাঁহার বিচারধারা সরল এবং সোজা ছিল। তিনি এক শত বৎসরেরও অধিককাল জীবিত ছিলেন। তিনি মাসে একদিনের বেশী একজনের গৃহের অন্ন গ্রহণ করিতেন না। তিনি একবেলা আহার করিতেন। তাঁহার নিকট একটি সাফা (নেকড়া) থাকিত। যাঁহার তাঁহাকে ভিক্ষা (খাদ্য) দিবার ইচ্ছা হইত, তিনি পূর্বদিন বৈকালবেলা সেই সাফাটি লইয়া আসিতেন এবং পরদিবস ঠিক সাড়ে দশটায় তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া আসিতেন। পাগলানন্দজীর নিকটে ধনী, গরীব, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সব রকম লোক যাইতেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অত্যন্ত মামুলী কথায় উহার সরল উত্তর দিতেন এবং চুপচাপ থাকিতেন। উপদেশ অপেক্ষা সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ এবং সেবাই যে জীবনকে বিকশিত হইতে বেশী সাহায্য করে, ইহা আমার মত। আমি কখনও উপদেশ বা কথা শুনিবার জন্য সাধুদর্শনে যাই না। আমি সাধুদের মনের সাম্যভাবটুকু অনুভব করি মাত্র। ইহাই আমার সাধুসঙ্গ। জনসাধারণের মধ্যে কর্মভাব প্রতিষ্ঠায় মহাত্মারা সঙ্গ দান করিয়াই বেশী সাহায্য করেন। খুব উচ্চ স্তরের আলোচনা ও কথা বলিতে পারেন, এমন চিন্তাশীল ও বিদ্বান সাধু কম।

কোন সাধুকে জীবনের একসময় ত্যাগী এবং অন্য সময় আসক্ত দেখিলে, তিনি তাঁহার ভীষণ সমালোচনা করিতেন। একবার তিনি কোন সাধুকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে কিছু বলেন। আমি বলিলাম, আমি এতে দোষ দেখি না। সাধু হইতে গৃহী হওয়া এবং গৃহী হইতে সাধু হওয়া, কোন অসম্ভব কথা নয়। জীবনে যাঁহারা সামান্য কয়েকদিনও সন্ন্যাসী থাকেন তাঁহারাও ইহার প্রভাবে অনেক পুণ্য লাভ করেন। অনেক সময়, সাধু হইতে গৃহী হওয়ার মূলে অন্য জন্মের প্রভাব থাকিতে পারে। বঙ্গদেশের চৈত্র মাসে শৈব সন্ন্যাসী হইবার নিয়ম আছে। কেহ একমাস, কেহ পনেরো দিন, সাত দিন, তিন দিন বা একদিনও সন্ন্যাসী থাকেন এবং সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন করেন। ইহাও ভাল ধর্ম-জীবন। গোরক্ষনাথের গুরু মীনানন্দস্বামী তপস্যার জীবন হইতে গৃহী হইয়াছিলেন এবং আবার সন্ন্যাসীও হইয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জীবনও ঐরূপ ছিল। এই ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির যজ্ঞের প্রভাবেই মহারাজ দশরথের পুত্রদের জন্ম হইয়াছিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষির কন্যাই শকুন্তলা। এই শকুন্তলাই ভরত রাজার মা ছিলেন। এই ভরতের রাজ্যেই ভারতবর্ষ। আমি তপস্বীর প্রশংসাই করি। কারণ উহা পুণ্য জীবন। তপস্যা জীবনকে পূত করে, আমি ইহার প্রশংসা করি। স্বামীজী বলিলেন, ব্রহ্মচারীর বিচারধারা সুন্দর, আমি ইহার সমর্থন করি। এখন হইতে আমিও এইভাবে কথা বলিব।

একবার স্বামীজী বাঙালীদের মৎস্যপ্রিয়তার তীব্র নিন্দা করেন। বলিলেন, খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান এবং ভক্তিমান জাতি। মৎস্য নিশ্চয়ই আহার করিবে। জলের পোকা, নোংরা খাদ্য, হিংসা, জীবহত্যা ইত্যাদি। আমি বলিলাম, মানবে বুদ্ধি বিদ্যা ঈশ্বরভক্তিই বড়

গুণ। আটা যদি ঐ সব গুণ না বৃদ্ধি করে তবে আটা মানুষকে বড় কি দিল, বলুন? জীবহত্যা লইয়াও খাদ্যের বিচার হয় না। কারণ ধান, যব, গমও জীব। ইহাতে শস্য হয়, গাছ হয়। ইহাদের হত্যাও হত্যা। বাছুরকে পীড়ন দিয়া দুধ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও হিংসা। বর্তমান বিজ্ঞান ভাইটামিনের বিচারে খাদ্য বিচার করে। ঋষিগণ সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস্ বিচারে খাদ্য বিচার করিতেন। মানুষের প্রবৃত্তি তামস্ হইলে সে তামস্ খাদ্য ভালবাসে, রাজস্ খাদ্য কর্মী ও যোদ্ধাদের প্রিয় হয়, তপস্বী ও জ্ঞানীরা সাত্ত্বিক খাদ্য খান। সমাজে সব রকম মানুষের প্রয়োজন আছে। ইহা ভিন্ন সমাজ চলে না। মাছ-মাংস আহার করিয়াও বাঙালীরা ভক্তিমান বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান জীব; সে আপনারই মত। যে দেশের অর্ধেকের বেশী অংশ জলময় থাকে, সেখানের খাদ্য জলে না ফলাইলে চলিতে পারে না। বৃক্ষাদিরা যে জীব ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরই মত। উপনিষদে এ সম্বন্ধে লম্বা আলোচনা আছে। মহারাজ জনকের সভায় ইহা লইয়া জোর আলোচনা হইয়াছিল। ব্রহ্মবিদুষী গার্গী এই আলোচনায় ভাগ লইয়াছিলেন। বেদান্তে জীব, জন্তু, মাটি, পাথর, জল, বায়ু, আকাশাদিকে চেতনা বলিয়াছেন। কাজেই হিংসা বা অহিংসার বিচারে খাদ্য-বিচার অসম্ভব। জীব জীবকে খায়, চেতনা চেতনাকে গ্রাস করে, ইহা সৃষ্টির নিয়ম। এ সব হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠুরের মত জীবহত্যা করে, একটু একটু করিয়া পেঁচাইয়া কাটে, জীবন্ত জীবকে গরম জলে ফেলিয়া হত্যা করে, বুকে শূল মারিয়া বর্বরের মত হত্যা করে - সে সব নিষ্ঠুর বর্বরদিগকে ক্ষমা করা যায় না। বৃক্ষাদির সুখদুঃখ বোধ ঠিক মানুষের মতন। ইহা জগদীশ বসু প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন, সে কিরূপ প্রমাণ বলুন। আমি সে সব কথাও বলিলাম। আমি আরও বলিলাম, আহারকে কেন্দ্র করিয়া এতটা বদ্ধমূল ধারণা না করিলে ক্ষতি কি? সাত্ত্বিক আহারী বাঙালীদের মধ্যেও অনেক আছেন। তিনি বলিলেন, বদ্ধমূল ধারণা না রাখাই ভাল।

একবার আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপানর মুখের রঙ ফ্যাকাশে হইয়াছে, আপনি কি দুর্গাবাড়ির ঝরনায় শীতল জলে নিত্য স্নান করেন? আমি বলিলাম, আমি নিত্য শেষ রাত্রে ঝরনায় যাই এবং স্নানাদি করিয়া ফিরিয়া আসি। তিনি বলিলেন, সাবধান ঐরূপ করিবেন না। ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। একা থাকেন, কাজেই সাবধান থাকা কর্তব্য। তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

পাহাড়ের আশ্রমে ভারত ধর্মমহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী জ্ঞানানন্দজীর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দজী আসিয়াছিলেন। তিনি তিন মাস আশ্রমে ছিলেন। বিবেকানন্দজী সীমাহীন সংস্কৃত ভাষার বিদ্বান। তিনি মাড়বার দেশের লোক। ভারত ধর্মমহামণ্ডল অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, এই সব গ্রন্থাদি স্বামী জ্ঞানানন্দজীর নির্দেশে বিবেকানন্দজী দ্বারা লিখিত এবং স্বামী দয়ানন্দজীর নামে প্রকাশিত। স্বামী জ্ঞানানন্দজী দূরদর্শী বুদ্ধিমান মহাত্মা ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দজীর প্রশংসা আমি গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি। মহামণ্ডল পৌরোহিত্যবাদীয় প্রতিষ্ঠান। যাহাতে শিষ্যদের মধ্যে ভবিষ্যতে উদার মতবাদের প্রভাব না হইতে পারে, এজন্য মহামণ্ডলের গ্রন্থগুলি ইহার ভাবী অধিকারী দয়ানন্দজীর নামে প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার অভিশাপ, স্বামী

দয়ানন্দজী পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেই শরীর ত্যাগ করেন। স্বামী জ্ঞানানন্দজী ইহার পরে অনেক যুগ বাঁচিয়া ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দজী পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। জ্ঞানানন্দজী মহারাজ তাহার পরও বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। শুনিয়াছি, এখন জ্ঞানানন্দ মহারাজের কন্যা শিষ্যা বিদ্যাদেবী মহোদয়া ভারত ধর্মমহামণ্ডলের কর্ণধার। স্বামী জ্ঞানানন্দজী বহু লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এক শত বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত ছিলেন।

বিবেকানন্দজী মহারাজ পাহাড়ের আশ্রমে আসিয়া প্রথম দিনই আমাকে খুব প্রশংসা করিলেন : ‘‘আপনার কথা আমরা সর্বদা আলোচনা করিয়া থাকি। আপনি যদি আমাদের মহামণ্ডলের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন তবে আমরা আপনাকে প্রতি মাসে তিন শত টাকা সহায়তা দিব।’’ আমি বলিলাম, ‘‘আমি সাধু মানুষ, আমার টাকার কি প্রয়োজন? আপনি যদি আমার বিচার ধারাকে নিজেদের দিকে প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে আপনাদের সঙ্গে আমার মিশিতে বাধা কি থাকিতে পারে? আমি আপনাদের অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। আপনারা শাস্ত্রকথার প্যাঁচে ফেলিয়া মানুষকে শূদ্র অচ্ছুত অপদার্থ অযোগ্য বলিয়া প্রচার করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণের জন্য সম্মান আদায় করিবেন, এইরূপ কথার প্রচার করিলে বর্তমান যুগে মার খাইতে হইবে। আমি চার বর্ণ এবং চার আশ্রম মানি, বৈদিক ধর্মও মানি। উপাসনা বিষয়ে যদি বেদ ব্রাহ্মণের জন্য এক রকম এবং অব্রাহ্মণের জন্য অন্য রকম কথা বলিয়া থাকেন, তাহাও প্রকাশ করুন। যদি সেটা না হইয়া থাকে তবে সকলেই গায়ত্রী ও ব্রহ্মোপাসনা করিবে, সেই কথা বলুন। ইহা ভিন্ন বৈদিক ধর্ম রক্ষা করা কঠিন হইবে।’’ তিনি বলিলেন, ‘‘আমি আপনাকে খুশী করিব, নিত্য বৈকালবেলা আলোচনা হইবে।’’ আমি বলিলাম, আচ্ছা। তিনি নিত্য আলোচনা করিতেন এবং নিত্য রণে ভঙ্গ দিতেন। তিনি নিত্য গুরুদেবকে আলোচনার বিষয়ে মোটামুটি সব কথাই বলিতেন। শেষকালে তিনি আমাকে অনেক আশীর্বাদ ও স্নেহ জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া যান। গুরুদেবকে আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। গুরুদেব ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

স্বামী জ্ঞানানন্দজীর দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে আমার সঙ্গে তাঁহার শক্তিবাদ সমাজ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। কালিকৃষ্ণ চক্রবর্তী (কাশীর বিখ্যাত চশমা ব্যবসায়ী) আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি শক্তিবাদ সমাজব্যবস্থার মোটামুটি সব কথাই বলিতাম। মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণকে বৈদিক ধর্মে দীক্ষা দিয়া আরও শাখা সমাজ গঠন করা সঙ্গত বলিয়া বলিলাম। আমি আরও বলিলাম, বিবাহ এবং অন্নচলন সম্বন্ধে পুরাতন সমাজের যেমন বাঁধন আছে, তেমনই থাকিবে, নূতন সমাজেও সেইরূপ বাঁধন দেওয়ার বিধান করা হইবে। তিনি খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের শুদ্ধি করিবার বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিরক্তিকর ভাষায় মত প্রকাশ করিলেন। আমিও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম ও ক্ষমা এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলাম। একটা কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া নানা মতবাদীদের সংস্পর্শে আসিয়া নানা প্রকার সমাজবাদ ও ধর্ম বুঝা খুবই সুবিধাজনক। গুরুদেবের উইলের মধ্যে গোলমালজনক কথা যদি না থাকিত, তবে চুনারের আনন্দাশ্রম আজ একটা শক্তিশালী শক্তিবাদ কেন্দ্রে পরিণত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি ভাবিতেছি,

গঙ্গার ধারে আমার তপঃস্থান ভৈরব গুহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা তপঃকেন্দ্র চুনারে রাখা শক্তিবাদীদের জন্য প্রয়োজন হইবে। চুনার পাহাড়ে আনন্দাশ্রমের কাছাকাছি কোথাও আবার মঠ করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে আমি চুনারের বিশিষ্ট লোকদের মতামত চাহিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, "যুগের পরিবর্তন হইয়াছে স্বরাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্মবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। এখন জঙ্গলে মঠ করিয়া দরজাখানাও রক্ষা করা যাইবে না। আপনি এ কাজে হাত দিবেন না।"

চুনার পাহাড়ের তপঃভূমি

আনন্দ আশ্রম মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর দিকে প্রায় দেড় মাইল আসিলে আমার বাল্যকালের কল্পিত তপঃভূমি পাওয়া যাইবে। এই তপঃভূমিকে কেন্দ্র করিয়া পাঁচ মাইল স্থান পর্যন্ত আট দিকে ঘুরিয়া আসিলে যে ভূমিখণ্ড পাওয়া যাইবে, তাহাতে আমার বর্তমান জন্মের চুনার পাহাড়ের তপঃভূমির পরিধি পাওয়া যাইবে। আমি এই বিরাট ভূমির প্রতিটি বৃক্ষতল, প্রতিটি ঝরনা, প্রতিটি প্রস্তরস্তূপ, প্রতিটি পাহাড়ী টিলাকে তন্ন তন্ন করিয়া আমার নিত্যকার সাধনার স্থানে পরিণত করিয়াছি। যেখান হইতে দৃশ্য সুন্দর এবং বিরাট, যেখানেই দেখা গিয়াছে মানবের রূপ দেখা যাইবে না, সেইখানেই আমি ধ্যানমগ্ন হইয়াছি। আমার নিত্যকার কর্ম-রুটিন অত্যন্ত ব্যাপক, অত্যন্ত কঠোর, কর্মও কর্তব্যময়। এইরূপ ভয়ঙ্কর কঠোরতা ও কর্তব্যকর্মের মধ্যেও আমি সময় বাহির করিয়াছি এবং নির্জন বনভূমি ও পাহাড় দেশের গর্ভে বসিয়া আত্মহারা হইয়াছি। যাহার মস্তকে এত কর্মস্তূপ, এত দায়িত্ব, সে এত সময় কোথায় পায়? কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা যে আমার তপস্যার জন্য সময়ের অভাব হইত না। সকাল মধ্যাহ্ন সায়ংসন্ধ্যা রাত্রি মধ্যরাত্রি, আমার সময়ের নিয়ম ছিল না। যখনই সুযোগ হইত আমি বসিয়া পড়িতাম। যদি বুঝিতাম মাত্র দুই মিনিট সময় আমার হাতে আছে, আমি দুই মিনিটের জন্যই ধ্যানস্থ হইতাম। সব ভুলিয়া এই দুই মিনিটই অন্তরাত্মার কোলে বিশ্রাম করিয়া লইতাম। দুইটা মিনিটের মধ্যেই আমি নবীন হইতাম। প্রতিটি কর্মের মধ্যেও আমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুই চার বার ফাঁক করিয়া লইয়া আমি ধ্যানস্থ হইতাম। এজন্য কঠোর কর্মও আমাকে ক্লান্ত করিতে পারিত না। আমি ছিলাম অনন্ত অসীম আত্মার কোলে সদা বিচরণশীল কচি শিশু। কোন কর্মই আমাকে আত্মাহীন করিতে পারিত না। আবার দুই মিনিটের ফাঁকেও আমি যে অন্তরাত্মার কোলে ডুবিবার সময় পাইতাম সেই দুই মিনিটও আমি অন্তরাত্মার স্নেহস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইতাম না। মা আমাকে যেন তৃপ্তি দিবার জন্য, দিন রাত আমার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ওই যে মাঝ খালীয়া, ওই যে অশ্বত্থামা দরী, ওই যে বুন্দা পাহাড়ে নির্জন পাথরের বাড়িগুলি, ওই যে দুর্গামন্দির, ওই যে দুর্গা পাহাড়, ওই যে মচ্ছরামারা ঝরনা, ওই যে দুর্গাবাড়ির ঝরনা, ওই যে ঝরণার ধারে অসংখ্য কেলীকদম্ব বৃক্ষরাজি, ওই যে ধাঁওহার পাহাড়, ওই যে চুড়িয়াবাবা পাহাড়, ওই যে আনন্দাশ্রমের এক মাইল পশ্চিমে প্রবাহিত নির্জন ঝরনা, ওই যে দুর্গামন্দিরের পেছনে অবস্থিত পাহাড় ভূমি, ওই যে ময়ূরের মন-মাতানো কঁ্যা-কঁ্যা ধ্বনি, ওই যে হরিণ গোষ্ঠীর গোঁ গাঁ, কোঁকা ধ্বনি, ওই যে ঘুঘু পাখির করুণ মধুর কণ্ঠধ্বনি, ওই যে

গো-মহিষের সীমাহীন বিচরণ ভূমি, ওই যে গরু মহিষীর কণ্ঠে বাঁধা ঘণ্টা ধ্বনি, ওই যে করঞ্চা বনে প্রস্ফুটিত ছোট ছোট সুমধুর গন্ধ-ঢালা পুষ্পরাজি। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত ছয়টি ঋতু আমার পবিত্র তপঃভূমিকে নিত্য নতুন সাজে সাজাইয়াছে। কখনও তপঃভূমি স্নিগ্ধ সবুজ পত্র ও বনশোভিত, কখনও বিশুষ্ক রুক্ষ করালরূপী। আমি বারো মাস তপঃভূমির স্নেহরসে আত্মহারা থাকিতাম। তপঃভূমির সৌন্দর্য ও সুগন্ধ সবচেয়ে মধুময় হইত বসন্তকালে। সে সময় বনের প্রতি পদে পদে বন্য করঞ্চ ও নিম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া মনকে সুমধুর গন্ধে পরিপূর্ণ করিত। ছোট করঞ্চা ফল এ সময় হইতেই ফলিতে আরম্ভ করিত এবং কিছুদিনের মধ্যে পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করিত। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় করঞ্চা প্রচুর পরিপক্ক হইত। ইহা অম্লমধুর স্বাদবিশিষ্ট। যত ইচ্ছা আহার কর। কখনও অরুচি হইবে না। বসন্তকালে কটহর, মকইচা, চারপিয়ার, কুল, তেন, বনফুলও প্রচুর হইত। বনের ফল এবং বনের কন্দ আমি প্রচুর আহার করিয়াছি। কিন্তু আমি বলিয়াই রাখি, ইহা দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করা কঠিন এবং জীবনধারণও অসম্ভব। অনেক পরিশ্রমে অল্প খাদ্য জুটানো যাইত। জঙ্গলী কুল ভিন্ন কোন ফলই এক স্থানে প্রচুর ফলিত না। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া জুটাইতে হইত। কাজেই জীবনরক্ষার জন্য এইসব বনফল যথেষ্ট ছিল না। আমাকে ডাল রুটি ও ভাতের আশ্রয় লইতেই হইবে, ইহা আমি বেশ বুঝিয়া লইলাম। এ সব বনভূমির মধ্যে কতকগুলি স্থান বেশ শ্বাপদসঙ্কুল এবং ভয়ঙ্কর ছিল। কোন কোন দিন বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা হয়তো একা নির্জন বনের মধ্যস্থিত ঝরনার ধারে বসিয়াছি, হঠাৎ সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত। আমি ধীরে ধীরে সরিয়া আসিতাম। কারণ, চারিদিকে গভীর বন এবং বড় পাথরের খণ্ডগুলি দ্বারা সর্বতোভাবে ঘেরা এবং অগম্য এই বনভূমিকে কেন্দ্র করিয়া যে বন্যজন্তু নিবাস করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মচর্যের কথা

বেশ বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে নানা কথার সন্ধান পাওয়া গেল। তখন অনুশীলন সমিতির যুগ। দাদারা বালকগণকে দলে আনিয়া দেশ উদ্ধারের কাজে লাগাইতে অগ্রসর, আমার মতন ঈশ্বর বিশ্বাসী বালক তাঁহাদের মনকে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি অনেকগুলি ছোট ছোট ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধীয় বই পাইলাম। আরও বাল্যকালে রামায়ণ মহাভারত শ্রবণকালে গুরুগৃহ, ব্রহ্মচর্য ও বেদপাঠের অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। বইগুলিতে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা আমার মনে স্থান পাইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য নিয়মগুলি আমি খুব নিষ্ঠার সহিতই পালন করিতাম। ওইসব নিয়মের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম আমি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের নিকটও জানিতে পারিয়াছিলাম। ইহার ফলে আমি বেশ সুস্থ শরীর এবং সুস্থ মনের ক্ষেত্র হইয়াছিলাম। নিত্য শেষরাত্রে সূর্যোদয়ের ঠিক এক ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট পূর্বে আমি শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচ ও স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া গায়ত্রী জপে মন দিতাম এবং পরে পাঠ আরম্ভ করিতাম। শেষরাত্রে শয্যাত্যাগের ফলে আমি প্রচুর সময় পাইতাম।

আমার মন আরও বাল্যকাল হইতেই সংসারচক্রের বাহিরে আসিয়াছিল। এখন উহা আরও দৃঢ় ভিত্তি গ্রহণ করিল। দাদাবাদীরা আমাকে দেশ উদ্ধারের কথা খুব বলিত। কিন্তু আমার মন দেশ উদ্ধার অপেক্ষা তপস্যার জীবনযাপন বেশী পছন্দ করিত। আমি গৃহত্যাগ করিব, সাধন তপস্যা করিব, ইহা তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। আমি বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে যে সব নিয়ম পালন করিতাম উহা নিম্নলিখিত রূপ :

১। সূর্যোদয়ের ঠিক চারদণ্ড (এক ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট) পূর্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতাম। প্রথমেই সূর্য প্রণাম, মাথা ভূমি সংলগ্ন করিয়া ভূমি প্রণাম করিতাম। বৃদ্ধারা বলিয়াছিলেন, সূর্য প্রণাম ও ভূমি প্রণাম করিলে শরীর নীরোগ থাকে। (সূর্য প্রণাম এবং ভূমি প্রণাম সূর্যোদয়ের পূর্বে হওয়া চাই।)

২। ইহার পর মলমূত্র ত্যাগ, দাঁতন ও স্নান। স্নানান্তে ঘাড়ে আঘাত করা। স্নানান্তে জলেই সংক্ষেপ তর্পণ অর্থাৎ তিন অঞ্জলি জল দান। এইরূপ জল দান করিলে ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবের আশীর্বাদ লাভ হয়; ইহাও বৃদ্ধারা বলিয়াছেন। স্নানের পরই আসনে বসিয়া গায়ত্রী জপ করা হইত।

৩। বই পড়িবার মত আলোর বিকাশ হইলেই বাহিরে আসিয়া পাঠারম্ভ। সামান্য খাদ্যগ্রহণ। আবার পাঠ। পাঠের পর গৃহকর্ম ও গোসেবা।

৪। স্নানাহার, বিদ্যালয় গমন, ছুটির দিনে এ সময় নানাপ্রকার গৃহকর্ম। পুরাতন পাঠ অভ্যাস।

৫। বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আহার, যেদিন সময় বেশী থাকিত সেদিন অঙ্ক কষা বা পাঠ। পরে ব্যায়াম।

৬। ঠিক সন্ধ্যার পরই পাঠ। অনেকক্ষণ পাঠ। আহারান্তে বিছানায় বসিয়া ধ্যান ও পরে শয়ন। শেষরাত্রে শয্যাত্যাগের পূর্বে ধ্যানাদি।

৭। কৌপীন ধারণ ও প্রস্রাবাদিতে জলশৌচ। মলত্যাগের পর বস্ত্র বদলানো। আহারকালে কথা না বলা। পঞ্চবায়ুর জন্য অন্নদান করিয়া যথাবিধি গণ্ডুষ করিয়া আহার আরম্ভ। এইসব নিয়মাবলী আমার জীবনের নিত্যকার অভ্যাসের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। বলা প্রয়োজন, এ সব নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মচর্য এবং কর্মজীবন অসম্ভব। কাজেই প্রাথমিক সাধক ও ব্রহ্মচারীদের এ সব নিয়মে একনিষ্ঠ হওয়া কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য বিষয়ে নিষ্ঠাসম্পন্ন কন্যাগণ পুরুষগণ হইতে এবং ছেলেরা মেয়েদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবেন।

জীবনে প্রথম পঁচিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পঁচিশ বৎসর গার্হস্থ্য, তৃতীয় পঁচিশ বৎসর বানপ্রস্থ এবং চতুর্থ পঁচিশ বৎসর সন্ন্যাস। যাঁহারা সুখের জীবন ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রথম পঁচিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য নিয়ম নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন এবং যতটা সম্ভব সেইসব নিয়ম সমস্ত জীবনকাল নিজেদের অভ্যাসে ধরিয়া রাখিবেন।

ব্রহ্মচর্য কথার অর্থ কি?

উঃ - (১) ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে বিচরণ বা আচরণ ব্রহ্মচর্য। (২) ব্রহ্মজ্ঞানের পর মহাপুরুষগণের যেরূপ আচরণ উহা ব্রহ্মচর্য। (৩) সাধু সন্ন্যাসী যোগী এবং মহাত্মাগণ যেরূর জীবনযাত্রা আচরণ করেন, উহা ব্রহ্মচর্য। (৪) ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিবে এবং ব্রহ্মধ্যান বা ব্রহ্মনাড়ী ধ্যান করিয়া সৎভাবে কর্ম উপাসনা ও জ্ঞানের অনুশীলন করিবে। ইহা ব্রহ্মচর্য। ব্রাহ্মমুহূর্তে যাহারা শয্যাত্যাগ করে না, তাহাদের কখনও উচ্চচিন্তা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য অসম্ভব। (৫) যথাবিধি গায়ত্রী দীক্ষা ও উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া উহার অনুশীলন, গুরুগৃহে বাস এবং নারীর সংস্পর্শ হইতে পুরুষের দূরে থাকা এবং পুরুষ সংস্পর্শ হইতে নারীর দূরে থাকা ব্রহ্মচর্য।

গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তিস্তর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ‘ক্রমবিকাশের পথে’ দেখুন। শুধু নিয়ম পালনে ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা হয় না। কারণ অনুভূতিহীন নিয়ম পালন বেশী সুখদায়ক হয় না। গণেশস্তরের অনুভূতি, সূর্যস্তরের অনুভূতি, বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি এবং শিবস্তরের অনুভূতির কথা ক্রমবিকাশে আলোচনা করুন। কোন একটি অনুভূতির ভিত্তি না থাকিলে ব্রহ্মচর্য ও নিয়ম পালন নীরস কার্য হয়। নীরস নিয়ম পালনের ব্রহ্মচর্য সাধককে যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারে না। এজন্য অন্ততঃ গণেশস্তরের অনুভূতি আসা চাই। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ে গণেশস্তর এবং উন্নত শিবস্তরের অনুভূতি শক্তিশালী অবলম্বন। সূর্য ও বিষ্ণুস্তরের অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মচর্য জীবন নিষ্কণ্টক হয় না। কারণ এই দুইটি অনুভূতির সঙ্গে প্রেমস্পৃহা এবং মিলনসুখস্পৃহা মাঝে মাঝে জাগ্রত হইয়া সাধককে সংসারের দিকে টানিবে। গণেশস্তরের অনুভূতি যেমন মানবকে নিরালা এবং একক জীবনের প্রতিষ্ঠা দান করিয়া সুখী করিতে সক্ষম, সূর্য ও বিষ্ণুস্তরের অনুভূতিগুলি সেরূপ নহে। এই দুইটি স্তর সাধককে লোকসঙ্গে তৃপ্তি দিতে চেষ্টা করে এবং জনতাও সেই সাধকের দিকে আকৃষ্ট হইতে ভালবাসে। এই দুইটি স্তরে

মাতৃভাব এবং সন্তানভাব ভাল অবলম্বন। বিষ্ণুস্তরের অনুভূতিকালে মিলনসুখস্পৃহা মাঝে মাঝে এত শক্তিশালী হয় যে সংসার প্রবেশ রুদ্ধ করা কঠিন বলিয়াই মনে হইবে। পূর্বাবধি ব্রহ্মচর্য জীবনের নিয়ম পালনে যাঁহারা একনিষ্ঠ তাঁহারা কতকটা বল পাইতে পারেন। গুরুর একান্ত স্নেহ, নিরালা অবস্থান এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের অবলম্বন এবং শরীর ও মনকে স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য ক্রিয়া, নিত্য শিবপূজা আদি অবলম্বন থাকিলে, শিবস্তরের অনুভূতি লাভ সহজ হয়। শিবস্তরের অনুভূতি আসিলে ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য জীবন হইল, জানিতে হইবে। শিবস্তরের শান্তিবোধ না ফুটিলে ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য জীবন হইল না, ইহাই জানিতে হইবে। (ক্রমবিকাশ দ্রঃ)

আমরা প্রাথমিক সাধকগণকে দীক্ষার সময় গণেশস্তরের অনুভূতির সন্ধান দিতে চেষ্টা করি। সাধক যদি দীক্ষার সময়কার অনুভূতি ও মনের সাম্যস্থিতির মূল্য বুঝিতে পারেন, তবে দেখা যাইবে, ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি তাঁহার নিত্যকার জীবনে স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের স্বভাবে ওইসব নিয়মগুলি সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে না, তাঁহাদের আত্মবিকাশ অনেক দূর বিকশিত হয় না। ব্রহ্মচর্য জীবনের নিত্য নিয়ম পালনের মধ্যে প্রচুর রস আছে। ক্রমাগত কয়েক বৎসরকাল ওই সব নিয়ম পালনের পর ওই রস গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের শরীর ও মন আয়ত্ত করে। ব্রহ্মচর্য নিয়মের রস একবার কিছুদিন পাইতে থাকিলে, জীবনে ওই সব ত্যাগ করিতে আর ইচ্ছাই হইবে না। এইজন্য ব্রহ্মচর্যের নিয়ম পালনই ব্রহ্মচর্য। ইহা শরীর ও মনকে সুস্থ ও নীরোগ রাখে এবং কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে।

সূর্যোদয়কে কেন্দ্র করিয়া চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচটি প্রাকৃতিক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়। ব্রহ্মচর্য জীবনের নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যে এই পাঁচটি প্রাকৃতিক পরিবর্তনকে বিশেষভাবে অবলম্বন করিবার বিধান আছে। বিশ্ব প্রকৃতির এই পাঁচটি পরিবর্তনকে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, মধ্যরাত্রি এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত বলে। প্রাতঃ = ব্রহ্মাণী = সৃষ্টি। মধ্যাহ্ন = বৈষ্ণবী = পালন। সায়ং = রুদ্রাণী = লয়। মধ্যরাত্রি = তুরীয়া = মহাকালী বা আদ্যাশক্তি। ব্রাহ্মমুহূর্ত = ব্রহ্ম = নির্গুণ চেতনা। আমি প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত পাঁচটি সন্ধ্যোপাসনাই করিতাম। এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানবের এবং জীবের যে কর্মধারার পরিবর্তন হয়, উহা নিত্যই বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ষাট দণ্ড দিন রাত্রির মধ্যে মাত্র চার দণ্ড ব্রহ্মকাল। সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী চার দণ্ড কাল বিশ্ব প্রকৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। এই সময় সাধক নিশ্চয়ই জাগ্রত হইয়া গৃহের বাহিরে অনেকটা সময় থাকিবেন এবং অন্যান্য সন্ধিকালের মধ্যে যেরূপ যেরূপ কর্মবিভাগ নিহিত আছে, উহাও কর্মের মধ্যে ফুটাইতে চেষ্টা করিবেন। এইভাবেই কঠোর কর্মের মধ্যে আমার সমস্ত জীবন নিয়মিত হইয়া চলিয়াছে। ইহাই ব্রহ্মচর্য জীবনের মর্মকথা।

গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ইঁহারা মনোবিকাশের ক্রমোন্নত স্তর। শক্তিস্তরের বিকাশকে কেন্দ্র করিয়া পাঁচ সন্ধ্যার সন্ধ্যোপাসনার বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এমন উন্নত স্তরের সাধনা আর হইতেই পারে না। যে সব মহর্ষিগণ আমাদের জন্য এইরূপ সাধনার ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানের তুলনা নাই। তাঁহাদের চরণকমলে শত প্রণাম নিবেদন করি। হে আমার গুরুগণ! তোমরা আমার মস্তকে

আরও স্নেহ ও আশীর্বাদ বর্ষণ কর। আমি যেন তোমাদের প্রবর্তিত পথে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চলিতে পারি।

অধিকাংশ বনের পশু পক্ষীরা ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত। কালের মধ্যে বসন্তকাল ভিন্ন কোন সময়েই সেই সব জীবগণ সৃষ্টি এবং পালন কার্য করে না। উন্নত স্তরের প্রাকৃতিক পশুপক্ষী স্বামী-স্ত্রীরা রাত্রিতে কখনও একস্থানে থাকে না। তাহারা বেশ দূরে দূরে থাকে। সাধক জীবনে সূর্য স্তরের বিকাশে প্রেম বিকাশ হয়, অনেক সাধক এ সময় মাতৃভাব বা সন্তানভাব অবলম্বন করেন। বিষ্ণু স্তরের বিকাশে তীব্রতম যোগলক্ষণ সম্পন্ন সাধক অত্যন্ত জটিলতার মধ্য দিয়া শিবস্তরে আসিতে পারেন। যে সব সাধক গণেশস্তরের মধ্য দিয়া শিবস্তরে আসেন তাঁহাদের জীবন একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু সকল সাধক ওই ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন না। যাঁহাদের অনুভূতি বিকাশের স্তর গণেশ স্তরেই আসে নাই তাঁহাদের নিকট সূর্য বিষ্ণু তো অনেক দূরের সাধনার বিষয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে গুরুশক্তি লইয়া। ভৈরব ভৈরবী সাধনার পথে যদি ওই ভাবের শক্তিমান গুরু ভাগ্যবশে পাওয়া যায় তবে উচ্চলক্ষ্যসম্পন্ন সাধকের জন্য এই পথে শিবস্তরের প্রতিষ্ঠা কঠিন নয়। কোন মানুষের জীবনলক্ষ্যই একটা স্তরে আটকাইয়া রাখিলে জীবন আরামপ্রদ হয় না। জীবনগতি সবগুলি অন্তর বিকাশের বিশিষ্টতাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ব্রহ্মচর্য। জীবনের মধ্যে প্রথম স্বাস্থ্য চাই, তাহার পর গণেশস্তরের কিছুটা শক্তি থাকা প্রয়োজন, এইরূপ সূর্যস্তরের স্নেহ ভালবাসা, বিষ্ণুস্তরের সুখ এবং সকলকে লইয়া গৃহস্থালী বা সমাজের নানা স্তরের লোক ও জীবজন্তুকে লইয়া সকল সুখের জীবন চাই, ইহার উপর ত্যাগ সাধনা অনাসক্তির স্বাদও থাকা চাই। ইহার উপর অসুর গুণ্ডা বর্বরকে দমন করিবার জন্য প্রচুর মনোবল এবং শক্তির অধিকারী হওয়া চাই। বাস্তবিক ইহাই ব্রহ্মচর্য জীবনের লক্ষ্য। যে ব্রহ্মচর্য জীবনকে এভাবে ফুটাইতে সাহায্য করে না, উহাকে ব্রহ্মচর্য বলা চলে না। ব্রহ্মের নিয়ম যে ভাবে এই চরাচর বিশ্বে এবং মানবের মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিকশিত আছে উহা জীবনে লইয়া আসাই ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য জীবনে আসল স্তর হইতেছে শিব স্তর, সে স্তরে অবস্থান করিয়া সাধক শিবের মতন ত্যাগ তপস্যা ও যোগীজীবন যাপন কর; ইহা ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য। আবার শিব যেমন কঠোর তপস্বিনী পার্বতীর সঙ্গে একটু অন্য প্রকারের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, উহাও ব্রহ্মচর্য জীবন। আবার শিব পার্বতী যেমন সংসারজীবন যাপন করিয়া সমাজকল্যাণের জন্য অসুরনাশক কার্তিক ও গণেশের মত সন্তান উৎপন্ন করিবার কারণ হইয়াছিলেন, তাহাও ব্রহ্মচর্য জীবন। কথিত আছে, শিব পার্বতীর ক্রমাগত ছয় মাস মিলনে একবার মাত্র ক্ষয় হইত।

গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণকে আমরা শক্তিস্তরের মহাত্মা বলিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য কথা যে শ্রীকৃষ্ণের সন্তানগণ প্রায় সকলেই অসুরভাবাপন্ন ছিলেন। শিব-পার্বতীর পুত্র কার্তিক-গণেশ বিখ্যাত অসুরনাশক দেবতা। ইহার কারণ, শিব পার্বতীকে শিবস্তরের তপস্যা এবং শক্তিস্তরের বিশেষতার উপাদানে গড়িয়া লইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীগণকে ওইভাবে গঠন করেন নাই। এ জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগণের শেষ জীবন উচ্চ সম্মানের অনুকূল হয় নাই। এ সব পৌরাণিক কথা লইয়া আমরা বেশী আলোচনা করিতে চাই না। ব্রহ্মচর্য

জীবনের লক্ষ্য কি? এবং কি নিয়মে উহা কৃতকৃত্য করিতে হইবে উহারই সামান্য আভাস দিবার জন্য আমরা এ সব কথার সামান্য আলোচনা করিলাম।

"বিন্দু ধারণং হি ব্রহ্মচর্যং।" "ঊর্দ্ধরেতো ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানবঃ।" "বিদ্যার্থং ব্রহ্মচারী স্যাৎ।" "মরণং বিন্দু পাতেন, জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।" "যদিচ্ছন্তং ব্রহ্মচর্যং চরন্তী -"

শিবস্তরের অনুভূতি আসিলে সাধক ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ত্রুটিহীন হইবে না। শিবস্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ একটুখানি কথা নয়। এইরূপ সিদ্ধযোগী কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এই স্তরের সাধকদের যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ক্রমবিকাশের পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করুন। সাধনা এবং জ্ঞান বিকাশের পথে যাঁহারা শিবস্তরে অনুভূতি এবং জীবনাদর্শের সন্ধান পাইয়াছেন, এমন সাধকই পূর্ণ ব্রহ্মচারী।

পনের ষোল বৎসর বয়সেই বালকের মন নানা রকম সাংসারিক চিন্তায় আবর্তিত হইতে থাকে। মনের মধ্যে যে কোন চিন্তা প্রবেশ করিলেই মস্তিষ্ক কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান হইতে রসস্রাব হইতে থাকে। আমরা এই রস ধারাকে চিন্তাপ্রসারিণী রস নাম দিলাম। মস্তিষ্কস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রের স্রাব ভিন্নও মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সোমরস সর্বদা ক্ষরিত হইতেছে। এই সোমধারা, জাগরণে নিদ্রায় ও সুষুপ্তিতেও প্রবাহমান আছে। সোমধারা প্রবাহিত না থাকিলে মনের ক্রিয়া চলিতেই পারে না। মন সোমধারাকে সর্বদা ব্যয় করে। সোমরসধারা স্নিগ্ধ ও শীতল, ইহা তৃপ্তিদায়ক, শান্তি ও জ্ঞানবর্ধক। ইহাকে জ্ঞানধারাও বলা যায়। মন লৌকিক চিন্তা ছাড়িয়া দিলে সোমরসধারাই যে জ্ঞানরূপা, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই সোমধারাই শিবের মস্তকে গঙ্গাদেবীর ধারা জানিতে হইবে।

নানা প্রকার চিন্তা করিয়া, মন মস্তিষ্ককে কর্মপ্রসারিণী রসে প্লাবিত করিয়া গরম করে। মন যদি চিন্তা ভাবনা ছাড়িয়া দেয়, তবে সোমরসের ক্ষয় হয় না। সোমধারা সেই সময় সমস্ত মনোময় ক্ষেত্রকে প্লাবিত ও শুদ্ধ করে এবং সেই রস ক্রমে মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকার নাড়ীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শরীরযন্ত্র এবং মনকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। শিবস্তরের সাধকগণ এই অমৃতধারায় সর্বদা প্লাবিত হইতে থাকেন। সাধারণ মানবের মন ক্রিয়াশীল হইয়া কর্মপ্রসারিণী রস মস্তিষ্কে বৃদ্ধি করে। এই রস সমস্ত শরীর ও স্নায়ুযন্ত্রকে গরম করে। এই গরম রসই শরীর ও মনকে ভোগ পথে উদ্বেলিত করে। ইহাই বিন্দুপাত নামে খ্যাত।

উন্নত স্তরের সাধকগণ প্রতিদিন বহুক্ষণ মনকে সাম্য রাখিয়া সোমরসকে ক্ষয় হইতে না দিয়া, শরীর ও মনকে স্নিগ্ধ করিবার স্বাভাবিক ক্রিয়াকে পুষ্ট করিতে যত্নশীল হন। এই স্নিগ্ধকরণকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইলে, শরীর ও মন শীতল হয় এবং কর্মপ্রসারিণী রস সোমরসের সঙ্গে পরিপাক হইয়া পুনঃ শরীরের পুষ্টির কার্যে নিয়োজিত হয়। ইহার ফলে, বিন্দুপাতের আর প্রয়োজন থাকে না। ইহাই ব্রহ্মচর্য।

মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ডের কথা 'ক্রমবিকাশে'র বহু স্থানে বলা হইয়াছে। এই শিবপিণ্ডই শিব; ইহারই আদর্শে মন্দিরে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়া থাকে। শিবপিণ্ড ধ্যান করিয়া

শিব পূজা করা কর্তব্য। এই শিবপিণ্ড হইতেছে, আমাদের শরীরযন্ত্রের সমস্ত প্রকার ক্রিয়া ও যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। শিবপিণ্ড স্নিগ্ধ থাকিলে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও স্নিগ্ধ থাকে। ইহা গরম হইলে সমস্ত শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শরীরের যন্ত্রাবলী গরম হয়। কর্মপ্রসারিণী রস শরীরকে গরম করে, কিন্তু সোমরস সমস্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করে। সোমরস প্রবাহে স্নিগ্ধ শরীর ও মনই ব্রহ্মচর্য। সন্ধিকাল এবং কর্মকাল পাশাপাশি বিদ্যমান। প্রাতঃ সন্ধিকালের পরই কর্মকাল আরম্ভ হয়, এভাবে মধ্যাহ্ন সন্ধিকালে উপস্থিত হইলেই, আবার সন্ধিকাল এবং সন্ধ্যোপাসনা, আবার কর্মকাল শেষ হইয়া সায়ং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হয়। এ ভাবে মধ্যরাত্রি আসে, সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিকাল বা উপাসনাকালও উপস্থিত হয়। কর্মের শেষে দুই দণ্ডকাল বিশ্রাম এবং শিবপিণ্ড ধ্যানে তন্ময় হইয়া সোমরস প্রবাহে মনকে নিবিষ্ট করিয়া শ্রান্ত মনকে স্নিগ্ধ করিতে হয়। এভাবে শ্রান্ত মনকে সোমরসে প্লাবিত করিলে শরীরে কর্মপ্রসারিণী রস নিজের উষ্ণতা বিসর্জন দেয়। সমস্ত দিনের মধ্যে প্রতিটি কর্মের ফাঁকে নিশ্চিন্তমনে সোমরস ধ্যান করিতে হয়। মনকে নিশ্চিন্তকরণই সোমরস ধ্যান জানিবে। ইহার ফলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে এবং শরীরের ক্ষয় বন্ধ হয়। প্রতিদিন যখনই অবসর পাইবে তখনই সোমরস প্রবাহকে সতেজ করিবার জন্য মনকে চিন্তাশূন্য করিবে।

ইহাই ব্রহ্মচর্যের সিদ্ধ অবস্থা। বলা প্রয়োজন, সোমরস প্রবাহ সাধক জীবনে আয়ত্ত হইলে, অন্তর প্রবাহে সাধকের মন এত বেশী তৃপ্ত থাকে যে তখন বহুদিন পর্যন্ত সাধক কর্ম সংস্রবে থাকিতে পারে না। গোলমাল, অশান্তি, কোলাহল, কর্মদায়িত্ব, লোকসঙ্গ, সব হইতেই সাধক শিবস্তর বিকাশের সময় আলগা হইয়া যান। চব্বিশ ঘণ্টা সাম্য মনে সাধক শিবধারা পান করিয়া তৃপ্ত থাকিতে চান। ইহা এক অপূর্ব অমৃত সাধনা। আহার, নিদ্রা ও কর্ম ব্যস্ততা সবই যেন স্তব্ধ।

মুখে একটু চিনি ফেলিয়া দাও, দেখিতে পাইবে উহাকে দ্রবীভূত করিবার জন্য মুখের মধ্যে চারিদিকেই রসস্রাব হইয়া ওই চিনিকে গলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ওই সব রস এবং চিনিটুকু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবে। সেখান হইতে এই রস শরীরে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করিবে। মনের মধ্যে কোন চিন্তা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, মস্তিষ্কস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে স্রাব নির্গত হয়। এই কর্মপ্রসারিণী রস শরীরকে গরম করে। মনের চিন্তা একদম বন্ধ করিয়া দাও, ফলে সোমরস মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রকে বিনা বাধায় স্নিগ্ধ শীতল ও অমৃতময় করিতে সময় ও সুযোগ পাইবে। ইহাই ব্রহ্মচর্য এবং ইহাই ক্ষয়হীন ব্রহ্মচর্য। এইরূপ ব্রহ্মচর্য জীবনের স্পর্শ পাইলে আর কর্ম ও সংসার জীবন লইয়া থাকা, বহুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। যতক্ষণ সাধক শক্তিস্তরের সন্ধান পাইবে না, ততক্ষণ আর সংসারও নাই, আশ্রমও নাই, কর্মও নাই। ইহাই শিবত্ব। এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত শিবই মদন ভস্ম করিয়াছিলেন। পাঁচ সাত শত বৎসরেও এইরূপ একটি যোগেশ্বর ব্রহ্মচারী শিব সমস্ত ভারতে হয় কি না, সন্দেহ আছে। ইহারই নাম "বিন্দু ধারণং হি ব্রহ্মচর্যং।"

আমার আঠাশ ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে আমি গুরুদেবের আশ্রম ছাড়িয়া দিলাম। জীবনের আর এক ভয়ঙ্কর অধ্যায় আরম্ভ হইল। এখন আমি যেখানে-সেখানেই থাকি, যাহা পাই আহার করি। মাথায় কর্মের দায়িত্ব নাই। কর্তব্যের বন্ধন নাই। মনের কোণে

কোণে পূর্ণতা ও শান্তি ভরিয়া রহিয়াছে। আমি কখনও গিরিগুহায়, কখনও গঙ্গাতটে, কখনও বৃক্ষতলে, কখনও খোলা পাহাড়ে, কখনও ভগ্ন মন্দিরের ধারে থাকি। আমি নাই, আমার নাই - একটা 'নাই নাই' বাহ্য চেতনা এবং পরিপূর্ণ আন্তর চেতনার মধ্যে আমার দিনরাত কাটে। পাহাড়ের আশ্রম এবং এই অবলম্বনহীন নিরালা জীবনের সীমারেখা আমি অতি সহজেই ভাগ করিতে পারি এবং বর্ণনা করিতে পারি।

জীবন বিকাশের এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমি অন্য অধ্যায়ে করিব। আমার জীবনের এই ভয়ঙ্কর অধ্যায়ও শেষ হইয়াছিল এবং প্রারব্ধ জড়িত আরও কঠিন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল, আমি সেই অধ্যায় সম্বন্ধেও কিছু কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব। এই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অধ্যায়ে সাধকের চরিত্র কিরূপ হয়, সে সম্বন্ধেও আমি আচার্য শঙ্করের লেখাকে অবলম্বন করিব এবং অতি সংক্ষেপে এখনকার মত আমি এ অধ্যায় শেষ করিব।

দুইটি প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন, পাহাড়ের আশ্রম আমার জীবনের এই অধ্যায়ের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। কিন্তু সেখানে কর্তব্য দায়িত্ব এবং কর্মের চাপ অতিক্রম করিয়া নিশ্চিন্ত জীবন গ্রহণ অসম্ভব ছিল। গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া প্রস্ফুটিত শিবস্তরের জীবন পরিচালনা আমার পক্ষে যথেষ্ট অসম্ভব ছিল। কিন্তু পাহাড় আশ্রমের মত তপোভূমিও আমার দুষ্প্রাপ্য হইবে, ইহাও আমি বুঝিতেছিলাম। পাহাড় আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি শ্রেষ্ঠ তপঃভূমি হারাইলাম। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম তপঃজীবনও পাইলাম। এই শ্রেষ্ঠতম তপঃজীবন কয়েক মাস পূর্ব হইতেই দেখা গিয়াছিল। আমি মা গঙ্গার কোলে থাকিয়া সব ভুলিব, ইহা আমার বহুদিনের অন্তরের বাসনা। পাহাড় আশ্রমে গঙ্গা নাই, আবার পাহাড় আশ্রমে কর্তব্যের বোঝা, দায়িত্বের জটিলতা এবং কর্মের চাপ হইতে মনকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব ছিল। যেখানে মা গঙ্গার প্রবাহ আছে, এবং কর্তব্য, দায়িত্ব ও কর্মের চাপ নাই, এইরূপ জীবনের সন্ধিক্ষণে আমি দাঁড়াইয়াছি। আমার এ জন্মের পবিত্র তপঃভূমিকে প্রণাম, আবার অন্য জন্মের তপঃভূমিকে ভূমি লুণ্ঠিত প্রণাম। আমি পাহাড় আশ্রমের আশেপাশে কয়েকমাস খুবই ঘুরিলাম। বহুদিন আমার আসনভূমিগুলিকে বারবার দেখিলাম এবং সত্যই একদিন একাকী মা গঙ্গার তটভূমিতে চলিয়া আসিলাম।

যখন পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি, উহার পূর্ব দুই বৎসর আমার পর পর দুইবার টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। প্রথমবারে আমি আমার প্লীহা যন্ত্রটিকে অত্যন্ত বৃহদাকারে প্রাপ্ত হইলাম। দ্বিতীয়বারে, আমি আমার মস্তিষ্ক যন্ত্রটিকে অত্যন্ত দুর্বল পাইলাম। প্রথম আঘাতে আমি শীত সহ্য করিবার শক্তি হারাইলাম, দ্বিতীয়বারের আঘাতে আমি রোদ সহ্য করিবার শক্তি নষ্ট করিলাম। মস্তিষ্কের এই দুর্বলতা এতটা গভীর হইয়াছিল যে, আমি একটু ঘুমিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের হাঁটুর নিম্নভাগ অসাড় হইয়া যাইত এবং হাত দুইখানা ও কনুইয়ের নিম্নভাগ অসাড় হইয়া থাকিত। কিন্তু আশ্চর্য জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুতবেগে এ সব স্থানে দুই তিন মিনিটেই চেতনার সঞ্চার হইত। আমার দুর্বল মস্তিষ্কটি এবং দুর্বল প্লীহা যন্ত্রটি আমার জীবনযুদ্ধের যে আরও একটি অধ্যায়ের সূচনা করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি থাকিতে পারে? "আমায় সকল রকমে কাঙাল করিলি, গর্ব করিতে চূর।" যদি মস্তিষ্ক ও প্লীহা আমাকে বিবশ না করিত তবে শিব অধ্যায়েই আমার জীবন শেষ হইতে পারিত।

মহামায়ার খেলার আরও এক অধ্যায় যে আরম্ভ হইবে, উহার বীজ আমার সঙ্গেই রহিল। দুইটি শত্রু যদি আমার সঙ্গী না হইত তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাচীন ভগ্ন মন্দির, বৃক্ষতল, গঙ্গাতট, গিরিগুহা, পর্বতচূড়া, নির্জন দিঘির ঘাট, উন্মুক্ত শ্মশানই আমার শেষদিন পর্যন্ত আসন ও শয়নের কেন্দ্রে পরিণত হইয়া থাকিত। প্লীহাটি ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য করে না। মস্তিষ্ক শুষ্ক আলো বহন করে না। দিনের বেলাটি কোন নির্জন মন্দিরের ভগ্ন কোণায় তন্ময় হইয়া থাকি। সন্ধ্যার পর আকাশের তলায় আশ্রয় লই। রাত্রিতে যতক্ষণ বৃষ্টির আবির্ভাব হয় না ততক্ষণ গঙ্গাতটে ধ্যানাবস্থায় কাটে। চুনার হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটই আমার প্রিয় স্থান। সমস্ত দিন কাহারও সঙ্গে হয়তো একটা কথাও হয় না। নিদ্রাও প্রায় ছিল না। সর্বদা আত্মধ্যান, মন যেন নড়িতেই চায় না। আত্মতৃপ্তির নেশাই জীবনের সব হইয়া গিয়াছে। যখনই যেখানে যাই, সেইখানেই দিনের রোদ ও রাত্রের বৃষ্টি হইতে শরীরটা রক্ষা করিবার মত একটা নির্জন দেবস্থান স্থির করি। ছোট তিনটি হাঁড়ি থাকিত, একটায় ডাল, একটায় চাল ও একটায় আটা থাকিত। কেহ কিছু রাখিয়া গেলে সেইটা সিদ্ধ বা পোড়াইয়া আহার ও শরীররক্ষা চলিত। রান্নার জন্য কাঠকয়লাই অবলম্বন ছিল, তাহাও কেহ না কেহ দিয়াই যাইত। যদি উহার অভাব হইত তবে শ্মশানের কয়লা সংগ্রহ করিতাম, উহাতেই ডাল চাল সিদ্ধ হইত, রুটি পোড়ানো যাইত। এইভাবে সুখের জীবন, আমার বহু বৎসর ভালই কাটিল। ভিক্ষা বা চাওয়া বা সুখদুঃখ বলা আমার কোনদিনই ছিল না, এখনও নাই। পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিয়া মা গঙ্গার তটে আসিলাম। প্রায় দুই তিন মাস অবস্থানের পর একদিন শেষরাত্রে গঙ্গাস্নান করিতে গঙ্গায় গিয়াছি, গঙ্গাস্নান করিয়া গামছা পরিধান করিয়া বস্ত্রখণ্ডটুকু ধৌত করিয়া কাঁধে রাখিয়া মা গঙ্গাকে প্রণাম করিতেছি, সেই সময় কাঁধ হইতে বস্ত্রটুকু গঙ্গায় পড়িয়া গেল। উহা আর পাওয়া গেল না। পরদিন স্নানান্তে ওই ভাবেই অন্য বস্ত্রখানা মা কাড়িয়া লইলেন। তৃতীয় দিন বিশেষ সতর্ক হইয়া স্নান করিলাম, বস্ত্রখানা কাচিয়া লইতেছি ঠিক সেই সময় কে যেন মায়ের স্রোতের আড়ালে দাঁড়াইয়া লইয়া গেলেন। পরিধানে ভিজা গামছা মাত্র রহিল, এ ভাবে আসনে ফিরিয়া আসিলাম, অনেকক্ষণ ভাবিলাম, এখন কি করি? পতিতপাবনী মা গঙ্গা কি আমাকে সন্ন্যাসী করিয়া দিলেন? রাত্রিকালে একখানা মোটা সুতীর চাদর গায়ে দিতাম। সেইখানাকে চিরিয়া তিনখানা করিলাম। কোনও প্রকারে হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঢাকিবার উপাদান হইল। এ ভাবে কয়েক দিন কাটিবার পর এক মহাশয়, জানিনা কাহার আদেশে, দুইখানা নূতন দশ-হাতি সাদা বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। উহা কাটিয়া এবার চারখানা হইল। মা বস্ত্র লইলেন, আবার দিলেন। কেন তিনি বস্ত্র কাড়িয়া লইলেন এবং দিলেন এবং কেন দিলেন তা তিনিই জানেন। মায়ের মনে কি শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার কথা ছিল? মায়ের নেওয়া দেওয়ার জন্য সত্যানন্দের কোনই বিষাদ বা উল্লাস ছিল না। বিবস্ত্র হইয়া থাকা আমার জীবনের নীতি ছিল না। আচার্য শঙ্কর শিবস্তোত্রে এক স্থানে বলিতেছেন -

> "ওঁ স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে,
> শান্তে স্বান্তপ্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।
> লিঙ্গং তদ্ ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি,

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥"

যাহা প্রণবময়, যাহা জীবনী শক্তিরূপে সুষুম্না মার্গে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ জীবাত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ। যাহা অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার, যাহা জ্ঞানময়, যাহা পরম ব্রহ্ম নামে খ্যাত। যাহা সমস্ত জীবে (ব্রহ্মনাড়ী রূপে) অবস্থিত, যাহা মঙ্গলময়, যাহা ব্রহ্ম নামে খ্যাত, এমন লিঙ্গকে আমি স্মরণ করি নাই। হে শিব, হে শিব, হে শিব, হে মহাদেব, হে শম্ভো, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

আমার পরম গুরু শ্রীশঙ্কর কি সত্যই এই শিবতত্ত্বকে জানিতেন না? তিনি না জানিলে এমন স্পষ্ট ভাবের বর্ণনাসহ শিবকে স্মরণ করিতে পারিতেন না। পরমগুরু আচার্য শঙ্কর আবার কি বলিতেছেন, উহাও উদ্ধৃত করিতেছি -

ওঁ নগ্নো নিঃসঙ্গ শুদ্ধ-ত্রিগুণ-বিবহিতো ধ্বস্ত মোহান্ধকারো।
নাসাগ্রে ন্যস্ত দৃষ্টি র্বিদিত জবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যাবস্থয়া ত্বাৎ বিগত কলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি।
ক্ষন্তব্যো মে ঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

আমি উলঙ্গ অবস্থায়, নিঃসঙ্গ হইয়া এবং ত্রিগুণের প্রভাব হইতে বিশেষভাবে রহিত অবস্থায়, শুদ্ধ আত্মরূপে নিমগ্ন থাকিয়া, নাসাগ্রে ন্যস্ত দৃষ্টি লইয়া, শঙ্কর প্রতিভা দর্শন করি নাই। আমি উন্মনা হইয়া, কালির কলুষ হইতে বিমুক্ত শঙ্করকে স্মরণ করি নাই। অতএব হে শিব, হে শিব, হে শিব, হে মঙ্গলময় শিব, হে মহাদেব, হে শম্ভো! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

এখানেও আচার্য শঙ্কর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য স্তরে বিচরণ করিয়া শিবের চরণে শরণাগতি ও নম্রতা জ্ঞাপন করিয়া নিজেই শঙ্করতুল্য মহিমান্বিত হইতেছেন। ইহাই শিবস্তরের ব্রহ্মচর্য। এবং ইহা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য জীবন। পতিতপাবনী মা গঙ্গা বস্ত্র লইলেন। যদি না দিতেন, তবে কি আমি বস্ত্রের জন্য ভিক্ষা করিতাম? মা কি আমাকে সত্যই শিব করিলেন? মা গঙ্গা কি আমার সেই গর্ভধারিণী মা, যিনি আমার এই "ছেলে যোগী হইবে বলিতেন"।

প্রারব্ধজনিত কারণে মহাযোগী শিব পার্বতীকে বিবাহ করেন এবং কিভাবে শক্তিস্তরের ব্রহ্মচর্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পার্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করেন সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কথা আমরা বলিয়াছি। আমাদের শক্তিস্তরের ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কারণ, ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীস্ত্রী মিলনের জীবনে দুইটা স্তর আছে। উহার একটি হইতেছে মনোময় কোষের জগৎ এবং অন্যটি হইতেছে, বিজ্ঞানময় কোষের জগৎ। বিজ্ঞানময় কোষ চিরশুদ্ধ চিরপবিত্র চিরমহান; কিন্তু মনোময় কোষ সংঘাতময়; সংঘাতময় বলিয়াই স্ত্রী ও স্বামীর মিলিত জীবনে জটিলতা দেখা দেয়। বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিষ্ঠিত স্বামী শিবতুল্য মহাত্মা। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দময় বিজ্ঞান নর এবং নারীর উভয়ের পবিত্র স্তর; কিন্তু মনোময় জগৎ অর্থাৎ মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার জগতের বিচারে দুইজনে ভেদ থাকিবেই। শিব পঞ্চবক্ত্র, মহান আত্মা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দকে কেন্দ্র করিয়াই

আছেন। এজন্যই তিনি পঞ্চবক্ত্র শিব। বিজ্ঞানের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত স্বামীকে কেন্দ্র করিয়া একনিষ্ঠ সতীর মিলন জীবন নিশ্চয়ই শক্তিশালী ব্রহ্মচর্য জীবন। ইহাতে সন্দেহ নাই। শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত শিবের সঙ্গে পার্বতীর মিলন জীবনে সৃষ্টি এবং অসৃষ্টি দুইই থাকিতে পারে। যদি বিশ্বকল্যাণের জন্য অর্থাৎ অসুর ধ্বংসের জন্য গণেশ ও কার্তিকের মত সন্তান প্রয়োজন হয়, তবে সেটাও ব্রহ্মচর্য জীবন। আবার শাস্ত্রে যেমন কথিত আছে যে শিব পার্বতীর মিলন জীবনে, ছয় মাসেও ক্ষয় হইত না, সেটাও সত্য কথা এবং সেটাও শক্তি সাধনা এবং ব্রহ্মচর্য জীবন। যোগী যোগিনী, ভৈরব ভৈরবীর কথা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। আমাদের মনে হয়, শিবস্তরের তপস্বীর শক্তিস্তর প্রকাশের সময়, প্রারব্ধ বশে, এইরূপ জীবন আসিতে পারে। এই সময়, ইহার আলোচনা কোনই কাজ দিবে না; কাজেই ব্রহ্মচর্য জীবনের এই অত্যুচ্চ জীবনের কথা আর আলোচনা করা ঠিকও হইবে না। ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রথম কথা ‘‘নর নারী দূর দূর থাকিবেন’’। ব্রহ্মচর্য জীবনের শেষ কথা প্রারব্ধের প্রভাবে মিলন জীবনেও ঊর্ধ্বরেতাই থাকিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পাহাড়ের আশ্রমে গোপালন

চুনার আনন্দাশ্রমে গোপালনের ব্যবস্থা গুরুদেব করিলেন। প্রথমে দুইটি চাষের বলদ আসিল। সেই সঙ্গে আসিল একটি গোবৎস্যা। নাম তাহার কৃষ্ণা। কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণা এবং কপালে তাহার সাদা টিকুলী। অতীব সুলক্ষণা এবং আকর্ষণ শক্তিসম্পন্না। যতক্ষণ চক্ষের সামনে থাকিবে, ততক্ষণ দৃষ্টি ফিরানো যায় না। দেখিতেই ইচ্ছা হয়। সূর্যানন্দজী একে চুনার কাজী হাউস হইতে নিলামে পাঁচ টাকায় খরিদ করিয়া আশ্রমে দান করিয়াছেন। কাজী হাউসগুলি (খোঁয়াড়) গোবংশকে সস্তায় কসাইয়ের হাতে ধরাইয়া দিবার এক সুন্দর ব্যবস্থা। এক একটা কেন্দ্রে শত শত গোবংশ একত্র হয় এবং উহাদিগকে শেষকালে কসাইয়ের হাতে নামমাত্র মূল্যে তুলিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন দয়াবান হিন্দু কখনও কখনও ঐ নিলাম-লীলায় যোগদান করেন এবং যদি পারেন মৃত্যুপথযাত্রী দুই-একটিকে রক্ষা করিবার জন্য নিলামে ডাকিতে চেষ্টা করেন। কসাইরা যদি বুঝিতে পারে, দয়াবানরা অগ্রসর হইয়াছে, তখন তাহারা নিলামের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সংঘশক্তি প্রয়োগ করে। একটা জাতের ক্ষাত্রশক্তি যখন অন্য একটা শক্তির নিকট পরাজিত হয় তখন পরাজিতের ধর্ম কর্ম ও উচ্চ সভ্যতার মূলে নিত্য কিরূপ সাংঘাতিক আঘাত ও অপমান আসে, উহার সীমা করা যায় না। শুনিয়াছি, খোঁয়াড় ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের প্রচুর আয় হয়। সমস্ত ভারতে লক্ষ লক্ষ খোঁয়াড় আছে। আমার মনে হয় কসাইকে পালন করিয়া গোবংশ ধ্বংস করিবার এইরূপ বর্বরসুলভ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

সূর্যানন্দজী চুনার ঘাটের পুরোহিত। তিনি বিবাহ করেন নাই। ঘাটের ধর্ম ব্যবসায় করিতেন এবং সাধন ভজন করিতেন। তিনি ঘাটেই শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণার জীবনলীলা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। গাভী হইবার পূর্বেই শুষ্ক কূপে পড়িয়া কৃষ্ণা মারা যায়। কেহই উহা জানিতে পারে নাই। হঠাৎ কৃষ্ণাকে পাওয়া গেল না, মৃত্যুর কয়েকদিন পরে জানা গেল সে শুষ্ক কূপে জীবনলীলা ত্যাগ করিয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে হয়তো এক যুগে অনেক লোক ছিল, কারণ সর্বত্রই জঙ্গলের মধ্যে ঐরূপ কূপ রহিয়াছে।

কৃষ্ণার পরই লালী আসিল। লালী সাদা রঙের ছোট গরু। সঙ্গে উহার বাচ্চা আছে। সে সামান্য দুধ দিত। আমিই দুইতাম। আমার উপর লালীর এত গভীর স্নেহ ছিল যে তাহাকে দুইবার সময় আর বাচ্চার প্রয়োজন হইত না। তাহার বাঁটে হাত দিলেই সে দাঁড়াইয়া থাকিত। নাকে হিং ধ্বনি করিয়া স্নেহ শ্বাস ছাড়িত। আমি এমন স্নেহশীলা গাভী আর দেখি নাই। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর কাটিল। লালী অনেক বাচ্চা একে একে প্রসব করিল।

গুরুদেব গোপালনের ব্যবস্থা করিলেন, ইহা স্বাভাবিক। কারণ ঋষিদের আশ্রমে গোরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। গোচারণ এবং গোরক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া ঋষিগণ শিষ্যদিগকে পরীক্ষাও করিতেন। এই গোধনকে কেন্দ্র করিয়াই মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে মহারাজ বিশ্বামিত্রের মতভেদ হইয়াছিল। যাহাতে বিশ্বামিত্রের পরাজয় এবং বিশ্বামিত্রের তপস্যার জীবন গ্রহণের বিস্তারিত ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। শ্রীকৃষ্ণও বাল্যকালে রাখালই ছিলেন। তবে তিনি কিন্তু গোয়ালা হইয়া যান নাই। তাঁহার বাল্যজীবনেও অসুর নাশ ও শক্তিবাদীয় প্রতিভা ছিল। তিনি বাল্যকালেই অনেক অসুর নিধন করিয়াছিলেন। গোপালন অধ্যায়ে তাঁহার শরীর এবং মস্তিষ্ক পুষ্টির প্রচুর উপাদান তাঁহার খাদ্যে স্থান পাইয়াছিল। দুধ দধি ঘৃত মাখন তাঁহার বাল্যের প্রিয় খাদ্য ছিল। গোদুগ্ধ জ্ঞানবর্ধক উপাদেয় খাদ্য। মানুষের জ্ঞান এবং শক্তিদাতা খাদ্যের মধ্যে গোদুগ্ধই শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করিয়াছে। গুরুদেবের গোপালন পরিকল্পনা নানা ভাবেই অনুকরণীয় এবং রক্ষণীয় আদর্শ - ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনে অনেক স্নেহ ও ভালবাসার কথা আছে। স্নেহ ও ভালবাসার প্রভাব মনে না থাকিলে পালন কার্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণের গোপালন স্নেহ ভালবাসা দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

পাহাড়ের আশ্রমে গোপালন ভয়ঙ্কর সমস্যা। আশ্রমের অনেক জমি। কিন্তু ওই পাহাড়ে ছয় মাসের অধিক কাল ঘাসের চিহ্নও থাকে না। মা বসুমতী গ্রীষ্মের উত্তাপে কালো হইয়া যান। পাহাড়টা ছয় মাস ধরিয়া ঘাসহীন এবং জলহীন অবস্থায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। জলের জন্য বন্য পশুরা যেখানে ঝরণা আছে, উহার নিকট চলিয়া আসে। আনন্দাশ্রমের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে একটা পাহাড়ী ছোট ঝরণা আছে। উহা দুর্গম স্থান, গরু মহিষাদি বৃহৎ পশুরা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। ছাগল ভেড়া এবং বন্য পশুরা সেখানে অনায়াসেই প্রবেশ করে। ঝরণার জল অতীব স্বচ্ছ এবং শীতল। আমি অনেক সময় সেই ঝরণার ধারে বসিয়া ধ্যানাদি করিয়াছি। আবার বন্য পশুর আবির্ভাব বা অবস্থান লক্ষ্য করিয়া চলিয়াও আসিয়াছি। পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানে পশুদের পানীয় জল পাওয়া কোন সমস্যাই নহে। কিন্তু সেখানে গরুর প্রবেশ অসম্ভব।

গুরুদেবের গোপালন সমস্যার সবটাই আমার ঘাড়ে চাপিল। গ্রীষ্মকালে একটা গরু বেশ বড় ঘড়ার চার ঘড়া জল পান করিবেই। কুড়ি বাইশটা গরুকে ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া দেওয়া ভয়ঙ্কর সমস্যা। আমি মাথা খাটাইয়া পাথর, লোহা ও বনের লতার মিশ্রণে জল তুলিবার একটা কল প্রস্তুত করিলাম। উহা পাঁচ মিনিট চালাইলে বড় ঘড়ার পনের ঘড়া (প্রায় পঞ্চাশ গ্যালন) জল পাওয়া যাইত। হাতে-গড়া কল, প্রতি মাসেই মেরামত করিতে হইত। তাহা হইলেও বহু বৎসর কাজ চলিল।

একবার বর্ষার আরম্ভে গুরুদেব হৃষীকেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার হৃষীকেশে তিনি কয়েকটি সাধু শিষ্য লইয়াছেন। তাঁহারা রাসেশ্বর, ভবেশ্বর, সুরেশ্বর প্রভৃতি। তিনি আশ্রমের কাজ কিছুটা ভাগ করিয়া দিলেন। ভবেশ্বরজী গোশালা দেখিবেন। গোশালার ভার গ্রহণ করিবার দু-চার দিনের মধ্যেই তিনি রাখালের কাজ হইতে চাকরটিকে প্রহারে বিতাড়ণ করিলেন। এবার গরুগুলিকে তিনি প্রহারের মারফৎ বশীভূত করিবেন, স্থির করিলেন। প্রহারের ভয়ে ভবেশ্বরজীকে দেখিলেই গরুগুলি দৌড়াইতে থাকে। এদিক ওদিক করিতে থাকে। কি অপরাধে জানি না, ধবলীকে বাঁধিয়া

লইয়া ভবেশ্বরজী ভয়ঙ্কর প্রহার করিলেন। একটা আস্ত তালের ডালকে গাভীটির পিঠে ছাতু করিয়া দিলেন, গুরুদেব সবই দেখিলেন। গাভীটি জিহ্বা বাহির করিয়া শুইয়া পড়িল। আমি দেখিলাম, প্রতিবাদ করিলেই একটা ছোটলোকী ঝগড়ার সৃষ্টি করিবেন, বুঝিলাম। দশ-বারো দিন বাদ গরুটার সমস্তটা পিঠ হইতে একটা শুষ্ক চামড়া খসিয়া পড়িল। গুরুদেব উহাও দেখিলেন। প্রহারের ভয়ে, চাকর নাই, গরুগুলি মার খাইয়া খাইয়া এমন হইয়াছে যে ভবেশ্বরজীকে দেখিলেই এদিক ওদিক পালায় ও ছটফট করে। গুরুদেব দোতলায় বসিয়া সবই দেখেন। একদিন আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন গরুগুলিকে সংযত করিতে পারি কিনা।

আমি বলিলাম, হ্যাঁ পারি। গুরুদেব বলিলেন, তবে করিয়া দাও। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া লালীকে ডাকিলাম এবং এক পাহাড়ী হিন্দী ভাষায় বলিলাম, সব এসো। ধীরে ধীরে সকলেই আমার দিকে আসিল। আমি বলিলাম, তোমরা আমার সামনে ক্ষেতের ঘাস খাও, আমি দেখিব। তাহারা প্রায় দু ঘণ্টা ধরিয়া ওই ক্ষেতের চারিটি আলের মধ্যেই রহিল এবং ঘাস খাইল। গুরুদেব সবই দেখিলেন। ইতিমধ্যে ভবেশ্বরজী গুরুদেবকে বলিলেন, দেখিলেন তো বাবা, সত্যানন্দজী বশীকরণ জানেন। এই পাহাড়ের জীব জন্তু মানুষ এবং পশু সবই ওঁর বশীভূত। গুরুদেব কিছুই বলিলেন না।

ভবেশ্বরজী পূর্বে পুলিশে কনেস্টবলের চাকুরী করিতেন, অনেকদিন চাকুরীর পর সাধু হইয়াছেন। তাঁহার মনের সাধ, তিনি আনন্দাশ্রমটার কর্তৃত্ব করিবেন এবং আমাকে যে কোন ফিকিরে সরাইবেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। আমি আবাল্য কর্মী প্রকৃতির মানুষ। কর্ম ত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারিব কিনা, সেটা বেশ সমস্যা। প্রতিপদে ভবেশ্বরজী গোলমাল সৃষ্টি করেন, আমার পক্ষে এ ভাবে আশ্রম পরিচালনা অসম্ভব। আমার উপর যতই অত্যাচার হউক আমি কখনও গুরুদেবকে কাহারও বিরুদ্ধে কিছুই বলিতাম না। হাজার জটিলতার মধ্যে কাজ চালাইয়া যাওয়াই আমার নীতি ছিল।

গোপালনকে কেন্দ্র করিয়া আমার জীবনে অনেক বিচিত্র ঘটনা আছে। অনেক করুণ কথা, অনেক ভয়ঙ্কর কথাও আছে। ললিতার প্রথম বাচ্চা হইয়াছে, দুই একদিন মাত্র। এর মধ্যেই তাহার বাচ্চাকে বন্যজন্তু হরণ করিয়াছে। সকাল বেলা গোশালায় প্রবেশ করিয়াই দেখা গেল, বাচ্চাটি নাই। ললিতা তো আমাকে ঘেরিয়া ধরিল, বাচ্চার দাবী ও আর্তনাদ, আমি সবই বুঝিলাম, কিন্তু আমি বাচ্চা কোথায় পাই? সে আহার ত্যাগ করিল, সর্বদা আমার পিছনে পিছনে আর্তনাদ এবং দাবী জানাইতে লাগিল। জঙ্গলের মধ্যে মাঠে অনেক গরু চরিয়া বেড়ায়, সে এক একবার সেইসব দলে প্রবেশ করে, বাচ্চার খোঁজ করে এবং আমার নিকট অতি দ্রুত চলিয়া আসে, ওই একই দাবী, একই রকম আর্তনাদ। ললিতা লাল রঙের ছোট গাভী। সে এখানেই জন্মিয়াছে এবং এখানেই গাভী হইয়াছে। সে অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে ঘাড় কাত করিয়া সামনে দাঁড়ায়, আমার কাছে বাচ্চার জন্য আর্তনাদ এবং দাবী জানায়। আমি তাহার গায়ে হাত বুলাই, মাথায় স্নেহ দেখাই। কিন্তু সে তাহা চায় না, উপেক্ষা করে। জানি না, ঈশ্বর মায়ের প্রাণে কত স্নেহ ঢালিয়াছেন। সেই স্নেহের তৃপ্তির জন্য সন্তানও দিয়াছেন। ঈশ্বরের দেওয়া সেই স্নেহের গভীর ক্ষুধাকে পূর্ণ করিবার আমার সাধ্য নাই। এখানে, কলিকাতায় মৃত বাচ্চাকে ফেলিয়া দিয়াই গোয়ালারা গোয়াবাগানে যায় এবং নূতন বাচ্চা খরিদ করিয়া আনিয়া

গাভীর স্নেহরস পুষ্টির ব্যবস্থা করে। গাভীও শান্ত হয়, গোয়ালাও লাভবান হয়। কিন্তু পাহাড়ের আশ্রমে অবস্থান কালে আমার এতটা বুদ্ধির উন্মেষ হয় নাই। তিন চার মাস বাদ ললিতা গর্ভবতী হইল এবং সেইদিনই তাহার আর্তনাদ শেষ হইল। বনের পশু, সেও বুঝিল, এবার সে আবার মা হইবে, সন্তান পাইবে। সে আশায় সে আর্তনাদ ত্যাগ করিল।

গরু জাতের অদ্ভুত শক্তিবাদ বৃত্তি আমি অনেক দেখিয়াছি। তখন গ্রীষ্মকাল চরম অবস্থায় আসিয়াছে। সেদিন কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর অন্ধকার রাত। গরুগুলি সবই বাহিরে খোলা আকাশ তলে। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই বৃষ্টি আরম্ভ হইবে। দুইটি মাত্র গাভী ছুটা অবস্থায় আছে, আর সব বাঁধা আছে। সাধারণতঃ গরুগুলিকে ছুটাই রাখিতে হয়। কারণ অনেক সময়ই বন্য জন্তুর আক্রমণে গরু মারা যাইতে পারে। এবং তাহাতে গো হত্যার পাপ হয়। গরু বাঁধিয়া না রাখারও অসুবিধা আছে। ইহার ফলে বন্য জন্তুর আক্রমণ হইলে গরুরা এদিক ওদিক ছুটিতে থাকে। সেই সময় বন্য জন্তু উহাদিগকে আক্রমণ করিতে সুবিধা পায় এবং হত্যা করে। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রতিদিনই বন্য জন্তু আসে। গরুরা সব মাঠে শুইয়া আছে। আমি নিকটেই একটা খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়াছি। আমার নিকটে খুব ছোট আলোতে একটা হারিকেন বাতি জ্বলিতেছে, রাত্রি প্রায় বারটা হইতে একটা হইবে। পূর্ব দিক হইতে একটা বন্য জন্তু আনন্দে ও উল্লাসে চিৎকার করিয়াছে। আমি খাটিয়ার উপর বসিয়াই বাতির আলো জোর করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম একটা গরুকে কোন জন্তু একটু একটু করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতেছে। অন্ধকারের জন্য জন্তুটিকে দেখা যাইতেছে না। গরুটিরও পেট মাত্র দেখা যাইতেছিল। আমি নানা রকম ধমকাইলাম, চিৎকার করিলাম। জন্তু মানিল না, সে টানিয়াই চলিয়াছে। খালি টিনে আওয়াজ করিয়া নানা রকমে ধমকাইতে লাগিলাম। এ ভাবে আট দশ সেকেণ্ড কাটিল। তখন আমি ডান হাতে বাঁশের টুকরা এবং বাম হাতে হ্যারিকেনটি লইয়া জন্তুটির দিকে অগ্রসর হইলাম এবং জন্তুটিকে হিন্দী ভাষায় গালি দিতে লাগিলাম। আমি একটু অগ্রসর হইবা মাত্র দুইটি গাভী আমার দুই দিকে আমার শরীরের সঙ্গে গা লাগাইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা মাথা কাত করিয়া শিঙগুলিতে মারিবার উপক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাগুলিকে অতি দ্রুত মাটিতে আঘাত করিতে করিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইল। আমি জন্তুটির নিকটে আসিতেই জন্তুটি গরুটাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি আহত গাভীর গায়ে হাত দিলাম। গরু দুইটি আমাদিগকে ঘেরিয়া অতি দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল, যাহাতে জন্তু পুনঃ নিকটস্থ হইতে না পারে। এ জন্য গরু দুইটি ওইরূপ করিতে লাগিল। আমি বাঁশ ও হ্যারিকেন মাটিতে রাখিয়া মৃতপ্রায় গরুটির নাকে হাত দিলাম। গরুটির দম বন্ধ ছিল, বায়ুতে তাহার পেটটি পরিপূর্ণ ছিল। সে অত্যন্ত জোরে এক দীর্ঘ শব্দে সমস্ত বায়ু ত্যাগ করিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি গায়ে হাত বুলাইতে ছিলাম। সঙ্গের গাভী দুইটি তাহাকে লেহন করিতে লাগিল। এবং তাহাকে লেহন করিতে করিতে অন্যান্য গরুগুলির মধ্যে লইয়া গেল। সকলে আহত গরুটিকে পাইয়া উল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল এবং গরুটিকে লেহন করিতে লাগিল। সেই রাত্রে আরও তিন বার বন্য জন্তুটি গরুগুলিকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তিন বারই বন্ধনহীনা গাভী দুইটি চক্রাকারে দৌড়াইয়া সমস্তগুলি গরুকে রক্ষা করিয়াছিল। ভোর

হইতেই আমি আহত গাভীটির সেবায় মন দিলাম। তাহার গলার অংশ ফুলিয়া একটা কলাগাছের মতন হইয়াছে, তাহার শ্বাসযন্ত্র ভিতরের দিকে প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে খুব ধীরে ও কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস করিতেছিল। আমি আগুন জ্বালিয়া পাথর গরম করিয়া ওর গলায় অনেকক্ষণ সেঁক দিলাম। কাপড় ও চটের সাহায্যে তাহার গলা বাঁধিয়া দিলাম। তাহাকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন করাইলাম। সে তিন চারদিন পরে অনেক সুস্থ হইল, জলপান করিল। প্রায় এক সপ্তাহ মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইল।

এই ঘটনার পরের দিন অমাবস্যার নিশাকাল। আমি প্রায় সমস্ত রাত্রি মায়ের পূজা করিব। প্রতি অমাবস্যায় আমি সমস্ত রাত্রি কালীপূজা করিতাম এবং ঊষাকালে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতাম। সেদিন গরুগুলিকে রাত্রিকালে একাকী রাখা যাইতেই পারে না। সেদিন বন্যজন্তু নিশ্চয়ই হামলা করিবে। আমি দুইজন লোক ঠিক করিলাম, তাহারা গরুগুলির সঙ্গে থাকিল। খুব জোর করিয়া দুইটা আলো জ্বালিয়া দিলাম। বেশ নিশ্চিন্ত মনে মায়ের পূজা করিলাম। তখন মনে হইত, চিরজীবনই মায়ের নিশাপূজা করিব। পূজাশেষে মায়ের সীমাহীন স্নেহে আমার শরীর মন অমৃতময় হইয়া যাইত। সমস্ত দিন গাধার মত খাটুনীতেও আমার কোন অবসাদ আসিত না। ইহার কারণ, সন্ধ্যাপূজা ধ্যান জপ ও যোগাদিতে আমি প্রচুর অমৃতের সন্ধান পাইতাম। আমি আর বেশী দিন নিশাপূজা করিতে পারি নাই। ইহার কারণ কয়েক মাসের মধ্যেই ভবেশ্বরজীকে গুরুদেব আশ্রমে আনিলেন। তাঁহার আসিবার পরও তিন চার মাস নিশাপূজা হইয়াছিল। তিনি বায়না করিলেন, আমার সঙ্গে বসিয়া নিশাপূজা করিবেন। আমি তাঁহাকে নিজের পূজা নিজে করিতে বলিলাম। তিনি শুনিলেন না। তিন চারটা নিশাপূজা তাঁহাকে লইয়াই করিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নিশাপূজা আর অমৃতের সন্ধান দিতেছিল না। পূজায় বিঘ্ন করিয়া ধ্যান জপ শান্তি নষ্ট করিবার লক্ষ্যেই তিনি নিশাপূজায় যোগ দিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এ ভাবে পূজার কোনই মানে হয় না। আপনি যদি পূজায় যোগ দিবার জন্য বায়না ধরেন তবে আমি আর নিশাপূজা করিব না। বরং আপনিই নিশাপূজা করুন। তিনি পুলিশী চালেই বলিলেন, আপনি না পূজা করিলে আমিও করিব না। বন্য জন্তুর উপদ্রব আমার নিশাপূজার আনন্দ কাড়িয়া লইতে পারে নাই; কিন্তু অবস্থার বিপর্যয়ের সামনে আমি নিজেই নিশাপূজা বন্ধ করিলাম।

যে রাত্রিতে বন্য জন্তুর আক্রমণের সামনে আমি গোরক্ষায় বন্য জন্তুর সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলাম, ঠিক উহার পনের দিন পূর্বে, গো-রক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া রাত্রিকালে আমি এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। বন্ধনহীনা গাভী দুইটি মধ্য রাত্রিতে দল হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। উহাদের এই কার্য বিপজ্জনক; কারণ বন্য জন্তুরা তাহাদিগকে একক পাইলে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে। আমি জ্যোৎস্না রাত্রির আলোতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে অগ্রসর হইলাম। কিছুটা অগ্রসর হইয়াছি, আর সামনেই এক বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে আমার মস্তকে দংশন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সে অতি দীর্ঘ বিষধর। আমার মস্তকের উপরেও তাহার ফণাটি প্রায় এক হাত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তখনও তাহার শরীরের অর্ধ অংশ জমির উপর রহিয়াছে। তাহার ফণা হইতে আমি মাত্র তিন হাত দূরে আছি। আমি মুহূর্তে তাহার মুখ ও চক্ষুর দিকে তাকাইলাম এবং এক পা পেছনে ফেলিলাম। সে

তৎক্ষণাৎ জোর ফোঁস শব্দ করিয়া ফণা নামাইল। আমি তাহার দিব্য উজ্জ্বল কান্তিটি চন্দ্রালোকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম। সে হয়তো আমাকে স্নেহ করিয়াছে অথবা ক্ষমা করিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাকে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া অবলোকন করিতেছি, সে উহা মোটেই পছন্দ করিল না। সে আবার দাঁড়াইল ও ফণা বিস্তার করিল। এবার তাহার ফণা আড়াই ফুটের ঊর্ধ্বে উঠিল না। আমি পাঁচ সাত পা পিছনে আসিলাম এবং সুন্দর দীপ্তিময় শরীরটি দেখিতে লাগিলাম। আমি দাঁড়াইয়া আছি, ইহা সে আবার পছন্দ করিল না। সে আবার ফণা তুলিল। এবার তাহার ফণাটি দেড় ফুটের ঊর্ধ্বে উঠিল না। আমি দেখিলাম বিষধরকে আর ব্যস্ত করা ঠিক নহে, আমি ধীরে ধীরে পেছনে হাঁটিয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, সে ফণা নামাইয়াছে। তাহার পর আর তাহাকে দেখা গেল না। সে কোন্ জাতীয় সর্প ইহা আমার জানিবার খুবই ইচ্ছা ছিল। আমি অনেক অভিজ্ঞ লোককে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সকলেই বলিয়াছে "শঙ্খচূড়"। সর্প সম্বন্ধে বই পুস্তক এবং প্রবন্ধ পাঠে এবং ফটোর ভঙ্গিমায় আমিও বুঝিলাম সে "শঙ্খচূড়"। সে আমার অন্তরের দেবতা, কি সাক্ষাৎ যম, ইহা আমি জানি না। আমি তাহাকে খুবই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি তাহাকে ভয়ও পাই নাই। এমন তেজপূর্ণ অথচ স্নিগ্ধমূর্তিকে হয়তো আমার অন্তর বালকোচিত সরল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। শুনিয়াছি, অনেক সময় বালকেরা সরল বিশ্বাসে বিষধরকে ধরিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। আবার ইহাও শুনিয়াছি, বিষধর কোন কোন বালকের সরল স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া বার বার আসিয়া বালকের সঙ্গে খেলা করিয়াছে।

আমি সর্প ও বন্য জন্তুর কথা সবই গুরুদেবকে পত্রে জানাইলাম। তিনি হৃষীকেশ হইতে লিখিলেন, "তুমি যোগ দীক্ষিত, এ সব ঘটনা যোগ দীক্ষার বিভূতি। শিব তোমাকে পরীক্ষা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক।" যে দুইটি গাভীকে কেন্দ্র করিয়া আমি বিষধরের ফণার সীমার মধ্যে গিয়াছিলাম, ঠিক সেই গাভী দুইটিই আমাকে বন্য জন্তুর সম্মুখে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এই দুইটি ঘটনার কথা আমি পাহাড়ী পরিচিত কয়েকজন বৃদ্ধ গোয়ালাকে বলিয়াছিলাম - তাহারা বলিতেছিল, "বিষধর স্বয়ং শঙ্খচূড়। সে তোমাকে সাধু বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। শঙ্খচূড় কাহাকেও ছাড়ে না। সে অতিক্রোধী বিষধর।" আর বন্য জন্তুর কথায় তাহারা বলিল, "এমন কাজ করিতে নাই। আমরা দুঃখিত যে তুমি বার টাকার গাভীর জন্য জীবন দিতে গিয়াছিলে। সে তোমাকে একটা থাপ্পড় মারিলে তোমার জীবন থাকিত না। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। সামনে পাকা বাড়ি, তুমি উহাতে প্রবেশ না করিয়া বন্য জন্তুর সামনে গিয়া দাঁড়াইলে? একটু হ্যারিকেনের আলো ও এক টুকরো বাঁশের মধ্যে কি শক্তি থাকিতে পারে যে তুমি রক্ষা পাইতে পার?" আমি বলিলাম, পাকা ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিব এবং বন্য জন্তুরা উল্লাসে চক্ষের সামনে গোশালার গরু ভক্ষণ করিবে, ইহা দর্শন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ইহা ভাবিতেও পারি না।

আমি নিত্য সূর্যোদয়ের পূর্বে গোশালায় প্রবেশ করিতাম। মাঝে মাঝে গরুগুলি আমাকে দুধ দুইবার সময় পেছন হইতে লেহন করিত। প্রায় সবাই একটু একটু লেহন করিয়া সরিয়া যাইত। গুরুদেব দোতলায় দাঁড়াইয়া ইহা একদিন দেখিয়াছেন। আমি গাভী

দোহন করিয়া টাটকা দুধ গুরুদেবকে পান করিতে দিতাম। আমি দুধ গ্লাসে লইয়া দোতলায় উঠিয়াছি তখন গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "গরুগুলি তোমাকে রোজই লেহন করে?" আমি বলিলাম, না। মাঝে মাঝে গাই দুইবার সময় আমাকে অসহায় পাইয়া ঐরূপ করে। তিনি বলিলেন, "তোমাকে পশুরা এত ভালবাসে, সেটার দিকে নজর না দিয়া তুমি মানুষকে ভালবাসিয়া ক্ষতবিক্ষত হও, ইহা ভাবিতে আমি কষ্ট পাই।" আমি কোন উত্তর দিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম, ভালবাসা কি ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিষয়।

তখন খুব বর্ষাকাল। পাহাড়খানা সবুজ রঙের শাড়ি পরিধান করিয়াছে। মাঝে মাঝে বনরাজি, মাঝে মাঝে পাহাড়ের উচ্চ অঙ্গটি আবার সমতল ক্ষেত্রেরও অভাব নাই। আমি প্রায় আটটায় গুরুদেবের গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমার ছাদে যাইতে ইচ্ছা হয়। তুমি যদি আমাকে লইয়া যাও তবে যাওয়া যায়। তিনি হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়াছেন। পাহাড়ের শোভা দেখিবেন। আমি বলিলাম, চলুন। তিনি আমার ঘাড়ে হাত দিয়া একটু ভর দিয়া সিঁড়ি অতিক্রম করিলেন এবং ছাদে আসিলেন। তিনি চারিদিকে দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃশ্যকে একেবারে সামনে আনিয়া এবং অন্যবার দূরে রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, বহুদূরে কতগুলি গরু চরিতেছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, ঐগুলি কি আশ্রমের গরু? আমি বলিলাম, হয়তো হইতে পারে। তিনি দূরবীণ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, দেখ না। আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, এরা কতদূরে আছে? আমি বলিলাম, এক মাইলের সামান্য কম হইবে। তিনি বলিলেন, উহাদিগকে ডাকিয়া তুমি আনিতে পার? আমি বলিলাম, যদি শুনিতে পায় তবে নিশ্চয়ই আসিবে।

তিনি - তুমি ডাকিলে শুনিতে পাইল, ইহা কি করিয়া বুঝিব?

আমি - শুনিতে পাইলেই মাথা ও কান তুলিবে।

তিনি - সকলেই কান তুলিবে?

আমি - হ্যাঁ, সকলেই কান তুলিবে।

তিনি - আমি দূরবীক্ষণে দেখিব, তুমি ডাক।

আমি বেশ জোরে ডাকিলাম, লালী - আবার ডাকিলাম - লালী। আবার ডাকিলাম - লালী।

উহাদের মনকে ধ্বনিতে আকর্ষণ করিবার জন্য একবার দ্বিতীয় শব্দে, অন্যবার প্রথম শব্দে তৃতীয়বার উভয় বর্ণে; এই ভাবে দুই তিন বার ডাকিতেই লালী মাথা তুলিল ও কান তুলিল। একটু পরে সকলেই মাথা তুলিল এবং কান তুলিল।

গুরুদেব বলিলেন, তুমি উহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে পার ?

আমি বলিলাম, হ্যাঁ।

গুরুদেব বলিলেন, তবে ডাকিয়া আন, আমি দেখিব।

আমি গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় বলিলাম, লালী এস। সকলে এস।

গরুগুলি সকলে লেজ তুলিল এবং কান ও মুখ তুলিয়া দৌড়াইয়া নৃত্য ভঙ্গীতে আসিতে লাগিল। গরুগুলি আমাদের নিকট হইতে প্রায় তিন চারি বিঘা দূর আছে। এমন

সময় গুরুদেব বলিলেন, ইহাদিগকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়াইবে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। গুরুদেব বলিলেন, তবে দাঁড় করাইয়া দাও না? আমি বলিলাম, বস্, বহী রহো।

শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সব দাঁড়াইয়া গেল। এবার গুরুদেব বলিলেন, এবার তুমি উহাদিগকে আবার ফেরত পাঠাতে পার? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। গুরুদেব বলিলেন, তবে ফেরত পাঠাও, আমি দেখিব। আমি গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় ফিরিয়া যাইতে বলিলাম, তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল এবং বনের আড়ালে মিলাইয়া গেল। ইহার পর, গুরুদেব আমার কাঁধে হাত রাখিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি গিরিগুহায় আশ্রয় লইলাম। কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলাম। আমার বাহ্য জীবন নীরস হইয়া গেল। পশু পাখী ও বন তরুলতার স্নেহ আবেষ্টনী আমি ছিন্ন করিলাম। আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া গভীর স্নেহ ও ভালবাসার আবেষ্টনী গড়িয়া উঠিয়াছিল, দূরে দূরে পাহাড়ের নরনারীর সঙ্গে আমার স্নেহসূত্র গভীরই ছিল। তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়াছে, গুহায় যাইয়া দর্শন করিয়াছে। ধীরে ধীরে হয়তো তাহারা আমাকে ভুলিয়াও গিয়াছে। শুনিয়াছি, রাখাল রাজা শ্রীকৃষ্ণ নাকি বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া যান নাই। আমি পাহাড়ের আশ্রমে কয়েকবার গিয়াছি। গুরুদেবকে দর্শন করিতে আমি সন্ধ্যাবেলা অনেকবার আশ্রমে গিয়াছি, সকালবেলা ফিরিয়া আসিয়াছি। গুহার সম্মুখে অতীব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং আমার অন্তর জুড়িয়া শান্ত সাম্য অনুভূতি সর্বদা বিরাজমান। আমার নিদ্রাও ছিল না। নিদ্রার প্রয়োজনও ছিল না। শরীর ও মন আমার ক্ষয়হীন একটা সাম্য শান্ত রসে দিনরাত মজিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া রাজপ্রাসাদে গিয়াছিলেন। স্নেহভালবাসার রসক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া তিনি কঠোর কর্তব্যের আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়াছিলেন। আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি যে জীবন পাইয়াছিলাম, উহাতে আশ্রমজীবনের অপেক্ষা আত্মরস সহস্রগুণ অধিক ছিল। আমি পাহাড়ে ও জঙ্গলে ভ্রমণ করিতাম এবং কখনও চুপচাপ একান্তে বসিয়া থাকিতাম। গুরুদেবের আশ্রয়ে অবস্থানকালে আমি শত শত ঘটনায় বৃক্ষলতা পশু পাখী জীব জন্তুর সীমাহীন স্নেহ ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাথরের মধ্যেও স্নেহরস আছে। একদিন যেখানে বসিয়া দুই ঘণ্টা কাটাইয়াছি পরদিন আবার সেইখানে যাইবার জন্য মনে আগ্রহ জাগিয়াছিল। এ ভাবেও আমার জীবনকাল প্রায় পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। জীবনের প্রথম চৌদ্দ বৎসর সংসারের আবেষ্টনী, বিদ্যাভ্যাস ও কঠোর শ্রমের মধ্যে, দ্বিতীয় পনর বৎসর গুরুসন্ধানে ও গুরুসেবায়, কঠোর সাধনায়, তপস্যায় এবং সীমাহীন পরিশ্রমের মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। এ ভাবে ঊনত্রিশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পর আরও কঠোর তপস্যার জীবন আরম্ভ হয়। এখন আমার বয়স প্রায় তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন। প্রকৃতি আমার তপস্যার জীবন সহ্য করিলেন না। আমাকে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আনিবেন। এ জন্য আমাকে কঠোর আঘাত হানিলেন। কয়েকজন দুষ্ট লোক এবং পুলিস ষড়যন্ত্র করিয়া আমার উপর অত্যাচার করিল। আমি পুলিসকে এবং দুর্জনকে সাহায্য করিয়া ছিলাম। এ ঘটনা উহারই পুরস্কার। আমি শক্তিবাদী অবশ্যই ইহার প্রতিশোধ লইয়াছি। সমাজকল্যাণকল্পে আত্মনিয়োগ করিবার পর আমি অনেক বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আসিয়াছি। ইহা সত্য ঘটনা যে আমার অন্তর সদা শান্তই আছে। ইহা সিদ্ধ গুরুদের আন্তরিক আশীর্বাদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অসুখ-বিসুখ

গৃহত্যাগের কিছুদিন বাদই আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালটায় ভাল থাকিতাম, কিন্তু বর্ষাকাল ও শীতকালটা আমি অসুস্থই থাকিতাম। আটাশ, ঊনত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি ক্রমাগত অসুস্থই ছিলাম। তাহার পর, আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হইলাম। গৃহত্যাগের কয়েক দিন পরই বুঝিলাম এই বিশ্বে আপনি বলিতে আর কেহই নাই, কিছুই নাই। গৃহে ফিরিয়া যাইবার কথা আমি ভাবি নাই, কারণ সেখানের আকাশ বাতাস গৃহ বৃক্ষলতা ও মানুষ আমাকে অন্তর হইতে মুছিয়া দিয়াছে। আর আমার এ স্থানের কথা ভাবিতে আর ভাল লাগে নাই। নানা মুনির আশ্রমে আমি ঘুরিয়াছি; কিন্তু গুরুকে না ধরা পর্য্যন্ত কোথাও আশ্রয় করা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচ দাঁতন করিয়া আত্মধ্যানে আসনে বসা এবং গীতা পাঠ করা আমার আরও বাল্যকালের অভ্যাস। গৃহত্যাগের পর দেশ কাল ও আশ্রয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সামঞ্জস্য হইত না, ফলে শরীরে ঠাণ্ডা বসিয়া যাইত। ইহারই ফলে আমি অসুস্থ হইলাম, মানুষের দয়া মনুষ্যের চিকিৎসা ঔষধ পত্র ও আহারের অপ্রচুরতা আমার ছিল না। কিন্তু শরীরকে সামঞ্জস্য করিবার মত অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমি এখন জন্মস্থান ও উহার পারিপার্শ্বিক গণ্ডীতে নাই। ইহা না বুঝা আমারই অন্যায় ছিল। যাঁহাদের সংস্পর্শে ছিলাম, তাঁহাদেরও অভিজ্ঞতা ছিল না। যে সব ডাক্তার বৈদ্য আমাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মাথাতেও এ সব কথা কখনও জাগে নাই। শীত বর্ষা উপেক্ষা করিয়া শেষ রাত্রে একখানা ছোট বস্ত্র পরিধান করিয়া মাঠে পায়খানা যাইয়া স্নান বা কোমর পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইবার পর যে শরীরকে বস্ত্র ও আবরণ দেওয়া প্রয়োজন, ইহা আমি ঊনত্রিশ বৎসর বয়সেও বুঝিতে পারি নাই। গুরুর নিকট থাকিয়াও আমার শরীর রক্ষার মত বুদ্ধি দিবার অভিজ্ঞ লোক আমার জোটে নাই। সীমাহীন পরিশ্রম, সীমাহীন অযত্ন এবং সীমাহীন তিতিক্ষা আমার শরীরকে অপটু করিয়াছিল। যতক্ষণ ম্যালেরিয়া জ্বর শরীরে অবস্থান করিত ততক্ষণ আমার বিশ্রাম ছিল, তাহার পরই আমাকে কর্তব্য ও দায়িত্বের চাবুকে কঠোর কার্যে নামিতে হইত। নিত্য জ্বর, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্বর; গ্রীষ্মকাল ভিন্ন প্রায় সব সময়ই আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিত। যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই সময় কমলাঘাট (মিরকাদিম) স্টীমার ঘাটে আমি নিজের শরীর ওজন করিলাম। দেখিলাম, শরীরের ওজন এক মণ বারো সের। আটাশ বৎসর বয়সে যখন আমি পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিয়া নামিয়া চুনার স্টেশনে আসিলাম তখন মনে হইল এবার শরীরের ওজনটা লইয়া দেখা যাক। আমি দেখিলাম, এক মণ নয় সের হইয়াছি। দীর্ঘ যৌবনকালটায় আমার শরীরে একটুও মাংস জমে নাই। কিন্তু

ক্ষয় হইয়াছে তিন সের। গৃহত্যাগের সময় আমার সঙ্গে ছিল দশ আনা পয়সা। এখন পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিবার সময় আমার নিকট তিনখানা পোষ্টকার্ড, প্রতিখানা দুই পয়সা মূল্যের রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন আমার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। একখানা পোষ্টকার্ড গুরুদেবকে অন্য দুইখানা দুইজন পরিচিত ভদ্রলোককে লিখিলাম। আশ্রম ত্যাগের পর আমি শরীর রক্ষার জন্য আকাশবৃত্তি গ্রহণ করিলাম। ঈশ্বর কৃপায় আমি যাহাই পাইয়াছি, তাহাতেই আমার চলিয়া যাইত। কোন কষ্ট হয় নাই বা কোনও প্রকার অসুবিধাও হয় নাই।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আনন্দাশ্রম ত্যাগের শেষের দুই বৎসর একটু বেশী জটিল হইয়াছিল, কারণ, এই দুই বৎসরে দুইবার টাইফয়েড হইয়াছিল। প্রথম বৎসরের টাইফয়েডের পর দেখা গেল, পেটের প্লীহাটি বর্ধিত হইয়া সমস্তখানা পেটই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহা তিন-চার মাসের মধ্যে একটু একটু করিয়া কমিল এবং ভয়াবহ রূপটি কিছুটা সংকোচ করিল। কিছু আহার করিলে আর বসাই যাইত না, ভীষণ কনকন করিত, শয়ন করিলে কম হইত। শেষের বার টাইফয়েডে মস্তিষ্কের শক্তি কমিয়া গেল। মাথায় আর রোদ সহ্য হইত না। একটু রোদ শরীরে লাগিলেই শরীরে জ্বালা হইত, মাথায় শুষ্কতা আসিত এবং নিদ্রিত হইলেই হাত হইতে কব্জীর নিম্ন অর্ধাংশ এবং পায়ের অঙ্গুলী হইতে হাঁটু নিম্ন অর্ধাংশ অসাড় হইয়া যাইত। দুইবার টাইফয়েডকালেই আমি একাকী ছিলাম। দুইবারই আমার প্রচুর পায়খানা হইত এবং তন্দ্রাকালে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতাম। "আমারই শরীরখানা আমি ভাগে বিভক্ত করিয়া দিবার কার্যে ব্যস্ত আছি। শরীরটা অত্যন্ত পরিশ্রমে আমি ভাগ করিয়া তিন টুকরা করিতেছি, কিন্তু শরীরের টুকরাগুলি বারবারই জোড়া লাগিয়া যাইতেছিল। এই কার্যে আমি এত ব্যস্ত যে আমার একটুও অবসর নাই। এই কার্যে আমি এতই শ্রান্ত যে, আমার শরীর ঘামাইয়া যাইতেছে।" এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও কার্য আমার মস্তিষ্ককে অত্যধিক পীড়ন দিতেছে। একটু একটু তন্দ্রাভঙ্গকাল মাঝে মাঝে দেখা দিত, সেই সময় মনে হইত আমি বোকা হইয়া গিয়াছি, কারণ আমার মস্তিষ্ক কোনও প্রকার কার্য ও চিন্তা বা বিবেচনা গ্রহণ করিতে অক্ষম মনে হইত। আশ্রমের রোগীরা সমস্ত দিনই ঔষধের জন্য আসিত। তাহারা আমার পায়খানার ব্যবহারের মত জল ঘটি সাজাইয়া দিয়া যাইত। অনেকগুলি ঘড়াতে জল পায়খানা স্থানের নিকটে রাখিয়া যাইত। আমি দিন রাত বারান্দায়ই থাকিতাম। বারান্দা হইতে নামিয়াই আমি পায়খানায় যাইতাম। খুব পাতলা পায়খানা অনেকটা করিয়া হইত। পায়খানা হইবার পরই আমি অনেকক্ষণ শক্তিহীন ভাবে মাটিতেই পড়িয়া থাকিতাম। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে, ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠিয়া খাটিয়ায় পড়িয়া থাকিতাম। গোশালার গরুগুলিকে প্রথম দিন মাত্র সমাগত রোগীগণকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়া দিতাম, পরে যতদিন আমি অসুস্থ থাকিতাম ততদিন ঈশ্বরই উহাদের রক্ষা করিতেন। দুইবারই টাইফয়েড অসুখটি আমার বর্ষাকালেই হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে ঐরূপ অসুখ হইলে আশ্রমের গরুদের জলাভাবে জীবন রক্ষাই অসম্ভব হইত। ঈশ্বর উহাদের রক্ষক। তিনি সকলকেই রক্ষা করেন। পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমি অনেকস্থানেই অবস্থান করিয়াছি, তবে মোটামুটি আমি ভৈরব গুহায়ই আশ্রয় লইলাম। এবার আমি শরীরের সুখদুঃখ প্রয়োজন অপ্রয়োজন সব কিছু বুঝিবার মত সময় ও অবসর পাইলাম।

স্যাঁতসেঁতে স্থান, শীত এবং জলজ বাতাস, আমার শরীরের পক্ষে বিশেষভাবেই হানিকারক হইয়াছিল। আমার মনে হয়, মানুষের যদি কামজ ব্যাধি না থাকে এবং এই দুইটি বস্তু হইতে সে যদি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে তবে সে সুস্থই থাকিতে পারিবে। পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিবার পর আমার অসুখ যখনই যাহা কিছু দেখা দিয়াছে, সবই অসাবধানতায় হইয়াছে, ইহা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করা প্রয়োজন। ইহা সত্য ঘটনা যে ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, উহা শরীরে কিছু না কিছু থাকিয়াই যায় এবং জল ও ঠাণ্ডার প্রবাহের মধ্যে শরীরখানাকে পাইলে নিজের রূপ নানাপ্রকার রোগের মারফত দেখাইয়া দেয়।

সপ্তম অধ্যায়

পশু ও পক্ষী প্রসঙ্গ

পাহাড়ের আশ্রমে নানাপ্রকার পাখীর আড্ডা ছিল। ইহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে কতকগুলি অদ্ভূত কথা আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আশ্রমের মধ্যে কয়েকটা বড় বড় আম গাছ ছিল। একটা গাছে দুইটি কাক থাকিত। এরা বহু দূর দূর গ্রামে যাইত, আহারের ব্যবস্থা করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মঠে ফিরিয়া আসিত। বাচ্চা জন্মিলে ইহারা খুব বেশী দূরে যাইত না। মঠের মধ্যেই আহার্য সংগ্রহ করিত। ইহাদের কণ্ঠস্বর আমি জানিতাম। একদিন ভেড়ী গ্রামে গিয়াছি। এর মধ্যে কাক দুইটা যে ওই গ্রামে আসিয়াছে সে সংবাদ তাহারা আমাকে জানাইয়া গেল। আমি তাহাদের কথা ও আশ্রমের কথা ভাবিতে ভাবিতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। ইহাদের অদ্ভুত আপন ভাব আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একবার আমি ইমিনীয়া নামক গ্রামে গিয়াছি। সেখানে কাক দুইটি জানাইয়া দিল, আমরা তোমার সঙ্গেই আছি। ইমিনীয়া জঙ্গলী গ্রাম, ওইখানে জঙ্গলী জন্তুর উপদ্রব হয়। আমি যে কাজে ভেড়ী এবং ইমিনীয়াতে গিয়াছিলাম, আমার সেই সব কাজ হয় নাই। তাহারা হয়তো আমাকে ফিরিয়া যাইতেই বলিয়াছিল। জানি না, তাহারা 'কাজ হইবে না' ইহা কি ভাবে জানিত। অথবা আমার সাথী হইবারই বা কি কারণ হইতে পারে। আমার উপর কোনও প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহারা কাহাকে সংবাদ দিত? আশ্রমে কয়েকটি বিরাট বৃক্ষ ভিন্ন কোন জনমানব তো ছিল না। তাহারা খবর রাখে, খবর দেয় পরিচিত জীব জন্তু, পশু পাখী এবং মানব সমাজকে। একদিন কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, কাক দুইটি মিলিয়া নিজেদের বাচ্চাকে মারিবার জন্য আঘাত করিতেছে। বাচ্চাটির দোষ সে সময় হইবার পূর্বেই উড়িবার চেষ্টা করিয়াছে এবং বাসা হইতে জমিতে পড়িয়া গিয়াছে। আঘাত করিতে করিতে তাহারা বাচ্চাকে মৃতপ্রায় করিল এবং ক্ষতস্থানে বিষাক্ত কোন বস্তু আনিয়া দিল। এবং নিজেরা চলিয়া গেল, চার পাঁচ ঘণ্টায় বাচ্চাটি মারা গেল। মরিবার সময় দুইজনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করিতেছিল এবং বাচ্চাটাকে আঘাত করিতেছিল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল বাচ্চাটাকে বাসায় তুলিয়া দিলে হয়তো সমস্যা থাকিত না। কিন্তু তাহারা এমন দুর্গম স্থানে বাসা বাঁধিয়াছে যে সে ডালে আমার প্রবেশ অসম্ভব। আরও একবার আমি দুইটি চড়ুই পাখীকে অসময়ে পতিত বাচ্চাকে নিষ্ঠুরের মত হত্যা করিতে দেখিয়াছি। আমি পতিত বাচ্চাটাকে বহুবার তাহার বাসায় তুলিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু বাচ্চাটি কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরেই বাসা হইতে উড়িবার চেষ্টা করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। তখন ভাল ভাবেই বুঝিলাম, অবাধ্য বাচ্চাদের স্বভাব বদলায় না বলিয়াই পিতামাতারা ঐরূপ নিষ্ঠুরের মত বাচ্চাকে হত্যা করে। দেখিলাম, পিতা খাদ্য আনিয়া পতিতের মুখে দিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু মা সেই খাদ্য

মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে। এ সব নিষ্ঠুর আচরণের কথা মনে হইলে আজও আমার শরীর ও মন অবশ হইয়া আসে। পাখীরা এ সব নিষ্ঠুর কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া দূরে চলিয়া যায় এবং বাচ্চাটি দুই-চার ঘণ্টা মরণের নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শরীর ত্যাগ করে। চড়ুই পাখীর হত্যাকালে দেখিলাম, সাদা রং এবং বিষজাতীয় বস্তু ক্ষতস্থানে ঢালিয়া দিতেছে। আশ্রমের মধ্যে তালগাছে ফেংগা হিংগুয়া পাখী বাচ্চা দিত। ওরা ভয়ঙ্কর হিংস্র এবং সাহসী পাখী। এরা পতঙ্গ জাতীয় জীব আহার করে। বোলতা, ভীমরুল জাতীয় বিষাক্ত পতঙ্গকে এরা অত্যন্ত সাহসের সহিত ধরিয়া আহার করে। বোলতা ও ভীমরুলের বাসার নিকটে বসিয়া ইহারা সহজেই উহাদিগকে একটি একটি করিয়া ধরে এবং ঐখানে বসিয়াই আহার করিতে থাকে। ইহারা শেষ পর্যন্ত বাসাটি পর্যন্তও আহার করিয়া বংশ ও বাসা নিঃশেষ করিয়া চলিয়া যায়। আশ্রমের তাল গাছের উপর ইহারা বাচ্চা দিত। সে সময় চিল জাতীয় পাখীদিগকে আশ্রমের এলাকায় প্রবেশ করিতে দিত না। যে কোন বড় পাখীকে ইহারা গোত্তা মারিয়া আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিত। কাকদিগকে ইহারা আক্রমণ করিলে কাকগুলি তৎক্ষণাৎ মাটিতে বা ডালে বসিয়া পড়িত। বসিয়া, ইহারা ফেংগাদের আক্রমণকে শুধু ঠোঁটের সাহায্যে প্রতিহত করিয়া দিত। ফেংগা পাখীরা শেষ রাত্রে অতি মিষ্ট ও আকর্ষণী স্বরে ঈশ্বর স্মরণ করে। আমার মনে হইত ইহাদের ঈশ্বর-ভক্তি দুর্লভ। ইহারা সমস্ত দিন আহার ও কর্তব্য করে এবং সন্ধ্যাকালে বৃক্ষের ডালে আশ্রয় লয় এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঈশ্বরের নাম করে। ইহারা অত্যন্ত কালা রংয়ের ছোট পাখী, লেজটি মৎস্যের লেজের মতন।

শিকারী পাখীরা (বাজ) আশ্রমের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই পাখী ধরিত। ইহারা পাখী ধরিয়াই কাঁটা ঝোপে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিত এবং আহার করিয়াই চলিয়া যাইত। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল, সব পাখীরাই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। শিকারী পাখী কোন পাখী ধরিলেই সব পাখীরা চিৎকার করিত এবং সকলে সমবেত ভাবে শিকারীর উপর যাইয়া চড়িয়া তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিত। এ ভাবে দেখা গেল বাজ পাখীরা আর আশ্রমের মধ্যে শিকার করিতেই পারিতেছে না। যাহাকে ওরা শিকার করে তাহাকেই সমবেত পাখীরা মুক্ত করিয়া দিতেছে। এবার বাজ পাখীরাও সংঘবদ্ধ ভাবে শিকার করিতে আসিত। একটা বাজ কোন পাখীকে ধরিবা মাত্র তিন-চারিটা বাজ আসিয়া শিকারী বাজটাকে পাহারা দিত। ধৃত পাখীর হত্যার পর টহলদার শিকারীরা চলিয়া যাইত। আমি শিকারীদিগকে কখনও একটা খাদ্যকে দুইজনে আহার করিতে দেখি নাই। যে ধরিত সেই আহার করিত। শিকারীদের শিকার ধরা, পাখীদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় সেই খাদ্য পাখীটির উদ্ধার, ফেংগাদের (হিংগুয়া পাখী) অন্য পাখীকে গোত্তা মারা আক্রমণ, আক্রান্ত পাখীদের আত্মরক্ষার কৌশল, কাকদের আমার সংবাদ রাখার আগ্রহ প্রভৃতি কার্যধারা দেখিতে আমার খুব ভাল লাগিত। আমি উৎসুক হইয়া এসব কাণ্ড দেখিতাম। আশ্রমে ঘুঘু পাখীর বাসা সব সময়ই থাকিত। ইহারা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির পাখী। আমাকে কখনও ভয়ের মধ্যে ধরিত না। পশুপাখীরা আমাকে সর্বদাই দেখিত এবং পরিচিত ব্যক্তির মতই মনে করিত। বন্যরা যদি আমাকে খাদ্য বা শত্রু মনে করিত তবে আমাকে তাহারা নিশ্চয়ই হত্যা করিত বা ভয় করিত।

মহিষাসুর বধ

বর্ষাকাল, রাত্রি প্রায় দেড়টা হইবে। একজন পাহাড়ী কৃষক, নাম রঘুবীর 'রক্ষা কর, বাঁচাও' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। আশ্রম হইতে তাহার চাষের জমি আধ মাইল দূরে হইবে। কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে আসে না। আরও আধ মাইলের মধ্যেই বাঘ আছে। সেই সব স্থানে লোকও আছে, কেহই সাড়া দেয় না। আমি আওয়াজ দিলাম, "আসিতেছি।" আমি হাতে একটি হেরিকেন লইয়া সেই দিকে চলিলাম। রঘুবীরকে একটা পাগলা মহিষ আটক করিয়াছে। মহিষটি তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। রঘুবীর একটা বৃহৎ নিম্ব বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল। রঘুবীরের হাতে একটা অতি তীক্ষ্ণ লোহার শর এবং একটি পাহাড়ী বাঁশের শক্ত লাঠি। আমাকে আসিতে দেখিয়া মহিষটা ওকে ত্যাগ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইল। আমি তখন একটা বৃহৎ নিম্ব বৃক্ষের তলা দিয়া অগ্রসর হইতেছি। রঘুবীর আমার জীবন সংশয় দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "নিম্ব বৃক্ষের গোড়ায় আশ্রয় লও। আশ্রয় লও। এখনই তোমাকে হত্যা করিবে।" আমি নিম্ব বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইলাম। রঘুবীর অতি দ্রুত আমার নিকট আসিল। এর মধ্যেই সাক্ষাৎ যম মহিষটি আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ধরিল। মহিষের বিশাল শরীর, বেঁটে বেঁটে শিং। আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, আর আমরা নিম্ব বৃক্ষের চারিদিকে ঘুরিতেছি। ক্রোধে মহিষটি বৃক্ষকেই প্রহার করিতেছে। বৃক্ষটা কাঁপিতেছে। মহিষের প্রকাণ্ড শরীর সে যতই দ্রুতবেগে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে ততই সে হয়রান হইতেছে। আমাদের হালকা দেহ, নিম্ব বৃক্ষের গোড়ায় ঘুরিয়া আত্মরক্ষা করিতে আমাদের অসুবিধা হইতেছে না। সে সময় সময়, বৃক্ষ ঘেঁষিয়া ঘুরিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় রঘুবীর তীক্ষ্ণধার লোহার শর, গাছের আড়ালে থাকিয়া, ওর মস্তকে ও ঘাড়ে বিদ্ধ করিতেছে। এই ভাবে প্রায় আধঘণ্টা মহিষের আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে ও মহিষকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া হয়রান করিতে করিতে কাটিল। মহিষ শ্রান্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া একটু দূরে গেল। রঘুবীর আমাকে বলিল, সাবধান বৃক্ষতল ছাড়িও না, ও এখনই আবার আসিবে। ও কেবল আমাদিগকে ভাঁওতা দিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে দূরে রাখিতে চায়। এই দেখ, আমার এই লোহার শরটা, আমার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া আমার পায়ের পাতাটা বিদ্ধ করিয়াছে। এবং উহা হইতে ক্রমাগত রক্ত বাহির হইতেছে। আমি বলিলাম, চল, বৃক্ষের উপর গিয়া সেখানে ডালে বসিয়া তোমার পা বাঁধিয়া দিব। আমার পরিধানে যে বস্ত্র আছে, উহা ছিঁড়িয়া তোমার পা বাঁধিব। তাহাই করা হইল। আমাদিগকে বৃক্ষের উপরে দেখিয়া মহিষ আবার আসিল। সে মনের সুখে নিম্ব বৃক্ষকে আঘাত করিতে লাগিল। গাছটি কাঁপিতেছিল। রঘুবীর বলিল, এবার ও যদি নিকটে জলাশয় পাইত তবে শরীর ভিজাইয়া জল আনিয়া বৃক্ষের তলায় কাদা করিয়া বৃক্ষের গোড়া নরম করিতে আরম্ভ করিত। এবং বৃক্ষের গোড়া নরম করিয়া বৃক্ষকে কাত করিত এবং আমাদিগকে ধরিত। পাগলা মহিষ এত বড় হিংস্র যে বলিবার নয়। মহিষ বিশ বাইশ মিনিট বৃক্ষকে কেবল শিঙের

ধাক্কায় কাত করিতে চেষ্টা করিয়া মনের দুঃখে চলিয়া গেল। মহিষ চলিয়া যাইবার পর আমি ও রঘুবীর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। ওকে ঔষধ দিয়া ভাল করিয়া পা-টা বাঁধিয়া দিলাম। ঠিক সেই সময় গুরুদেব আমাদের কথা শুনিতে পাইয়া আমাকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সব বলিলাম, গুরুদেব আমাকে খুব তিরস্কার করিলেন। আমি কোনই উত্তর দিলাম না। পর দিবস সমস্ত দিনই ঐ মহিষ কয়েকজনকে আক্রমণ করিয়াছে। কয়েকজনকে আহত করিয়াছে এবং একজনকে অজ্ঞান করিয়াছে। আমি কূপে জল তুলিতে গিয়াছি দেখিয়া দূর হইতে আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। আমি দৌড়াইয়া দোতলার উপর আসিলাম। সে পাকা পাথরের দেওয়ালে কয়েকটি গুঁতা মারিয়া চলিয়া গেল।

বৈকালবেলা গুরুদেব আমাকে ডাকিলেন। বলিলেন, মহিষের একটা ব্যবস্থা কর। আজ সমস্তটা দিন সে অনেক লোককে আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা অনেকে বৃক্ষের উপর আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। আমাদের মহুয়া বৃক্ষে দুইটা লোক আশ্রয় লইয়া সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে। আমিও বলিলাম, ‘‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’’

আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মহিষরাখাল গোয়ালাদিগকে ডাকিলাম। তাহারা দশ-বারজন একত্র থাকিয়া মহিষ চরাইতেছে। পাগলা মহিষ তাহাদিগকে কিছু বলে না। কারণ তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিধর এবং তাহাদের হস্তে শক্ত লাঠি আছে এবং তীক্ষ্ণ ছোট ছোট কুড়ুল আছে। তাহারা সমবেত প্রহারে মহিষকে কাবু করিতে সক্ষম। তাহারা আসিল, আমি বলিলাম, তোমরা সাহায্য কর, মহিষকে ঠিক করিব। তাহারা বলিল, যাহা করিতে বল, রাজী আছি।

আমি বলিলাম, তোমাদের শতশত মহিষের সাহায্যে ওকে ঘেরিয়া ফেল এবং সমস্ত মহিষের দলকে আমাদের পুকুরে নামাইয়া দাও। পরে যাহা করিবার সেটাও বলিব। তাহারা তাহাই করিল। আশ্রমের প্রকাণ্ড মোঠ তোলা দড়ি ছিল। আমি উহা বাহির করিয়া দিলাম এবং বলিলাম, যাও, এবার জলে নামো। ওর গলায় ফান্দা লাগাও, মোটা দড়ির একদিকে তাল গাছের সঙ্গে প্যাঁচ দিলাম, অন্য দিকটায় একটা ফান্দা করিয়া মহিষের গলায় লাঠির সাহায্যে পরানো হইল। এবার গোয়ালারা ছোট কুড়ুল লাগানো লাঠির প্রহারে মহিষকে কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। পুকুরের জল রক্তবর্ণ হইল। মহিষ একদম নিস্তেজ হইল। তাহাকে টানিয়া তাল গাছের নিকট আনা হইল। তাহার বিক্রম শেষ হইল। গোয়ালারা তাহার নাকে ছিদ্র করিয়া তাহাকে দড়ি পরাইয়া দিল। সে এবার সভ্য হইল। তাহাকে গোয়ালারা একটা ছাগলের বাচ্চার মতই লইয়া চলিয়া গেল। গোয়ালারা বলিল, ওকে তিন দিন অনাহারে রাখিব এবং পরে ওকে মহিষের গাড়ির মহিষ করিব। গুরুদেব রক্তবর্ণ জল দেখিয়া বলিলেন, ‘‘মহিষাসুর বধ’’।

আশ্রমের জমি খরিদ করার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমার আশ্রম ত্যাগের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্তও পালিত পশু এবং তাহাদের মালিকদের অত্যাচার সমস্যা কিছু না কিছু ছিল। পাহাড়ের আশ্রমে গোশালা হইবার দরুন পালিত গরুদের জন্য ঘাস সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। ঐদিকে বর্ষাকালে মা গঙ্গার জল বৃদ্ধি হয়। পার্শ্ববর্তী জনপদগুলি ভাসিয়া যায়। সেখান হইতে সহস্র সহস্র গো-মহিষ এবং তাহাদের মালিকের দল পাহাড়ে প্রবেশ করে। ইহাদের উপদ্রবে আশ্রমের ঘাস রক্ষা করা অসম্ভব। ইহাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ

করা ভিন্ন চলাই অসম্ভব। গুরুদেব শেষ পর্যন্ত ইহাদের সমস্যাও আমার ঘাড়ে ফেলিলেন। ইতিমধ্যে উহাদের সহিত আমাদের কয়েকটি মামলাও হইল। তাহাতে যথেষ্ট ভাল ফল হয় নাই। আমার উপর ভার আসিবার পর আমি অন্য পথে ইহার মীমাংসায় মন দিলাম। আমি সব বিষয়ই গোয়ালাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে থাকিতাম। ক্রমে তাহারা সব বিষয়েই আমার উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এবং স্বেচ্ছায় সামান্য সামান্য ক্ষতিপূরণ দিতে লাগিল। এত প্রভাব, এত প্রতিপত্তি, এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা এবং সব সমস্যার সমাধান হইবার পরও যখন ভাবি গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত আনন্দাশ্রম আজ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তখন মনে ভীষণ দুঃখ হয়। বন্য জন্তুর মধ্যে থাকিলেও আমার তাহাদের সহিত মিত্রতার অভাব ছিল না। মানুষের স্বার্থজড়িত ঘটনার মধ্যে থাকিলেও আমার কর্তব্যে ত্রুটি ছিল না এবং কাহারও সহিত আমার শত্রুতাও ছিল না।

পশুর জন্মান্তর কথা

পাহাড়ের আশ্রমের কিছু দূরে সেবক নামক গোয়ালার গরুর দলে একটা গাভী ছিল। সে একাদশীতে কোন প্রকার আহার গ্রহণ করিত না বা জল পানও করিত না। সেই গরুটা কখনও ষাঁড়ের সংস্পর্শেও যাইত না। কাজেই কখনও গর্ভবতীও হয় নাই, সন্তানের মাও হয় নাই। গুরুদেব বলিতেন, সে নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্মণ-বিধবা বা উচ্চ বংশীয় বিধবা ছিল, নিশ্চয়ই কোন পাপে তাহার গোজন্ম হইয়াছে। ঊর্ধ্বস্তর হইতে নিম্নস্তরে জন্ম হইলে, পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা মনে থাকিয়া যায়। যতন গড়েরিয়ার একটা কুকুরী ছিল। সেও কুকুরের সংস্পর্শে যায় নাই। সে যতন ভিন্ন অন্য কোন বাড়িরই আহার্য গ্রহণ করিত না। সে সর্বদা যতনের দরজার সামনে পড়িয়া থাকিত। এই কুকুরীটাও একাদশীতে পান আহার করিত না। গুরুদেব বলিতেন, যতনের নিকট কোন জন্মে কুকুরীটা ঋণী ছিল। পাহারা দিয়া সে ঋণ শোধ দিতেছে। গুরুদেব, ঋণ শোধ বিষয়ে ভগীরথ ব্রহ্মচারীর পিতার কুকুর জন্মের কথা বলিলেন। এই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন। তাঁহার পিতা গয়াতীর্থে আসিয়া পাণ্ডার নিকট তিন শত টাকা ধার করিয়া দেশে যান। তাঁহার অর্থ চুরি গিয়াছিল বলিয়াই তিনি ধার করেন। দেশে যাইয়া কিছুদিন বাদই মারা যান। পাণ্ডার দেনা তাঁহার আর শোধ দেওয়া হইল না। ভগীরথ পিতৃহীন মাতৃহীন হইয়া মামার নিকট যান। মামীর ব্যবহার, এই বালকের উপর স্নেহহীন ছিল। বালক আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গঙ্গায় যায়। সেখানে এক সাধু তাহাকে রক্ষা করেন এবং বালক সাধুর সঙ্গেই চলিয়া যায়। দৈববশে বালক পাণ্ডার বাড়িতে আশ্রয় লয়। পাণ্ডা ও পাণ্ডাপত্নী বালককে পুত্রবৎ পালন করেন। পাণ্ডা সন্তানহীন ছিলেন। তাঁহার বাড়ির কুকুরটা ভগীরথের পিতা ছিলেন। ধার শোধের জন্য তাঁহার কুকুর জন্ম হয়। ভগীরথের সঙ্গে কুকুরটার খুব ভাব ছিল। স্বপ্নে ভগীরথ সব জানিতে পারিল। তিনি পাণ্ডার নিকট ও খাতাপত্রে পিতার ঋণের কথা সবই জানিলেন। ভগীরথ পাণ্ডার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভিক্ষা করিয়া তিনশত টাকা একত্র করেন। সেই অর্থ পাণ্ডার হাতে দিবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা মারা যায়। ভগীরথ ফল্গু তীরে কুকুরের দাহ করেন এবং যথাবিধি অশৌচ গ্রহণ করিয়া পিতার শ্রাদ্ধপিণ্ড করেন। ভগীরথের আর

দত্তক হইয়া পাণ্ডার বিত্ত গ্রহণের বা ভোগের ইচ্ছা রহিল না। তিনি মামা ও মামীর সংবাদ গ্রহণের জন্য মামার দেশে রওনা হন। ভগীরথের জীবনকথা খুবই করুণা মাখা ও মর্মস্পর্শী। গুরুদেব সেই সব কথার সংগ্রহে এক উপাদেয় ও সুন্দর পুস্তক লিখিয়া ছাপিয়াছিলেন। কুকুর জন্ম লইয়া ধর্ম ভিত্তিক ঋণ শোধের কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। আমার এবং মঠ-সংযুক্ত অনেক অর্থই অনেক লোককে আমি আত্মসাৎ করিতে দেখিয়াছি। ইহা হয়তো এ যুগেরই ধর্ম; কিন্তু ইহার শেষ ফল, ভাল কি মন্দ কে জানে!

অষ্টম অধ্যায়

সাধনা এবং অনুভূতি

বাল্যকালের সাধনা তো অনেকটা শাস্ত্রহীন ও মনের মতন একটা কিছু করাই থাকে। বাল্যে, নানারকম দেবদেবীর মূর্তি দেখিয়াছি। তাহাতে, সাদা রঙের হরি-মূর্তির ধ্যান করিতে ভাল লাগিত। ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আমি বেশ রীতিমত মা কালীর ধ্যান করিতাম। ইহা বেশ শক্তিশালী ধ্যান বলিতে হইবে। ভয়ঙ্কর ঝড় বা বিপদকালে মাকে স্মরণ করিলে সবই রক্ষা হইত, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মাকে ধ্যান করিয়া রোগীকে রোগ মুক্তি দেওয়া ইহা প্রায় সাধারণ ঘটনা ছিল। আমি স্বপ্নে এবং জাগ্রতকালে মানসক্ষেত্রে বহু বহু মূর্তি দর্শন করিয়াছি। এসব মূর্তির মধ্যে চতুর্ভুজ কমলা মূর্তি প্রধান। যে সব মূর্তির দর্শন হইত, সে সবের ছবি আমি কখনও দেখি নাই। হরি-কীর্তনকালে আমি এক সময় দুইজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলাম। জানিলাম, ইহারা নাকি গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। একবার কীর্তনকালে গভীর নীলবর্ণ বালক কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করিয়াছিলাম। একবার রাসপূর্ণিমা রাত্রে স্বপ্নে একটি অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়াছিলাম। অনেক কৃষ্ণ এবং অনেক রাধা, সকলেই চন্দ্রাতপের মত শ্বেত ও স্নিগ্ধ বর্ণ। বহুদূর আকাশের মধ্য হইতে একটা শ্বেত জ্যোতি গঠিত গোলাকার রাস্তা। রাস্তাটি ধীরে ধীরে নিম্নের দিকে গোলাকার হইয়া মোড়াইয়া মোড়াইয়া নামিয়াছে। সেই রাস্তাটার নিম্ন প্রান্ত আমার চক্ষের সামনের একটা বড় গোল চক্রাকার রাস্তারূপে পরিণত হইল। সেই রাস্তা ধরিয়া অনেক যুগল মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে আমার সামনে আসিলেন। আমার সামনে তাঁহারা অতি দ্রুত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়েক পাক নৃত্য করিলেন এবং ধীরে ধীরে উপরের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের রূপের স্নিগ্ধ শ্বেত ছটা আমার সম্মুখে এবং বাতাসে বহুক্ষণ ছিল। এখনও মনে হয় এই বিদ্য লীলা আমার অন্তরে জাগ্রত আছে। এর ভিতর কি রহস্য এবং ইহা কিরূপ ঘটনা, ইহা আমি জানিতাম না। পরে জানিলাম, ইহা ভগবানের রাসলীলা। একজন বৈষ্ণব সাধুকে এই স্বপ্নকথার মর্ম জানিতে চাহিয়া পত্র দিয়াছিলাম। তিনি বৈষ্ণবোচিত ভাববিগলিত ভাষায় আমাকে লিখিলেন, ‘‘তুমি ধন্য, যে ভগবানের দিব্য রাসলীলা দর্শন করিয়াছ। তুমি মায়ের শিশু, ব্রজের বালক এবং বৃন্দাবনের কিশোর। শ্রীভগবান বৃন্দাবনে ত্রিবিধ ভাবের লীলা করিয়াছিলেন। এই স্বপ্ন তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস।’’ এই পত্রের কি মর্ম তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝি না। এই লীলাটি আমার এখনও ভাবিতে ভাল লাগে। বাল্যে হরিকীর্তনে যোগ দিলে বেশীক্ষণ কীর্তন করা যাইত না, আমি পড়িয়া যাইতাম। ইহার কারণ, আমি একটা তাল ও ধ্বনির আবর্ত দেখিতে পাইতাম। এই আবর্ত হালকা লাল রঙের ছিল। এই আবর্ত আমার সম্মুখ হইতে আসিয়া আমার শরীরকে ভেদ করিয়া পিছন দিকে চলিয়া যাইত। ইহাতে মন আরও আকৃষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতাম না। শরীরের অস্তিত্বও ভুলিয়া যাইতাম, এবং পিছন দিকে

একটু দূরে পড়িয়া যাইতাম। দুই এক মিনিটের মধ্যেই সব স্মৃতি ফিরিয়া আসিত। এসব দর্শন কীর্তন বা দশাভাব আমাকে কোনই তৃপ্তি দিত না। ইহা ভিন্নও আমার জীবনে ঘটিত, অনেক ধর্মীয় ভাব আছে, কিন্তু এখানে বলিয়া রাখাই প্রয়োজন যে এ সবকে বিশেষ কোন খাঁটি বস্তু বলিয়া আমার মনে হইত না। কারণ আমার মনের কোন তৃপ্তিই ইহাতে হইত না। মনে তৃপ্তি না দিলে কোন অনুভূতি এবং কোন দর্শনকেই পাকা কিছু বলিয়া মানা যায় না। আমার মনে হয়, ওই যে রাসলীলা দর্শন, উহাকে কেন্দ্র করিয়া কিছুটা উন্নত সাধনা করা চলে। মূর্তি দর্শন এবং লীলা দর্শন, সাধককে খুব বেশী দূর লইয়া যাইতে সক্ষম নহে।

চোদ্দ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ষোল বৎসর বয়সে চুনার ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে ব্রহ্মদীক্ষা হইল। মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকা কেন্দ্রে ধ্যান ও জপ আরম্ভ করিলাম। পূর্বে মায়ের ধ্যানে যে রস পাইতাম, যে তৃপ্তি হইত, উহার কোন আভাসই নূতন ধ্যানে হইত না। বেশ শুষ্ক সাধনা হইল। নিজের মনের মত কাল্পনিক সাধনা আমাকে কতকটা তৃপ্তি নিশ্চয়ই দিয়াছিল, কিছুটা বিভূতিও দিয়াছিল। কিন্তু উহার পরিণতিতে আমি ভবিষ্যতে ব্যবসাদার সাধু বা ধর্ম ব্যবসায়ী গৃহী ভিন্ন কি হইতে পারিতাম? এখন যে সাধনা চলিয়াছে, উহার পরিণতি কি এবং কোথায় সেটা আমার জানা নাই। ভিতরে কিছুই ছিল না, কিন্তু উপরে ছিল ভাব-দশা এবং উপরে ছিল ছোটখাট বিভূতির চাটনী। ইহা একজন উচ্চলক্ষ্যসম্পন্ন সাধকের কোন্ কাজে আসিবে? আমি বেশ নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্যের নিয়ম পালন করি এবং নিষ্ঠার সহিত সাধনা করি। এরূপ নানা ভাবে কিছু বৎসর কাটিবার পর ব্রহ্মদীক্ষা ও অভিষেক হইল। অভিষেকের পরও মানস জগতের কোন পরিবর্তন বুঝিলাম না। তারা দীক্ষার পর একটু ফাঁকা ফাঁকা অনুভূতি দেখা দিয়াছিল। তাহাকেও স্থায়ী করিতে পারিলাম না। এক এক সময় মনে হইত অন্য কোন সাধনার ধারা অবলম্বন করা হয় তো ঠিক হইবে। এরূপ ভাবও বেশী দিন চলিত না। দুইবার আকাশ বাণী হইল - ''যাহা ধরিয়াছ, ধরিয়া থাক, সময়ে সবই পাইবে।'' একে তো অলৌকিক প্রভাবে গৃহত্যাগ ও গুরুলাভ, তাহার উপর প্রায় ছয় মাসের মধ্যে দুইবার আকাশ বাণী হইল। দ্বিতীয় বারের আকাশ বাণীর পর মন অনেকটা সাম্য হইল, কারণ, ইহা নিশ্চয় হইল, এ পথেই সাধনা করিব। আমি নিত্য নিষ্ঠার সহিত সাধনা করি। অনেক প্রাণায়াম ও অনেক আসন ও মুদ্রানুশীলন করিয়া নিত্য গীতা চণ্ডী ও উপনিষদ পাঠ করি। প্রচুর জপ করিয়া থাকি। একদিন কথা প্রসঙ্গে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেকে অমুক (একজন অন্য সম্প্রদায়ের লোক) হইতে কম সাধক মনে কর বলিয়া মনে হয়। আমি বলিলাম, সাধনা অনেক করি, অনেক ক্রিয়াও করি, অনেক জপ করি, কিন্তু এখনও এমন কিছু পাই নাই যাহা দ্বারা মনকে বশে রাখা যায়। যতক্ষণ উহা হয় নাই ততক্ষণ কাহারও সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নহে। গুরুদেব বলিলেন, প্রথমটায় ভিত্তি গড়িতে হয়, পরে উচ্চ অনুভূতি আসিবে। গুরুদেবের কথা হয়তো সবই ঠিক; কিন্তু পাঁচ বৎসরের সাধনা যদি কোন অনুভূতির ভিত্তি দান না করে তবে সাধকের ধৈর্য থাকে কি ভাবে? ক্রমাগত পাঁচ বৎসর সাধনার পর মেরুদণ্ডের মধ্যপক্ষে এক সুন্দর শ্বেত জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল। আমি কয়েক দিন খুবই আরামে কাটাইলাম। ইহা যে চিত্রাণী নাড়ী, ইহা এখন বুঝি। আমি কথাটা কমলা-মাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন,

গুরুদেবকে বলা কর্তব্য। ইহা উচ্চস্তরের অনুভূতি। শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, তুমি এ সব লইয়া না থাকিয়া শুধু সাধনা করিয়া যাও। আমি সরল বিশ্বাসে তাহাই করিলাম এবং অনুভূতিটাও সরিয়া গেল। আবার মনে অস্বস্তি চলিল। এ ভাবে কিছুদিন চলিবার পর এক সমস্যাপূর্ণ অনুভূতি ফুটিল। মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকাকে কেন্দ্র করিয়া একটা ফাঁকা স্নিগ্ধ শ্বেত অনুভূতি ফুটিল, একটা শ্বেত ঘন ফাঁকা বোধ ও গুরু-মূর্তি সেখানে আছেন। এখন সমস্যা এই যে ফাঁকাটা থাকিবে কি, গুরুমূর্তি থাকিবেন। আমার মনে ইহাই সমস্যা। দুইটার একটা থাকিলেই যেন ভাল হয়। ইহা কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? গুরুদেব নিকটে নাই থাকিলেও জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইবে কিনা, সেটাও সমস্যা। কারণ তিনি যদি আবার একটা বিভ্রান্তির নির্দেশ দেন তবে ভাল ভাবেই অস্বস্তির মধ্যে জড়াইয়া যাইব। আমি অতি সাবধানে একজন অন্য সম্প্রদায়ের সাধক ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে খুব সংক্ষেপে এবং সাবধানে পূর্ব ঘটনা বলিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা কিন্তু ভয়ঙ্কর বিস্ময়কর ঘটনা, শিষ্য যদি উচ্চ স্তরের অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ না হন তবে গুরুদের ধারা কিন্তু গরু গাধা দিয়া চলিবে না। আমি বলিলাম, আর আমি জিজ্ঞাসা করিব না। আপনি বলুন। তিনি বলিলেন, স্নিগ্ধ জ্যোতি ঘন ফাঁকাটাই থাকিবে। মূর্তিটা মিলাইয়া যাইবে। ইহা চিদাকাশ অনুভূতি। তিনি আরও বলিলেন, শান্তিকে কেন্দ্র করিবেন। যখনই দ্বিধা দেখা দিবে, তখনই শান্তি কোথায়, উহা সন্তর্পণে বিচার করিবেন এবং উহা ধরিয়া রাখিবেন। এই ভাবে চলিলেও ক্রমে উন্নত পথ পাইয়া যাইবেন। চিদাকাশের বোধের কেন্দ্র কেবল মস্তিষ্ক কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না; ইহা হৃদয়জগতে এবং বিশ্বজগতেও দেখা দিল। আমার মন মেজাজ চালচলন কথাবার্তার রীতিনীতি সবই বদলাইয়া গেল। আমার বহিঃশূন্য, অন্তঃশূন্য এবং সর্বশূন্য বোধ ভালভাবেই দেখা দিল। আবার কয়েক দিনের মধ্যেই বহিঃপূর্ণ, অন্তঃপূর্ণ এবং সর্বপূর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত দিনের পরিশ্রম এবং সমস্ত রাত্রির সাধনা সবই আমার নিকট এখন সহজ জীবনের আসবে পরিণত হইল। এই সব ঘটনা, আমার তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সের ঘটনা।

এখন আমার দীক্ষা ত্রিপুরা দীক্ষায় আসিয়াছে। আমি মনের তৃপ্তিতে সাধনা করি, জপ করি। রাত্রি দেড়টার পরই সাধনায় বসি। বসিবার একটু পরেই এক সুন্দর ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই ধ্বনি কোথা হইতে আসে জানি না। সেই ঘণ্টাধ্বনি এক শ্বেত জ্যোতি বহন করিয়া আনে। ধ্বনিটা কেবল ধ্বনি নহে সেই ধ্বনিটা স্নিগ্ধ ও শ্বেত স্বচ্ছ জ্যোতিরূপা। মনে হইত, সমস্ত পাহাড়খানাই ঘণ্টাধ্বনি এবং চন্দ্রজ্যোতিতে পরিপূর্ণ আছে। আমি উহারই মধ্যে থাকিয়া সাধনা করি। এই জ্যোতিবাহী ধ্বনি আমি নিত্য শুনিতাম। মনে হইত একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজিতেছে। এই ধ্বনি অতীব মিষ্ট। গুরুদেব এখন ভালভাবেই বুঝিলেন, আমার অন্তরবিকাশ দ্রুত পরিবর্তনের ধারা ধরিয়াছে। আমি মোটামুটি কিছুই বলি না। কোন আলোচনারই প্রয়োজন মনেও করি না। গুরুদেব অনেক সময়ই প্রশ্ন করেন, কিন্তু আমি খুব সন্তর্পণে অল্প উত্তর দিয়া থাকি। কথা প্রসঙ্গে, আমি ঘণ্টানিঃস্বনীর কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, আরুণী ক্রিয়া কর। ভিতরের অনাহতও শুনিতে পাইবে। একটি ছোট তুলা গাছের প্রথম উৎপন্নকালে দ্বিপত্র শোভিত চারাকে দেখাইয়া মস্তিষ্কটা বুঝাইলেন। এই দ্বিপত্র মস্তিষ্কটি কিভাবে সহস্রার মধ্যে রহিয়াছে সেই

সবও বলিলেন। এবার তিনি দ্বিপত্রের সম্মুখ এবং পিছন স্থানকে বুঝাইয়া আরুণী ক্রিয়া করিতে বলিলেন। ক্রিয়াটি আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের অনাহত ধ্বনিও শ্রবণ আরম্ভ হইল। দিন রাতই এই ধ্বনি শ্রবণ হইত। এখন মনটা ঐ ধ্বনিতেই মজিয়া থাকে। কয়েক মাসের মধ্যে বুঝা গেল সেই ভিতরের ধ্বনিটিও জ্যোতির্ময়। সেই জ্যোতিটি অতীব সূক্ষ্ম, ইহা মনকে কোথায় কোন্ অমৃত জগতে প্রলীন করিয়া চলিয়াছে। রাত্রিতে বাহিরের ঘণ্টাধ্বনি এবং দিনরাত অন্তরের অনাহত ধ্বনির আকর্ষণে আমি এখন ভালই আছি। আমার নিত্য বাহ্য কর্মের রুটিন পূর্ববৎই জটিল আছে। কর্ম আমাকে কোনদিনই অনুভূতি হইতে বঞ্চিত করে নাই, এখনও করে না। অনাহত ধ্বনি আরম্ভ হইবার পর ক্রমাগত তিন বৎসর কাল এই ধ্বনি আমাকে মুগ্ধ করিয়াই রাখিয়াছিল। শেষকালে ইহা এক সূক্ষ্মতম অন্তর জ্যোতিতে পরিণত হইল। তাহার পর ইহা কোথায় কোন এক অজ্ঞাত বিন্দুতে বিলীন হইল জানি না। ইহা মনকে এক সূক্ষ্মতম বিন্দুতে বিলীন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। এই নাদ শ্রবণ-পথে অগ্রসর হইলে সন্ন্যাসভূমি অধিক দূরে থাকে না। ইহা সত্যকথা যে অনাহত ধ্বনি এখন আর শুনিতে পাই না। কিন্তু অনাহত ধ্বনি যে সূক্ষ্ম জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া মস্তিষ্কমধ্যে বিলীন হইয়াছিল, স্মরণ করিলেই উহা অনুভব করা যায়। অনাহত ধ্বনি ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া জ্যোতিরূপে পরিণত হয়। ইহা মস্তিষ্কের শেষপ্রান্তে জ্যোতিরূপে সাধকের মনকে অন্তরমূলে আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপথে নিমগ্ন করে। ইহা লয়যোগের পথে খুবই উচ্চস্তরের সাধনা। ইতিপূর্বে গুরুপাদুকা ধ্যানকে কেন্দ্র করিয়া শূন্যবোধ ও পূর্ণবোধের কথা অর্থাৎ চিদাকাশের কথা বলিয়াছি। ঐ সাধনা রাজযোগাত্মক জানিতে হইবে। অনাহত ধ্বনির মূলস্থান মস্তিষ্কের কেন্দ্রে বিদ্যমান, সাধকের মন সূক্ষ্ম হইলে ইহা বিনা ক্রিয়াতেই শুনিতে পাওয়া যাইবে। ইহা শুনিতে খুবই ভাল লাগে। কেবলই শুনিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় সাগরের অন্য পার হইতে কেহ এই মধুর ধ্বনি পাঠাইতেছেন, সাগরের এ পারে থাকিয়া সাধক কান পাতিয়া এই দীর্ঘ ওঁ, ওঁ, ওম্ ম্ ম্ ম্ ধ্বনিও শ্রবণ করিতেছেন। এই ধ্বনিই শেষকালে অতি সূক্ষ্ম এক জ্যোতিরূপে দেখা দেয়। ঐ সূক্ষ্ম জ্যোতিটাতে ধ্বনিও থাকে জ্যোতিও থাকে। দুইটাই তত্ত্বতঃ এক এবং মনকে প্রলীন করিতে সক্ষম। বহুদিন ধ্বনিতে এবং জ্যোতিতে মন প্রলীন হইবার অভ্যাসটা পরে পাকাপাকি অভ্যাসরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে মন সাম্য হইবার একটা স্থায়ী বা সিদ্ধ ভূমি প্রাপ্ত হয়। মন এভাবে প্রলীন হইবার স্থায়ী ভিত্তি লাভ করিবার পর অনাহত ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না। অনাহত ধ্বনির মূল স্থান অনাহত চক্রে নয়। ইহার মূল স্থান মস্তিষ্কে। সংযত ও ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ সাধকের মন ভক্তি ও ভালবাসা জগতের সংস্পর্শে আসিলে মনের স্থিতি অনাহত চক্রে আসিল জানিতে হইবে। অনাহত জগতের নিকটস্থ হইলেই মন এতটা সূক্ষ্ম ও হালকা হয় যে, অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। অনাহত ধ্বনি প্রথমটায় যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় শেষটায় সেইরূপ থাকে না। শেষকালে ইহা দীর্ঘ ওঁকার ধ্বনিতে পরিণত হয়। ইহার স্বরূপও ম্ ম্ ম্ ম্ ম্ ম্ এর মত। ইহা অত্যন্ত মধুর হালকা এবং অত্যন্ত স্নিগ্ধ। ইতিপূর্বে আমি স্বর্গীয় ঘণ্টাধ্বনির কথা বলিয়াছি। যে কোন পবিত্র এবং স্বর্গীয় ভূমিতে এই ধ্বনির আভাস পাওয়া যায়, গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদমঠেও মাঝে মাঝে আমি ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। সাধক নিজের মনকে শক্তিবাদীয় মনে পরিণত করুন

অর্থাৎ মন হইতে দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ নীতি বহিষ্কার করুন। ঈর্ষা কুটিলতা এবং ভণ্ডামী ছাড়িয়া দিন, এভাবে সাধনায় অগ্রসর হইলে নাদ শ্রবণ সহজ হয়। মনে এই সব হীনবৃত্তি থাকিলে কোনও প্রকার উচ্চ অনুভূতিই ফুটিবে না; বরং ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা আয়ত্তকৃত উচ্চ অনুভূতির অবলম্বনে মনকে শুদ্ধ রাখিলেই মন হালকা থাকে এবং হালকা মনই অনাহত ধ্বনি সহজে শ্রবণ করে।

কুণ্ডলিনী জাগরণ। বন্ধনত্রয় সহযোগে প্রাণায়াম ও মুদ্রাদির অনুশীলন আমি প্রথম ব্রহ্মদীক্ষার সময় হইতেই করিতেছিলাম। গুরুদেব সেই ক্রিয়ার সঙ্গে মহামুদ্রা ও অন্যান্য কয়েকটি ক্রিয়াও যুক্ত করিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, কয়েকদিন ধরিয়াই মনের স্থিতি মূলাধারের দিকে বেশীক্ষণ একাগ্র থাকে। এবং মেরুদণ্ডের মধ্যপথে বিদ্যুতের মত কি যেন চমকাইয়া ওঠে। এভাবে কয়েকটা দিন চলিবার পর প্রাণায়াম ও মুদ্রাদির অনুশীলন ফলে মূলাধারে যেন একটা ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হইল। এবং মা কুণ্ডলিনী অতি দ্রুত চক্রগতিতে মেরুমজ্জা ভেদ করিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলেন। ইহা যে বজ্রানাড়ীর কম্পন ইহাতে সন্দেহ নাই। এই বজ্র কম্পনের পর আমার দৃশ্যজগৎ এবং মানসজগৎ ও বোধজগৎ চেতনাময় হইল। এ জীবনের মত জড়-দর্শনের ভ্রান্তি মিটিয়া গেল। প্রতিটি বোধ প্রতিটি চিন্তা মেরু-মজ্জার মধ্য দিয়া নাড়ী পথে মস্তিষ্কে যাতায়াত করে। যে সব বোধধারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া নাড়ী পথে মস্তিষ্কে গমনাগমন করে সেইগুলিও যাতায়াত কালে সমস্ত মেরুদণ্ড মধ্যপথস্থিত নাড়ীগুলিকে কম্পিত করে। মেরুপথে জড়তা কুণ্ডলিনী জাগরণে বা বজ্রনাড়ীর কম্পনে দূরীভূত হইয়াছে। কাজেই সব বোধধারা ও ভাবধারাই অমৃতের স্পর্শে অমৃতময় হইয়া চলিয়াছে। কুণ্ডলিনী জাগরণের পর, আমার এক অদ্ভুত সর্দিভাব দেখা দিল। অনেক কফ বাহির হইয়া গেল। বুঝিলাম, কুণ্ডলিনী জাগরণে মেরুমজ্জা হইতে কফ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে।

চিদাকাশ অনুভূতি, নাদানুভূতি এবং কুণ্ডলিনী জাগরণ এই তিনটিই উচ্চস্তরের অনুভূতি। ইহাদের মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগরণকে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি বলা যায়। যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ, আন্তর মন উহাই বেশী আঁকড়াইয়া রাখে। মন উচ্চ উচ্চ স্তরের অনুভূতি যতই আঁকড়াইয়া থাকুক না কেন সাধক কিন্তু এখনও জীবত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াই ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। জীবত্বের সীমা এবং উহার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সাধনা এবং এই সীমার মধ্যে থাকিয়া যে সব অনুভূতি প্রকাশ পায়, সে সব কথা আমি পরে বলিব। কুণ্ডলিনী জাগরণ পর্যন্ত যে সব ক্রিয়া ও সাধনা আমি করিয়াছি, সেই সব সাধনা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে এখন কিছু বলা প্রয়োজন। আমি প্রথমেই সাধনার ক্রিয়াগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিব। কতগুলি যোগের ক্রিয়া খুব সহজ ও সুখপ্রদ এবং মন ও শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কতগুলি সাধনার ক্রিয়া সামান্য অনুশীলনেই উপকারী, কিন্তু বেশী করিলে শরীরের ক্ষতি হইবে। আমি সব সাধনা একসঙ্গে করিতাম না। আমার সাধনাগুলি মধ্যরাত্রি, শেষরাত্রি, প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালের ভাগে ভাগ করা ছিল।

মধ্যরাত্রি কৃত্য। 'মহাসন্ধ্যা'ই মধ্যরাত্রির কৃত্যের প্রথম সাধনা। অন্যান্য তিনটি সন্ধ্যার মত মধ্যরাত্রি কৃত্য সন্ধ্যাও আমি জলসহ করিতাম। অভ্যাস হইয়া গেলে এই সন্ধ্যানুষ্ঠানটি জল ছাড়াও করা যায়। ইহা তান্ত্রিক সন্ধ্যার অঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি লয় তুরীয়া ও ব্রহ্ম সন্ধ্যাকালের অনুষ্ঠান তান্ত্রিক সন্ধ্যায়ই পূর্ণভাবে স্থান পাইয়াছে। বৈদিক সন্ধ্যায়

প্রথম তিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান আছে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিনে বৈদিক বিধানে সায়ং সন্ধ্যা নিষিদ্ধ।

উপনয়নের পর বৈদিক সন্ধ্যা করিতে হয়। দীক্ষার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা কর্তব্য। বৈদিক সন্ধ্যা খুব শান্তিপ্রদ ও পবিত্র। তান্ত্রিক সন্ধ্যা অত্যন্ত গম্ভীর এবং শক্তিপ্রদ; কাজেই বৈদিক সন্ধ্যার পরই তান্ত্রিক সন্ধ্যা দীক্ষিত মাত্রই অনুষ্ঠান করিবেন। মহানিশার সন্ধ্যা তান্ত্রিক বিধানেই আছে। উহার অনুষ্ঠান সবই তান্ত্রিক ত্রিসন্ধ্যার মত, কেবল ধ্যান মন্ত্রটির ভেদ আছে। সাধারণতঃ মহাসন্ধ্যার কথা কোন পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য মহানিশার ধ্যান মন্ত্রটি এখানে দেওয়া হইল। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়ং মধ্যরাত্রি ও ব্রহ্মমুহূর্ত কালের সময় প্রকৃতিতে মনকে লীন করাই সন্ধ্যা উপাসনার প্রধান লক্ষ্য। একমাস কাল সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবার পরই মন জানি না কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার সময় প্রকৃতির সহিত সাম্য হইয়া যায়। সৃষ্টিজ্ঞান, স্থিতিজ্ঞান, লয়জ্ঞান, তুরীয়জ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সময় ধরিয়া সন্ধ্যা করিলে মন ব্রহ্মজ্ঞানের এই পাঁচ স্তরেরই নিকটবর্তী হইতে পারে। গুরুদেব বলিতেন, রাত্রি বারটা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত কাল পর্যন্ত সকলটা সময়ই মহানিশার সময়। গুরুদেব আমাকে রাত্রি দুইটায় জাগাইয়া দিতেন। আমি পরে দেড়টায় জাগিয়া যাইতাম ও মহাসন্ধ্যার কার্য আরম্ভ করিতাম।

মূলাধারে ইষ্ট এবং সহস্রার গুরু প্রণাম॥ আচমন॥ আসনশুদ্ধি॥ গুরু আদির প্রণাম॥ জলশুদ্ধি মার্জন॥ প্রাণায়াম॥ অঘমর্ষণ তর্পণ॥ সূর্যার্ঘ্য॥ ইষ্টদেবতার অর্ঘ্য॥ অঙ্গন্যাস॥ করন্যাস॥ সবই ত্রিসন্ধ্যার মত। মহানিশার ধ্যান অন্য রকমের, উহা পরে বলা যাইতেছে। ধ্যানের পর জপ॥ জপ সমর্পণ। প্রণাম -

ওঁ নিশায়ামাদ্যারূপাঞ্চ সৃষ্টি স্থিত্যান্তকারিণীম্।
গায়ত্রীং ত্র্যক্ষরীং দেবীং মূর্তিত্রয় সমন্বিতাম্॥
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কল্পার্থং ব্রহ্মাণীং প্রকৃতিং পরাম্।
ব্রহ্মণা শিবরূপেন সদানন্দ স্বসংযুতাম্॥
জগতঃ পালনার্থায় স্নেহার্দ্র হৃদয়ান্বিতাম্।
বৈষ্ণবীং জগদম্বাঞ্চ পয়ঃপূর্ণ পয়োধরাম্॥
সংহার সংবিধানায় বিস্তৃতবদনাং স্মরেৎ।
বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রুদ্রাণীঞ্চ চতুর্ভুজাম্॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চতুর্বেদ সমন্বিতাম্।
ব্রহ্মাদিভিদেবগণৈঃ সেবিতাং স্বরস্বন্দরীয়ম্॥
তুরীয়াং প্রকৃতিং দেবীং সাধকানাং স্বসিদ্ধিদাম্॥

ইহা যে প্রায় কালীর ধ্যান, ইহা পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন। এবং ইহাই তিন অক্ষরের সমষ্টি ওঁ-কারের ধ্যান। ধ্যানের পর জপ। এবং জপের পর জপ সমর্পণ। মহানিশার গায়ত্রী যথা -

‘ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ ওঁ তদ্ ব্রহ্মাণ্ড প্রসবাদি কারিণ্যানন্দরূপ বরেণ্যং। ভর্গস্তূরীয়া দেব্যা ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ শ্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ ওঁ॥

বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষায় ‘ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ’ কথার অর্থ -

ইচ্ছাশক্তিশ্চ ভূঃকারঃ ক্রিয়া শক্তি র্ভুবস্তথা।
স্বঃকারঃ জ্ঞানশক্তিশ্চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বরূপকঃ॥

ইচ্ছাশক্তি কালী, ক্রিয়াশক্তি তারা, স্বঃশক্তি ত্রিপুরা॥ কাজেই দেখা যায়, মহাবিদ্যার উপাসনা দ্বারাই সম্যক উপনয়ন জ্ঞান বা গায়ত্রী জ্ঞান সম্ভব। এজন্যই বঙ্গদেশ, নেপাল, কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে উপনয়নের পরেও তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন বেশী। মহাসন্ধ্যার উপাসনার পরই আমি সমস্ত প্রকার যোগের ক্রিয়া আরম্ভ করিতাম। এ সব যোগক্রিয়া শেষ করিয়া মহাবিদ্যার বীজমন্ত্র জপ করিতাম।

স্থূল ভূতশুদ্ধি। এই ক্রিয়া আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর করিয়াছি। প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত বহু বৎসর আমি স্থূল ভূতশুদ্ধির ক্রিয়া করিয়াছি। ইহা আমার সাধনার পথে কোন বিশেষ উপকার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমার মতে ইহা একটি কল্পনার সাধনা। ইহাতে তত্ত্বকথা কমই আছে। ‘‘সাধক আসনে বসিয়াই দেখিবে, সে একটি দ্বীপের উপর বসিয়া আছে। দ্বীপটি ছোট। দ্বীপটিতে বন জঙ্গল ফলের বাগান এবং কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে। ইহাতে পাখীরা হ্রীঁ, শ্রীঁ, ক্রীঁ, ঐঁ বীজের ধ্বনিতে সুন্দর গান করিতেছে। ধীরে ধীরে সাধক দেখিবে দ্বীপটি সমুদ্রজলে ধ্বসিয়া গেল। সাধক জলের উপর বসিয়া রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে জলময় বিশ্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই। সমুদ্রে খুব তরঙ্গ উঠিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগিয়া সাধকের চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। জল শুষ্ক হইল, সাধকের চারিদিকে কেবলই আগুন। এই আগুন শেষকালে সাধকের শরীরকে পোড়াইয়া দিল। যখন আর পোড়াইবার কোনই ইন্ধন রহিল না তখন ছাইটুকুও বায়ুতে উড়িয়া কোথায় চলিয়া ও মিশিয়া গিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বায়ুও সাম্য হইল। কেবল আকাশ রহিল।’’ এই ক্রিয়া করিতে বসিয়া আমার মন বার বার পালাইয়া যাইত এবং কল্পনা হইতে সরিয়া যাইত। কাজেই এই ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াকে আকাশ পর্যন্ত আনিতে আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। আমি কখনই আরাম পাইতাম না, বরং শরীরে জ্বালা হইত। ইহার কারণ, কায়াকাশ ধ্যান সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা ছিল না। আমি গুরুদেবকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘‘মন বার বার পালাইয়া যায় কেন?’’ তিনি বলিলেন, ‘‘মন যত বার পালাইবে, তত বার এই ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া নূতন করিয়া আরম্ভ করিবে।’’ এই ক্রিয়া এবং গুরুদেবের নির্দেশের কথা ভাবিলে আমি এখনও শঙ্কিত হই। কারণ এইরূপ সাধনা আমাকে শান্তি দেয় নাই। সাধক যদি স্থূল ও ভূতশুদ্ধির কল্পনা দুই এক মিনিটে শেষ করিয়া কায়াকাশ ধ্যান করেন তবে ঠিক ঠিক উপকার পাইবেন। কারণ মন গঠনের সঙ্গে আকাশ তত্ত্বের মিল আছে। আকাশ ব্যাপক এবং ফাঁকা, মনও ব্যাপক এবং মনও ফাঁকা উপাদানে গঠিত, সগুণ চেতনাবিশেষ। কায়াকাশের মধ্য দিয়া মনকে যত শীঘ্র ধরা যায় অন্য কোন সাধনায় মনকে এত সহজে ধরা যায় না। স্থূল ভূতশুদ্ধির মধ্যে বহু রহস্যময় অনুভূতির কথা আছে। কিন্তু ইহা লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো ঠিক নয়, এই কথাই মোটামুটি এখানে বলা হইল। সূক্ষ্ম ভূতশুদ্ধির কথা বলিবার পূর্বে যোগের অনেকগুলি ক্রিয়ার কথাও বলিব। সে ক্রিয়াগুলি সবই প্রাণায়ামমূলক।

বন্ধনত্রয় সহযোগে প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম গুরুর আদেশ ভিন্ন করিবে না। মেয়েদের মাসিক কালের দুই এক দিন পূর্ব হইতে ইহার অভ্যাস বন্ধ রাখিতে হইবে এবং মাসিকের নিবৃত্তির পরও দুই-একদিন পর্যন্ত এই প্রাণায়াম করা ক্ষতিকর। এই প্রাণায়ামকারী নারীদের মাসিক ধর্ম ঠিক মত বিনা বাধায় এবং বিনা ব্যথায় নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু মাসিক কালে ইহার অনুষ্ঠান ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ। মাসিক কালে এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে মাসিক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ভয়ঙ্কর জটিল রকমের পেট ব্যথা দেখা দিবে। এই প্রাণায়ামটির কথা গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ঊনত্রিশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রাণায়ামটি অনেকগুলি মুদ্রায় এবং আসনে করিবার বিধি আছে। ইহার লক্ষ্য কুণ্ডলিনী জাগরণ। থুথনীকে (মাথা লটকাইয়া) চিবুক সংলগ্ন করিবে, ইহার নাম ‘‘জালান্ধর বদ্ধ’’। নাভিকে আৎ মারিয়া পিঠের দিকে টানিবে ইহার নাম ‘‘উড্ডীয়ান বদ্ধ’’। মল ও মূত্র দ্বারকে সংকোচ করিয়া উপরে নাভির দিকে টানিবে, ইহার নাম ‘‘মূল বদ্ধ’’।

বীরাসনে উপবেশন কর। বাম গোড়ালীকে মলদ্বারের উপরে স্থাপন কর। দক্ষিণ গোড়ালিকে লিঙ্গমূলে রাখ - এভাবে উপবেশন করার নাম বীরাসন। বীরাসনে উপবেশন করিবার পর হাত দুইটি এমন ভাবে কোলের উপর রাখ যাহাতে কনুই দুইটি দ্বারা পেটের দুইদিকে চাপ দেওয়া যায়। এইভাবে বেশ সোজা হইয়া বসিবার পর কাকচঞ্চুতে বায়ু চার মাত্রায় টানিবে বা পূরক করিবে। পূরক করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঢোক গিলিবে এবং এ বায়ুর সূক্ষ্ম অংশ নাভিস্থানে গিয়াছে ভাবিবে, এবার জালান্ধর বদ্ধ করিবে এবং মূল বদ্ধ করিয়া কনুইদ্বারা পেটের দুইদিকে চাপ দিবে এবং ১৬ মাত্রা কুম্ভক করিবে। কুম্ভক শেষ করিয়া মূলবদ্ধ উড্ডীয়ানবদ্ধ এবং জালান্ধরবদ্ধ ছাড়িয়া দিবে এবং ধীরে ধীরে গলায় ঠেকাইয়া বায়ুকে আট মাত্রায় রেচক করিবে। চার মাত্রায় পূরক, ষোল মাত্রায় কুম্ভক এবং আট মাত্রায় রেচক করিবে। এইভাবে তিনটি প্রাণায়াম করিলে একটি প্রাণায়াম করা হইবে। এই প্রাণায়ামের মাত্রা বৎসরে একটি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ষোল করা চলিবে। ইহার বেশী মাত্রা বৃদ্ধি করিবে না। ইহা মূলাধারকে কম্পিত করে, কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে এবং সুষুম্নাকে প্রবাহিত করে।

মহামুদ্রা এবং মহাবদ্ধ। বন্ধনত্রয় সহযোগে প্রাণায়াম বেশ ভাল ভাবে আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত মহামুদ্রার অভ্যাস আরম্ভ করা ঠিক হইবে না। এক বৎসর কাল বন্ধনত্রয় প্রাণায়াম অভ্যাস করিবার পর মহামুদ্রা অভ্যাস করা কর্তব্য।

দক্ষিণ গোড়ালী গুহ্যদ্বারে রাখ এবং গোড়ালীর উপর সমস্ত শরীরের বোঝা রাখিয়া উহার উপর বস। বাম পায়ের হাঁটু উঠাইয়া পায়ের পাতাটি ভূমির উপর রাখ। হাঁটুটিকে দক্ষিণ এবং বাম হাতে জড়াইয়া ধর। হাঁটুর উপর কোন বস্ত্রাদি থাকিবে না। এ ভাবে বসিয়া কাকচঞ্চু মুদ্রায় চার মাত্রায় পূরক কর। পূরক করিবার পরই ঢোক গিলিবে, মুখের থুতি মাথা লটকাইয়া চিবুক সংলগ্ন করিবে। বাম পা-টি সোজা করিয়া সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিবে। উপুড় হইয়া দুই হাতে বাম পায়ের অঙ্গুলী ধরিবে। এবং উড্ডীয়ানবদ্ধ ও মূলবদ্ধ করিবে এবং ষোল মাত্রায় বায়ু কুম্ভক করিবে। কুম্ভকের পর পায়ের আঙুল ছাড়িয়া দিবে। এবং ধীরে ধীরে বায়ু আট মাত্রায় গলায় ঠেকাইয়া ছাড়িয়া

দিবে। এবার প্রসারিত বামপদ ভাঁজ করিয়া পায়ের পাতাটি ক্রোড়ের উপর আনিবে এবং গোড়ালীটি লিঙ্গমূলে স্থাপনা করিবে। এইভাবে বসিয়া আবার একটি প্রাণায়াম বন্ধনত্রয় সহযোগে করিবে। এবার বাম পায়ের গোড়ালীর উপর বসিবে। ডান পায়ের হাঁটু উপরে উঠাইয়া পায়ের পাতা আসনে রাখিবে। দুই হাতের পাতাদ্বারা হাঁটুটিকে জড়াইয়া ধরিয়া চার মাত্রায় পূরক করিবে এবং জালান্ধরবদ্ধ করিবে। পূরকের পরই ডান পা প্রসারিত করিয়া উপুড় করিয়া দুই হাতের অঙ্গুলী দ্বারা ডান পায়ের অঙ্গুলী ধরিবে এবং উড্ডীয়ানবদ্ধ এবং জালান্ধরবদ্ধ করিয়া সোজা হইয়া বসিবে এবং জালান্ধর উড্ডীয়ান এবং মূলবদ্ধ শিথিল করিয়া ধীরে ধীরে আট মাত্রায় বায়ুর রেচন করিবে। এইবার বাম পায়ের ক্রিয়ার মত দক্ষিণ পদটিকেও ভাঁজ করিয়া দক্ষিণ পদের গোড়ালীকে লিঙ্গমূলে স্থাপনা করিবে। হাত দুইটি ক্রোড়ের উপর রাখিয়া দুই হাতের কনুই দ্বারা পেটের দুইদিকে চাপ দিতে পারা যায়, এমন ভাবে রাখিবে। এ ভাবে বসিয়া চার মাত্রায় পূরক করিয়া ঢোক গিলিয়া জালান্ধরবদ্ধ করিবে। এবং মূলবদ্ধ ও উড্ডীয়ানবদ্ধ করিয়া ষোল মাত্রায় কুম্ভক করিবে। কুম্ভক কালে দুই কনুই দ্বারা পেটের দুইদিকে চাপ দিবে। কুম্ভক শেষ করিয়া জালান্ধর, উড্ডীয়ান এবং মূলবদ্ধ শিথিল করিবে এবং আট মাত্রায় বায়ু পূর্ব নিয়মে রেচক করিবে। এবার দুই পায়ের পাতার উপর সমস্ত শরীরের বোঝা রাখিয়া উঠকা হইয়া বসিবে, দুই হাতের পাতা দ্বারা দুইটি হাঁটু জড়াইয়া ধরিবে। এই ভাবে বসিয়া চার মাত্রায় কাকচঞ্চু মুদ্রা দ্বারা বায়ুর পূরক করিবে এবং ঢোক গিলিয়া জালান্ধরবদ্ধ করিবে। আসনে বসিয়া দুই পা প্রসারিত করিবে। দুই পায়ের অঙ্গুলীগুলি দুই হাতে একটু উপুড় হইয়া ধরিবে। এবার উড্ডীয়ানবদ্ধ ও জালান্ধরবদ্ধ করিয়া ষোল মাত্রায় কুম্ভক করিবে। কুম্ভক শেষ হইলে পায়ের আঙুল ছাড়িয়া দিবে, জালান্ধর উড্ডীয়ান এবং মূলবদ্ধ শিথিল করিবে, এবং ধীরে ধীরে আট মাত্রায় বায়ু রেচক করিবে। এইভাবে রেচন শেষ হইবার পর দুই পা মুড়িয়া পদ্মাসনে বসিবে, হাত দুইটি ক্রোড়ের উপর রাখিবে এবং চার মাত্রায় কাকচঞ্চু মুদ্রায় পূরক করিয়া জালান্ধরবদ্ধ করিবে। জালান্ধর করিয়া উড্ডীয়ান ও মূলবদ্ধ করিবে এবং ষোল মাত্রায় কুম্ভক করিবে। কুম্ভক কালে দুই হাতের কনুই দ্বারা পেটের দুই দিকে চাপ দিবে। ষোল মাত্রা কুম্ভক শেষ হইলে জালান্ধর উড্ডীয়ান এবং মূলবদ্ধ শিথিল করিয়া পূর্ব নিয়মে আট মাত্রায় রেচক করিবে। এখানে মহামুদ্রা এবং মহাবদ্ধ একত্র করিয়া লেখা হইল। অভিজ্ঞ গুরু মহামুদ্রা এবং মহাবেধ প্রাথমিক সাধকের জন্য প্রথমটায় মহামুদ্রার অভ্যাস করাইয়া পরে মহাবদ্ধ মিলাইয়া মহামুদ্রা ও মহাবদ্ধের উপদেশ দিতে পারিবেন। বাম পায়ে দুইটি, দক্ষিণ পায়ে দুইটি, উভয় পায়ে একটি অর্থাৎ মোট পাঁচটি, এ ভাবে তিন বার সমগ্র প্রাণায়ামটি সম্পন্ন করিলে, অর্থাৎ পনেরোটা প্রাণায়ামে একটি মহামুদ্রা ও মহাবদ্ধ হয়। গুরুর উপদেশ ভিন্ন ইহার অনুশীলন করা বিপজ্জনক। শাস্ত্রে যেভাবে সংক্ষেপে মহামুদ্রা ও মহাবেধ বর্ণিত হইয়াছে উহাকে অবলম্বন করিয়া এই মহামুদ্রার অভ্যাস করা যায় না। আমি অনেককে বিভ্রান্ত হইতে দেখিয়াছি বলিয়াই একটু বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি লিখিলাম।

এই পনেরোটি প্রাণায়াম লাগাতারে করিতে হইবে। ইহাতে মাঝখানে সাধারণ শ্বাসপ্রশ্বাস করার নিয়ম নাই। বন্ধনত্রয় প্রাণায়াম বেশ ভাল ভাবে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত

মহামুদ্রা ও মহাবদ্ধ করা যায় না। বন্ধনত্রয় ভাল ভাবে অভ্যাস হইতে হয়তো উহার প্রাণায়াম মাত্রা চার হইতে বৃদ্ধি হইয়া পাঁচ হইতে এগারো অথবা বারো ক্রমে বারো মাত্রায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন অবস্থায় মহামুদ্রাও বারো মাত্রায়ই আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ বারো, চব্বিশ, আটচল্লিশ মাত্রায় ইহা সম্পন্ন হইবে। বন্ধনত্রয় প্রাণায়াম ষোল মাত্রায় আসিয়া থাকিলে মহামুদ্রাও ষোল মাত্রায় আরম্ভ হইবে।

মহাবেধ। পদ্মাসনে উপবেশন কর। হাত দুইটি পা এবং তলপেটের ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া আপন আসনের উপর এমন ভাবে রাখ, যাহাতে হাতের মণিবন্ধ দুইটী আসিয়া একটির সঙ্গে অন্যটি সংলগ্ন হয়। হাতের কনুই দুইটি নাভির দুই পার্শ্বে ঠেকিবে। সম্পূর্ণ শরীরের বোঝা হাতের উপর থাকিবে। এইভাবে ঠিক হইয়া উপবেশন কর। এবার চার মাত্রায় (অথবা বন্ধনত্রয় ক্রিয়ায় অভ্যস্ত মাত্রায়) পূরক কর এবং জালান্ধর বদ্ধ কর। জালান্ধর করিবার পরই শরীরের বোঝা হাতের উপর স্থাপনা কর এবং উড্ডীন ও মূলবদ্ধ কর এবং ১৬ মাত্রায় কুম্ভক কর। কুম্ভকের পরই শরীরের বোঝা হাত হইতে সরাইয়া আসনে স্থাপন কর। জালান্ধর উড্ডীন এবং মূলবদ্ধ শিথিল কর এবং ধীরে ধীরে ৮ মাত্রায় রেচক কর। এইভাবে তিনটি প্রাণায়াম কর। ইহার নাম মহাবেধ। বন্ধনত্রয় সাধনার প্রাণায়ামের মাত্রা যতটা আসিবে, মহাবেধ সাধনার আরম্ভও সেই মাত্রায় হইবে। বন্ধনত্রয় সাধনার প্রাণায়ামের মাত্রা ধরিয়াই মহামুদ্রা, মহাবদ্ধ এবং মহাবেধ সাধনা করা কর্তব্য।

বন্ধনত্রয় সম্পন্ন করিয়া দুই চারি মিনিট অপেক্ষা করিয়া মহামুদ্রা ও মহাবদ্ধ করিবে। মহামুদ্রা ও মহাবদ্ধ করিবার পরও দুই চার মিনিট ফাঁক দিয়া মহাবেধ করা ভাল। বন্ধনত্রয়, মহামুদ্রা, মহাবদ্ধ এবং মহাবেধই কুণ্ডলিনী জাগরণের কার্যে ব্যবহৃত হয়। সাধক কুণ্ডলিনী জাগরণের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। মায়ের যখন ইচ্ছা তিনি নিজেই জাগিবেন, এ জন্য কোন চেষ্টা করিতে নাই; তাহাতে মস্তিষ্কে জটিল অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। যাঁহাদের মন খুব উচ্চ স্তরের এবং শক্তিবাদীয় নহে তাঁহাদের কুণ্ডলিনী জাগে না।

নাভিক্রিয়া। গুরুর উপদেশানুসারে "নাভিক্রিয়া" নামক একটি ক্রিয়া আমি অভ্যাস করিতাম। এই ক্রিয়ার কয়েকটি অংশ অত্যন্ত রুক্ষ। এ জন্য আমি ঐ ক্রিয়াটি সম্বন্ধে এখানে বলা বন্ধ রাখিলাম। লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যপরম্পরাতে, শুনিয়াছি, নাভিক্রিয়ার অভ্যাস বেশ ভাল ভাবে প্রচলিত। তাঁহাদের শরীর ও মনের গঠনও বেশ রুক্ষ বলিয়াই আমার ধারণা। রুক্ষ শরীর ও রুক্ষ মন কুণ্ডলিনী জাগরণের অনুকূল নহে। যোনী মুদ্রার অভ্যাসকারীদের নাভিক্রিয়ার অভ্যাসের প্রয়োজন মনে হয় না। যোগের কোন ক্রিয়া বা যোগ অভ্যাসের কোন অনুভূতিই সাধককে দার্শনিক এবং জ্ঞানী করে না। এ সব উচ্চ স্তরের যোগসাধনা নিশ্চয়ই দার্শনিক জ্ঞানের সহায়ক। কিন্তু দার্শনিক জ্ঞানের পথ অন্য প্রকারের। সে সব কথা আমি পরে বলিব।

যোনীমুদ্রা। পদ্মাসনে উপবেশন কর। দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণদ্বয়ের সামনের নরম অস্থিখণ্ডকে পিটিয়া কর্ণদ্বার বন্ধ কর। চক্ষুদ্বয় তর্জনী দ্বারা মৃদু চাপ দিয়া ধর। মধ্যমাদ্বয় দ্বারা দুইটি নাসাপুষ টিপিয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ কর। অনামিকাদ্বয় ও কনিষ্ঠাদ্বয় দ্বারা ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন ওষ্ঠদ্বয় টিপিয়া বন্ধ কর। প্রয়োজন বোধে মুখের পথে বায়ু গ্রহণ

করিবে এবং খুব প্রয়োজন বোধে নাসিকার পথে একটু একটু বায়ু ত্যাগ করিবে। এই ক্রিয়ায় কুম্ভকই বেশী করিতে হয় এবং ব্রহ্মনাড়ীতে মন একাগ্র রাখিতে হয়। এবং ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্ধ্ব পথে একশত বার, নিম্নপথে একশতবার (ওঁ১, ওঁ২, ওঁ৩ ক্রমে) জপ করিতে হয়। এই ক্রিয়ার ফলে নানাপ্রকার জ্যোতি দেখা যায় এবং নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এ সব জ্যোতি এবং শব্দের দিকে মন দিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই। এই ক্রিয়ার পরই দেখা যাইবে মন আশ্চর্য ভাবেই সাম্য হইয়াছে। মনে হইবে, মনটা যেন বেশ বোকা বোকা হইয়াছে। এই ক্রিয়ার পরই দুই হাতের তলাদ্বারা মুখমণ্ডল মস্তিষ্ক ঘাড় পার্শ্ব হস্ত পদ বুক নাভি তলপেট উরু সব হাত বুলাইয়া মাজিয়া দিবে। ইহার ফলে শরীর দিব্য হয়, মনও নির্মল হয়। গীতায় (অঃ ৮, শ্লোঃ ১৩) এই ক্রিয়াটির কথা আছে। যাঁহারা সুস্থ জীবন কালে এইরূপ ক্রিয়ার অভ্যাস করেন না, মৃত্যুকালে তাঁহারা যে ওইরূপে ওঁকার স্মরণ করিয়া শরীর ত্যাগ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ আশা করাই বৃথা।

পেশনক্রিয়া। সোজা হইয়া উপবেশন কর। বায়ু টানিয়া কুম্ভক কর; নাভিকে কেন্দ্র করিয়া বায়ুকে পেটের মধ্যে পেট মোড়াইয়া মোড়াইয়া যাঁতা চালাইবার মত বিশ বার বাম দিকে ঘোরাও এবং বিশ বার ডান দিকে ঘোরাও। ইহার দ্বারা লিভার প্লীহা ও অন্ত্র শক্তিশালী হয়। শরীর নীরোগ থাকে। জঠরানল উদ্দীপ্ত হয়।

বিপরীতকারিণী মুদ্রা। ইহার অন্য নাম শীর্ষাসন। ইহা আমি অভ্যাস করি নাই। ইহা আমার সহ্য হয় না। আমি সর্বাঙ্গ আসন করিয়াছি। সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং যন্ত্রাদির কেন্দ্র মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড মধ্যে স্থিত আছে। ইহার অভ্যাস করিলে সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শক্তিশালী ও সতেজ হয়। গুরুদেব বলেন, ব্রহ্মচর্য পুষ্ট শরীরের বিপরীতকারিণীর প্রয়োজন হয় না। এ সব আসন দুই চার মিনিটের বেশী সময় করিবার প্রয়োজন নাই।

সর্পমুদ্রা, কাকচঞ্চু এবং শ্বানমুদ্রা। সর্পগণ যে ভাবে জিহ্বা (জিহ্বা বাহির না করিয়াও করা যায়) বাহির করিয়া হাঁ করিয়া শীতল বায়ু গ্রহণ করে এবং হাঁ করিয়া গরম শ্বাস ত্যাগ করে উহার নাম সর্পমুদ্রা। ইহা সর্বদা করা যায়। এবং করাও কর্তব্য। বিশেষ করিয়া কঠিন প্রাণায়ামকারীর শরীর নিশ্চয়ই ইহাতে খুব ভাল থাকে; বুক এবং পেটের কোন অসুখ হয় না। বুক এবং পেটে কোন অসুখ থাকিলে সারিয়া যায়। শরীরে বাত ধরে না। ইহা আয়ু বৃদ্ধি করে। শরীরের রং সুন্দর হয়। কাকচঞ্চু কাক এবং পাখীমাত্রই বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে ইহার অভ্যাস করে। ইহাও শরীরকে শীতল রাখে কতকটা সর্পমুদ্রার মত উপকারী। শ্বানমুদ্রা ব্যাঘ্র কুকুর ও সিংহগণ অভ্যাস করে। ইহারও ফল কতকটা সর্পমুদ্রার মতন। জিহ্বা বাহির করিয়া উহার উপর দিয়া হা হা শব্দ করিয়া শীতল বায়ু টানিয়া হা হা শব্দ করিয়া গলার মধ্য দিয়া গরম বায়ু ত্যাগ করিতে হয়। সমস্ত যোগের ক্রিয়া শেষ করিয়া পাঁচ সাত মিনিট সর্পমুদ্রা করিয়া সূক্ষ্ম ভূতশুদ্ধি আরম্ভ করিতে হয়। এ সব মুদ্রা কালে পূর্ণভাবে শ্বাস টানিবে এবং পূর্ণভাবে শ্বাস ত্যাগ করিবে।

সূক্ষ্মভূতশুদ্ধি এবং কুণ্ডলিনী পূজা। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হইলে সূক্ষ্মভূতশক্তি হয় না। সাধকগণ মহাশক্তি কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিবে না। তিনি যে সব

মানসিক ও শারীরিক পরিস্থিতির মধ্যে জাগ্রতা হন সেই সব পরিস্থিতি না আসিলে তিনি জাগ্রতা হন না। পরিস্থিতি পরিপক্ক হইবার পূর্বে যদি তিনি জাগ্রতা হন তবে জানিতে হইবে তিনি ঠিক ঠিক জাগ্রতা হন নাই এবং উহার ফলও সুবিধাজনক হইবে না। ব্রহ্মগ্রন্থি বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইবার একমাত্র শক্তিশালী সাধনা কুণ্ডলিনী জাগরণ। ব্রহ্মগ্রন্থি ও বিষ্ণুগ্রন্থি কতকটা অংশ রাজযোগের পথেও জাগ্রত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব। কিন্তু রুদ্রগ্রন্থি কুণ্ডলিনী না জাগিলে ভেদ হইবে না। ব্রহ্মগ্রন্থি কল্পনা ও আশার গ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ঈর্ষা ও মোহের গ্রন্থি। রুদ্রগ্রন্থি হইতেছে দম্ভ অহঙ্কার আত্মম্ভরিতার গ্রন্থি। যাঁহাদের কথাবার্তায় ও চিন্তাধারায় এ সব গ্রন্থির প্রভাব অত্যন্ত বেশী তাঁহাদিগকে ভাল সাধক বলা যায় না। ক্লাসের ভাল ছাত্র বা ছাত্রীকে দেখিলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক চিনিতে পারেন। সে সব ছাত্র ছাত্রীকে পড়াইতে ও বুঝাইতে শিক্ষকগণের পক্ষে যতটা সুবিধা থাকে বাকসর্বস্ব মূর্খ ছাত্র ছাত্রীকে পাঠ দেওয়া ততটা সুবিধাজনক হয় না।

সাধক মাত্রেরই যোগের অনুশীলন, দীক্ষা, শিক্ষা ও প্রাথমিক সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া বিচার বিবেচনা ও আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থি ও বিষ্ণুগ্রন্থির প্রভাব ক্ষীণ করা প্রয়োজন। বিচার বিবেচনা ও আলোচনায় অন্তঃকরণ যতটা নির্মল করা যায় ততটা নির্মল না হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি ঠিক পথে জাগ্রত হইবেন না। অপুষ্ট ক্ষেত্রে কুণ্ডলিনীর স্পন্দন আসিলে উহার ফল ভাল হইবে না। ইহার ফলে মস্তিষ্কের শক্তি নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে এবং জীবনে মানসিক ব্যাধি দেখা দিবে। শক্তিশালী গুরুতে শ্রদ্ধা এবং মহাশক্তিতে একনিষ্ঠ ভক্তি থাকিলে কুণ্ডলিনী জাগরণ সহজ হয়। সাধক ক্রিয়া করিয়া যাইবেন, স্বাস্থ্য ও মানসক্ষেত্রের বিকারগুলি নির্মূল করিবার দিকে দৃষ্টি দিবেন এবং যতটা সম্ভব নিশ্চিন্ত মনে সাধনার অভ্যাস করিবেন। কুণ্ডলিনী জাগরণের সব ক্রিয়াই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পন্ন; কিন্তু এসব ক্রিয়ার মধ্যে যদি নিজের গভীর ভক্তি এবং গুরুস্নেহ মিশ্রিত না হয় তবে কুণ্ডলিনী জাগরণ হওয়া কেবল কঠিনই নহে, এ সব ক্রিয়া সাধকের শরীর ও মনকে রুক্ষ করিয়া দিবে। এ জন্য কুণ্ডলিনী জাগরণের ক্রিয়ার সঙ্গে কুণ্ডলিনী ধ্যান ও পূজা ও স্মরণের মাধ্যমে ভক্তিভাব বৃদ্ধির চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য পূর্ব পূর্ব গুরুগণ উপদেশ করিয়াছেন।

মূলাধার কেন্দ্রের একটু নিম্নে কন্দর্প নামক স্থির বায়ুপীঠ বিদ্যমান। এই বায়ুপীঠে মন স্থির হইয়া এবং মূলবদ্ধ ক্রিয়া হইবার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলিনী জাগিয়া যাইবেন। আমার যখন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হইয়াছিলেন, সেই সময়কার কথা মনে আছে। কয়েক দিন ধরিয়াই মনটা মূলাধারের নিম্নে আকৃষ্ট হইয়া একাগ্র হইতেছিল। এবং বার বার ঐ স্থানে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছিল। শাস্ত্রে কন্দর্প বায়ুকে স্থির বায়ু বলা হইয়াছে। কন্দর্প মানেই আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন স্থির বায়ু। ইহাতে মন সংযুক্ত হওয়া মানেই ওই স্থির বায়ুতে মন মজিয়া যাওয়া। মন মানেই অগ্নি এবং মন মানেই ব্রহ্মা। কন্দর্প বায়ুকে ধ্যান করিয়া সাধক কয়েক বার যং রং বা 'পবন দহন' মন্ত্র স্মরণ করিবেন। যং = বায়ু বা পবন। রং = অগ্নি বা দহন।

আমি শীতলী মুদ্রায় প্রাণায়াম করিতাম এবং বন্ধনত্রয় সহযোগে মুদ্রাদির অনুশীলন করিতাম। যে দিন মহাশক্তি মা জাগ্রতা হন উহার কয়েক দিন পূর্ব হইতেই মূলাধারের নিম্নে কন্দর্পের প্রভাবে মন মজিয়া যাইতেছিল এবং বিদ্যুৎচমকে মূলাধার চমকিত হইতেছিল। ডান নাসায় বা বাম নাসায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া আমি কখনও মুদ্রাদির অভ্যাস করি নাই। তাহাতে আমার কুণ্ডলিনী জাগরণে কোন বাধা আসে নাই। যাহা হউক সাধক স্থির আসনে উপবেশন করিবেন, নিজের ক্রোড়ের উপর হাত দুইখানি চিতভাবে স্থাপনা করিবেন এবং মূলাধার চিন্তা করিয়া ‘‘যং রং’’ বীজ স্মরণ করিবেন এবং ভক্তির সহিত নিত্য শেষ রাত্রির দিকে বা অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবেন। যথা -

‘‘ওঁ ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনিং সূক্ষ্মাৎ মূলাধার নিবাসিনীং।
তামিষ্ট দেবতারূপাং সার্দ্ধ ত্রিবলয়ান্বিতাং।
প্রসুপ্ত ভজনাকারাং স্বয়ম্ভু লিঙ্গমাশ্রিতাং।
বিদ্যুৎ কোটি প্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্বদা কারণ প্রিয়াং॥’’

‘‘মূলাধার নিবাসিনী কুণ্ডলিনী দেবীকে ধ্যান করিবে। তিনি অতীব সূক্ষ্মা। তিনি ইষ্টদেবতার স্বরূপিনী, এবং নিদ্রিত সর্পের আকার বিশিষ্টা, তিনি সাড়ে তিন পাকে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। একসঙ্গে কোটি বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায় তিনি প্রভাযুক্তা হওয়ায় মনে হয়, তিনি যেন বিচিত্র বসন পরিহিতা, তিনি শৃঙ্গারাদি রসে যেন উল্লাসরতা ও সতত কারণ প্রিয়া বা আনন্দরসে বিভোর হইয়া আছেন।’’

কুণ্ডলিনীর মানসপূজা -

মূলাধারে ওঁ লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং ওঁ ক্রীঁ মহাশক্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ
স্বাধিষ্ঠানে ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ ক্রীঁ মহাশক্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ
মণিপুরে ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ওঁ ক্রীঁ মহাশক্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ
অনাহতে ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং ক্রীঁ মহাশক্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ
বিশুদ্ধায় ওঁ হং আকাশাত্মকং পুষ্পং ওঁ ক্রীঁ মহাশক্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ
সমস্ত ব্রহ্মনাড়ীতে ওঁ ক্রীঁ সর্বাত্মকং তাম্বুলং ওঁ ক্রীঁ মহাশক্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ

কুণ্ডলিনীর প্রণাম -

ওঁ নমস্তে দেব দেবেশি যোগীশ প্রাণবল্লভে।
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গবেষ্টিতে।
ওঁ প্রসুপ্ত ভুজাগাকারে সর্বদা কারণ প্রিয়ে।
কামকলান্বিতে দেবি মমাভীষ্টং কুরুচ -
অসারে ঘোর সংসারে ভবরোগাৎ কুলেশ্বরি।
সর্বদা রক্ষ মাং দেবি জন্ম সংসার বন্ধনাৎ॥

‘‘ওঁ আনন্দরূপাং (প্রকাশমানাং) প্রথম প্রয়াণে প্রতিপ্রয়াণেহেপ্য মৃতায়মানাং

অন্তঃপদব্যোমনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপমবলাং প্রপদ্যে॥"
ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে...

ভূতশুদ্ধি। শাস্ত্রে ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ প্রসিদ্ধ আছে। উহার প্রথমটিকে এক নম্বর ভূতশুদ্ধি বলিব।

১নং ভূতশুদ্ধি -

"স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা "হংসঃ" ইতি মন্ত্রেণ কুণ্ডলিনীং জীবাত্মানং বৈলোম্যেন চতুর্বিংশতি তত্ত্বানি (লয়ানি বিভাব্য) চ সুষুম্নাবর্ত্মনা শিরোঽবস্থিত পরমাত্মনি পরম শিবে সংযোজ্য, হ্রীঁ কারং রক্তবর্ণং নাভৌ ধ্যায়েন পুরকেন তস্য ষোড়শবার জপেন তদুদ্ভুতেন অগ্নিনা লিঙ্গশরীরং সংদহ্য "স্ত্রীঁ"কার পীতবর্ণং হৃদি চিন্তয়ন্ কুম্ভকেন তস্যা চতুষষ্ঠি বার জপেন তদুদ্ভুতেন বায়ুনা ভস্ম প্রোৎসার্য্য "হূঁ"কার শ্বেতবর্ণং শিরসি ধ্যানেন রেচকেন তস্য দ্বাত্রিংশবার জপেন তদুদ্ভুতেন অমৃতেন তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা সমস্তং অপগতবাশুং নির্মলং দেবতাভেদেন চিন্তয়েৎ॥"

নিজের ক্রোড়ে উত্থান ভাবে হস্তদ্বয় রক্ষা কর। "হংসঃ" ইতি মন্ত্রে জীবাত্মারূপী কুণ্ডলিনীকে বিলোমভাবে উত্থান করাইবে। উহাতে ২৪টি তত্ত্ব লয় (বিলীন) হইয়াছে ভাবিবে এবং সুষুম্না পথে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মস্তিষ্কে অবস্থিত পরমশিবরূপী পরমাত্মাতে সংযুক্ত হইয়াছেন ভাবিবে। এইরূপ ভাবিবার পর নাভিস্থানে রক্তবর্ণ "হ্রীঁ" কার ধ্যান করিয়া ১৬ মাত্রায় পূরক করিবে এবং পূরক করিতে করিতে ভাবিবে এই অগ্নিতে সাধকের লিঙ্গ শরীর দগ্ধ হইয়াছে। এবার সাধক হৃদয়স্থানে পীতবর্ণ "স্ত্রীঁ"কার ধ্যান করিবে এবং ৬৪ মাত্রায় কুম্ভক করিবে এবং ভাবিবে হৃদয়-উত্থিত বায়ুদ্বারা ভস্মীভূত সমস্ত ভস্ম উড়িয়া বায়ুতে বিলীন হইয়াছে। এবং মস্তিষ্কে শিবপিণ্ডে শ্বেতবর্ণ হূঁকার ধ্যান করিবে এবং ৩২ মাত্রায় রেচক করিবে। এবং ভাবিবে সেই হূঁকার হইতে উদ্ভূত অমৃতে সমস্ত শরীর ও মন প্লাবিত হইয়া সেই অমৃতের ধারায় নিজের অহংরূপী কারণ শরীর অমৃতের স্নানে নির্মল হইয়া, উহা নিজ ইষ্টদেবতার রূপে পরিণত হইয়াছে। এখানে প্রাণায়ামে ১৬, ৬৪, ৩২ মাত্রার কথা বলিয়াছেন। সাধক যে মাত্রায় প্রাণায়াম করিয়া অভ্যস্ত সেই মাত্রায় প্রাণায়াম করিলেই চলিবে। ৪, ১৬, ৮ মাত্রায় হইলেও চলিবে। জাগরণকালে কুণ্ডলিনী এত দ্রুত স্পন্দিত হন যে সে সময় সেই স্পন্দনের মধ্যে কোন চক্রে কি ক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় উহা ধরিবার শক্তি জীবের মন বা জীবের বুদ্ধি রাখে না। মূলাধার ধ্যান এবং প্রাণায়াম ও মুদ্রাদির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মা কখন জাগিবেন ইহা কেহ জানে না। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি, ধারণা, ধ্যান, একাগ্রতা ও মুদ্রা প্রাণায়ামাদির প্রভাবে সৃষ্ট হইয়া কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। এবং তিনি অতি দ্রুত (নিমিষার্ধে) সুষুম্না ভেদ করিয়া সহস্রার প্রবেশ করেন। তাঁহার গতি অতি দ্রুত চক্রাকারে অনুষ্ঠিত হয়। কুণ্ডলিনী জাগরণ বিষয়ে সত্য ঘটনা ইহাই। ইহা হওয়া সত্ত্বেও কুণ্ডলিনী জাগরণ ও ভূতশুদ্ধির ক্রিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। সন্ধ্যা পূজাদিতে উহার প্রয়োগও আছে। কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বাদ দিয়া এখন ক্রিয়াটি কি ভাবে অনুষ্ঠিত

হইবে এবং সাধক কি ভাবে নিত্য ইহার অভ্যাস করিবেন, সেই বিষয়টা আমাদের আলোচনা করা কর্তব্য। আমরা ক্রিয়াটিকে সহজ করিবার চেষ্টা করিব।

বৈদিক সন্ধ্যায় প্রাণায়াম কালে মহাব্যাহৃতি স্মরণ করিবার নিয়ম প্রবর্তিত আছে। নাভিতে রক্তবর্ণ ব্রহ্মার ধ্যানসহ মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে পূরক, হৃদয়ে নীলবর্ণ বিষ্ণুর (এখানে ভূতশুদ্ধি মন্ত্রে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে) ধ্যান করিয়া মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে কুম্ভক করিতে বলিয়াছে। এবং রেচক কালে মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ধ্যানে শ্বেতবর্ণ শিব ধ্যান করিয়া মহাব্যাহৃতি স্মরণ সহ রেচক করিতে বলা হইয়াছে। এই ভাবে তিন বার প্রাণায়াম করিতে হয়। এই ভূতশুদ্ধি অনুষ্ঠানেও হ্রীঁকার স্বরূপ রক্তবর্ণ নাভিধ্যান, স্ত্রীঁকার স্বরূপ পীতবর্ণ অনাহতকেন্দ্র ধ্যান এবং হূঁকার (নিরালা ঈশ্বর) স্বরূপ শ্বেতবর্ণ অমৃত ধ্যান মস্তিষ্ক কেন্দ্রে করিতে নির্দেশ দিয়াছে।

ভূতশুদ্ধি মন্ত্রে পূরক কালে রক্তবর্ণ অগ্নির প্রভাবে সাধকের লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধিভূত করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এত সব কল্পনার প্রয়োজন নাই। নাভিপদ্মে রক্তবর্ণ শিবলিঙ্গ বা রক্তবর্ণ ব্রহ্মার ধ্যানই যথেষ্ট। মন্ত্রসহ একাগ্র মনে ইহা সাধিত হইলে, সমস্ত শরীরে ও মানসক্ষেত্রে ইহার প্রভাব পড়িবেই। নাভিচক্রকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শরীরে অগ্নিকণা পরিবেশিত হয়। নাভিকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শরীরই গরম থাকে। এই অগ্নিময় শরীর বা উত্তাপময় শরীর ধ্যানই যে ভূতশুদ্ধির পূরক ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের শরীরকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শরীরে ও যন্ত্রে একটা বায়ুময় দেহ অবস্থিত আছে। একমনে এই বায়ুময় শরীরের কেন্দ্র হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শরীরকে বায়ুময় দেখাই এই পূরক ক্রিয়ার লক্ষ্য। বৈদিক পূরক ধ্যানে বায়ুকেন্দ্রকে নীলবর্ণ বলা হইয়াছে। এখানে ভূতশুদ্ধির ধ্যানে ইহাকে পীতবর্ণ বলিতে চান। বায়ু যখন কোন বস্তুকে শোষণ করে তখন উহা পীত বা পাটকিলে বর্ণ হয়। "স্ত্রীঁ" বীজে পীতবর্ণের প্রভাব বেশী (দ্রঃ ক্রমবিকাশের ৭ম অধ্যায়)। যাহা হউক, হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শরীরে বায়ুর প্রভাব হইয়া থাকে। স্নেহ এবং ভালবাসা বায়ুদেবতার সর্বজীবে প্রিয়রূপ। স্নেহ ও ভালবাসার রূপ ফুরাইয়া গেলে বায়ুদেবতার রূপে পীতবর্ণের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। যাহা হউক, হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া সাধকের সমস্তটা শরীরই বায়ুময়, সাধক ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। এই বায়ুতে যদি ভালবাসার ছাপ শেষ হয় তবে সাধক শিবত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন। এইজন্য পীতবর্ণ বায়ু ধ্যানের উপর ভূতশুদ্ধি অধিক জোর দিয়াছেন। আমি আবাল্য নীলবর্ণ বিষ্ণুধ্যানেই অভ্যস্ত ছিলাম, কাজেই আমি নীলবর্ণ সরস বিষ্ণুধ্যানই করিতাম। সাধকদশায় কোন কথারই ভেদ বুঝিতাম না, এখন সব কথারই ভেদ ও লক্ষ্য বুঝা যায়। রেচক কালে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডে অমৃতময় শিবধ্যান বৈদিক প্রাণায়ামেও রহিয়াছে। এখানে ভূতশুদ্ধি মন্ত্রে ঐ স্থানে "হূঁ"কার রূপী অমৃতময়ের ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। এবং সেই অমৃতে সমস্ত শরীর, মন ও প্রাণ প্লাবিত হইয়া সাধকের সমস্ত আকৃতি প্রকৃতি ও শরীর জুড়িয়া অভীষ্ট দেবতার রূপ ধ্যানের কথা ভূতশুদ্ধি মন্ত্রে বলিতেছেন।

গুরুদেব বৈদিক প্রাণায়াম কালেও বন্ধনত্রয়ের অভ্যাস করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। বৈদিক প্রাণায়ামে পূরক, কুম্ভক, রেচকের মাত্রা সমান থাকে। আমি নিত্য অনেক মুদ্রাদির অভ্যাস করিতাম এবং মুদ্রাগুলি আমি সবই কাকচঞ্চু মুদ্রায় ১, ৪, ৮ মাত্রা

হিসাবে করিতাম। বৈদিক প্রাণায়াম নাক টিপিয়া করিতে হয়। বৈদিক প্রাণায়ামে পূরকে রক্তবর্ণ ব্রহ্মার ধ্যান নাভিচক্রে, কুম্ভকে নীলবর্ণ বিষ্ণুধ্যান হৃদয়চক্রে এবং রেচকে মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ডে শ্বেতবর্ণ শিবধ্যান করিয়া আমি সন্ধ্যানুষ্ঠানের প্রাণায়াম করিতাম। রেচক হইবার পর আমার শরীর, মন, প্রাণ সবই স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। আমার মন ফাঁকা ও ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। ইহা আমি নিত্য অনুভব করিতাম। গুরুদেব বৈদিক প্রাণায়ামেও বন্ধনত্রয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমি তান্ত্রিক প্রাণায়ামে বন্ধনত্রয় করিতাম বলিয়া বৈদিক প্রাণায়ামে বন্ধনত্রয় করিতাম না। বন্ধনত্রয় সহ বৈদিক প্রাণায়াম করিয়া আমি আরামও পাইতাম না। ইহার দুইটি কারণ ছিল। (১) মাত্রা বিভ্রাট। (২) রেচকান্তে শান্তি ও স্নিগ্ধতার অভাব। বন্ধনত্রয়সহ প্রাণায়াম করিবার সময় ৪, ১৬, ৮ মাত্রার হিসাব যেমন স্বাভাবিক ও সিদ্ধ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল, ঠিক তেমনিই নাক টিপিয়া বৈদিক প্রাণায়ামে ও রেচনান্তে শান্তি ও স্নিগ্ধ ভাবের প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া যাইত। রেচকান্তে মন যেন সর্ব প্রকার বোঝাহীন হালকা ও কষ্টভোলা হইয়া যাইত। মন একটা ফাঁকা ও আরাম-জগতে আত্মহারা হইত। আমার শরীরে আত্মভাবটা যেন যাপ্য হইয়া যাইত। ফাঁকা ও আরাম বিশ্বের মধ্যে মন কতকটা আত্মহারা হইয়া, এবং একটু একটু ব্রহ্মনাড়ীতে নিম্নমূলী ধারা ধরিয়া, আমি সন্ধ্যার বাকী অনুষ্ঠানগুলি শেষ করিয়া গায়ত্রী জপ করিতাম। নিজের অভিজ্ঞতায় আমি ইহাই বুঝিয়াছি, বন্ধনত্রয় সহযোগে মুদ্রা ও প্রাণায়াম করা ভাল। কিন্তু এই প্রাণায়ামে পূরক, কুম্ভক ও রেচকে শরীর তেজপূর্ণ ও গরম হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে কুণ্ডলিনী জাগরণ ক্রিয়া। যাঁহারা ঐ ভাবে মুদ্রাদির অনুশীলন করেন তাঁহাদের পক্ষে সম মাত্রায় বৈদিক প্রাণায়ামের সঙ্গে বন্ধনত্রয় সহ অভ্যাস করিবার প্রয়োজন নাই। পূরক কালে, ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠানে, নাভিস্থিত অগ্নিদ্বারা স্থূল শরীর ভস্মীভূত করিবার কথা আছে, হৃদয়স্থিত বায়ু দ্বারা সেই ভস্মের ছাই উড়াইয়া দিবার কথা আছে। শেষকালে রেচক কালে মস্তিষ্কস্থিত অমৃত প্লাবনে পাপ বিধূরিত হইয়া অমৃতময় হইবার কথা আছে। বৈদিক সন্ধ্যার প্রাণায়ামে নাভিচক্রে রক্তবর্ণ ব্রহ্মার ধ্যানসহ পূরক এবং হৃদয়ে নীলবর্ণ বিষ্ণুর ধ্যানসহ কুম্ভকে কি ফল হইত আমি উহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু রেচকান্তে অমৃতের স্নিগ্ধস্পর্শ আমার শরীর, প্রাণ ও মনকে যে প্লাবিত করিয়া দিত ইহাতে একটুও সন্দেহ নাই। রেচকান্তে শরীরের চেষ্টা ও মন অবসর পায় বলিয়া উহার ফল বুঝা যাইত। পূরক ও কুম্ভক কালে শরীরের ও মনের চেষ্টা থাকে বলিয়া হয়তো উহা বুঝিবার সুযোগ হইত না, কিন্তু উহার ফল নিশ্চয়ই হইত।

উপনিষদ বলেন,

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব,
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ। কঠ ৯৫॥৯॥

যেমন অগ্নি এক, তিনি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকটি রূপের মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং ব্যাপক আকাশরূপেও স্থিত আছেন; ঠিক সেইরূপ, সর্বভূতান্তরাত্মা এক হইলেও তিনি প্রত্যেকটি রূপের সঙ্গে এক হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং প্রত্যেকটি রূপকে অতিক্রম করিয়া ব্যাপক রূপেও (আকাশের মতন) অবস্থিত আছেন।

উপনিষদ আবার বলেন,

বায়ুর্যথেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব॥

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ কঠ ৯৬॥১০॥

যেমন বায়ু এক, তিনি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেকটি রূপের মূর্তি ধারণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি রূপের বাহিরেও ব্যাপকভাবে (আকাশের মতন) অবস্থিত আছেন, ঠিক সেইরূপ পরমাত্মা প্রত্যেকটি রূপের রূপ ধারণ করিয়াও ব্যাপকরূপে অবস্থিত আছেন।

নাভিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সমস্ত শরীরে ও যন্ত্রে অগ্নিতত্ত্ব ক্রিয়াশীল। এই অগ্নিতত্ত্ব শরীরকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত বিশ্বে ব্যাপকভাবে অবস্থিত। সাধকের ভূতশুদ্ধি মন্ত্রে পূরক ক্রিয়ার সঙ্গে এই অনুভূতিই জড়িত। আমাদের হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সমস্ত শরীরযন্ত্রে ও মানসক্ষেত্রে যে বায়ুক্রিয়া বিদ্যমান, সেই বায়ু শরীরের বাহিরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও ব্যাপ্ত আছে। ভূতশুদ্ধির কুম্ভক ক্রিয়ার লক্ষ্য শরীর, অন্তর ও বহির্জগৎব্যাপী এই বায়ুব্রহ্মের সংস্পর্শে আসা।

আমাদের মস্তিষ্কমধ্যস্থিত শিবপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া শান্তি ও জ্ঞানময় ঈশ্বর বিদ্যমান। এই জ্ঞানময় ঈশ্বর কেবল আমাদের শরীরের অণুপরমাণুতেই ব্যাপ্ত নহেন, ইনি শরীর ও মানস জগৎকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের অন্তর ও বাহ্যজগতেও ব্যাপ্ত আছেন। ভূতশুদ্ধির ইহাই রেচকক্রিয়া। তিনবার এইভাবে প্রাণায়াম করিতে হয়।

সাধক কায়াকাশ ধ্যান করিবে, ব্রহ্মনাড়ীর চিন্তা করিবে এবং স্থূল ভূতশুদ্ধির নিয়মে মূলাধার চিন্তা করিয়া পৃথিবীমণ্ডল এবং শরীরস্থিত মাটির অংশ চিন্তা করিবেন। স্বাধিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর চারিদিকের জলমণ্ডল দর্শন করিবেন এবং শরীরস্থিত রক্ত রসাদি জলীয়তত্ত্ব স্মরণ করিবেন। তাহার পর মণিপূরকে কেন্দ্র করিয়া শরীরের অগ্নি এবং বিশ্বব্যাপী অগ্নির ব্যাপক অস্তিত্ব বুঝিবেন। ইহার পর অনাহত কেন্দ্রকে স্মরণ করিয়া শরীরস্থিত বায়ুর কার্য্যাবলী ও বিশ্বব্যাপী বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করিবেন। ইহার পর কণ্ঠচক্র ও আজ্ঞাচক্রটি শিবপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সমস্ত শরীরে ও মানসক্ষেত্রে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান ও শান্তির ধারা যে ভাবে বিদ্যমান উহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীতত্ত্বে আসনে উপবেশন করিবার পর জলতত্ত্বে মন দিবেন, স্বাধিষ্ঠান কেন্দ্র ও জলতত্ত্বে মন দিবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অস্তিত্ব অন্তর্হিত হইবে। মণিপুর চক্র এবং অগ্নিতত্ত্বে মন দিবার সঙ্গে সঙ্গে জল শেষ হইয়া যাইবে। শান্তি ও জ্ঞানের আধার কণ্ঠচক্র এবং আজ্ঞাচক্রে মন দিবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসাম্য হইবে এবং শান্তি ও অমৃতধারা সমস্ত শরীর ও মনকে প্লাবিত করিবে। এবং স্বভাবতঃই বাহ্য ও অন্তর ক্ষেত্র শান্তি ও অমৃতে প্লাবিত হইবে। কায়াকাশ ও ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবে স্থূল ভূতশুদ্ধির কার্য তিন চার মিনিটের মধ্যে শেষ করিয়া সূক্ষ্ম ভূতশুদ্ধির জন্য প্রাণায়াম করিবেন। পূরকে রক্তবর্ণ নাভিচক্র, কুম্ভকে নীলবর্ণ হৃদয়চক্র এবং রেচকে শ্বেতবর্ণ শিবপিণ্ড ধ্যান করিবেন। এই ভাবে পূরক কুম্ভক ও রেচক সহ তিনটি প্রাণায়াম করিয়া ৩নং ভূতশুদ্ধির নিয়মে ভূতশুদ্ধি করিবেন।

শাস্ত্রমতে অন্যপ্রকারের ভূতশুদ্ধির কথা। ইহা ২নং ভূতশুদ্ধি। ওঁ (মূল) ভূত শৃঙ্গটাচ্ছিরঃ সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরমশিব পদে যোজয়ামি স্বাহা॥ ১॥ ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥ ২॥ ওঁ রং সংকোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ

পরমশিব স্বষুম্না পথেন মূল শৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা॥ ৪॥

ওঁ মূলাধারস্থিত জীবশিবরূপী ত্রিকোণ শক্তিকে মস্তিষ্কস্থিত পরমশিবরূপী ত্রিকোণ পরমশিবে আমি স্বাহা মন্ত্রে যুক্ত করিতেছি॥ ১॥ (এখানে স্বাহা মানে জীব ভাবের অভাব এবং পরমাত্ম ভাবের পুষ্টি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সাধকের জীবভাব শেষ হইল এবং পরমাত্ম ভাবের প্রতিষ্ঠা হইল।)

ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥ "হে বায়ুশক্তি, আপনি আমার লিঙ্গ শরীর শোষণ করুন শোষণ করুন, আপনাকে স্বাহা মন্ত্রে আত্মদান করিতেছি।"

১ নং ভূতশুদ্ধিমন্ত্রে প্রথম রক্তবর্ণ অগ্নিশক্তির কথা প্রথমেই এবং বায়ুরূপী মহাশক্তির কথা দ্বিতীয়বারের মন্ত্রে ছিল। এখানে উহার বিপরীত কথা আছে। এখানে বায়ুকে প্রথম এবং অগ্নিকে দ্বিতীয়বার স্থান দেওয়া হইয়াছে। মূলাধার পদ্মের নিম্নে কন্দর্প বায়ু বিদ্যমান। এই বায়ু স্পন্দিত হইলেই সমস্ত শরীরে স্পন্দন ও শিহরণ হয় এবং সে সঙ্গে মূলবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ মানেই মহাশক্তিরূপা অগ্নিশক্তির ঊর্ধ্বগমন। এইজন্যই ২নং ভূতশুদ্ধি মন্ত্রে বায়ু স্পন্দনের পর অগ্নির স্পন্দনের কথা আছে। যথা - ওঁ রং সংকোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা। এখানে সংকোচ শরীর মানে স্বষুম্না মার্গস্থিত কফে গড়া ব্রহ্মনাড়ী। অগ্নি ও বায়ু মিলিত স্পন্দনে এই কফ কতকটা জ্বলিয়া যায় এবং কতকটা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অন্যান্য নাড়ীতে চলিয়া যায় এবং সর্দির আকারে সেইসব কফ বাহির হইয়া যায়। আমার ব্যক্তিগত জীবনে ইহাই হইয়াছিল।

শেষ মন্ত্র :- ওঁ পরম শিব স্বষুম্না পথেন মূলশৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা॥ "হে পরমশিব, আপনি স্বষুম্না পথে মূলাধারস্থিত ত্রিকোণ শক্তিকে উল্লসিত করুন; প্রজ্বলিত করুন প্রজ্বলিত করুন; আপনি হংসঃ স্বরূপ এবং আপনি সোঽহম্ স্বরূপ, আপনাকে আমি স্বাহা মন্ত্রে আত্মদান করিতেছি।"

পরম শিবের কৃপায় যেভাবে মূলাধার কম্পিত হইয়া উল্লসিত হন এবং যেভাবে মূলাধারে অগ্নিসম বিদ্যুৎ কম্পিত হইয়া বজ্রনাড়ীরূপা কুণ্ডলিনীশক্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সহস্রারে গমন করেন, এই মন্ত্রে সব লক্ষণ সহ উহার বিস্তৃত বিবরণ বলা হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, কুণ্ডলিনী জাগরণই সূক্ষ্ম শুদ্ধির মূল কথা।

সাধক কন্দর্প বায়ুপীঠে পবন দহন বীজ "যং রং" স্মরণ করিবেন এবং এই ২নং ভূতশুদ্ধি মন্ত্রগুলি পাঠ করিবেন এবং পূরকে হূঁ, কুম্ভকে হংসঃ এবং রেচকে সঃ মন্ত্র স্মরণপূর্বক বন্ধনত্রয় সহযোগে প্রাণায়াম করিবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিস্তারিত ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান করিবেন। নিম্নস্থ এই ভূতশুদ্ধির ক্রিয়াকে আমরা ৩নং ভূতশুদ্ধি নাম দিলাম।

৩ নং ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া। ৩নং ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠানে যে সব মন্ত্র আছে, উহার আলোচনা দ্বারা কোন স্তরের বিকাশে কিরূপ মনস্তত্ত্ব বিদ্যমান উহা বুঝিতে পারিবেন। কুণ্ডলিনী জাগরণ হইল, কিন্তু মনস্তত্ত্বের কোনই পরিবর্তন হইল না, এইরূপ পরিস্থিতিতে বুঝা যাইবে, আসলে কুণ্ডলিনীর জাগরণই হয় নাই। অথবা কুণ্ডলিনীর জাগরণকে সাধক

কোন কাজে লাগান নাই এবং তিনি পুনঃসুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হইবার পরই বহুদিন ধৈর্য ধরিয়া অনুশীলন করিলে ৩নং ভূতশুদ্ধির সব মর্মই অনুধাবন করা সম্ভব। মূলাধারাদি প্রত্যেক চক্রেই সৃষ্টি ক্রিয়া এবং বিলীন ক্রিয়া সর্বদা হইয়া চলিয়াছে। বিলীন ক্রিয়া বুঝাই ভূতশুদ্ধি। যজ্ঞবিধিতে বহ্নি চেতনার উদ্বোধন ক্রিয়ায় একটি মন্ত্র আছে, যথা "ওঁ চিৎ পিঙ্গল, হন হন, দহ দহ, পচ পচ, সর্বং জ্ঞাপয় স্বাহা।" অর্থাৎ হে পিঙ্গলবর্ণ চেতনা স্বরূপ অগ্নি! আপনি হনন করুন হনন করুন (অর্থাৎ বাধাগুলিকে হনন করুন), দহন করুন দহন করুন (অজ্ঞানতা এবং তামসিকতা দহন করুন)। পচ পচ মানে হজম করুন। হজম করা মানে এই ধ্বংস ক্রিয়ায় যাহা প্রয়োজনীয় উহা শরীরের মধ্যে রক্ষা করিয়া অন্য সব উপাদান নষ্ট করুন। এই ভাবে হনন দহন ও পচন কার্যের মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান। প্রত্যেক কেন্দ্রেই নানাপ্রকার উপাদান বিদ্যমান, এইসব উপাদানেই শক্তি আছে। হনন দহন ও পচনে শক্তিকণার ধ্বংস হয় না। বরং শক্তি কণা হনন দহন ও পচন দ্বারা স্পষ্টরূপ ধারণ করে। ফলে সাধক সেই সব জানিয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। ধ্বংসের মধ্য দিয়া জ্ঞানের বিকাশ হয়। কুণ্ডলিনী শক্তিকে সাড়ে তিন প্যাচে অবস্থিত, বলা হইয়াছে। এই সাড়ে তিন পাকের গতিই কুণ্ডলিনী জাগরণ। যজ্ঞবিধিতে অগ্নিকে যজ্ঞকেন্দ্রে সাড়ে তিনবার ঘুরাইয়া যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। কুণ্ডলিনী জাগরণ ও অগ্নি প্রজ্জ্বলন একই প্রকারের ক্রিয়া। ইহার একটি আন্তর কুণ্ডলিনী ক্রিয়া, অন্যটি বাহ্য যজ্ঞ ক্রিয়ার অগ্নি স্থাপনামাত্র।

কুণ্ডলিনী জাগরণে বা মহাশক্তির ঊর্ধ্বগতিতে, কোন চক্রে কিরূপ ধ্বংস বা বিলীন কার্য হয়, উহার মধ্য দিয়াই জ্ঞানের পথ বিদ্যমান! একশতখানা পদ্মপত্র একত্র রাখিয়া একটা সূঁচ ফুটাইয়া দিলে, সূঁচটা একটা একটা করিয়াই পত্রগুলিকে ভেদ করে। ঠিক সেইরূপ তীব্রগতিসম্পন্না কুণ্ডলিনী জাগরণেও প্রত্যেক চক্রেই ভেদনক্রিয়া হয় এবং সেই ভেদন ক্রিয়ার দরুণ বিভিন্ন স্তরে মনস্তত্ত্বের পরিবর্তনও হয়। ৩নং ভূতশুদ্ধির ক্রিয়াতে এই পরিবর্তনের প্রচুর উপাদান আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানকে কেন্দ্র করিয়া এই বিলীন ক্রিয়ারহস্য আলোচনা করিতে করিতে সাধক সহস্রারের দিকে অগ্রসর হইবেন। সুষুম্না, বজ্রা, চিত্রিনী, তাহার পর ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান। মূল কথা, ব্রহ্মনাড়ীই এসব নাড়ী, ইহাদের শাখাপ্রশাখা এবং ষট্চক্রের সঙ্গে জড়িত সমস্ত নাড়ী ও ক্রিয়া, শক্তি ও দেবতা এবং সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয়। সাধক শুধু ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই ভূতশুদ্ধি করিবেন। ইহা সত্য ঘটনা যে সমস্ত বাধা, সমস্ত আবরণ, সমস্ত অনুভূতি ও জ্ঞানের শেষ প্রান্ত হইতেছেন ব্রহ্মনাড়ী; তাহা হইলেও ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র না করিলে ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া ভয়ঙ্কর জটিল হইবে, এবং এ সব ক্রিয়া সাধককে মোটেই আরাম বা তৃপ্তি দিবে না। বহুদিন ধরিয়া সাধকগণ ভূতশুদ্ধি লইয়া অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে আলোচনা করিবেন। যোগের সমস্ত ক্রিয়ার লক্ষ্য মনকে তৃপ্তি দেওয়া এবং মনকে শক্তিমান করা। মনকে যেন কোন প্রকারেই পীড়ন না দেওয়া হয় বা চঞ্চল করা না হয়। যখনই দেখা যাইবে মনের তৃপ্তি কম হইতেছে, তখনই সব ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যাহাতে মনে কোনও প্রকার চাপ না পড়ে এবং মনে তৃপ্তি ও আরাম থাকে এবং ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্যও বুঝা যায়, ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভূতশুদ্ধির

অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। গ্রন্থ পাঠ করিয়া, বিনা গুরুতে ঘরে বসিয়া, সিদ্ধ বা পাগল হইয়াছে এবং বিনা গুরু ও সাধনার অবলম্বনে ছলসিদ্ধ এবং ছল সাধক ও শক্তিবাদী হইয়াছে এমন লোকের সঙ্গে আমার অনেক সাক্ষাৎ হইয়াছে।

প্রাণায়াম করিবার পরই সাধক ভূতশুদ্ধির ক্রিয়া করিবেন। অনেক পুস্তকে ভূতশুদ্ধি করিয়া, পরে প্রাণায়ামের কথা উল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বলা প্রয়োজন, ইহা ভুল নির্দেশ।

ভূতশুদ্ধির প্রথম ক্রিয়া। ব্রহ্মনাড়ীর সর্ব্বনিম্ন প্রান্ত মূলাধার কেন্দ্রে মন দিন। এখানে প্রথম শিব স্বয়ম্ভূ, ইনি ব্রহ্মা। ইঁহার শক্তির নাম ডাকিনী। এই চক্রে বং শং ষং সং এই চারিটি বর্ণ শোভিত চারিটি পত্র আছে। এই পত্রগুলি সোন পুষ্পের মতন পীতাভ লোহিত বা অরুণ বর্ণ। এই পত্রের মধ্যস্থান পীতবর্ণ। ইহাতে লং বীজ আছেন। এই পত্রের সমস্ত বর্ণ ও দেবদেবী ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন, দেখো এবং বল, "ওঁ ব্রহ্মণে পৃথিব্যধিপতয়ে নিবৃত্তি কলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা।" প্রত্যেক চক্রের ইহাই নিয়ম যে সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত জ্ঞান একবার জাগ্রত হয় এবং একবার বিলীন হয়। বিলীন ক্রিয়া বুঝাই ভূতশুদ্ধি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হইলে উদ্ভব বা বিলীন ক্রিয়া বুঝা যায় না। এই মন্ত্রটির অর্থ, নিবৃত্তি কলাত্মক ব্রহ্মাকে হূঁ ফট্ এবং স্বাহা মন্ত্রে আহুতি। হূঁ = অবগুণ্ঠিত। ফট্ = অস্ত্রাঘাতে মৃত। স্বাহা = অগ্নিতে আহুতি বা আত্মদান। অর্থাৎ নিবৃত্তি রূপ সৌন্দর্যে বিভোর মনই কুণ্ডলিনী জাগরণের সর্বপ্রথম মানস লক্ষণ। যাঁহার মনে নিবৃত্তি ভাব নাই, তিনি নামেই কুণ্ডলিনী সাধক, জ্ঞান তাঁহার জন্য নহে। নিজেকে নিবৃত্তিতে আবরিত কর। আমিত্বকে অস্ত্রাঘাতে নিহত কর এবং নিবৃত্তিকলাতে আত্মাহুতি দান কর।

ভূতশুদ্ধির দ্বিতীয় ক্রিয়া। স্বাধিষ্ঠান চক্রে মন দাও। এই চক্রে বং ভং মং যং রং লং এই সব বর্ণাত্মক দল আছে। ইহারা সিন্দুরের মত রক্তবর্ণ। এই পদ্মের মধ্যস্থলে শ্বেতবর্ণ জলাত্মক 'বং' বীজ বিদ্যমান। এই চক্রের অধিপতি বিষ্ণু। ইনি লক্ষ্মী (রাকিনী) সহ অবস্থান করেন। এই বিষ্ণুই দ্বিতীয় শিব। ইঁহার শক্তির নাম রাকিনী। সমস্ত বর্ণ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী এবং বং বীজ সবই ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন; দেখো এবং বল, "ওঁ হ্রীঁ বিষ্ণবে জলাধিপতয়ে প্রতিষ্ঠা কলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা"। নিবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভই 'প্রতিষ্ঠা' কলা। পূর্ব মন্ত্রে যে নিবৃত্তির আরম্ভ ছিল এই মন্ত্রে ঐ নিবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠা জানিত হইবে। আজ এই সাজ সাজিলাম, কাল অন্য রকম চমকে বিভূষিত হইলাম; আজ দিল্লী, কাল আগ্রা, পরশু বিলাত করিলাম, আজ এর সর্বনাশ এবং কাল ওর সর্বনাশ করিলাম, ইহা কোন প্রতিষ্ঠার লক্ষণ নহে। নিবৃত্তিকলায় প্রতিষ্ঠাই ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠা। বাহ্য জগতে নিবৃত্তি না আসিলে অন্তর বিকাশ হয় না, জীবনে তৃপ্তি আসে না। আত্মপ্রতিষ্ঠা, ত্যাগ প্রতিষ্ঠা, সত্যপ্রতিষ্ঠাময় অচঞ্চল জীবনই কুণ্ডলিনী জাগরণের স্বাধিষ্ঠান চক্রলক্ষণ।

ভূতশুদ্ধির তৃতীয় ক্রিয়া। মণিপুর চক্রে মন দাও। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী মণিপুরে আসিলেন, ভাবো। এই চক্রে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই সব বর্ণাত্মক পদ্মদল রহিয়াছে। এই দলগুলি নীলবর্ণ। এই পদ্মের অধিপতিরুদ্র। ইনি রক্তবর্ণ শিব। ইঁহার

শক্তি শ্যামবর্ণা লাকিনী শক্তি। এই পদ্মের মধ্যস্থল রক্তবর্ণ। ইহাতে অগ্নিতত্ত্ব রং বীজ রহিয়াছেন। সবই বহ্নিবীজে এবং বহ্নিবীজ ব্রহ্মনাড়ীতে বিলুপ্ত হইলেন, দেখো; এবং বল - "ওঁ রুদ্রায় তেজোঽধিপতয়ে বিদ্যাকলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা"। অর্থাৎ বিদ্যাকলাত্মক তেজাধিপতিতে হূঁ ফট্ এবং স্বাহা মন্ত্রে সাধকের আত্মাহুতি। কুণ্ডলিনী শক্তি মণিপুরে আসিলে সাধক তেজস্বী হন। যাঁহার তেজ নাই, তিনি ত্যাগী হইতে পারেন না, জ্ঞানলাভের মূল হইতেছে "তেজস্বিতা"। অবিদ্যা ও বিদ্যা জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে তেজস্বী সাধকই বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ। "অবিদ্যান্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরঃ পণ্ডিতস্মন্য মানাং দদ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" কঠ ৩৪॥ ৫॥ "অন্তরে অবিদ্যাই বিদ্যমান রহিয়াছে, নিজেকে নিজে পণ্ডিত মনে করিতেছেন, এইভাবে মূর্খগণ অন্যকেও অবিদ্যা পথে টানিয়া লয়। অন্ধ যেমনভাবে অন্ধকে লইয়া যায়।" কুণ্ডলিনী শক্তি নাভিচক্রে আসিলে সাধকের যেরূপ লক্ষণ হয়, এই মন্ত্রে সাধক নিজেই উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সংসারের কষাঘাতে ও সংঘাতে জর্জরিত নিস্তেজ মানুষকে সংসার আটকাইয়া রাখিতে পারে। কিন্তু তেজস্বী নিশ্চয়ই ত্যাগ দ্বারা সব সংঘাত অতিক্রম করিবেন। যিনি ত্যাগী ও তপস্বী, তিনিই জ্ঞান বা বিদ্যাকলায় বিভূষিত হইবেন। অগ্নি সমস্ত বস্তুকে ধ্বংস করেন, রূপান্তর করেন; কিভাবে রূপান্তর করেন, দেখো। জ্ঞানবিকাশের ইহাই নিয়ম। যজ্ঞমন্ত্রে এজন্যই বলা হইয়াছে "ওঁ চিৎ পিঙ্গল! হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বং জ্ঞাপয় স্বাহা॥" হে পিঙ্গলবর্ণচেতনা! আপনি হনন করুন, দহন করুন, পচন ক্রিয়া করুন। প্রত্যেকটি মন্ত্রেই কলা শব্দ যুক্ত হইয়াছে। কলা মানে আকর্ষণশক্তি সমন্বিত সুন্দরতা। ত্যাগে যাহার আনন্দ নাই সে ত্যাগী হইতে পারে না। অঙ্ক কষিতে যে আরাম পায় না, অর্থাৎ গণিতকলায় যাহার আকর্ষণ নাই, সে অঙ্ক শিখিতে পারে না। সে নিশ্চয়ই অঙ্কে ফেল করিবে। যে সাধকে অন্তরবিকাশে আকর্ষণ নাই, সুন্দরতা নাই, সে সাধনায় কি লাভ করিল?

ভূতশুদ্ধির চতুর্থ ক্রিয়া। কুণ্ডলিনী শক্তি এবার অনাহত চক্রে আসিলেন। এক-একটি চক্রের কলায় সম্যক বিভূষিত সাধক নিশ্চয়ই সেই চক্রভেদ করিবেন। কলা মানেই কলন যোগ্য সৌন্দর্য। কুণ্ডলিনী জাগরণের ইহাই বিশেষতা যে মহামায়া যোগ্যকে আটকাইয়া রাখেন না। এক একটি স্তরের কলাশক্তিতে সাধকের অন্তর বিভূষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া সাধককে উন্নত চক্রে লইয়া আসেন। অনাহত চক্রে কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ বর্ণাত্মক দ্বাদশ দল রহিয়াছে। ইহারা রক্তাভ বর্ণ। এই দলের মধ্য অংশ ধূম্র বর্ণাভ। ইহাতে যং বীজ বিদ্যমান। এই চক্রের অধিপতি ঈশান। ইনি ধূম্রাভ শ্বেতবর্ণ। ইঁহার শক্তি পীতবর্ণা লক্ষ্মী, ইনিই কাকিনী শক্তি। সাধক দেখ, কুণ্ডলিনী শক্তি এই চক্রে আসিলেন এবং এই চক্রের সমস্ত বর্ণ, বীজরূপী যং এবং সমস্ত দেবদেবী ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন। মহাশক্তির আবির্ভাবে সমস্ত কর্তৃত্ব মহাশক্তিতে স্বতঃই আত্মদান করেন। এই বিলীন কার্য দর্শন করিয়া বল - "ওঁ হৌঁ ঈশানায় বায়্বধিপতয়ে শান্তি কলাত্মনে হূঁ ফট্ স্বাহা।" বায়্বধিপতি ও শান্তিকলাত্মক ঈশানে 'হূঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে সাধকের আত্ম আহুতি হইল। বহির্মুখী বায়ুই শারীরিক ও মানসিক অশান্তির কারণ; অন্তর্মুখী বায়ুই শান্তিকলা স্বরূপ। স্নেহ ভালবাসার বায়ু, আশা

আকাঙ্ক্ষার বায়ু, ঈর্ষা বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বায়ু, সন্দেহ রোগ, জলবায়ু, ধুলাবায়ু, অল্পাধিক অনেকেরই থাকে। এজন্য অশান্তিও বেশ ভালভাবেই ভোগ করিতে হয়। কুণ্ডলিনী হৃদয়কেন্দ্রে প্রবেশ করিলে, সব বায়ুই সাম্য হয় এবং অশান্তিও শেষ হয়। কুণ্ডলিনী জাগরণ অধ্যায়ে, দেবাদিদেব মহাদেব যেরূপ বিচক্ষণ সাধনার ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন, উহা সত্যই বিস্ময়কর। বাহ্যবিষয়ে আসক্তিই দুঃখ এবং বায়ু সাম্য হওয়াই ''শান্তিকলা''। গীতায় বলিয়াছেন ''যে হিসংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়ঃ এব তে।'' ''সংস্পর্শজ ভোগ মাত্রই দুঃখের হেতু''। জ্ঞানীজন ঐ পথে পা দেন না। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহত কেন্দ্রে কুণ্ডলিনী প্রবেশ করিলে প্রত্যেক কেন্দ্রেরই চিন্তাধারা বিপরীতমুখী হয়। ইহাই নিবৃত্তি মার্গ বিজ্ঞান। সাধারণ মানব প্রবৃত্তি মার্গী কিন্তু কুণ্ডলিনী সাধক নিবৃত্তি মার্গী।

ভূতশুদ্ধির পঞ্চম ক্রিয়া। সাধকের আর বাহ্য সংস্পর্শজ ভোগে আকর্ষণ নাই। কাজেই সাধককে আর অশান্তিময় বিশ্বে আটকাইয়া রাখিবারও কেহ নাই। কুণ্ডলিনী এবার বিশুদ্ধাখ্য চক্রে প্রবেশ করিলেন। বিশুদ্ধাখ্য চক্রে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ১৬টি বর্ণ রহিয়াছে। ইহারা গাঢ় ধূম্রবর্ণ। এই দলের মধ্যস্থল শুক্ল বর্ণ। ইহা হং বীজাত্মক। এখানে সদাশিব বিদ্যমান। ইনি দশভুজ, শ্বেতবর্ণ, ত্রিনয়ন, পঞ্চমুখ। ইঁহার শক্তি শাকিনী দেবী, ইনি পীতবর্ণা চতুর্ভুজা। সমস্ত বর্ণ, হং বীজ, ও সমস্ত দেবতা ও দেবী ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইলেন, দেখো, এবং বল - ''ওঁ সদাশিবায় আকাশাধিপতয়ে* শান্ত্যতীত কলাত্মনে হুঁ ফট্ স্বাহা।'' শান্ত্যতীত কলাই জ্ঞান কলার আরম্ভ। এখানে আসিলে সাধকের অন্তর এবং বাহির ব্যাপিয়া বার বার ফুটফুটে জ্ঞানের নির্মল জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। কুণ্ডলিনী কোন্ স্তরে আসিলে সাধক কোথায় আসেন, ভূতশুদ্ধিক্রিয়ায় সেই সবই পরিষ্কার বিবৃত হইয়াছে। কুণ্ডলিনী জাগরণ হইলে সাধক কিন্তু আর সাধারণ স্তরের মানব থাকেন না। কুণ্ডলিনী শক্তি যখন জাগ্রতা হন তখন ইহা এক নিমিষের ঘটনা। কিন্তু মহাশক্তি সাধককে যাহা দিয়া যান, উহার অনুশীলন না করিলে, কুণ্ডলিনীর সুপ্তা অবস্থা প্রাপ্ত হইতে বেশী সময় লাগিবে না।

ভূতশুদ্ধির ষষ্ঠ ক্রিয়া। বিশুদ্ধাখ্য চক্র অতিক্রম করিবার পর কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিলেন। এইবার সাধক আজ্ঞাচক্রে মন দাও। মস্তিষ্কের ডান ও বাম ভাগের নিম্নাংশই আজ্ঞাচক্রের দুইটি পত্র। ডান দিকের মস্তিষ্কে হং এবং বাম দিকের মস্তিষ্কে ক্ষং বিদ্যমান। ইহারা নীলাভ শ্বেত বর্ণ। এই চক্রের মধ্যস্থলে ওঁ বিদ্যমান। ইহার বর্ণ পূর্ণ চন্দ্রের উজ্জ্বল আধারে রক্ষিত স্বর্ণ বর্ণ। এই ওঁকারই পরাশিব এবং তাঁহার শক্তি পরাশিবা ষট্‌মুখী যোগিনী দেবী। ইনি সতত যোগারূঢ়া হইয়া উপবিষ্টা আছেন। ইঁহার বর্ণ শ্বেতজ্যোতিযুক্ত। ইনি চতুর্ভুজা, বেদ পুস্তক, নরকপাল, ডমরু জপমালাধারিণী সতত যোগারূঢ়া হইয়া উপবিষ্টা আছেন। কুণ্ডলিনী বা সাধকের জীবনীশক্তি আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিলে, আজ্ঞাচক্রের বর্ণদ্বয়, ওঁকার রূপ আজ্ঞাপীঠ এবং সমস্ত দেবদেবী মহাশক্তি কুণ্ডলিনীতে বিলীন হইলেন, দেখ। এবার কুণ্ডলিনী নিরালম্ব পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এই পুরীতেই গুরুপাদুকা পীঠ। এই পীঠের কথা ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ডে বলা হইয়াছে।

---

* প্রকাশকের নিবেদন। এই অংশটি ''পূজাপ্রদীপ'' গ্রন্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধন করা হয়েছে।

গুরুপাদুকাকে কেন্দ্র করিয়া সাধনা করা আনন্দমঠের প্রধান এবং মর্ম্ম অবলম্বন। গুরুপাদুকার শেষপ্রান্ত সোমচক্র। সোমচক্রের অমৃতধারায় সাধকের শরীর ও সমস্ত বিশ্ব অমৃতময় হইয়া যায়। সোমচক্রের পর অব্যক্তপীঠ। অব্যক্তপীঠের পর শক্তিস্তর বা পুরুষোত্তম স্তর। পুরুষোত্তম স্তরের সক্রিয় নিষ্ক্রিয় স্তর মিলাইয়া ‘‘হং সঃ’’ স্তর। ক্রিয়াহীন নিষ্ক্রিয় স্তরই শুদ্ধ ব্রহ্মনাড়ী। ঠিক ঠিক দার্শনিক স্তর সিদ্ধ সাধকের শেষ বিকাশের স্তরে জানা যায়। কিন্তু ভূতশুদ্ধির ক্রিয়া লয় যোগের কথা। ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্ধ্বগতিই সৃষ্টির লয়। ইহারই ক্রম কুণ্ডলিনী জাগরণে দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মনাড়ীর নিম্নগতিই সৃষ্টি। নিম্নগতিতে সমস্ত চক্রের উদ্ভব এবং ঊর্ধ্বগতিতে সমস্ত চক্র-ক্রিয়া ও মনের ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়া, জানিতে হইবে।

ভূতশুদ্ধির ষষ্ঠ মন্ত্র ‘‘হং সঃ’’। ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্ধ্বগতি হং এবং নিম্নগতি সঃ। ঊর্ধ্বগতিতে সমস্ত সৃষ্টির লয় এবং নিম্নগতিতে সমস্ত সৃষ্টির উদ্ভব। সাধক এবার হং সঃ স্মরণ কর। ইহাই ঠিক ঠিক হং সঃ উপাসনা।

ভূতশুদ্ধির সপ্তম মন্ত্র ‘‘ওঁ’’। উভয় প্রকার গতিহীন এবং ক্রিয়াবিহীন নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই ওঁ। ইহাই ভূতশুদ্ধির শেষ প্রান্ত। উহা বহুদিন অভ্যাস ও পর্য্যালোচনা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়।

সাধক দশায়, কুণ্ডলিনী জাগরণের ক্রিয়াধারায় প্রবেশ করিবার পর মন সহস্রারের নিকটস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, একটা অমৃত বর্ষণ, ঝুর ঝুর করিয়া মেরুদণ্ড পথে সহস্রার হইতে নামিয়া আসিত এবং সমস্তগুলি চক্রের বর্ণগুলি সেই অমৃতে নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইত। নিত্য ইহার অনুভব করিতাম। ক্রমে এই অমৃতের ধারায় সমস্ত শরীর, প্রাণ ও মন সঞ্জীবিত হইত। আমি নবীন মানুষ হইয়া যাইতাম। জ্ঞানের এই অমৃত ধারাকে কি ভাবে সমস্ত অন্তর ক্ষেত্রে এবং বাহ্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে হয়, সমস্তটা ‘‘ন্যাস অধ্যায়’’ সেই কথায় পরিপূর্ণ। এ সম্বন্ধে ন্যাস অধ্যায়ে কিছু বলিব। এখন নিত্য ক্রিয়ার জপ অংশ বলিতে হইবে।

মন্ত্রচৈতন্য ও জপ। ভূতশুদ্ধির পরে মন্ত্রচৈতন্য। মন্ত্রচৈতন্য অর্থে মস্তিষ্কস্থিত গুরুকেন্দ্র, কণ্ঠবক্রস্থিত মন্ত্রকেন্দ্র এবং হৃদয়স্থিত দেবতার কেন্দ্র, তিনটিই নিম্নমুখী গতি সম্পন্ন এক অমৃতময়ী ব্রহ্মনাড়ী দ্বারা ব্যাপ্ত আছে, এইরূপ ভাবনা সহ জপ করিতে হয়। কায়াকাশ ধ্যান সহও এইরূপ মন্ত্রচৈতন্য ধ্যান করা যায়; কিন্তু ইহার ফলে শান্তি কমিয়া যাইবে। কাজেই দীর্ঘ জপে কায়াকাশ ধ্যানে বেশী জোর দিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে অনেক পুরশ্চরণ করিতে হইয়াছিল। কাজেই আমাকে নিবিষ্ট মনে অনেক জপ করিতে হইত। জপ অত্যন্ত আরাম প্রদ সুখের সাধনা। আমি মালাতেই জপ করিতাম। মালাটি আমার অমৃতের সমুদ্র ছিল। অমৃতাত্মক অনামা, তেজাত্মক মধ্যমা এবং জ্ঞানাত্মক অঙ্গুষ্ঠা সহযোগে মালাটি ধরিলেই আমি অন্তরাত্মার স্নেহ ও শান্তিস্পর্শে মজিয়া যাইতাম।

সহজোলী অমরোলী ও ব্রজোলী মুদ্রা। শুনিয়াছি, এই মুদ্রার অভ্যাস বীরাচারী সাধকের মধ্যে কিছু কিছু প্রচলিত আছে। ইহা নরনারীযুক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে অভ্যাস করিতে হয়। এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে যে টুকু কথা লিখিত আছে সেইগুলি সবই ভ্রান্তিপূর্ণ।

আসলকথা, ইহা গুরুগম্য ব্রহ্মচর্য মূলক গুহ্যবিদ্যা। আমি দিব্যাচারী সাধকের পর্য্যায়ের মানুষ। আমাদের মধ্যে ইহার প্রচলন নাই। ঊর্দ্ধমুখী মৈথুনিক সুখগতিই কুণ্ডলিনী জাগরণ। ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান। নরনারীর সংস্পর্শ দ্বারা ইহার কোন সুবিধা হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কুণ্ডলিনী ধ্যানেই "শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসাং" কথা আছে। কুণ্ডলিনী জাগরণে কন্দর্প নামক বায়ুর ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই বাহ্য নরনারী মিলনের সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। আমি অনেক নিকৃষ্ট লোককে এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে শুনিয়াছি এবং দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইতেও শুনিয়াছি। কুণ্ডলিনী জাগরণ সম্বন্ধে ভ্রান্তশিক্ষা এবং ব্রজোলী ক্রিয়ার কুফল হইতে দূরে থাকিবার জন্যই আমি ব্রজোলী মুদ্রা সম্বন্ধে বলিলাম। যে সুখের আকর্ষণে যৌনমিলন হয়, সেই সুখের মধ্যেই দুইটি ক্রিয়া বিদ্যমান। উহার একটিতে সৃষ্টি ও ক্ষয়, অন্যটিতে আনন্দ ও ব্রহ্মচর্য রহিয়াছে।

"ক্ষয় ও সৃষ্টি", "আনন্দ ও ব্রহ্মচর্য" একই নাড়ীর ঊর্দ্ধ ও নিম্নমুখী দুইটি গতি। একই ঘটনার একজন সৃষ্টিকর্তা, অন্যজন ঊর্দ্ধরেতা। কালীধ্যানে ইহাই "বিপরীত রতাতুরা"। সিদ্ধদশায় অনেক মহাপুরুষের প্রারব্ধজনিত অন্য জন্মের দেনা পাওনা মিটাইয়া শেষ মুক্তির পথ করিতে হয়। সিদ্ধ মহাত্মা ইহা দ্বারা দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন এবং কোন কোন ভাগ্যবতী সতীও অন্য জন্মের স্বামীকে সাক্ষাৎ শিবরূপে লাভ করিয়া জ্ঞানী ও জগন্মাতার পদে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারেন; কোন কোন নারী অন্য জন্মের প্রতিশোধও গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন এবং সরিয়া যান।

মানস জপ। মানস জপে মনমালাগঠনের বিজ্ঞান বুঝিতে হয়। এ সব ক্রিয়া কুণ্ডলিনী জাগরণের সঙ্গে সম্বন্ধ জড়িত। মূলাধার আদি ষট্চক্রের বর্ণগুলিই মনমালার এক একটি দানা। কুণ্ডলিনী সূত্রে এই দানাগুলি গ্রথিত আছে এইভাবে ধ্যান করিতে হয়। এই মালাই অনুলোম এবং বিলোম ভাবে জপ করিতে হয়। এইরূপে মালার দানার সংখ্যা ১০০ হয় এবং ইহার সঙ্গে অং কং চং টং তং পং বং এবং শং সংযুক্ত করিলে ১০৮টি দানা হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি সাড়ে তিন পাকে মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ইঁহার দুইটি মুখ। একটি মুখ স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মস্তকের উপর এবং অন্যটি মূলাধারাস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রের নিম্নকোণে অবস্থিত। এই ত্রিকোণ যন্ত্রের মধ্যস্থলে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। কুণ্ডলিনীর যে মুখটি* মূলাধারস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রের নিম্নকোণে অবস্থিত সেই কোণটিই ব্রহ্মনাড়ীর একটি মুখ। এই সাড়ে তিন পাকে বেষ্টিত কুণ্ডলিনীই বজ্রানাড়ী। ইহা কম্পিত হইলেই ব্রহ্মনাড়ীর মুখ খুলিয়া যায় এবং মহাশক্তি কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া যান (ক্রমবিকাশ ৪র্থ খণ্ড দ্রঃ)। কুণ্ডলিনী জাগরণের ঊর্দ্ধগতিতে তিনি চক্রে চক্রে বর্ণমালাগুলিকে বিলোমে গ্রাস করিতে থাকেন। ইহার নাম মানস মালা গঠন। মূলাধার চক্রে সং ষং শং বং, স্বাধিষ্ঠানে লং রং যং মং ভং বং, মণিপুরে ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং, অনাহত চক্রে ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং, বিশুদ্ধায় অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ৼং ৯ং ঋৼং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং,

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের "মূলটি" শব্দটির স্থানে "মুখটি" গৃহীত হল।

আজ্ঞাচক্রে ক্ষং বর্ণের অর্দ্ধাংশ গ্রাস করিবার পর কুণ্ডলিনী শক্তির অন্য মুখ উত্তোলন করিয়া লং বর্ণ উদ্গীরণ করিবেন। এই লংটির উচ্চারণ ড়ং-এর মত। ইহাকে সর্ববর্ণের সমষ্টি বর্ণ বলা হয়। দ্বিদলস্থিত অবশিষ্ট অক্ষর হং-কে গ্রাস করিবেন এবং উদ্গীর্ণ লং বর্ণকে পুনরায় গ্রাস করিয়া তাঁহার ভিন্ন মুখে অর্দ্ধগ্রস্থ ক্ষং বর্ণের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ গ্রাস করিবেন। কাহারও কাহারও মতে এই ক্ষং বর্ণই বর্ণমালার মেরু হইবেন। এই মেরু ক্ষং-কে পরিত্যাগ করিয়া প্রতি মাতৃকা বর্ণের সঙ্গে বীজ মন্ত্র মিলাইয়া (অর্থাৎ ওঁ অং ক্রীঁ ইত্যাদি) অনুলোমে অং হইতে লং পর্যন্ত এবং প্রতিলোমে ক্ষং হইতে অং পর্যন্ত জপ করিলে একশত জপ হইল। তৎপরে অষ্টবর্ণের (স্বরবর্ণ, ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ, অন্তস্থ্য বর্গ, উষ্মবর্গ) আটটি আদি বর্ণের সহিত বিন্দু মিলাইয়া জপ করিলে একশত আটটি বর্ণমালার জপ হইল। ইহাই মানস জপ। মানস জপ আমি যে ভাবে সম্পন্ন করিতাম সে সম্বন্ধে আমি পরে বলিতেছি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ বলা যাইতেছে।

গ্রন্থির্মা কুণ্ডলীশক্তি র্নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্র সমুচ্চরেৎ॥
অকারাদি লকারান্ত মনুলোম মিতি স্মৃতম্।
পুনর্লকার মারভ্যং শ্রীকণ্ঠান্তং মনুঃ জপেৎ॥
অষ্টবর্ণাদ্যষ্টবর্ণৈস্তথা ন্যূন মথাষ্টকম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্তা সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়া॥

“গ্রন্থিহীনা কুণ্ডলিনী শক্তি নাদের শেষ স্তর মেরুস্থানে (মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মনাড়ীরূপে) অবস্থিতা আছেন। সাধক এইরূপ ভাবিবে, এর পরে বিন্দুসহ বর্ণ উচ্চারণ করিয়া প্রতি বর্ণের সঙ্গে মূলমন্ত্র উচ্চারণ (বা স্মরণ) করিবেন। অ হইতে ল পর্যন্ত অনুলোমে স্মরণ করিবেন। পুনঃ ল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকণ্ঠা পর্যন্ত (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কণ্ঠবর্ণ অ) অকার পর্যন্ত বর্ণসহ জপ করিবেন। ইহার পর অষ্টবর্ণের আদি অক্ষরের সঙ্গে মূলমন্ত্র মিলাইয়া ৮ সংখ্যক জপ পূর্ণ করিয়া (অর্থাৎ মোট ১০৮) অষ্টত্তোর শত জপ করিয়া* ধীমান সাধক জপ সমর্পণ করিবেন।”

আমার মানস জপের মেরু ছিল দ্বিদল চক্রের মধ্যবর্তী লং। আমি কুণ্ডলিনীকে মেরুস্থানে বা নাদের শেষ লয় স্থানের পরপারে ভাবিতাম, এবং লং কে মেরুস্থির রাখিয়া হং ক্ষং দ্বিদলে, অং আং ইত্যাদি বিশুদ্ধায়, কং খং ইত্যাদি অনাহতে, ডং ঢং ইত্যাদি মণিপুরে, বং ভং ইত্যাদি স্বাধিষ্ঠানে, বং শং ষং সং মূলাধারে বীজমন্ত্র সহ জপ করিয়া, বিলোমে উপরের দিকে আজ্ঞা পর্যন্ত চলিয়া আসিতাম। আমার মানস জপের মেরু ছিল লং। ক্ষং কে মেরু ভাবিয়া জপ করিতে আমার সুবিধা হইত না। এসব কথা লইয়া মতভেদ করা বা তর্ক করা আমি প্রয়োজনীয় মনে করি না। মানস জপ এক কুম্ভকে করিবার আদেশ আছে। কিন্তু এক কুম্ভকে ঊর্ধ্ব ও নিম্নমুখে ১০৮ বার জপ সুবিধাজনক হয় না। এ জন্য ঊর্ধ্ব ও নিম্নমুখের বর্ণমালার সঙ্গে বীজমন্ত্রের জপ সাধারণ শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শেষ করিয়া শেষ ৮টির জপ এক কুম্ভকে করিলেই সুবিধা হইবে।

---

* প্রকাশকের নিবেদন - “অষ্ট জপ করিয়া” স্থলে “অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া” গৃহীত হল।

মানস জপে মূলাধার আদি চক্রগুলিতে কিছুদিন ধরিয়া অনুলোম এবং বিলোম ভাবে বর্ণধ্যান আয়ত্ত করিতে হয়। অনুলোম এবং বিলোম বর্ণধ্যান আয়ত্ত না হইলে মানস জপ মোটের উপর আরামপ্রদ হইবে না। মানস জপ বেশী করিতে নাই। ১০৮ বর্ণ মানস জপ যথেষ্ট। মূলাধার চক্রে চারিটি বর্ণ, বং শং ষং সং; বিলোমে সং ষং শং বং। স্বাধিষ্ঠান চক্রে ৬টি বর্ণ, বং ভং মং যং রং লং; বিলোমে লং রং যং মং ভং বং। মণিপুর চক্রে দশটি বর্ণ, ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং; বিলোমে ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং। অনাহত চক্রে দ্বাদশটি বর্ণ, কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং। বিলোমে ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং। বিশুদ্ধায় ষোলটি বর্ণ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ, বিলোমে অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং। আজ্ঞাচক্রে হং ক্ষং; বিলোমে ক্ষং হং। সব মিলাইয়া বর্ণ পঞ্চাশ হইল। এই পঞ্চাশটি ভিন্নও আরও একটি মন্ত্র ধরিতে হয়। উহার নাম লং (ড়ং)। এই লং (ড়ং) মানে সব বর্ণের সমষ্টি বর্ণ। আজ্ঞাচক্রের কেন্দ্রে এই বর্ণটির স্থান। এই লং-ই - মালার মেরুস্থান। লংটিকে কেন্দ্র মানিয়া আজ্ঞা হইতে মূলাধার পর্যন্ত বর্ণধ্যান করিতে করিতে নামিয়া আসিতে হয়।

চক্রগুলিকে ডান ও বামদিকে ভাগ করিয়া প্রত্যেক চক্রে প্রথম দক্ষিণার্দ্ধে সামনা হইতে পেছনে বর্ণ ধ্যান করিতে হইবে এবং বামদিকে বর্ণগুলির সংস্থান দক্ষিণার্দ্ধের শেষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া সামনের দিকে ক্রমে আসিবে। অনুলোম ও প্রতিলোমে বর্ণজ্ঞান আয়ত্ত হইবার পর মানস জপ আরম্ভ করিতে হইবে। মূলাধারে ওঁ বং ক্রীঁ ওঁ শং ক্রীঁ ওঁ ষং ক্রীঁ ওঁ সং ক্রীঁ॥ এই নিয়মে প্রত্যেক চক্রে এক একটি বর্ণমালার সঙ্গে মিলাইয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধে অগ্রসর হইবার সময় বর্ণগুলি ব্রহ্মনাড়ীতে বিলীন হইতে থাকিবে এবং আজ্ঞা হইতে নিম্নদিকে জপকালে বর্ণগুলি চক্রে চক্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে। এইভাবে ১০০ সংখ্যক জপ হইবার পর আটটি বর্ণের সঙ্গে বিন্দু সংযোগ করিয়া অং কং চং টং তং পং বং শং এই আটটি দানা সন্নিবিষ্ট হইলে ১০৮ সংখ্যক বর্ণের সহযোগে মানসমালা প্রস্তুত হইল। মূলাধার হইতে ঊর্ধ্বমুখে উঠিবার পর সমস্ত ব্রহ্মনাড়ী ফাঁকা ও শূন্যাকার হইবে এবং ঊর্ধ্ব হইতে নিম্ন মুখে অবতরণ কালে সমস্তটা ব্রহ্মনাড়ীই বর্ণে বর্ণে সজ্জিত হইবে। ইহার পর আটটি আদি বর্ণের সঙ্গে বীজমন্ত্র যুক্ত করিয়া জপ করিলে ১০৮ বার জপ হইল। মানস জপ এক কুম্ভকে করিতে হয়। এতক্ষণ কুম্ভক রাখা সম্ভব না হইলে ঊর্ধ্বমুখে তড়িৎ গতিতে ফাঁকা ব্রহ্মনাড়ী স্মরণ করিবেন এবং আদি বর্ণের সঙ্গে বীজমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। জপান্তে জপ সমর্পণ, যথা :-

ওঁ সর্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতি স্বরূপিণী
গৃহাণান্তর্জপং মাতঃ কুণ্ডলিনী নমোঽস্তুতে॥

হে মাতঃ কুণ্ডলিনী, আপনি সকলেরই অন্তরাত্মায় নিবাস করেন, আপনি সকলের অন্তর্জ্যোতিরূপা, আপনি আমার অন্তর জপ গ্রহণ করুন, আপনাকে প্রণাম।

যদি অনাহত নাদের অনুভূতি থাকে এবং অনাহত নাদ যেভাবে অতিসূক্ষ্ম জ্যোতিরূপা হইয়া মস্তিষ্ক স্থিত মেরুস্থানে প্রতিষ্ঠিত শক্তিনাড়ীতে বিলীন হন, উহা জানা থাকে, তবে মূলাধার হইতে ঊর্ধ্বমুখে চক্রে চক্রে বর্ণমালা বিলয়প্রাপ্ত ফাঁকা ব্রহ্মনাড়ী এবং আজ্ঞাচক্র হইতে নিম্নমুখে চক্রে চক্রে বর্ণমালায় সজ্জিত ব্রহ্মনাড়ীকে স্মরণ করিয়া, আটটি আদি বর্ণের সঙ্গে মিলাইয়া বীজ মন্ত্র জপ করিলেও মানস জপের ফল পাইবেন। প্রথম প্রথম এক কুম্ভকে জপের চেষ্টা না করিয়া স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসেই ঊর্ধ্ব এবং নিম্নমুখে মানস জপ করিয়া শেষ আটটি জপ এক কুম্ভকে করিলেই চলিবে।

মানস জপ বিশেষ শক্তিপ্রদ সাধনা। ইহা বেশী করিবার মোটেই প্রয়োজন নাই। জপ শেষে বা পূজা শেষে মানস জপ, পূজা এবং জপকে শক্তিশালী করে। মানস জপে যদি মনে কোন প্রকার চাপ পড়ে তবে জানিতে হইবে, মানস জপের এখনও সময় আসে নাই। খুব হালকা মনে মানস জপ না হইলে মানস জপের ফল পাওয়া যাইবে না।

প্রথম প্রথম তন্ত্রধারক বা অন্য সাধকের সাহায্য লইয়া চক্রে চক্রে বর্ণমালাগুলিকে অনুলোমে ও বিলোমে আয়ত্ত করিয়া লইলে জপের সুবিধা হইবে।

মানস হোম। মূলাধার চক্রে আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা রেখা চতুষ্টয়ই অগ্নিকুণ্ড। সেখানে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণই অগ্নির আবির্ভাব। এখানে ধর্মাধর্ম হইতেছে হবি। এই অগ্নি সুষুম্না পথে নাভি পর্যন্ত আসিলে প্রথম আহুতি।

১। "ওঁ ক্রীঁ নাভি চৈতন্য রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যম্ অক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥"

আমি নাভিস্থিত চেতনারূপা অগ্নিতে ধর্মাধর্ম হবিদ্বারা মনোময় স্রুবে সর্বদা ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায়কে আহুতিদান করিতেছি।

ঐ অগ্নি সুষুম্না পথে অনাহত কেন্দ্রে আসিলে আহুতি। যথা -

২। "ওঁ ক্রীঁ ধর্ম্মাধর্ম্ম হবির্দান্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যম্ অক্ষ-বৃত্তিজুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥"

"ধর্ম ও অধর্ম রূপ হবিঃ দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মাগ্নিতে মনোময় স্রুব দ্বারা সর্বদা সুষুম্নাপথে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছি।"

অনাহতে অগ্নিকে অধিক উদ্দীপ্ত বলা হইয়াছে। কারণ, ইহা বায়ু বীজের কেন্দ্র। বায়ুর সংস্পর্শে অগ্নি অধিক উদ্দীপ্ত হয়।

৩। ওঁ প্রকাশাপ্রকাশ হস্তাভ্যাং অবলম্বোন্মনী স্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কলাস্নেহ পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥

প্রকাশ এবং অপ্রকাশ রূপ হস্তদ্বয় দ্বারা উন্মনী রূপ স্রুব অবলম্বনপূর্বক তাহাতে ধর্মাধর্ম ও স্নেহকলা রূপ হবিপূর্ণ করিয়া সেই পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করিতেছি।

এই আহুতি, বিশুদ্ধাখ্য চক্র পর্যন্ত প্রজ্জবলিত অগ্নিতে আহুতির কথা। ইহা জ্ঞানচক্র এখানে অগ্নি পূর্ণরূপ লইয়াছেন। এখানে প্রকাশ ও অপ্রকাশ হস্তদ্বয়, উন্মনী মনই স্রুব, ভাবিবার কথা।

৪। ওঁ অন্তর্নিরন্তর নিবিন্ধন মেখমানে

মায়ান্ধকার পরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচি বিকাশ ভূমৌ
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশি বাবসানম্ ॥ স্বাহা॥

"যাহা হইতে অদ্ভুত দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার অন্তরে ইন্ধন ব্যতীয় ও নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত ও প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই অনির্বচনীয় সম্বিৎস্বরূপ অগ্নিতে আমি বসুধা হইতে শিব পর্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমস্ত মায়া প্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিতেছি।"

চতুর্থ আহুতিতে অগ্নি আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া অবস্থিত আছেন। পূর্ব মন্ত্রে অগ্নি ছিলেন জ্ঞানরূপী। এখানে অগ্নি হইতেছেন সম্বিৎস্বরূপ। জ্ঞানজগৎ মানে মাত্র "জ্ঞান জগৎ", সম্বিৎ জগৎ মানে উচ্চ ও নিম্ন সমস্ত স্তরের জ্ঞানের সমষ্টি ও সামঞ্জস্য পূর্ণ ক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্রমানেই মস্তিষ্ক ক্ষেত্র। এখানে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্ঞান-অজ্ঞান বুদ্ধিক্ষেত্র মানসক্ষেত্র ও স্নেহ ভালবাসা, সমস্তের সমাবেশ বুঝিতে হইবে।

৫। ইদং তু পাত্র ভরিতং মহাতাপ পরামৃতং
পূর্ণাহুতি ময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্॥ স্বাহা॥

এবার আমি মহাতাপ এবং শ্রেষ্ঠ (জ্ঞানরূপ) অমৃত দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়াছি, এবার পূর্ণাহুতিময় অগ্নিতে আমি পূর্ণহোম অর্পণ করিতেছি। আমার সব কিছু শেষ হউক।

পঞ্চম আহুতিতে অগ্নি মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছেন এবং সমস্ত প্রকার তাপ (অধিভৌতিক, অধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক তাপ) এবং পরাজ্ঞান সবই তাহাতে মিলাইয়া গেল, ইহাই সাধকের শেষ আহুতি।

এই অন্তর হোম বিষয়েও কিছু কথা বলিবার আছে। দেখা যায়, কুণ্ডলিনী কেন্দ্র হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন উচ্চ স্তরে আসিতেছেন তেমনিই অগ্নির আত্মস্বরূপে নূতন নূতন রূপ ও শক্তি প্রকাশিত হইতেছে। আহুতির উপাদানও বদলাইয়া যাইতেছে। কুণ্ডলিনী মানে সাধকের ইষ্টদেবতা মহাশক্তি। ইনি সাধককে ক্রমে উচ্চ স্তরে আত্মপ্রকাশ করেন।

একটা পশুস্তরের মানুষ যে সমাজ ও ধর্ম স্থাপনা করে সেটা বর্বর ভিন্ন অন্য মানবের অনুকূল হয় না। একটা দুর্বল মানুষ যে সমাজবাদ ও ধর্ম স্থাপনা করে অসুরের পদলেহক মূর্খ ভিন্ন সে সমাজ ও ধর্ম অন্য কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। একজন শক্তিমান জ্ঞানী যে ধর্মের স্থাপনা করেন সে ধর্ম স্তরে স্তরে কিরূপ উচ্চ স্তরের দিকে বিকশিত হইয়া সাধককে উচ্চ স্তরের জ্ঞানী ও শক্তিমান করে, এই অন্তরহোম মন্ত্রে উহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। আনন্দমঠের সাধনায় ফাঁকি নাই। শক্তিবাদ ধর্মেও ফাঁকি নাই। আমি আমার নিত্যকার সাধনাকে কখনও কঠিন মনে করি নাই, এখনও করি না।

মধ্যরাত্রি কৃত্যের পরিশিষ্ট। ভূতশুদ্ধির পর এবং জপের পূর্বে করণীয় কতগুলি ক্রিয়া করিতে হয় উহাদের নাম ন্যাস ক্রিয়া। ন্যাস ক্রিয়া দ্বারা শরীর ও মন শুদ্ধ হয়। সাধকের জ্ঞানময় নবীন জীবন গঠন হয়। ভূতশুদ্ধির শেষে ও জপের পূর্বে ন্যাস করিতে হয়। আমি প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজা করিতাম। সেই সময় সব ন্যাসই বিস্তারিত ভাবে করিতাম। তাহাতেও আমার খুব সুবিধা হইত না। আমি কতগুলি ন্যাস কয়েক মাস

আবার কয়েকটি ন্যাস পুনঃ অন্য কয়েক মাস অভ্যাস করিতাম। আমি প্রায় প্রত্যেকটি ন্যাসের মধ্যেই অনুভূতি এবং শান্তির আলো পাইয়াছি। আমি কালী ও তারা উপাসনার ন্যাসগুলির নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। কারণ যে কোন পূজা-পদ্ধতিতে সেই সব ন্যাসের বিস্তারিত অনুষ্ঠান লিখিত আকারে পাওয়া যায়। সাধারণ পূজা-বিধান দেখিয়া সেই সব অভ্যাস করিতে পারিবেন। ব্রহ্মনাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই ন্যাস অভ্যাস করিবেন।

মাতৃকা ন্যাস, করাঙ্গ ন্যাস, ষড়ঙ্গ ন্যাস, অন্তর্মাতৃকা ন্যাস, বাহ্য মাতৃকা ন্যাস, সংহার মাতৃকা ন্যাস, বর্ণ ন্যাস, পীঠ ন্যাস, ঋষ্যাদি ন্যাস, কর ন্যাস, অঙ্গ ন্যাস, ষোঢ়ান্যাস, বীজ ন্যাস, তত্ত্ব ন্যাস, ব্যাপক ন্যাস, আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা॥ ইহার পর ধ্যান। সমস্ত ক্রিয়াই অত্যন্ত স্থির, ধীর এবং শান্ত মস্তিষ্কে করিবেন। ত্রিপুরা দীক্ষাকালে যে সব ন্যাস করিতে হয় সে সম্বন্ধেও বলা হইবে।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত কৃত্য। ব্রাহ্ম মুহূর্ত হইতেছে পূর্ব দিবসের শেষ এবং নবীন দিবসের আরম্ভকাল। এই সন্ধিকালে অজপা জপের সঙ্কল্প করিতে হয়। আনন্দমঠের সাধনায় অজপা জপের কার্য মহাসাম্রাজ্য দীক্ষার পর হইতে আরম্ভ হয়। সূর্যদেবের অর্দ্ধ উদয় কালই সূর্যোদয়। এই সময় হইতে ১-৩৬ মিঃ পূর্ব সময়ের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

দিন রাত ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ড। এই সময়ের মধ্যে ২১৬০০ বার শ্বাসপ্রশ্বাস হয়। ৬টি শ্বাসপ্রশ্বাস বা প্রাণক্রিয়াকে এক পল ধরা হয়। ৬০ পলে এক দণ্ড। ৬০ দণ্ডে এক দিবা রাত্রি = ৬×৬০×৬০ = ২১৬০০ প্রাণক্রিয়া। ইংরেজ-হিসাবে একটি প্রাণক্রিয়া = ৪ সেকেণ্ড। ৬০ সেকেণ্ড = এক মিনিট = ১৫ প্রাণক্রিয়া। এক ঘণ্টায় ১৫×৬০ =৯০০ প্রাণক্রিয়া। ২৪ ঘণ্টায় × ৯০০ = ২১৬০০ প্রাণক্রিয়া। যোগীদের আয়ু বিচারের ইহাই নিয়ম, তাঁহারা ২১৬০০ প্রাণক্রিয়ায় একদিন আয়ু গণনা করেন। যদি ২৪ ঘণ্টার প্রাণক্রিয়াতে কোন লোকের ৪০০টি প্রাণক্রিয়া বেশী হয়, তবে জানিতে হইবে তাহার প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১৬০০ সেকেণ্ড আয়ুক্ষয় বেশী হইবে। সেই অনুপাতে তাহার আয়ু প্রতিদিনই একটু বেশী ক্ষয় হইতে থাকিবে। আবার যদি ২৪ ঘণ্টায় তাহার ৪০০টি প্রাণক্রিয়া কম হয়, তবে জানিতে হইবে সে বেশীদিন বাঁচিবে। এ জন্য অজপার সঙ্গে সংযোগ করিয়া মন্ত্র জপ করিবার অভ্যাস করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।

শক্তিবাদ সাধনায় প্রাথমিক একাক্ষরী মন্ত্রের দীক্ষা কালে এমন ক্রিয়া জড়িত করিয়া দীক্ষা দেওয়া হয় যে, উহা সম্ভবতঃই প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং জপ আরামের হয়। অগ্রবর্তী সাধনায় মন্ত্র বদলাইতে হয়, তখনও দুই একদিন একটু লক্ষ্য করিয়া জপ করিলে সেই মন্ত্রও প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। একাক্ষরী, দুই অক্ষরী, তিন অক্ষরী বা যে কোন সংখ্যার মন্ত্র প্রাণক্রিয়ার সহিত জপ করা চলে। তবে প্রথমটায় একাক্ষরী বা প্রণব মিলাইয়া দুই অক্ষরী মন্ত্র হইলে সুবিধা হয়। আমাদের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে শরীরের সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যকে আমরা বলিতে পারি ছন্দ বা তাল। কয়েকদিন প্রাণক্রিয়ার সহিত মিলাইয়া জপ করিলে সেই ছন্দের সঙ্গে আপনি সামঞ্জস্য হইয়া যাইবে।

ওঁ ক্রীঁ, ওঁ হ্রীঁ, ওঁ হূঁ, ওঁ হৌঁ, ওঁ জুঁ সঃ, ওঁ ঐঁ, হং সঃ প্রভৃতি মন্ত্রকে তো সহজেই অজপার প্রাণক্রিয়ায় মিলানো যায়, মালা মন্ত্রের মত দীর্ঘ মন্ত্রও প্রাণক্রিয়ার সহিত মিলাইয়া জপ করা যায়।

অজপা মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস। ওঁ অস্য অজপা গায়ত্রী মন্ত্রস্য হং সঃ ঋষিঃ, অব্যক্ত গায়ত্রী ছন্দঃ, পরম হং সো দেবতা, হং বীজং সঃ শক্তিঃ, সোঽহং কীলকং, পরমাত্মা প্রীতয়ে উচ্ছ্বাস নিশ্বাসাভ্যাম্ ষট্ শতাধিকৈক বিংশতি সহস্র অজপা জপ সমর্পণেন মোক্ষ প্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ।

মস্তকে ওঁ "হং সঃ" ঋষয়ে নমঃ॥ মুখে ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ॥ হৃদি ওঁ পরম হংসায় দেবতায় নমঃ॥ মূলাধারে ওঁ হং বীজায় নমঃ॥ পাদয়ো ওঁ সঃ শক্তয়ে নমঃ॥ সর্বাঙ্গে ওঁ সোঽহং কীলকায় নমঃ॥

ষড়ঙ্গ ন্যাস। ওঁ হংসাং সূর্যাত্মনে তেজোবত্যৈ শক্তয়ে হৃদয়ায় নমঃ॥

ওঁ হং সীং সোমাত্মনে প্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা॥

ওঁ হং সূং নিরঞ্জনাত্মনে অবিদ্যা শক্তয়ে শিখায়ৈ বষট্॥

ওঁ হং সৈং নিরাভাসাত্মনে মায়া শক্তয়ে কবচায় হুঁ॥

ওঁ হং সৌং অনুসূক্ষ্মাত্মনে ঈক্ষণশক্তয়ে নেত্রাভ্যাং বৌষট্॥

ওঁ হং সঃ অব্যক্তাত্মনে (অনন্তাত্মনে) জ্ঞান শক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্॥

হং সঃ ধ্যানম্। ওঁ গমাগমস্থং গমনাদি শূন্যং চিদ্রূপং তিমিরান্তকারং।

পশ্যামি ত্বং সর্বজন প্রধানং নমামি হং সং পরমার্থরূপং॥

১। "মূলাধারে - ওঁ স্বর্ণ বর্ণ চতুর্দ্দলে দ্রুতসৌবর্ণ বর্ণবাদি সান্ত চতুর্ব্বর্ণান্বিতে ষটশতং অজপাজপং সশক্তি গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ॥"

২। "স্বাধিষ্ঠানে - বিদ্রুমণিভে বিদ্যুতপুঞ্জ প্রভাত বাদিলান্ত ষট্বর্ণন্বিতে ষড়দলে সহস্রং অজপাজপং সাবিত্রী সহিতায় ব্রহ্মণে সমর্পয়ামি নমঃ॥"

৩। "মণিপুরে - ওঁ নীলোৎপল মেঘ নিভে ডাদিফান্ত দশবর্ণান্বিতে দশদলে ষট্ সহস্রং অজপাজপং লক্ষ্মী সহিতায় নারায়ণায় সমর্পয়ামি নমঃ॥"

৪। "অনাহতে - ওঁ তরুণ রবিনিভে কাদিঠান্ত দ্বাদশ বর্ণযুতে দ্বাদশদলে ষট্ সহস্রং অজপাজপং সশক্তি শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ॥"

৫। "বিশুদ্ধে - ওঁ ধূম্রবর্ণ ষোড়শদলে রক্তবর্ণ অকারাদি অঃকারান্ত ষোড়শ স্বরান্বিতে ষট্ সহস্র অজপাজপং প্রাণধারিণী শক্তি সহিত জীবপুরুষায় সমর্পয়ামি নমঃ॥"

৬। "আজ্ঞাখ্যে - ওঁ শ্রীচন্দ্রপ্রভে দ্বিদলে হ ক্ষ বর্ণন্বিতে সহস্র অজপাজপং অর্দ্ধনারীশ্বরায় মায়া শক্তি সহিত গুরুমূর্তয়ে সমর্পয়ামি নমঃ॥"

৭। "সহস্রারে - ওঁ নানা বর্ণোজ্জ্বলে সহস্রদলে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সমুদয়োজ্জ্বলে সহস্রং অজপাজপং সশক্তি গুরবে সমর্পয়ামি নমঃ॥"

ওঁ পরদেব্যা হৃদিস্থেন প্রেরিতেন করোম্যহম্।
নমে কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বাপি কৃত্যমস্তি জগত্রয়ে॥

এইভাবে পূর্বদিনের ২১৬০০ অজপা সমর্পণ করিয়া পর দিবসের জন্য ২১৬০০ জপের সংকল্প করিয়া ধ্যান যথা -

ওঁ আরাধয়ামি মণি সন্নিভ আত্ম লিঙ্গং
মায়াপুরি হৃদয় পঙ্কজ সন্নিবিষ্টং
শ্রদ্ধানদী বিমল চিত্ত জলাবগাহং
নিত্যং সমাধি কুসুমৈরপুনর্ভবায়॥

আমি মায়াপুরীর হৃদয় পঙ্কজে (অর্থাৎ সহস্র দল কমলের মধ্যস্থলে) সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট আত্মলিঙ্গকে সর্বদা আরাধনা করি। শ্রদ্ধারূপ বিমল চিত্ত জলে অবগাহন করিয়া সর্বদা সমাধি কুসুমে তাঁহার পূজা করি। যাহার ফলে আমার আর পুনরাগমন হইবে না।

বৌদ্ধমন্ত্রে এই আত্মলিঙ্গকেই সহস্রার পদ্ম মধ্যস্থ মণি বলা হইয়াছে। এবং মন্ত্র বলা হইয়াছে "ওঁ মণি পদ্মে হূঁ।" "আপনি পদ্মমধ্যস্থিত মণি, আপনি নিরালা ঈশ্বর, অর্থাৎ হূঁ॥" অজপা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দেখুন।

অজপা সমর্পণান্তে যদি সুবিধা থাকে তবে একবার প্রাণায়াম করিতে হইবে। পূরক "হূঁ", কুম্ভক "হংসঃ", রেচক "সঃ"।

অজপা সমর্পণান্তে গুরুপাদুকা স্তোত্রসহ গুরু স্তোত্রাদি পাঠ্য। ইতি ব্রাহ্ম মুহূর্ত কৃত্য।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত কৃত্যের পর শৌচাদি শেষ করিয়াই আমি গোশালায় প্রবেশ করিতাম। গোসেবার কার্য শেষ করিয়া স্নানান্তে প্রাতঃ সন্ধ্যানুষ্ঠান ব্রহ্মযজ্ঞ ও গীতা চণ্ডী ও উপনিষদ পাঠ করিতাম এবং সময়ের সুবিধা থাকিলে সংক্ষেপে নিত্য (মন্দিরের) পূজা করিতাম। যদি সময়ের টানাটানি থাকিত তবে কিছু কাজকর্ম করিবার পর, পনের কুড়ি মিনিট পূজা করিতাম। আমি তিন বেলাই নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা করিতাম। দিনের বেলায় কঠোর কর্মের চাপে দিন কাটানো ভিন্ন আমার আর কোন সাধনা ছিল না। আমি দুইবেলায় খুব সংক্ষেপ রান্না ও আহার করিতাম। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্বের মধ্যেও আমি নানা গ্রন্থ ও নানা শাস্ত্র পাঠ করিবার মত সময় বাহির করিতাম। সময় সময় এসব কাজের জন্য প্রচুর সময় বাহির করিতে পারিতাম। এই অধ্যায়ের পর আমি গ্রন্থিভেদ সাধনার কথা আলোচনা করিব। যতক্ষণ সাধকের ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয় নাই ততক্ষণ এসব সাধনা সাধককে মোটেই আরাম দিবে না। ইহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। শূন্যবোধ আয়ত্ত হওয়াই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ। ইহা আয়ত্তে থাকিলে কোন সাধনাই কষ্টকর হইবে না। বরং আনন্দপ্রদই হইবে। এই অধ্যায়ে ব্রহ্মগ্রন্থিভেদের অনেক লক্ষণের কথাই বলা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

গ্রন্থিভেদের কথা

ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদের কথা এবার আলোচনা করিব। গৃহত্যাগের পর, সমানে পাঁচ ছয় বৎসর কাল আমি সাধনা করিয়া মনে কোন উৎসাহ বা আনন্দ পাই নাই। অনেক সাধনা অনেক জপ করিয়াছি, কিন্তু মন বসে নাই। সংসারে আমার কিছু চাওয়ার ছিল না, কোন কিছু পাইবার কথা আমি একদিনও ভাবি নাই। কিন্তু আমার মন নৈরাশ্যে ভরিয়া থাকিত। শেষ পর্যন্ত চিদাকাশের অনুভূতি ফুটিবার পর আমার মনের দৈন্য ও নৈরাশ্য শেষ হইল। আমার মনে হইল এবার সবই পাইয়াছি। আমার আর জানিবার বুঝিবার কিছু অবশিষ্ট নাই। ইহা যে ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদের লক্ষণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর হইতেই আমার সন্ধ্যা, পূজা, সাধনা ও জপাদিতে রসের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

বাল্যকাল হইতেই আমার মনে মাতৃস্নেহ পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। আমি ঠাকুমার নিকট প্রতিপালিত হইবার জন্যই হউক, অথবা বাল্যকাল হইতেই কালীমার উপর আমার অন্তরের গভীর সংযোগের জন্যই হউক, আমার কিন্তু মাতৃস্নেহ পাইবার অসীম আকর্ষণ ছিল। গৃহত্যাগের পর, সাধক দশায়, আমি উহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম এবং বহুদিন ভুলিয়াই ছিলাম। মাতৃভাব প্রবল ছিল বলিয়াই বোধহয় বাল্যকাল হইতেই নারীমাত্রই আমাকে খুবই ভালবাসিত। যাহাহউক কালের গতিতে আমি সবই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন বয়স ২২ বৎসরে আসিয়াছে। মনের অলক্ষ্যতে কখনও কখন একটা যৌবন চিত্র মনে খেলিত। একটা আব্ছা সংসার চিত্রও মনে জাগিত। কিন্তু মাতৃস্নেহ পাইবার কথাই আমার মনে সর্বদা জাগ্রত থাকিত। ঠিক এই সময়ে কোন স্নেহময়ী সাধিকা আমাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে মাতৃস্নেহে আদর করিলেন। এই ঘটনার পর আমার মনের মধ্যস্থিত আব্ছা আব্ছা যৌবন চিত্র একেবারে তিরোহিত হইল। মাতৃসাধকের জন্য ইহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ।

গৃহত্যাগের কিছুদিনের পূর্বের কথা; আমি শিলং যাইতেছি, সঙ্গে একটা কুকুরে কাটা রোগী। তীস্তাঘাটের পরে রাত্রিতে গাড়ীতে বসিয়া আছি। একজন ভদ্রলোক, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স, উপরে বাঙ্কে বসিয়াছিলেন। তিনি নামিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন; শান্ত গম্ভীর চেহারা।

আমার সম্বন্ধে তাঁহার একটা কৌতুহলময়ী ধারণা হইয়াছে। তিনি আমাকে দেখিয়াই ধারণা করিয়াছেন, আমি কোনদিন সন্ন্যাসী ও যোগী হইব। তিনি বাঙ্কে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার ধারণা হইল তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন; কিন্তু কালীভক্ত। অনেক কথা বলিলেন। তিনি আমাকে সারদামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

অযাচিত পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, মা সারদাময়ী কোন সময় তাঁহার মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার মন হইতে চিরদিনের মত কামপ্রবৃত্তি মিটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করি নাই। আমি বহু কথাই শুনিলাম, কোন কথারই বিশেষ উত্তর দিলাম না। কেবল বলিলাম, আশীর্বাদ করুন, যেন আপনার ধারণা আমার জীবনে ফলে। আমি সারদা মাকে দেখি নাই। দেখিবার কথা ভাবিও নাই।

সাধনার পথে একদিন একটা অদ্ভুত অনুভূতি ফুটিল। একটা সোনার মত রঙবিশিষ্ট ব্যাপক অনুভূতি। দেখিলাম, সেই গলিত সোনার মদ্যে আমার শরীরটা এলোমেলো ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। শরীরটাও ঢালা সোনার রঙে গড়া। শরীরটার একটা আকার মাত্রই আছে, উহাতে রক্তমাংস বা স্থূলত্বের কোনই চিহ্ন ছিল না। কয়েকদিন এই অনুভূতি আমার মনকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ক্রমে অনুভূতিটা একটু হালকা হইল এবং রঙের মধ্যে সোনালী ভাব কমিয়া লালচে ভাব হইল। তখন দেখা গেল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই লালচে রঙের উপাদানেই গঠিত। অর্থাৎ সবই আমার আত্মার উপাদানে গঠিত। ইহা যে খানিকটা বিশ্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। অনুভূতিটা কিছুদিনের মধ্যে আরও হালকা হইল এবং আমার মাতৃস্নেহের স্থূল স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। স্নেহস্পৃহা আমার হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া সব অন্তর ও বহির্জগৎ ছড়াইয়া পড়িতেছে, ইহা আমি সর্বদাই দেখিতেছি। কিন্তু আমার তাহাতে তৃপ্তি নাই! আমার অন্তর স্থূলের মাতৃস্নেহ চায়। আমি দেওয়াল, পাথরের খুঁটি, বৃক্ষ সবই জড়াইয়া ধরি; কিন্তু আমার প্রাণ জুড়ায় না। আমি এক ভয়ঙ্কর অস্বস্তির মধ্যে জড়াইয়া গেলাম। এসময় গুরুদেব আমার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক স্নেহ আদর করিলেন। কোলে তুলিয়াও অনেক আদর করিলেন। আমার স্থায়ী তৃপ্তি হইল না। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, আমার মনের যাতনা একই রকম রহিল। আমার এখন ইহাই ধারণা যে মনের এই স্নেহস্পৃহা যদি ব্যাপক মায়ের অঙ্গে মিশিয়া যায়, তবেই আমি এই যাতনা হইতে রক্ষা পাইব, অন্যথায় নহে। আমি দিন রাত ইহাই সাধনা করি যে আমার অন্তরের এই স্পৃহা মায়ের ব্যাপক রূপে মিলিয়া যাক। আমার আর স্থূলে মাতৃস্নেহের প্রয়োজন নাই। জানি না, আমার এই স্নেহস্পৃহা কত জন্মের এবং কত যুগের, তাহাও আমি জানি না। গুরুদেব সব সময় আশ্রমে থাকিতেন না। তিনি দূরে গেলেও আমার পত্রে ওই একই কথা - "আমি চাই, এই স্নেহস্পৃহা মায়ের ব্যাপকরূপে মিলাইয়া যাক্, এবং আমি এই যাতনা হইতে মুক্তি পাই।" একদিন সত্যই দেখা গেল মা আমার রূপ বদলাইয়াছেন। মায়ের সেই ব্যাপক সোনালী রং এর রূপকান্তিতে বড় বড় বরফ ঢাকা পাহাড়ের চাং বাঁধিয়াছে। আর মায়ের রূপে ফাঁক নাই। আমার মন ও প্রাণের প্রতিটি কোণে কোণে পাহাড়ের মত চাং বাঁধিয়াছে; মনে প্রাণে আর কোথাও ফাঁক নাই, কোথাও ফাঁক নাই। মা-ই আমার স্নেহঘন এবং স্নেহের উদ্বেলনহীন মূর্তি হইয়া দর্শন দিয়াছেন। আমার মা আর সেই মা নাই। মা আমার মিলনের স্পৃহাহীন ঠোস্‌রূপ ধারণ করিয়াছেন। আর সুখস্পৃহা নাই, আর ফাঁক নাই। মা আমার প্রাণের সব অভাব মিটাইয়া ঠিক ঠিক ব্যাপক বৈষ্ণবী মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। আমিও বুঝিলাম, ইহাই বিষ্ণুমায়ার অন্তিম রেখা।

বিষ্ণু গ্রন্থিতে বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ছলনা, সন্দেহ অনেক কুবুদ্ধির উদয় হয়; কিন্তু আমার মনে কখনও এ সব ছিল না। কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রভাবেই হয় তো এ সব হীন বৃত্তির অস্তিত্বও চলিয়া গিয়াছিল, মাতৃস্নেহ তৃষ্ণাটুকু কেন যে মা আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেটা আমার জানা নেই। সেটাও হয়তো মা নিজেকে সর্বতোভাবে বুঝাইবার জন্যই আমার অন্তরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থিতেও অনেক স্তর আছে, নানারকম অনুভূতিও আছে। আমি সে সব লইয়া আলোচনা করিতে চাই না। পাঠক ক্রমবিকাশের সূর্য স্তর ও বিষ্ণু স্তর দেখুন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাতৃভাব এবং মধুর যে পথেই অগ্রসর হও না, বিষ্ণু-মায়া তোমাকে ভালভাবেই পাক দিয়া ছাড়িবেন। বেদের দুই মন্ত্রের কথা মনে হইতেছে : "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপি হিতং মুখং। তৎ ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে।" ঈশো উপ, মন্ত্র ১২॥ "পূষণ্ একর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহরস্মিন্ সমূহ তেজাঃ। যৎ তে রূপং কল্যাণতম্ তৎ তে পশ্যামি। যো অসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" ঈশঃ ১৬॥ "হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা (অর্থাৎ বিষ্ণুস্তরের অনুভূতিদ্বারা) সত্যের মুখ আবরিত আছে। হে পূষণ! (অর্থাৎ হে হিরণ্ময় বিষ্ণু দেবতা!) আপনি আপনার তেজ রাশি (বিষ্ণু মায়ারাশি) অপনীত করুন; আমি সত্য স্বরূপকে দর্শন করিব॥ ১৫॥ হে পূষণ, হে এককচর, হে সংযম কারিণ, হে প্রজাপতি সম্ভূত সূর্যদেব, আপনি আপনার তীব্র রশ্মিসমূহ সঙ্কুচিত করুন, আপনার যাহা মঙ্গলময় রূপ, আমি উহা দর্শন করিব। আপনার যাহা মঙ্গলতম রূপ, উহা আমারও আত্মরূপ।"

রুদ্র গ্রন্থি হইতেছে, অহং এর গ্রন্থি। বিষ্ণু গ্রন্থিই ঠিক অস্বস্তির গ্রন্থি। ইহা মমত্বের গ্রন্থি। মা তো বিশ্বরূপিনী তবে সাধকের মাতৃস্নেহ স্থূলে পাইবার জন্য এত আকর্ষণ কেন? ইহার মূলে থাকে জন্ম জন্মান্তরের ভোগ এবং মিলনের প্রবৃত্তি এবং সেইগুলি ধরিয়া রাখেন অহং গ্রন্থি। এই অহংই ব্যাপক আত্মাকে বা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন এবং অহংকে বড় করিয়া দেখেন। বিষ্ণুগ্রন্থিহীন অহংও ব্যাপক হইয়াই দর্শন দেন। ইহা কিন্তু অসুরবাদের কেন্দ্র। রাবণের মত শক্তিমান তপস্বীও ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করিয়া নিজের নিয়মকেই বড় মনে করিতেন। এই জন্যই রাবণ দুষ্কার্য করিতে বিচলিত হইতেন না। বিষ্ণুস্তরে মহাশক্তির যতটা বিকাশ, অহংস্তরে মহাশক্তির বিকাশ সেই তুলনায় অনেক বেশী। অহংগ্রন্থির নিকটস্থ সাধক সমাজের সুখ দুঃখ বা মতামত হইতে নিজের জেদকে অধিক প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকেন। অসুরবাদী রাবণ এবং জেদ্‌বাদী ভীষ্ম চরিত্র বুঝিলে অহংগ্রন্থির প্রভাব বুঝা যায়। ভীষ্ম শেষকালে অসুরপক্ষেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরত্ব অপেক্ষাও তাঁহার অন্তরে 'অন্নপ্রভাব' অধিক মূল্যবান বিবেচিত হইয়াছিল। অহংগ্রন্থির মহাপুরুষ এবং বিষ্ণুস্তরের মহাপুরুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, বিষ্ণুস্তরে সাধকের দৈব তৃপ্তি ও দৈবীপক্ষে বেশী শ্রদ্ধা থাকে। অহংস্তরে দৈবী বৃত্তিকে নিজের অধীন বৃত্তি মনে করেন। শত দৈবী বৃত্তি ইঁহাদের চরিত্রে থাকিলেও জেদ্‌কেই ইঁহারা পরম সম্পদ মনে করেন। এই স্তরের অনুভূতিতে সুখ প্রচুর বিদ্যমান থাকে; কিন্তু শান্তি থাকে না। অহং গ্রন্থি ক্ষীণ হইলেও শিবস্তরের শান্তিবোধ ফুটিয়া যায়। অহং তত্ত্বকেন্দ্র বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি হইতে অনেক তেজপূর্ণ এবং মহান। বিষ্ণুস্তরের কেন্দ্রে অহং কেন্দ্রের মত এতটা তেজ থাকে না। অহং নিজে নিজে মহান,

নিজে নিজে তেজী। বিষ্ণুস্তরে সকলকে লইয়া সুখী এবং সকলকে লইয়া তেজস্বী। সাধক! তোমার অত তেজ এবং এত জেদ আর কতদিন? এই সময়টা আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য যে কিরূপ হইয়াছিল, সেটা ভাবিতে আমার এখনও ভয় হয়। শান্তির বোধক্ষেত্র নিকটেই বিদ্যমান। উহার সন্ধান পাইলে সাধক সবই ভুলিয়া যায়। এবার সাধক শিবত্বের সম্মুখীন। শান্তিবোধ অহংএর তটস্থ স্তর। সাধক যতক্ষণ শান্তিকে বোধ করেন, ততক্ষণ অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে অহং থাকেন। এই ক্ষীণ অহং শেষ হইলেই তন্মাত্রবোধ ক্ষেত্রে সাধকের প্রবেশ হয়। যতদিন অতি ক্ষীণ অহং বিদ্যমান ততদিন পুনঃ বাহ্যসুখের আকর্ষণ উদয় হইতে পারে। এই ভাবেই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হয় এবং তন্মাত্রবোধক্ষেত্র প্রকাশিত হয়। ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য। তন্মাত্র বোধের পর, মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব বা পূর্ণজ্ঞান বোধ। ইহার পর অব্যক্ততত্ত্ব, অব্যক্ত তত্ত্বের পর পুরুষোত্তম স্তর। ইহাই সগুণ এবং নির্গুণ শক্তিস্তর। অহংগ্রন্থি ভেদ না হওয়া পর্যন্ত তন্মাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ শক্তিস্তর পর্যন্ত কোন স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রন্থিভেদের পূর্বের সাধনা এবং গ্রন্থিভেদের পরের সাধনা এক রকমের নহে। হিরণ্ময় ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ সাধনা ও অনুভূতির ক্রমবিকাশ চলিয়াছিল, উহার একটা বৈজ্ঞানিক ধারা পাওয়া যায়। এই সাধনার ইতিহাসই আমার সাধক জীবনের প্রকৃত আত্মচরিত। ক্রমবিকাশ গ্রন্থই আমার ঠিক ঠিক আত্মচরিত। নানা প্রকার যোগের ক্রিয়া এবং উহার মধ্যে অনেকপ্রকার অনুভূতির সন্ধান আমি পাইয়াছি। কিন্তু নিজেকে ধরিয়া যে সাধনার বৈজ্ঞানিক ধারা আমি পাইয়াছি, উহার ক্রম হিরণ্ময় অনুভূতির কেন্দ্র হইতেই ধরা যায়। ইহার পরই আমি মন্ত্রযোগ অধ্যায়ে সাধনার একটা সহজ এবং বৈজ্ঞানিক ধারা প্রকাশের চেষ্টা করিব। কিন্তু যে ধারা ধরিয়াই যাও, হিরণ্ময় বিষ্ণু মায়া তোমাকে ভালভাবেই ক্ষতবিক্ষত করিয়া তবে ছাড়িবেন। ‘‘যে হি সংস্পর্শজাভোগা দুঃখযোগায় এত তে আদ্যন্ত বন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।’’ সংস্পর্শজ ভোগকে দুঃখের উৎস জানিবে। ইহার আদি ও অন্ত আছে (অর্থাৎ অনিত্য), জ্ঞানীজন ইহাতে আকৃষ্ট হন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ২, ১০ বৎসর ভালভাবে বিষ্ণুকলে নিষ্পেষিত হইবার পূর্বে কেহ জ্ঞানী হইতে পারিবেন কি?

অহং গ্রন্থির নিকটস্থ হইবার পর গুরুকে কেন্দ্র করিয়া কিছুটা দুর্বলতা সাধকে দেখা দিতে পারে। গুরু যদি মনে করেন শিষ্য তাঁহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় না, তবে উহার প্রতিক্রিয়া শিষ্যে দেখা দিতে পারে। শিষ্য যদি অহং গ্রন্থিভেদের নিকটস্থ হন তবে শিষ্য অতি সহজে ইহা অতিক্রম করিতে পারিবেন। ‘‘গুরুর নিকট নত থাকাই সভ্যতা এবং উহাই জ্ঞানের লক্ষণ।’’ গুরুদেব অনেক সময় বলিতেন, ‘‘সত্যানন্দ তাঁহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় না, ইহার কারণ, সত্যানন্দ তাঁহাকে সাধনা ও অনুভূতি বিষয়ে কোন কথাই বলে না।’’ আমি কেন যে কোন কথা বলিতাম না, ইহা আমি যথাস্থানে বলিয়াছি। গুরুদেবের দৃঢ় ধারণা, ‘‘সত্যানন্দের সাধনার মধ্যে ফাঁকী নাই’’ একথা তিনি সকলকেই বলিতেন। এবং সাধনার পর সাধনা ও দীক্ষার পর দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়াই যাইতেন। শান্তি ও জ্ঞান লক্ষ্যে একনিষ্ঠ সাধক সহজেই অহং গ্রন্থি অতিক্রম করিতে

পারিবেন। ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। বিষ্ণু গ্রন্থিতে আমি যেরূপ যাতনার সম্মুখীন হইয়াছিলাম, উহা অতীব ভয়ঙ্কর।

রুদ্রগ্রন্থির নিকটস্থ হইয়া আমি গুরুকে কেন্দ্র করিয়া যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হইয়াছিলাম। ইহার কারণ, গুরু আমাকে বাড়ি, ঘর, আশ্রম, বাগান, পশু, পক্ষী, গাভী, মানুষ, সমাজ, সকলের মধ্যে রাখিতে চাইতেন। আমি কঠোর তপঃজীবন ভালবাসিতাম। গুরু যাহা চাহিতেন, ইহা আমি জানিতাম। আমি যাহা চাহিতাম সেটাও তিনি বুঝিতেন। আমি আমার চাওয়াতে মন দিলে, তিনি যে আমাকে একবার নামাইবার চেষ্টা করিবেন ইহাও জানিতাম। কাজেই আমি শক্ত হইয়া অর্থাৎ রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া পরে আশ্রমজীবন ত্যাগ করিয়া তপঃজীবনে পা দিয়া ছিলাম। তিনি আমাকে বিষ্ণুস্তরে নামাইবার জন্য দুইটি সাংঘাতিক অস্ত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। শিষ্য কিন্তু তাঁহার আশীর্বাদে দুইটিই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহার অস্ত্র দুইটির কথা আমি হয় তো পরে যথাস্থানে বলিব। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইবার পর শক্তিস্তরের নিকটস্থ শক্তিমান সাধকের যে কোন বাধা অতিক্রম করিবার প্রচুর শক্তি রহিয়াছে।

মন্ত্রযোগ সাধনা

সন্ধ্যা, পূজা ও জপ হইতেছে মন্ত্র যোগ সাধনার মূল কথা। হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ এই সাধনার সহায়ক। মন্ত্রের অবলম্বনে সাধক উন্নতির শেষ প্রান্তে আসিতে পারেন, মন্ত্রের চারটা স্তর :- বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি এবং পরা। কেহ বলেন, কেহ শোনেন ইহা মন্ত্রের বৈখরী।

মনোজগতের মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া ‘‘মন্ত্র’’ ক্রমে জাগ্রত হন। ইহাই মন্ত্রের মধ্যমাস্তর। আমরা গণেশ সূর্য বিষ্ণু এবং শিবস্তরের নিম্ন অংশের কথা বলিয়াছি। ইহারা মন্ত্র জগতের ‘‘মধ্যমা’’। ক্রমবিকাশে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন। শূন্য বোধ, প্রেম বোধ, সুখবোধ এবং শান্তিবোধের এক অংশের নাম ‘‘মধ্যমা স্তর’’। মন্ত্র মধ্যমা অংশে জাগ্রত হইলে, মনস্তত্ত্বের বহু কথাই জানা যায়। মন্ত্র পশ্যন্তী স্তরে জাগ্রত হইলে তন্মাত্রাবোধ ও পূর্ণজ্ঞান বোধের ক্ষেত্র সাধকের অনুভূতিতে আসে। অব্যক্ত বোধ অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান বোধের বিলয়ের স্তর হইতে শক্তিস্তর আরম্ভ। এখান হইতেই অষ্টপরা শক্তি এবং এই অষ্টপরা শক্তি সমষ্টিভূত সগুণ মহাশক্তি এবং নির্গুণ মহাশক্তি (নির্গুণ ব্রহ্ম) এই সব স্তর সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রের ‘‘পরাস্তরের’’। মন্ত্রের মধ্যমা বিকাশের ক্ষেত্রেই হিরণ্ময় হিরণ্যগর্ভ অনুভূতি। এই স্তর হইতেই সাধকের অন্তরে সীমাহীন ভাবে বাহ্যসুখ প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ইহা অতিক্রম করিবার পর পশ্যন্তি এবং তাহার পর পরাশক্তির স্তর।

আমার সমস্তটা দিনই কঠোর কার্যের মধ্যে কাটিত। কম সময়, অধিক কার্য, আমার জীবন যুদ্ধের ইহাই মর্মকথা সত্যকথা। পাহাড়ের আশ্রমে সমস্ত দিনের কর্মশ্রান্ত শরীরে মন্দিরের আরতি শেষ করিয়া, মনটা তাকাইয়া থাকিত, সাধনায় কখন বসিব। আরতির শেষে শঙ্খে ফুঁ দিবার জন্য শঙ্খে জল ঢালিতে হয়, আবার ফুঁ দিবার পর পুনঃ জল

ঢালিয়া ধুইতে হয়। একটা তামার ঘড়ায় পূজা মন্দিরের জল রাখা হইত। আমি সংক্ষেপে আরতি শেষ করিয়া শঙ্খে জল ঢালিয়া ফুঁ দিলাম। জলপূর্ণ তামার ঘড়াটি বাম হাতেই ছিল। ঘড়াটিকে মাটিতে রাখিয়া শঙ্খে ফুঁ দিব এবং পুনঃ জলের ঘড়াটি তুলিয়া শঙ্খ ধুইব, এত সময় কোথায়? আমি শঙ্খে খুব জোড় এবং লম্বা ফুঁ দিতাম। ধ্বনির আঘাতে ঘড়ার জল ও ঘড়াটি খুব কাঁপিতে লাগিল। আমি ইচ্ছা করিয়া দুই চারিটি ফুঁ বেশী দিলাম। বৈখরী ধ্বনির কম্পনের মধ্যে এতটা শক্তি যে, এক ঘড়া জলসহ একটা ঘড়া বেশ জোরেই কাঁপিতে ছিল। আমি বুঝিলাম আমি যতই জোরে ঘড়াটা আঁকড়াইয়া রাখি না কেন, ঘড়া ও জল কম্পিত হইবেই। বৈখরীতে ধ্বনি শক্তির একটা যে গতি আছে এবং সেই গতি যে উপযুক্ত স্থানে আঘাত পাইয়া অন্য স্থূল বস্তুকে কম্পিত করিতে পারে, ইহার একটু আভাষ পাইলাম। আমি চণ্ডীপাঠ কালে চণ্ডীর পাতায় হাত রাখিয়া দেখিতাম, চণ্ডীর পাতাগুলি মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইতেছে, বুঝিলাম। আমি মাত্র সাধনায় প্রবেশ করিয়াছি, এই ঘটনা তখনকার কথা।

আরও একদিনের কথা; আমি তখন সাম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত। আমি চূনার স্টেশন হইতে দুর্গাবাড়ির ধার দিয়া পাহাড়ের আশ্রমে আসিতেছি। দুর্গাবাড়ির নিকট এক সাধু সাধনার জন্য কুটীয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি উহাতে গৃহপ্রবেশ উৎসব করিতেছেন। কাশী হইতে ভাল বাজনা ও সানাই আনাইয়াছেন। সুন্দর বাজনা বাজিতেছে, আমি শুনিতে শুনিতে দুর্গাবাড়ির ধার ধরিয়া পাহাড়ের আশ্রমের দিকে চলিয়াছি। যতক্ষণ শুনা যাইতেছিল ততক্ষণ শুনিলাম। তাহার পর আর শুনা যাইতেছিল না, কিন্তু মানসক্ষেত্রে নানা প্রকার রঙের নৃত্য ফুটিয়া উঠিল। কতগুলি রঙের রশ্মি নানা প্রকার তালের ছন্দে মনের মধ্যে নাচিতে লাগিল। এ কি, তবে কি ধ্বনিগুলির উত্থান পতন কতগুলি রঙেরই নৃত্য? এর পর আবার দেখা গেল, জপের মন্ত্রগুলিও অতি সূক্ষ্মস্তরে নানা প্রকার রং-এর রশ্মি বিস্তার করিয়া চারিদিকে দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমাকে সাধনার পথে বহু প্রকারের মন্ত্র জপের অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। মন্ত্রের মধ্যে ক্রমে নানা প্রকার রং-এর রেখা দেখিতে পাইলাম। ঐ সব রং রেখাকে অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ সাধনা ও অনুশীলনের ফল ক্রমবিকাশের মন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক ক্রমবিকাশ পাঠ করুন।

নিত্য পূজায় অনুভূতি

সকালবেলা স্নান করিয়াই পূজার জল এবং কয়েকটি বেলপাতা হাতে করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতাম। পূজার ফুল কমই পাওয়া যাইত। একমাত্র শীতকালে প্রচুর গাঁদা ফুল আশ্রমে ফুটিত। পূজার উপাদানে জলই প্রধান ছিল। পূজার ভোগে প্রথম প্রথম কিছু কিছু মিষ্ট দ্রব্য দিতেছিলাম। গুরুদেব বলিলেন, "নৈবেদ্য দিবার প্রয়োজন নাই।" নিত্য পূজায় আমার বিশ মিনিট সময় লাগিত। সন্ধ্যাপূজা যে কত শান্তিপ্রদ সাধনা উহার তুলনা নাই। ধ্যানের মন্ত্রগুলির মধ্যে কি রহস্য আছে, আমার মনে সেই দিকে চেষ্টা দেখা দিল। আমি নিশ্চিত মনে ধ্যান মন্ত্রগুলি মাত্র উচ্চারণ করিতাম; কিন্তু কখনও,

কোন রূপ কল্পনা করিতাম না। ধ্যানের একটি মাত্র শব্দই আমার লক্ষ্য থাকিত - যেমন গণেশ ধ্যানের প্রথম শব্দ 'খর্ব্বং'। এই 'খর্ব্বং' বলিতে অন্তরজগতে কি প্রভাব দান করে, সমস্তটা পূজার মধ্যে আমার মনে ঐ কথাটুকু মাত্রই জাগ্রত থাকিত। অনেক দিন পূজাকালে একদিন দেখা গেল 'খর্ব্বং' বলিতে মনটা 'খর্ব্বং' হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ মনের গতি স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে গণেশ ধ্যানের সব কথাই ক্রমে ক্রমে রূপ লইল। ইহা যে মনোজগতের একটা অংশ অর্থাৎ বুদ্ধি অংশ, ইহাও ক্রমে স্পষ্ট হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বুদ্ধি কেন্দ্রই গণেশ। গণেশ ধ্যানের মর্ম জানিবার পর সূর্য ধ্যান আরম্ভ হইল। সূর্য ধ্যানের এক একটি শব্দ লইয়া নিত্য পূজা চলিল। প্রেম বোধের কেন্দ্রই যে সূর্য, ইহা জানা গেল। বিষ্ণু ধ্যান লইয়া বহুদিন পূজা অর্চনা চলিল। জানা গেল, ইহা সুখকেন্দ্র। শান্তিকেন্দ্র এবং অহং কেন্দ্রই শিব। এবং পঞ্চতন্মাত্র বোধই পঞ্চবক্ত্র শিব। মহৎতত্ত্বের প্রলয় এবং অব্যক্ত তত্ত্বের আরম্ভই শক্তিধ্যানের মর্মকথা। সবই একটু একটু করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে বুঝা গেল। মস্তিষ্কের মধ্যে পঞ্চদেবতার কেন্দ্রগুলিও ক্রমে ধরা পড়িল। মানবসভ্যতার মনোবিজ্ঞানের এক শক্তিশালী পন্থা বাহির হইল। ঋষি প্রবর্তিত উপাসনা কাণ্ড যে অকাট্য বৈজ্ঞানিক সাধনা উহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। আমি একই ব্রহ্ম জ্ঞানের লক্ষ্যে অনেক স্তরের কথা বলিলাম। অনেক রকম সাধনার কথাও আলোচনা করিলাম। এবার আমি আমার জপের মালাটির কথা বলিব।

আমার জপের মালা

শাক্ত ও পূর্ণ অভিষেক কালে আমার হাতে মাত্র ১৩৵[*] টাকা ছিল। আমি কমলা-মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কত মূল্য হইলে মালা পাওয়া যাইবে? তিনি বলিলেন, ভাল মালার দাম ৷৷/০ আনা হইবে। আমি কমলা-মাকে ঐ ৷৷/০ আনা পয়সা দিলাম, আর সব অর্থে অভিষেকের খরচ করা হইল। কমলা-মা আমাকে মালা কিনিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম গাঁথা মালা বেশী দিন চলিল না, ছিঁড়িয়া গেল। আবার কি করিয়া গ্রন্থি দিয়া গাঁথিতে হয়, সেটা জানিবার জন্য চিন্তিত হইলাম। জানিলাম একটি অখণ্ড সূত্রে মালা গ্রন্থিত করিয়া, এক একটি মালার পরে এক একটি গ্রন্থি বীজমন্ত্র জপের সঙ্গে গাঁথিতে হইবে। আমি নিজের চেষ্টায় পৈতার সূতায় মালা গাঁথিলাম, গ্রন্থি দিলাম। ইহা ভাল হইল না। বেশীদিন চলিলও না। আবার ছিঁড়িয়া গেল। এবার গাঁথা ও গ্রন্থি একটু ভাল হইল। শুষ্ক দেশ, কাজেই এটাও বেশী দিন চলিল না। এবার আমি মালাকে শক্ত করিবার দিকে মন দিলাম। আবার গাঁথিলাম, ক্রমেই গ্রন্থি ভাল হইল। কিন্তু কয়েক বারই গাঁথিতে যে অখণ্ড সূতা লওয়া হইতেছিল, সব ছোট হইয়া যাইতেছিল। শেষ পর্যন্ত বেশ পাকাভাবে মালার গ্রন্থি ও মালা প্রস্তুত হইল। সেই মালাই আমার শেষ মালা। সেই মালা সুদীর্ঘ আঠার বৎসর চলিল। বুঝিলাম, যতক্ষণ মালা শাস্ত্র-সম্মতভাবে প্রস্তুত হয় নাই, ততক্ষণ ইহার আয়ু বেশী হইতে ছিল না। এই মালা কোন প্রকারে হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলে

[*] প্রকাশকের নিবেদন - সম্ভবত এক টাকা তিন আনা।

মালাটি তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া সিকুড়ে যাইত। এ জন্য মালাকে আমি খুবই সাবধানে রাখিতাম। মালার সূত্র আমার ব্রহ্মনাড়ী। মালার দানা আমার ষট্চক্রের বর্ণমালা। কাজেই ইহাকে শক্তসূত্রে এবং সুসজ্জিত ভাবে পাইয়া আমি তৃপ্তির সহিত জপ করিতাম। সেই মালা আমার নাই। কিন্তু উহার পবিত্র স্মৃতি আমার অন্তরে আজও আঁকা আছে। অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা এবং অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলী দ্বারা আমি জপ করিতাম। অঙ্গুষ্ঠ = জ্ঞান, আকাশ তত্ত্ব, মধ্যমা = তেজ, অগ্নি তত্ত্ব, অনামিকা = শান্তি, অমৃত তত্ত্ব। মালার মধ্য দিয়া ঐ সব তত্ত্বের স্ফুরণ মা আমার অন্তরে প্রচুর ঢালিয়া দিয়াছেন।

দশম অধ্যায়

রাজযোগের সাধনা

সপ্তযোগ ভূমি

যোগভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপতি সচতুর্থী স্যাত্ততোঽসংশক্তি নামিকা।
পরার্থভাবিনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগাস্মৃতা॥

(১) শুভেচ্ছা, (২) বিচারণা, (৩) তনুমানসা, (৪) সত্ত্বাপতি, (৫) অসংশক্তি, (৬) পরার্থভাবিনী, (৭) তুর্য্যগা ইহারা সাতটি যোগভূমি।

(১) শুভেচ্ছা প্রথম যোগভূমি। সাধারণ মানুষ স্ত্রীপুত্র ধন সম্পদেই তুষ্ট; এ সব থাকুক বা না থাকুক, অনেকের মনে একটা অস্বস্তি বোধ থাকে। এই অস্বস্তি বোধই মানুষকে যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট করে। সংসারের সবকিছু থাকিয়াও মনে অস্বস্তিবোধ যোগের একটি ভূমি। যাঁহাদের এই যোগভূমি লাভ হয় না, তাঁহারা কখনও যোগী হইতে পারেন না। যাঁহারা হাতী ঘোড়ার লোভে যোগী হন, তাঁহারা হাতী ঘোড়ার চিন্তা করিয়াই জীবন কাটান। যোগ তাঁহাদের কল্পনায়ও আসে নাই। (২) বিচারণা দ্বিতীয় যোগভূমি। বিচারণা, মানে বিচরণ। বিজ্ঞানসম্মত সাধনায় আত্মনিয়োগই দ্বিতীয় যোগভূমি। শক্তিমান গুরুর সংশ্রব হইলেই বিচারণা ভূমি লাভ সহজ হয়। সাধনায় আরাম পাইলেই বিচারণা ভূমিলাভ হইল। (৩) তনুমানসা মানে শূন্যবোধ। ইহা গণেশ স্তরের অনুভূতি। মন সাম্য বা ক্ষীণ হইয়া যায়। (৪) সত্ত্বাপতি। বাহিরে ও অন্তরে আত্ম সত্তার অনুভব হয়। সূর্য ও বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি। (৫) অসংশক্তি। বিষ্ণুস্তরের অনুভূতিকালে অনেক সাধকেরই ভালবাসা এবং যৌন সুখের আসক্তি দেখা দেয়। এই আসক্তির স্তরটি ভেদ হইলেই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হয়। এবং অনাসক্তির স্তরে প্রতিষ্ঠা হয়। (৬) পরার্থভাবিনী। ইহা শিবস্তরের বোধ। তন্মাত্র বোধই পরার্থবোধ। এ স্তরের বোধ প্রকাশিত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে তন্মাত্র পরমাণুতে গঠিত, ইহার জ্ঞান হয়। এই স্তর পর্যন্ত অনুভব হইয়াছে, এইরূপ সাধক দুর্লভ। (৭) তুরীয়গা। পূর্ণজ্ঞানই মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ববোধ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া অব্যক্তবোধ প্রকাশিত হয়। মহৎ ও অব্যক্তবোধ তুরীয়া যোগভূমি। এমন বৈজ্ঞানিক ও নিখুঁতভাবে যোগভূমির বর্ণনার উপর আর টিকা লিখিবার প্রয়োজন হয় না। স্তরগুলির নামই এত সুন্দর ও যুক্তিসম্মত যে উহার তুলনা হয় না। এই স্তরগুলির মধ্যে পুরুষোত্তম স্তরের উল্লেখ নাই।

সপ্তজ্ঞানভূমি

জ্ঞানদা জ্ঞান ভূমের্হি প্রথমা ভূমিকা মতা।
সন্ন্যাসদা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া যোগদা ভবেৎ॥
লীলোন্মুক্তি শ্চতুর্থী বৈ পঞ্চমী সৎপদাস্মৃতা।
ষষ্ঠ্যানন্দ পদা জ্ঞেয় সপ্তমী চ পরাৎপরা।

সপ্তজ্ঞানভূমির প্রথম জ্ঞানদাভূমি॥ এই স্তরের মানস লক্ষণ ''আমার যাহা জানিবার ছিল সব জানিয়াছি।'' এই ভূমির জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ। ইহা গণেশ স্তরের অনুভূতি। (২) সন্ন্যাসদা। এই স্তরের মানস লক্ষণ; ''আমার যাহা ত্যাগ করিবার ছিল, সবই ত্যাগ হইয়া গিয়াছে।'' ইহাও গণেশ স্তরের অনুভূতির আরও পরিপক্ক অবস্থা। (৩) যোগদা। এই ভূমির ইহাই মানস লক্ষণ যে ''সাধক মনে করেন আমার যাহা শক্তিলাভ করিবার ছিল, উহা লাভ হইয়া গিয়াছে।'' সমস্ত বস্তুতে নিজের আত্মাকে দর্শন করিয়া সাধক ইহাই মনে করেন ''নাস্তি যোগ সমং বলং।'' সত্যই, মনকে বশীভূত রাখিবার শক্তিই ''শক্তিলাভ''। ইহা সূর্যস্তর ও বিষ্ণুস্তরের এক অংশ জ্ঞান। (৪) লীলোন্মুক্তি। বিষ্ণুস্তরের পরিপক্ক অবস্থার কথা। সাধক পরিষ্কার বুঝিতে পারেন, তিনি এবার মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সংসারের সুখচক্র তাঁহাকে আর বশীভূত করিতে পারে না। (৫) সৎপদা। ইহা শিবস্তরের তন্মাত্র বোধকেন্দ্র। যে মূল কণায় বা উপাদানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত, উহারাই তন্মাত্র জগৎ। সাধক ইহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারেন। (ক্রমবিকাশে তন্মাত্র অংশ দ্রষ্টব্য)। (৬) আনন্দপদা। মহত্তত্ত্বে পুরুষোত্তম প্রতিফলিত হন ইহারা জীববীজ এবং মহত্তত্ত্বে মূলশক্তি বিবর্তিত হইয়া পঞ্চ তন্মাত্র সৃষ্ট হয়। এজন্য মহত্তত্ত্বই আনন্দপদা জ্ঞানভূমি। গীতা বলেন ''মম যোগী মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ সম্ভবঃ সর্বভূতানাং যতঃ ভবতি ভারত॥'' মহদ্ব্রহ্ম আমার সৃষ্টিচক্রস্থান, ইহাতে আমি বীজদান করি, ফলে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (৭) পরাৎপর জ্ঞানভূমি। ইহা শক্তিস্তর বা পুরুষোত্তম স্তরের জ্ঞানভূমি। পাঠক ক্রমবিকাশ দেখুন। ইহাই সাধকের অন্তিম ব্রহ্মজ্ঞানভূমি! সপ্ত যোগ ভূমির শেষ ভূমি হইতে সপ্ত জ্ঞান ভূমির শেষ ভূমি আরও উন্নত স্তর।

ষোড়শাঙ্গ রাজযোগ

অন্তিম লয় যোগের দীক্ষার পর বার বৎসর কাল রাজযোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। সমস্ত জীবনের সাধনা এবং অনুভূতিগুলিকে অনেক প্রকার জ্ঞানমূলক শাস্ত্রকথার সঙ্গে মিলাইয়া ও বিচার করিয়া দেখিতে হয়, নিজের জ্ঞান কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে এবং কতটা বাকী। অন্তিম দীক্ষা মানেই সন্ন্যাসদীক্ষা। এই দীক্ষার পর বার বৎসর রাজযোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলে আনন্দমঠের সাধনায়, সাধক সরস্বতী নাম

ধারণ করেন। অন্তিম লয়যোগ দীক্ষার পর, অনেক সাধক "বিরজা" গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকেও আনন্দমঠ সাধনার নিয়মে সরস্বতী বলা হয়। এই রাজযোগ সাধনার অঙ্গগুলি অত্যন্ত কঠিন সাধনা। আমরা শক্তিবাদ ভাষ্য লিখিয়া ইহাকে সহজ করিতে চেষ্টা করিব। তা হইলেও ইহা দুর্বোধ্যই থাকিয়া যাইবে।

রাজযোগ সাধনার ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা যাইতেছে। এসব ক্রিয়াগুলির অভ্যাস বলিতে যাহা বুঝায়, উহার কথাও বলা যাইতেছে।

ষোড়শাঙ্গ রাজযোগ

জ্ঞানলাভো হি শাস্ত্রাণাং শ্রবণান্মননাত্তথা।
যমো হি নিয়ম স্ত্যাগো মৌন দেশশ্চ কালকঃ॥
আসনং মূলবদ্ধশ্চ দেহ সাম্যং চ দৃক্‌স্থিতিঃ।
প্রাণ সংযমনং চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা॥
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥

(১) শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ এবং মনন, (২) যম, (৩) নিয়ম, (৪) ত্যাগ, (৫) মৌন, (৬) দেশ, (৭) কাল, (৮) আসন, (৯)মূলবদ্ধ, (১০) দেহ সাম্য, (১১) দৃক্‌স্থিতি, (১২) প্রাণ সংযম, (১৩) প্রত্যাহার, (১৪) ধারণা, (১৫) আত্মধ্যান, (১৬) সমাধি।

রাজযোগ সাধনার প্রথমেই শাস্ত্রজ্ঞান। গ্রন্থাদি পাঠে যে জ্ঞান লাভ হয়, উহার নাম শাস্ত্রজ্ঞান। অভিজ্ঞ জ্ঞানী এবং যোগীর নিকট শ্রবণ করিতে হয়, উহার নাম শ্রবণ। জ্ঞানার্থ বিষয়ে ও শ্রবণ-বিষয়ে মনে মনে পর্য্যালোচনার নাম মনন। এখানে উপনিষদ বা বেদান্ত বিষয়ে পাঠ-জ্ঞানই শ্রবণ এবং তদনুরূপ মননই যে মনন কথার লক্ষ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান এবং ঈশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুভূতিই বেদান্ত বা উপনিষদ নামে খ্যাত। এসব উপনিষমূলক অনুভূতির রাশিকে ভিত্তিমাত্র করিয়া যে সব পূর্ণ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে বেদান্ত পাতঞ্জলী ও সাংখ্য দর্শনই শ্রেষ্ঠ। কাজেই শুধু উপনিষদ পাঠই শাস্ত্রজ্ঞান নহে, ইহার সঙ্গে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত দর্শনেরও জ্ঞান ও শ্রবণ মনন হওয়া প্রয়োজন।

এখানে শক্তিবাদ দর্শনের কথাও বলা প্রয়োজন। ক্রমবিকাশ গ্রন্থে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তর এবং এসব স্তরের অনুভূতি, কর্মবিজ্ঞান, চরিত্রভিত্তি, মনোবিজ্ঞান, এসব বিভিন্ন স্তরের সমাজবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। ইহাতে নাস্তিকবাদ ও নাস্তিকবাদমূলক সমাজ, রাষ্ট্র ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে। কাজেই ইহাই ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক অকাট্য শাস্ত্র। অনেকের ধারণা একজন ঋষি ও যোগী কেবল নিজের মুক্তির কথা লইয়া থাকেন, শক্তিবাদ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও শ্রবণ মননের অবলম্বন থাকিলে একথা বলা চলে না। সমাজক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য এবং অকর্তব্যও বুঝিতে হয়। সমাজে কেবল শক্তিবাদী গৃহীরই প্রয়োজন হয় না, ইহা হইতেও শক্তিবাদী যোগী ও ত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। এ সব ত্যাগীরাই

অধ্যাত্মবাদ সমাজের মূল ভিত্তি। শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রবণ মনন বিষয়ে শক্তিবাদ সূত্রম্, শক্তিবাদ ভাষ্য উপনিষদ এবং শক্তিবাদ ভাষ্য গীতার অবলম্বনে শক্তিবাদী যোগীগণ ও অন্যান্য মতবাদিগণ এই রাজযোগ সাধনায় প্রবেশ করিবেন। তবেই শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রবণ মনন, ঠিক ফল দিতে সক্ষম হইবে। বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় সূত্র হইতেছে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র আত্মা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কাজেই গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তিস্তরের বিকাশে যেরূপ শাস্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে, সব শাস্ত্রই শাস্ত্র নামে খ্যাত। নাস্তিকবাদ এবং অসুরবাদমূলক শাস্ত্র এবং ধর্মও মানুষের অন্তরজগৎ হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। এসব শাস্ত্রেরও পর্যালোচনা প্রয়োজন। নয় তো আত্মজ্ঞানমূলক কোন শাস্ত্রই রক্ষিত হইতে পারে না।

২। **যম**। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যাসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ॥

সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই যথার্থ জানিয়া ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম করিতে হয়। ইহাকেই রাজযোগের 'যম' বলে। সাধকের নিরন্তর এই যম অভ্যাস করা কর্তব্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গণেশ শূন্যবোধ, সূর্য প্রেমবোধ, বিষ্ণু সুখবোধ, শিব শান্তি এবং পূর্ণবোধ, ইহারা সগুণ ব্রহ্মবোধের চারটি স্তর, শক্তিস্তর ইহা হইতেও উন্নত স্তর। স্থূল বিষয়ের প্রভাব গণেশ, সূর্য ও বিষ্ণুস্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। প্রথম প্রথম শূন্যবোধ, প্রেমবোধ ও সুখবোধ স্তরে ইন্দ্রিয় সংযম যতটা সহজ মনে হয়, পরে ততটা সহজ মনে হয় না। অর্থাৎ এ সব স্তরের অনুভূতি যদিও ব্যাপক এবং স্থূল ও মনোজগতের সমস্ত বিষয়ই ইহাদের রূপে রূপায়িত হয়, তবুও ইহা বলা যায় যে, এ সব স্তরে ইন্দ্রিয় এবং ভোগ সংযম পূর্ণ ভাবে হয় না। শিব স্তরে ও তন্মাত্র বোধ স্তরে, ভোগ এবং ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়। এ সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। সাধক শিবস্তরের সগুণ ব্রহ্মবোধের কেন্দ্রে ইন্দ্রিয় সংযমের পাকা স্তর প্রাপ্ত হন। ইহার পর শক্তিস্তরের ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থিত। শক্তিস্তরের বিকাশের পর অনেক সাধক পূর্বজন্মের সম্বন্ধযুক্ত অনেক ঘটনা বা প্রারব্ধ ভোগের সংস্পর্শে আসিয়া থাকেন। প্রারব্ধ সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা ভিন্ন সমস্ত বৈষয়িক জগতের ভোগ বিষয়ে সাধকের পূর্ণ সংযম শক্তি স্বভাবতঃই থাকে। কিন্তু প্রারব্ধ প্রভাবযুক্ত ঘটনার আবর্তে সাধকের সংযমশক্তি সীমাবদ্ধ। এক জন্মের স্ত্রীকে তুমি ফাঁকি দিয়া সাধক বা যোগী হইলে, যদি সেই স্ত্রী তোমাকে ধরিয়া থাকেন এবং না ছাড়েন, তবে সেখানে তোমার কোন স্তরের অনুভূতির ভিত্তি সম্পন্ন যমই কার্যকরী হইবে না। সতীত্বে নিষ্ঠাসম্পন্ন স্ত্রীকে জ্ঞান ও সুখের ব্যবস্থা সিদ্ধযোগীকে করিয়া দিতেই হইবে। এক জন্মের সতী স্ত্রীর অন্তরে এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার হৃদয়ে বায়ুরূপে জমা থাকে। প্রারব্ধ সম্বন্ধযুক্ত স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামীকে ভালবাসার চঞ্চলতা ও উদ্বেলন জাগ্রত হইলে সিদ্ধযোগীর অন্তরের উপরে ঝঙ্কার হইবেই। যোগীর সাধ্য নাই সেই হৃদয়-বীণার প্রতিফলিত ঝঙ্কার স্তব্ধ করিতে পারেন। কত কম লেন-দেনের মধ্য দিয়া সিদ্ধযোগী এই উদ্বেলনের প্রভাব অতিক্রম করেন, সেটা সিদ্ধযোগীর প্রতিভা ও বুদ্ধিশক্তির উপর নির্ভর করে। কায় মনে এবং বাক্যে সতী স্ত্রী যদি ইচ্ছা করেন তবে স্বামীর সমস্ত জ্ঞান এবং অনুভূতিকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিয়া

পূর্ণজ্ঞানী হইতে পারেন। তবে যাঁহারা সতীধর্মে নিষ্ঠাসম্পন্না নহেন তাঁহারা সামান্য রকম লেনদেন করিয়া হৃদয়স্থিত বায়ুর উদ্বেলন সাম্য ও শেষ করিয়া যোগভ্রষ্টা হইয়া অন্য পুরুষের আশ্রয়ে সংসারে প্রবেশ করেন এবং সিদ্ধযোগীকে মুক্তি দেন। এ সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিতে হইলে একখানা গ্রন্থ লিখিতে হইবে। প্রারব্ধ সম্বন্ধ না থাকিলে শিবস্তর বা শক্তিস্তরের যোগীদের এই রাজযোগের 'যম' প্রতিষ্ঠা সহজই থাকে। এজন্য কোন চেষ্টারই প্রয়োজন থাকে না, কারণ সব স্থূল পদার্থই ব্রহ্মস্বরূপ এবং সমস্ত আন্তর বা মানস ক্রিয়াই ব্রহ্মস্বরূপ। আত্মা বা ব্রহ্মই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বস্বরূপ, ইহাই যমজ্ঞানের মূলকথা। অহং গ্রন্থিভেদ না হইলে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। গণেশ, সূর্য ও বিষ্ণুস্তরের ব্যাপক অনুভূতি দ্বারাও 'অহং গ্রন্থি' ভেদ হয় না। ''গ্রন্থিজ্ঞান'' অধ্যায় দেখুন।

৩। **নিয়ম**। স্বজাতীয় প্রবাহশ্চ বিজাতীয় তিরস্কৃতিঃ।
নিয়মো হি পরমানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ॥

স্বজাতীয় প্রবাহ ও বিজাতীয় তিরস্কৃতি অর্থাৎ চেতনরূপী সদ্ভাবের গ্রহণ এবং জড়রূপী সংস্কারের ত্যাগ করণ যোগ্য বিচারকেই ''নিয়ম'' বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমি দীক্ষার সময় সামান্য ক্রিয়া, শক্তিশালী মন্ত্র এবং শক্তিশালী ধ্যানের উপদেশ দিয়া থাকি। ২, ১ দিনের মধ্যেই শক্তিশালী ও শান্তিময় অনুভূতির আবির্ভাব হয়। যদি সাধক বুদ্ধিমান এবং সাবধান থাকেন তবে আত্মবিকাশের শেষ স্তর পর্যন্ত এই অনুভূতির অবলম্বনেই চলিয়া যাইতে পারিবেন। কি ভাবে চলিলে বা ভাবিলে শান্তি বৃদ্ধি হইবে এবং কি ভাবে চলিলে বা ভাবিলে শান্তি কমিয়া বিষয়ের আবর্তে আসিবেন, সেটা সাধক নিজেই বুঝিতে পারিবেন। এবং কয়েক বৎসর মধ্যেই সমস্ত প্রকার সংসার প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারিবেন। বহু বৎসর সাধনার পর সিদ্ধদশায়, প্রারব্ধ কর্মফলে অদমনীয় বৈষয়িক আকর্ষণ জাগ্রত হইলেও উহাকে বুদ্ধিবলে অল্প লেনদেনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে পারিবেন। ''নিয়ম'' অত্যন্ত শক্তিশালী রাজযোগ সাধনা।

৪। **ত্যাগ**। ত্যাগপ্রপঞ্চ রূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতা পূজ্যঃ সদ্যমোক্ষ ময়ো মতঃ॥

চিদাত্মভাবের অবলোকন দ্বারা প্রপঞ্চ স্বরূপের পরিত্যাগই রাজযোগের ''ত্যাগ'' বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাত্মাগণ এই সাধনার যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। কারণ ইহা দ্বারা সদ্য মোক্ষলাভ হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। মন বুদ্ধি এবং অহংকে কেন্দ্র করিয়া আমরা এ বিশ্বসংসার দর্শন করিয়া থাকি। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে বুঝা যায়, এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই রূপ। দর্শনশাস্ত্রে ইহারই নাম ''বিশ্বরূপ''। আমাদের চিন্তাজগতে যাহা প্রতিভাত হয়, উহাও ব্রহ্মের স্বরূপ; উহারই নাম ব্রহ্মের ''তৈজসস্বরূপ''। আমাদের অনুভূতি জগতে যাহা প্রতিভাত হয় উহারই নাম ব্রহ্মের ''প্রাজ্ঞরূপ''। অহং কৈন্দ্রিক মানস জগৎ এবং আত্মামূলক মানস জগৎ একরূপ নহে। এইরূপ অহং কৈন্দ্রিক প্রাজ্ঞ বা জ্ঞানজগৎ এবং আত্মামূলক জ্ঞানজগৎদর্শনের মধ্যে ভেদ আছে। অহংমূলক দর্শন না হইয়া আত্মরূপমূলক দর্শন

হওয়া চাই, ইহারই নাম রাজযোগের ‘ত্যাগ’ সাধনা। ইহা সত্য সত্য সদ্যমুক্তির সাধনা। এই ত্যাগ সাধনায় সিদ্ধির জন্যই মহাত্মাগণ সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। সংসার ত্যাগ কিন্তু ত্যাগ নহে, আত্মদর্শনই ত্যাগ। ইহা বৃত্তি নিরোধেরই কথা।

৫। **মৌন**। যস্মাদ্ বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
যস্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধঃ॥
বাচো যস্মিন্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সত্যং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনস্তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদীভিঃ॥

যাঁহাকে বাক্য ও মন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবলমাত্র যোগীজনই যাঁহাকে অনুভব করিতে পারেন, এমন পরমব্রহ্মই “মৌন” নামে অভিহিত। সেই তত্ত্বকে লাভ করিবার জন্যই যোগিগণের চেষ্টা করা আবশ্যক। বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে, তাঁহার কথা কে বলিতে পারে? প্রপঞ্চ মাত্রই বক্তব্য হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব শব্দাতিরিক্ত। এই ভাবেই ব্রহ্মতত্ত্ব মৌন নামে খ্যাত। ইহা অত্যন্ত সহজ ও সত্যকথা, বাক্য বন্ধ করিয়া যে মৌন, উহা নিম্ন অঙ্গের ক্রিয়া মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মতে উহা বালকের ক্রীড়া মাত্র।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বাক্যের ৪টি স্তর আছে। বৈখড়ী, মধ্যমা, পশ্যন্তি ও পরা। যে বাক্য বাক্যেন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হয় উহার নাম বৈখড়ী। মনে মনে কোন কিছু পর্যালোচনা করিলে যে মানসধ্বনি প্রবাহিত হয়, উহার নাম মধ্যমা। যে কোন বোধ বা অনুভূতি মাত্রই পশ্যন্তি স্তরের ধ্বনি। বাক্য পরাস্তরে থাকিলে, বাক্য আর বাক্য থাকে না, সেগুলি কতকগুলি শক্তির ক্রিয়া মাত্র। শক্তির ক্রিয়াগুলি যে স্তরে ক্রিয়াহীন হয়, উহার নাম মৌন। ক্রমবিকাশ তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ দ্রষ্টব্য।

৬। **দেশ**। আদ্যন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্ন বিদ্যতে।
যেনেদং সততং ব্যাপ্ত স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ॥

যে দেশের আদি মধ্য ও অন্তে জনতার সম্বন্ধ নাই, যে দেশ সতত পরমাত্মা দ্বারাই ব্যাপ্ত থাকে, সেই সংস্কার সম্বন্ধ পরিশূন্য দেশকেই বিজন ‘দেশ’ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শক্তিবাদ ভাষ্য গীতায় ‘কায়াকাশ’ ধ্যানের কথা আছে। ‘দেশ’ নামক রাজযোগ সাধনার উহাই ভিত্তি।

কায়াকাশ, ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান এবং উচ্চ স্তরের বীজমন্ত্র রূপের বিজ্ঞান আমি প্রাথমিক দীক্ষাকালেই শিক্ষা দিয়া থাকি। দুই এক দিনের সাধনাতেই সাধক অজপা বিধানে জপের একটা শক্তিশালী ভিত্তি লাভ করেন। রাজযোগের ক্রিয়াগুলির মধ্যে “দেশ” এবং “প্রাণায়াম” সাধনা অতীব সহজ এবং সুন্দর শক্তিসম্পন্ন সাধনা। এসব সিদ্ধ সাধনার ধারা ধরিয়া রাখিতে পারিলে, জীবন শান্তিময় জ্ঞানময় এবং শক্তিময় হইতে বেশীদিন লাগে না। প্রাণায়াম অংশ দ্রষ্টব্য।

৭। **কাল**। কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মণাদীনাং নিমেষতঃ।

কাল শব্দেন নির্দ্দিষ্টশ্চাখণ্ডানন্দ অদ্বয়ঃ॥

যাঁহার নিমেষমাত্র মধ্যেই ব্রহ্মাদি হইতে সর্বভূতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া যায়, সেই অখণ্ডানন্দ রূপ অদ্বিতীয় সত্তাই ‘কাল’ নামে খ্যাত।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং তুরীয়, কালের এই চার প্রকার ক্রিয়া। একটা দিবা রাত্রিকেও এই ভাবেই ভাগ করা হইয়াছে। প্রাতঃ (সৃষ্টি), মধ্যাহ্ন (স্থিতি), লয় (সায়ং) ও তুরীয় (মধ্যরাত্রি)। এই চার প্রকার কালের শেষে ব্রহ্মমুহূর্ত্তের উদয় হয়। একটা ছোট কালকে ধরিলেও এই চার প্রকার কালের ভাগ পাওয়া যায়, এবং পরেই বিশ্রাম। মণিবন্ধে একটি নাড়ীর স্পন্দনও এইরূপ আরম্ভ, মধ্য, অন্ত, তুরীয় এবং বিশ্রামরূপে অবস্থিত। একটি মানস ক্রিয়ারও উত্থানে স্থিতি লয় তুরীয় ও বিশ্রাম বা ব্রহ্মরূপে শেষ হয়। সাধনার শেষ স্তরে বিরাম বা ব্রহ্মস্তরে সাধকের স্থিতি বৃদ্ধি হয়; এ জন্য সৃষ্টি স্থিতি লয় তুরীয় অবস্থাগুলি নাম মাত্র বা নিমিষমাত্র প্রতিভাত হয়। “প্রাণায়াম” অংশে এ সম্বন্ধে বলিব। প্রথম একটা দিনরাতের মধ্যে কালের ভাগগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়; পরে যে কোন ক্রিয়া বা যে কোন বস্তুর উৎপত্তি স্থিতি লয় তুরীয় ও বিশ্রামস্তরের নীতিতে বিচারনিয়োগ করিতে হয়। সব রকম অবস্থার শেষেই বিশ্রাম আবির্ভূত হয়। এই বিশ্রামই ব্রহ্ম। এই বিশ্রামে আনন্দ বেশী। এই আনন্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির মূলে এই আনন্দই বিদ্যমান। কর্ম্মই ঈশ্বর এবং বিশ্রামই ব্রহ্ম। কর্ম্ম এবং বিশ্রামকে কে না চায়?

৮। **আসন**। সুখেনৈব ভবেদ্ অস্মিন্নজস্র ব্রহ্ম চিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজ্ঞানীয়ান্নেতরং সুখনাশনম্॥
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানম ব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টা স্তন্নৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ॥

যে অবস্থায় সুখে ব্রহ্ম চিন্তন হইতে থাকে, তাহাকেই রাজযোগাঙ্গের আসন বলে। ইহার অতিরিক্ত যে সামান্য স্থূল আসনে বসা তাহা সুখাসন নহে, তাহা সুখনাশন, অর্থাৎ প্রকৃত সুখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহা সমস্ত ভূতের আদি, যাহা বিশ্বের অধিষ্ঠানস্বরূপ এবং যাহা অব্যয় এবং যে স্বরূপে সিদ্ধ-লোক স্থিত হইয়া থাকেন, তাহাকেই সিদ্ধাসন বলে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে স্থূল সিদ্ধাসনের অভ্যাসকে সিদ্ধাসন বলা হয় নাই। মন সদা সাম্য এবং স্বাভাবিক সুখে থাকে, ইহাকেই সিদ্ধাসন বলা হইয়াছে। উচ্চ স্তরের অনুভূতি না আসিলে এই অবস্থা স্থায়ী হয় না। নিশ্চিন্ততা, সাম্যতা এবং সহজ সুখ মিলিয়া মস্তিষ্ক ও মন সদা আনন্দে থাকে।

৯। **দেহসাম্য**। অঙ্গুনাং ন সমতাং বিন্যাৎ স তু মে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নো চৈব সমানত্ত্ব মৃজুন্নং শুষ্ক বৃক্ষবৎ॥

সমভাবাপন্ন ব্রহ্মে লীন হওয়াকেই দেহসাম্য কহে। শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় ঋজুতাকে দেহসাম্য বলে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। শরীর কাষ্ঠবৎ সোজা রাখার উপর জোর দেওয়া হয় নাই। মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকেন্দ্রগুলি সদা কর্ম করে, উহারা কর্মশেষে নিরালায় বিশ্রাম করিবে বা বিশ্রামের আরামে স্থিত থাকিবে, ইহাই দেহসাম্য।

১০। **দৃক্‌স্থিতি**। দৃষ্টিং ব্রহ্মময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ।
যা দৃষ্টিঃ পরমাদোরা ন নাসাগ্রাব নোকিনী॥
দৃষ্টি-দর্শন দৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রাব লোকিনী॥

দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া সমস্ত প্রপঞ্চময় জগৎকে ব্রহ্মময় দেখাকেই দৃক্‌স্থিতি কহে। এইরূপ দৃক্‌স্থিতিই পরমমঙ্গলকরী। নাসিকার অগ্রভাগ দেখাকে দৃক্‌স্থিতি বলে না। যে অবস্থায় দৃষ্টি, দর্শন ও দর্শকের একীকরণ দ্বারা বিরাম হইয়া যায়, সেই অবস্থাকেই প্রকৃত দৃক্‌স্থিতি বলিতে পারা যায়। যোগীরা সেইরূপ দৃক্‌স্থিতিরই অভ্যাস করিবেন। নাসাগ্র দেখার অভ্যাস করিবেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে জগৎ দেখার কথা বলিয়াছেন। অন্তর জগতের ক্রিয়াবলীকে জগৎ বলা ভাল। দর্শনশক্তি ও দ্রষ্টার সঙ্গে সেই দৃশ্যবস্তুর ভেদ থাকিলে আরাম হইতেই পারে না। আরামহীন হইলে উহা রাজযোগ বলা যায় না, সাধক ইহা মনে রাখিবেন। রাজযোগের সবগুলি ক্রিয়া কতগুলি ব্রহ্মজ্ঞানমূলক অনুভূতি। উচ্চ স্তরের সাধকগণের অন্তরে ইহা এক এক সময় এক একটি বিকশিত হয়। সাধকগণ বহুদিন সেই অনুভূতি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

১১। **মূলবদ্ধ**। যন্মূলং সর্ব্ব ভূতানাং যন্মূলং চিত্ত বন্ধনম্।
মূলবদ্ধং সদা সেব্যো যোগ্যোঽ সৌ রাজযোগিনাম্॥

যাহা সর্বভূতের মূলস্বরূপ, যাহা চিত্তবৃত্তি নিরোধের কারণস্বরূপ, তাহাকেই যোগতন্ত্রে মূলবদ্ধ বলে। রাজযোগ সাধকযোগীর এই অবস্থা সর্বদা সেবন করা কর্তব্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। সুখময় চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াও বৃত্তি নিরোধ করা যায়। নিদ্রা প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া বৃত্তি নিরোধের কথা যোগশাস্ত্রে আছে। নিদ্রাভঙ্গের পরই নিদ্রাসুখ স্মরণ করিয়া বৃত্তি নিরোধ করা সুখকর উপায়। কারণ, যে কোন ক্রিয়ারই প্রলয়ের শেষে নির্গুণ বা বিরাম অবস্থা পাওয়া যায়। যতক্ষণ ক্রিয়ার শেষ অবস্থার অনুভব হয় নাই, ততক্ষণ কোন কিছুকে মূল মানিয়া লওয়াকে কোন শক্তিশালী অবলম্বন মানা যায় না।

১২। **প্রাণ সংযম**। চিন্তাদি সর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বে সর্ব্বভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তি নাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥
নিষেধং প্রপঞ্চস্য রেচকাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ূরীরিতঃ॥
অতস্তদ্ বৃত্তিনৈশ্চলাং কুম্ভকঃ প্রাণ সংযমঃ।
অয়ং চাপি প্রবুদ্ধাণাং ঘ্রাণ পীড়ণম্॥

চিন্তাদি সর্বপ্রকার ভাবগুলিকে ব্রহ্মভাবে পরিণত করিতে পারিলে যখন সমস্ত প্রকার বৃত্তি নিরোধ হইয়া যায়, তখনই রাজযোগের প্রাণায়াম অবস্থা বলা হয়। ভাবনা দ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চের নাশ করিয়া দেওয়াকেই ইহার রেচক বলে। তাহার পর নিশ্চলরূপে

ব্রহ্মভাবে স্থির থাকিবার নাম কুম্ভক। ইহাকেই জ্ঞান মার্গের প্রাণায়াম ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার নিম্ন অঙ্গে নাসিকা পীড়ন দ্বারাই প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিতে হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। গীতার ২য় অধ্যায়ে শ্লোক ৫৫ হইতে ব্রাহ্মী স্থিতির ক্রিয়া ও লক্ষণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক শক্তিবাদ ভাষ্য-গীতা দেখুন। এই ব্রাহ্মী স্থিতি লক্ষণে ৬৪ শ্লোক বিষয়ে পরিমিত ভ্রমণের অভ্যাসও গীতা দিয়াছেন। এই ১৬টি রাজযোগ ক্রিয়ার সিদ্ধ সাধকও যদি অন্য জন্মের প্রারব্ধ কর্মফলে বৈষয়িক সংস্পর্শে আসেন, তবে দেখিতে পাইবেন কোন স্তরের অনুভূতি এবং কোনপ্রকার রাজযোগ সাধনার শক্তিদ্বারাও বৈষয়িক জগতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সেই সময় সিদ্ধ স্তরের সাধককে এই ৬৪ নং শ্লোকের পথ গ্রহণ করিতে হয়। প্রারব্ধ চক্র অতিক্রম করিবার জন্য সিদ্ধসাধককে যে পথ অবলম্বন করিতে হয় সেটা অত্যন্ত দুর্গম। সে পথে ভোগ এবং ব্রহ্মচর্য এক। ক্রমবিকাশে 'কুণ্ডলিনী জাগরণ এবং ব্রহ্মনাড়ী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আমরা উহার অধিক আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। কারণ উন্নত শিবস্তর অতিক্রম করিবার পর শক্তিস্তরের যোগীর প্রারব্ধ জীবন আরম্ভ হয়। উহা দুর্গম হইলেও সিদ্ধ যোগীর পক্ষে কোন কঠিন পথ নহে। উহাতে সৃষ্টি নাই, উহা শক্তি এবং ব্রহ্মচর্যেরই সাধনা মাত্র। এ সম্বন্ধে 'যম' অংশে অনেক কথা বলা হইয়াছে। প্রারব্ধ কেবল স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধেই জাগ্রত হয় না। দাস্য বাৎসল্য আদি সম্বন্ধেও জাগ্রত হইয়া থাকে। কথিত আছে, মেনকার কন্যা প্রসবের পর মহর্ষি বিশ্বামিত্র কন্যা রক্ষণে ও পালনে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে মেনকার অভিসম্পাতে বিশ্বামিত্রের পেটের ব্যথা হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে কয়েক বৎসর পর বিশ্বামিত্র নিজ কন্যা শকুন্তলাকে স্নেহ আদর করিবার পর সেই ব্যথা অতিক্রম করেন। অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা এবং শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে খেলা করিতেছিলেন। অপরিচিতা স্বীয় কন্যাকে মহর্ষি বিশ্বামিত্র গভীর স্নেহবশে বলপূর্বক কোলে তুলিয়াছিলেন, কারণ শকুন্তলা পিতাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। বিশ্বসংসার যাহাই ভাবুন না কেন, প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই, যোগী মুক্তিলাভ করেন এবং দুঃখ অতিক্রম করেন। প্রারব্ধ চাপিয়া রাখিয়া লাভ নাই। ইহাতে দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং অন্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, যতক্ষণ প্রারব্ধ কর্ম বন্ধন ক্ষয় হইবে না, ততক্ষণ যোগীর শেষ মুক্তি নাই। কন্যাকে স্নেহ করিবার পূর্বে বিশ্বামিত্র অনেক প্রশ্ন করিয়াও জানিতে পারেন নাই শকুন্তলার পিতা কে?

পাঠক গীতার শক্তিবাদ ভাষ্যে (২য় অঃ, শ্লোক ৫৫) প্রাণক্রিয়া অংশ পাঠ করুন। মস্তিষ্কস্থিত শিব পিণ্ডের ঊর্ধ্ব ভাগের নাম গুরুপাদুকা স্থান। ১২টি কেন্দ্রযুক্ত গুরুপাদুকা, অকথ রেখাময় অবলালয় (জ্ঞান শক্তিপীঠ), শিখাত্রয়, অকথ রেখা ও শিখাত্রয়ের মধ্যস্থিত নাদ বিন্দু, শিখাত্রয়ের লয়স্থানে দ্বন্দ্ব মিন্দু বা সোমচক্র স্থান (ইহাই ১৬ কলা জ্ঞানভূমি মহত্তত্ত্ব স্থান), এবং সোমচক্রের লয় ভূমি অব্যক্ত ভূমির সংস্থান বুঝিতে চেষ্টা করুন। বহুদিন ধরিয়া শিবপিণ্ডস্থিত গুরুপাদুকা ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। যতদিন এই ধ্যানে আরাম বা স্বাদ পাইবেন না ততক্ষণ গুরুপাদুকা অবলম্বন যথেষ্ট শক্তিশালী হয় নাই জানিতে হইবে। জীবের আন্তর সুখের সমস্তগুলি কেন্দ্রই মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকায় বিদ্যমান (দ্রঃ ক্রমবিকাশ ৪র্থ ভাগ)। গুরুপাদুকাকে কেন্দ্র করিয়া প্রাণক্রিয়া অবলম্বন সাধককে শেষ সমাধিভূমিতে লইয়া যাইবে। শেষ সমাধিভূমি মানে অব্যক্তপীঠ।

ইহার পরই শক্তিস্তর বা পুরুষোত্তম স্তর অবস্থিত। গুরুর নির্দেশ ভিন্ন কেহই এসব সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের সাধনা বিষয়ে বেশী মাতব্বরী করিবেন না। মস্তিষ্কব্যাপী শীতল ছত্রাকার সহস্রার এবং উহার গর্ভস্থিত শ্বেতশীতল গুরুপাদুকা কমল এবং এই কমলে শ্বেতশান্ত শীতল শিবতুল্য শক্তিমান গুরুর ধ্যান করিতে হয় অথবা আদিগুরু শিবের ধ্যান করিতে হয়। "প্রাণক্রিয়া" সাধনায় ইহাই প্রথম গুরুপাদুকা ধ্যান। ২য় স্তরে অকথ রেখা দ্বারা গঠিত ত্রিকোণ যন্ত্র বা অবলালয়। ৩য় স্তরে অ ক থ রেখার হ ল ক্ষ বিন্দু হইতে উত্থিত শিখাত্রয়। ৪র্থ স্তরে অকথ রেখা এবং রেখার কোণ হইতে উত্থিত শিখাত্রয়ের মধ্যস্থানে স্থিত "নাদ বিন্দু"। ৫ম স্তরে শিখাত্রয় লয়স্থানে দ্বন্দ্ব মিন্দু বা সোমচক্র স্থান বা মহত্তত্ত্ব ভূমিতে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া প্রাণক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হয়। সাধক এই ভাবে সাম্রাজ্য দীক্ষায় ৫টি স্তর অতিক্রম করিবেন। ইহার পর মহা সাম্রাজ্য দীক্ষায় দ্বন্দ্ব মিন্দুলয়ভূমি অব্যক্ত পীঠের ধ্যানের অভ্যাস সহ "প্রাণক্রিয়া" করিবেন। প্রাণক্রিয়া বা রাজযোগের প্রাণায়াম অত্যন্ত উচ্চ স্তরের সাধনা। এই অব্যক্ত ভূমিই শ্বাসপ্রশ্বাসের শেষ লয় ভূমি বা অজপার শেষ প্রান্ত। এই অব্যক্ত ভূমিই অনাহত নাদের শেষ লয় স্থান। এই অব্যক্ত ভূমিই সমস্ত সৃষ্টির শেষ লয় স্থান। ইহাই 'হংসঃ' স্থান। আমাদের শরীরস্থিত সমস্ত নাড়ী, সমস্ত যন্ত্র, সমস্ত প্রকার সৃষ্টিক্রিয়া এখান হইতেই নিয়মিত হয়। স্ত্রী পুং মিলনের সৃষ্টিচক্রের ইহাই শেষ প্রান্ত। এখানে দাঁড়াইয়া সিদ্ধসাধক প্রারব্ধ ক্ষয়ের পথে ভোগ ও ব্রহ্মচর্য এক রেখায় আনিতে সক্ষম। অব্যক্ত পীঠই হইতেছে শক্তিস্তর বা পুরুষোত্তম স্তরের তটভূমি। ইহাই প্রারব্ধ কর্মের শেষ কেন্দ্র এবং সৃষ্টিচক্রের শেষ লয়ভূমি। ইহাই শক্তিবাদ ধর্মের আরম্ভ ভূমি। ইহার পর পুরুষোত্তম স্তরের কথা আমি "শক্তি সাধনা" অংশে বলিব। প্রাণক্রিয়ার আরম্ভ কালে মনে হয় "গুরুপাদুকা সহ সমস্ত চিন্তাধারা শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।" কিন্তু কিছুকাল অভ্যাসের পর ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, কোন চিন্তা বা ধ্যানই বাহিরে যায় নাই; উন্নত লয়ভূমিতে মন বিলীন হয় মাত্র। শেষকালে বুঝা যাইবে, সব অব্যক্ত ক্ষেত্রে বিলীন হইতেছে। কল্পনা করিয়া প্রাণক্রিয়ার ফল পাওয়া যায় না। শান্তি, তৃপ্তি ও সাম্যকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

এখানে স্পষ্টই বলিয়া রাখা প্রয়োজন, গুরুপাদুকাকে কেন্দ্র করিয়া প্রাণক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই সমস্ত রাজযোগের অনুভূতি ও সাধনবিজ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। গুরুপাদুকার ধ্যান এবং প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে ধ্যান চিত্র বহিষ্কার অরম্ভ হইতে থাকিবে, এবং ক্রমেই অন্তরসুখের স্তরগুলি সাধকের অন্তরে ক্রমে ফুটিতে থাকিবে। আশ্চর্য যে, যে-কোন অনুভূতি, যে কোন প্রকারের সুখবোধ, শান্তিবোধ বা পূর্ণবোধই অন্তরে ফুটুক না কেন, প্রাণক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে উহা বাহির হইয়া যাইতে থাকিবে এবং অতি সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্মতম মঙ্গলময় অনুভূতির স্তরে আন্তরবিকাশ দেখা দিতে থাকিবে। এই ক্রিয়ার শেষ স্তর "হংসঃ পীঠ"। পূজা, পাঠ, জপ, স্তোত্র, কথা, বার্তা, ব্যবহার, বাদ্য, কর্ম, প্রারব্ধ ভোগ, সমস্তপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেচনার ইহাই শেষ কেন্দ্র। প্রাণক্রিয়ার শেষ স্তরই অজপা, প্রাণক্রিয়ার শেষ স্তরই মন্ত্র মূল, সাধনা মূল, সংযম মূল, ব্রহ্মচর্য মূল। সাধক ইহাকেই কেন্দ্র কর এবং শক্তিস্তরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হও। যদি ব্রহ্মগ্রন্থি বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইয়া থাকে, যদি কুণ্ডলিনী

জাগ্রত হইয়া থাকেন, তবে ভোগ, কর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান কোন জগতেই সাধক আর শক্তিহীন থাকিবেন না, এবং কোন জগৎই সাধককে আর বাঁধিতে পারিবে না। তবে সাধক যদি বন্ধনের স্তরে থাকিতে চাহেন তবে তাঁহাকে কাহার শক্তি মুক্ত করেন?

১৩। **প্রত্যাহার**। বিষয়েস্বাত্মনং দৃষ্টা মনসশ্চিতিমজ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞায়োনভ্যঽসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ॥

বিষয়ের মধ্যে আত্মতত্ত্বকে দেখিয়া মনকে ফিরাইয়া চৈতন্যস্বরূপে, সংলগ্ন করাকেই এ অবস্থার প্রত্যাহার ক্রিয়া বলা হয়। মুমুক্ষুগণের পক্ষে এই প্রত্যাহার ক্রিয়া অবশ্য কর্তব্য।

শক্তিবাদ ভাষ্য। প্রত্যেক বিষয়ে আত্মদর্শনের অভ্যাস করিতে থাকিলে মন শ্রান্ত হইবে। বৃত্তি নিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বৃত্তি মাত্রই আত্মরূপে দর্শন হয়। কাজেই বৃত্তি নিরোধের অভ্যাসই প্রধান কথা। বৃত্তি নিরোধের অবস্থা লাভ হইলে যে কোন বৃত্তিতে আত্মদর্শন স্বাভাবিক হয়। সেই স্বাভাবিক অবস্থাই আরও সহজ অভ্যাসে পরিণত করিতে হয়।

১৪। **ধারণা**। যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণং চৈব ধারণা সা পরামতা॥

যাহাতে যাহাতে মন যাইতে থাকে, যোগী সেই সেই বস্তুতেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া দর্শন করিতে করিতে মনের স্থিরতা আনেন, এইরূপ সাধনাকেই সর্বোত্তম ধারণা বলিয়া রাজযোগে উক্ত হইয়াছে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। উচ্চ স্তরের অনুভূতি না প্রকাশ হইলে, রাজযোগের কোন ক্রিয়াই করা চলে না। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়া, মনের এইরূপ চারটি স্তর আছে। খুব বিচার করিলে দেখা যাইবে, মনকে এক স্তরে স্তব্ধ করিলে, কোন অজ্ঞাত কারণে অন্য স্তরে চিন্তার ধারা বহিতে থাকে। উচ্চ স্তরের অনুভূতিসম্পন্ন সাধকের ইহাতে বিরক্তি হয় না ইহার কারণ, মন যত দূরেই যাক না কেন, সেইখানে অনেক পূর্ব হইতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন। ইহা সাধক স্পষ্ট দর্শন করিয়া থাকেন।

১৫। **আত্মধ্যান**। ব্রহ্মৈ বা স্মীতি সদ্‌কৃত্বা নিরালম্ব তথা স্থিতিঃ।
ধ্যান শব্দেন বিখ্যাতো পরমানন্দদায়িনী॥

"আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার সদ্‌বৃত্তি দ্বারা নিরালম্বরূপে যে স্থিতি, তাহাকেই ধ্যান বলে। ইহা দ্বারা পরমানন্দপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

শক্তিবাদ ভাষ্য। "মনের নিরালম্ব স্থিতিই" আত্মজ্ঞান। মনে কোন বৃত্তি থাকিলেই মনের আনন্দ কমিয়া যায়। এবং মনের বোঝা মনে হয়।

১৬। **সমাধি**। নির্বিকার তথা বৃত্যা ব্রহ্মাকার তথা পুনঃ।
বৃত্তি বিস্মরণং সম্যক সকাধির্জ্ঞান সংজ্ঞকঃ॥
ঊর্ধ্ব পূর্ণমধঃ পূর্ণং মধ্যপূর্ণং তদাত্মকম্।
সর্বপূর্ণং য আত্মেতি সমাধিস্তস্য লক্ষণম্॥

নির্বিকার বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। এবং বৃত্তির কথাও স্মরণ থাকিবে না, ইহাই সমাধির লক্ষণ। যিনি ঊর্ধ্বপূর্ণ, যিনি অধঃপূর্ণ, যিনি মধ্যপূর্ণ এবং সর্বপূর্ণ তিনিই পরমাত্মা এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই সমাধি লক্ষণ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে নির্বিকার বৃত্তি ও ব্রহ্মকার বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহা মনোবিকাশের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। শক্তিবাদ ধর্মের ইহাই মূল ভিত্তি। নির্বিকার সমাধি বুঝাইবার জন্য কেহ কেহ শরীরকে কাষ্ঠাকার দেখাইবার কসরৎ করেন, ঐ সব লোককে যোগী না বলিয়া সিনেমার আর্টিষ্ট বলিতে পার।

অজপাজপ। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রাণক্রিয়া বা রাজযোগের প্রাণায়াম অংশে ইহার শেষ কথা আলোচিত হইয়াছে। ক্রমবিকাশের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন। রাজযোগের প্রাণক্রিয়া ও অজপা এবং সমস্ত সৃষ্টির মূলস্থান সবই মস্তিষ্কস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে বিদ্যমান। সেখানে মন, প্রাণ, জ্ঞান, বিজ্ঞান সবই স্তব্ধ হয়। ইহাই সমাধিভূমি। এখানে আসিবার পর সাধক শক্তিস্তরে প্রবেশ করেন এবং পুরুষোত্তম স্তরকে জানিতে পারেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ‘‘শক্তিসাধনা’’ অংশে সব বলিব।

একাদশ অধ্যায়

আনন্দমঠের কথা ও মঠরহস্য সাধনা

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে শক্তিবাদ ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ মঠের অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই মঠগুলি বা সাধনার কেন্দ্রগুলি সাত ভাগে বিভক্ত। সাতটি মঠের মধ্যে চারটি মঠকে ব্যক্ত মঠ বলে এবং তিনটির নাম অব্যক্ত মঠ। প্রত্যেক মঠেরই সাধনার ধারা আছে। মঠের সাধু সম্প্রদায়কে মঠের পরিচয় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। ইহার ফলে, কে কোন্ মঠের শিষ্য এবং সাধনার কতটা কিভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, উহার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। প্রথম আমরা চারটি ব্যক্ত মঠের কথা বলিব। এই ব্যক্ত মঠ চারটি ভারতের চার প্রান্তে অবস্থিত। চারটি ব্যক্ত মঠের স্থূল পরিচয় এবং সূক্ষ্ম পরিচয় আনন্দমঠের সাধকমাত্রকেই বুঝিতে হয়। পরিচয়গুলির বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে সকলেই তান্ত্রিক সাধক এবং শক্তি উপাসক। আমাদের রাজযোগ সাধনাকালে মঠরহস্যও বুঝিতে হয়।

চারটি ব্যক্ত মঠের স্থূল পরিচয়

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
আশ্রম	পশ্চিম	পূর্ব	উত্তর বা বদরিকা	দক্ষিণ
মঠ	সারদা	গোবর্ধন	জ্যোতিঃ বা জোশি	শৃঙ্গেরী
ক্ষেত্র	দ্বারকা	পুরুষোত্তম	মুক্তি	রামেশ্বর
তীর্থ	গোমতী	মহোদধি	অলকানন্দা	তুঙ্গভদ্রা
দেবতা	সিদ্ধেশ্বর	জগন্নাথ	নারায়ণ	আদিবরাহ
দেবী	ভদ্রকালী	বিমলা	পুণ্যাগিরি	কামাখ্যা
আচার্য	বিশ্বরূপ বা হস্তামলক	বলভদ্র, তুঙ্গ বা পদ্মপাদ	নরকট বা ত্রোটক	পৃথ্বীশ্বর বা সুরেশ্বর
ব্রহ্মচারী	স্বরূপ	প্রকাশ	আনন্দ	চৈতন্য
সম্প্রদায়	কীটবার	ভোগবার	আনন্দবার	ভুবিবার
বেদ	সাম	ঋক্	অথর্ব	যজুঃ
গোত্র	অবগত	কাশ্যপ	ভৃগু	ভূর্ভুবঃ
মহাবাক্য	‘‘তত্ত্বমসি’’	‘‘প্রজ্ঞানামানন্দম্ ব্রহ্ম’’	‘‘অয়ামাত্মা ব্রহ্ম’’	‘‘অহং ব্রহ্মোঽস্মি’’
পদ	তীর্থ ও আশ্রম	বন ও অরণ্য	গিরি ও পর্বত	ভারতী, পুরী ও সরস্বতী

চারটি ব্যক্ত মঠের সূক্ষ্ম পরিচয়

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
গুরু	ব্রহ্মা	বিষ্ণু	রুদ্র	ঈশ্বর
ঋষি	তৎপুরুষ	অঘোর	সদ্যোজাত	বামদেব
উপদেশ	সৃষ্টি	স্থিতি	সংহার	অনুগ্রহ
গম্য	কুণ্ডলিনী বা প্রকৃতি	পরমাত্মা	কাল	বিজ্ঞান
যোগ	মন্ত্র ও হঠ	ভক্তি বা লয়	ক্রিয়া ও লয়	জ্ঞান, উরু বা লয়
সাত্ত্বিককরণ	নাসিকা	জিহ্বা	চক্ষু	ত্বক
রাজসকরণ	পাদ	উপস্থ	পাণি	পায়ু
চক্র	মূলাধার	স্বাধিষ্ঠান	মণিপুর	অনাহত
মূর্তি	পৃথিবী	জল	তৈজস বা অগ্নি	বায়ু
মহেশ্বর	ব্রহ্মা (অ)	বিষ্ণু (উ)	রুদ্র (ম)	নাদরূপ ঈশ্বর
অনুভূতি	ন্যায়দর্শন	বৈশেষিক দর্শন	যোগ দর্শন	সাংখ্য দর্শন
জ্ঞানভূমি	১ম জ্ঞানভূমি জ্ঞানদা	সন্ন্যাসদা ২য় জ্ঞানভূমি	যোগদা তৃতীয় জ্ঞানভূমি	লীলোন্মুক্তি ৪র্থ জ্ঞানভূমি
কার্য	তত্ত্বমসি বিচার	প্রজ্ঞানব্রহ্ম চিন্তা	জ্ঞানধ্যান প্রকাশ	জ্ঞান ধর্মাচরণ

তিনটি অব্যক্তমঠের স্থূল পরিচয়

ইহারা ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম মঠ নামে প্রসিদ্ধ

	৫ম মঠ	৬ষ্ঠ মঠ	৭ম মঠ
আশ্রম	ঊর্দ্ধ্ব	গুপ্ত	নিষ্কল
মঠ	স্থমেরু	পরমাত্মা	আনন্দ
ক্ষেত্র	কৈলাস	মানসসরোবর	অনুভূতি
তীর্থ	ত্রিবেণী বা স্থমানস	ত্রিপুটি বা ত্রিকোটি	নাদ
দেবতা	নিরঞ্জন	পরমহংস	বিশ্বরূপ
দেবী	মায়া	মানসী মায়া	চিৎশক্তি
আচার্য	ঈশ্বর	অদ্বিতীয় চৈতন্য	সদ্‌গুরু
অবস্থা	ব্রহ্মচর্যাতীত	ব্রহ্মচর্যাতীত	ব্রহ্মচর্যাতীত
সম্প্রদায়	কার্শিকা	সত্য বা সৎসন্তোষ	শ্রীব্রহ্মানন্দ
বেদ	বেদাতীত	বেদাতীত	বেদাতীত
গোত্র	পরমব্রহ্ম	পরমব্রহ্ম	পরমব্রহ্ম
সন্ন্যাস	সংহারক্রম	মহাসন্ন্যাস ভব পাশবিনাশ	মহাসন্ন্যাস পূর্ণানন্দক্রম

তিনটি অব্যক্তমঠের সূক্ষ্ম পরিচয়

	৫ম মঠ	৬ষ্ঠ মঠ	৭ম মঠ
গুরু	মহেশ্বর	পর শিব	পরম শিব
ঋষি	ঈশান	নীলকণ্ঠ	চৈতন্য
উপদেশ	অনুভব	নিরনুভব	পরমব্যোম
গম্য	শূন্য	ব্রহ্ম	পরব্রহ্ম বা পরমব্যোম
যোগ	বাসনা, পরা ও সন্ন্যাস	অমনস্ক	সহজ ও মোক্ষ
সাত্ত্বিককরণ	কর্ণ	মন	সমাধি
রাজসকরণ	বাক্	প্রাণ	মৃত্যু
চক্র	বিশুদ্ধা	আজ্ঞা	সহস্রার
মূর্তি	আকাশ	মন	তুরীয়
বিন্দুরূপ মহেশ্বর	ঁ	কলাস্বরূপ পরশিব	কলাতীত
অনুভূতি	পূর্ব মীমাংসা দর্শন	মধ্য মীমাংসা দর্শন	উত্তর প্রকৃতি বা ব্রহ্ম মীমাংসা দর্শন
জ্ঞানভূমি	সৎপদা পঞ্চম জ্ঞানভূমি	আনন্দ প্রদা ষষ্ঠ জ্ঞানভূমি	পরাৎপরা ৭ম জ্ঞানভূমি
স্বরূপ	পরমানন্দ	জীবন্মুক্ত মহাপূর্ণ পরমহংস	সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম মহাপুরুষ

সাতটি মঠ সম্বন্ধে মহাম্নায় গ্রন্থ

১। "প্রথমঃ পশ্চিমাম্নায়ঃ সারদা মঠ উচ্যতে।
কীটবারঃ সম্প্রদায়স্তীর্থাশ্রম পদে উভে।
দ্বারিকাখ্যং হি ক্ষেত্রং স্যাদ্দেবঃ সিদ্ধেশ্বর স্মৃতঃ।
ভদ্রকালী তু দেবী স্যাদাচার্য্যো বিশ্বরূপকঃ॥
(দেব সিদ্ধেশ্বর শক্তি ভদ্রকালীতি বিশ্রুতা।)
বিখ্যাত গোমতী তীর্থং ব্রহ্মচারী স্বরূপকঃ।
সামবেদঃ প্রপাঠ্যশ্চ তত্র ধর্ম্ম সমাচরেৎ।
জীবাত্মপরমাত্মৈক্য বোধো যত্র ভবিষ্যতি।
তত্ত্বমসি মহাবাক্যং গোত্রাবগত উচ্যতে॥"

২। "দ্বিতীয় পূর্ব্বদিগ্ ভাগে গোবর্দ্ধন মঠঃ স্মৃতঃ।
ভোগবার সম্প্রদায়ো বনারণ্য পদে তথা।
পুরুষোত্তমং তু ক্ষেত্রং স্যাচ্চজ্জগন্নাথোঽস্য দেবতা।

বিমলাখ্যাহি দেবী স্যাদাচার্য্য পদ্মপাদকঃ।
তীর্থং মহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ।
মহাবাক্যং চ তৎপ্রোক্তং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্।
ঋগ্‌বেদপঠনং চৈবসদা সদ্‌গুরু সৃশেবিতং।
কাশ্যপ গোত্রমাখ্যাতং তত্র ধর্ম্ম সমাচরেৎ॥"

৩। "তৃতীয়ে তুউত্তরাম্নায়ৌ জ্যোতির্নাম মঠোভবেৎ।
আনন্দবারো বিজ্ঞেয়ঃ সম্প্রদায়ঽস্য সিদ্ধিদঃ।
পদানি তস্য নামানি গিরি পর্ব্বতঃ সাগরাঃ।
বদরিকাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃত।
পুণ্যাগিরি চ দেবী স্যাদাচার্য্য স্ত্রোটকঃ স্মৃতঃ।
তীর্থং অলকানন্দাখ্যো ব্রহ্মচর্য্যভুৎ॥
অয়মাত্মা ব্রহ্ম চেতি মহাবাক্য মুদাহৃতং।
অথর্ব্ব বেদ বক্তা চ ভৃগ্বাখ্যো গোত্র উচ্যতে॥"

৪। "চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গেরী তু মঠোভবেৎ।
ভুরিবারাহ্বস্তস্য সম্প্রদায়ঃ সুশোভনঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরী ত্রিণি পদানিচ।
রামেশ্বরোহ্বয়ং ক্ষেত্রমাদি বরাহ (নারায়ণ) দেবতা।
কামাখ্যেতি সা দেবী স্যাৎ সর্ব্বকাম ফলপ্রদা।
পৃথ্বীধরাখ্য স্বাচার্য্যস্তুঙ্গ ভদ্রেতি তীর্থকং।
চৈতন্যাখ্যে ব্রহ্মচারী যজুর্ব্বেদস্য পাঠকঃ।
অহং ব্রহ্মাস্মি তত্রৈব মহাবাক্যঃ সমীরিতং॥"

৫। "পঞ্চম স্তূর্দ্ধ আম্নায়ঃ সুমেরু মঠ উচ্যতে।
সম্প্রদায়ে (পিনাকী) কাশিকস্যাৎ পদং নামাভিধ স্মৃতম্।
(কৈবল্য) কৈলাসক্ষেত্র মিত্যুক্তং দেবতাঽস্য নিরঞ্জনঃ।
দেবীমায়া তথাচার্য্য ঈশ্বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তীর্থং (সুমানসং) ত্রিবেনীচ প্রোক্তং ত্রৈলোক্য শরণং মহৎ।
তত্র সংহার মার্গেন সন্ন্যাসং মহদাশ্রয়েৎ॥"

৬। "ষষ্ঠেত্বাত্ম নিচাম্নায়ে পরমাত্মা মঠো মহান্।
(সত্য) সৎসন্তোষঃ সম্প্রদায়ঃ পদং যোগ মনুস্মরণ্।
তস্মিন্ (মানস) সরোবরঃ প্রোক্তঃ পরমংসোঽস্য দেবতা।
দেবী স্যান্মাসনীমায়াপ্যাচার্য্যশ্চেতনা বুধঃ।
ত্রিপুটী (ত্রিকোটী) তীর্থমিত্যুক্ত সর্ব্বপুণ্যপ্রদায়কম্।
ভবপাশ বিনাশায় সন্ন্যাসং মহদাশ্রয়েৎ॥"

৭। "সপ্তমে নিষ্কলাম্নায়ে শুদ্ধশ্রী আনন্দমঠঃ।
সম্প্রদায়ো ব্রহ্মানন্দঃ শ্রীগুরুপাদুকে তথা।
তত্রানুভূতিঃ ক্ষেত্রং স্যাদ্বিশ্বরূপোঽস্য দেবতা।

দেবী চৈতন্য-শক্তিঃ স্যাদাচার্য্যঃ সদ্‌গুরুস্ততঃ।
নাদস্য শ্রবণং তীর্থং জন্মমৃত্যু বিনাশনম্।
পূর্ণানন্দ ক্রমেনৈব সন্ন্যাসঃ তত্রচাশ্রয়েৎ॥"

দশনামী সন্ন্যাসী। তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। ইহারা দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ইঁহারা সকলেই আচার্য্য শঙ্করের প্রশিষ্য সম্প্রদায়। আচার্যদেবের চার জন প্রধান শিষ্য চার মঠের মঠাধীশ ছিলেন। এই চার জনের প্রধান দশজন কঠোর তপা শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা ঐ দশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১। **তীর্থ** - "ত্রিবেণী সঙ্গমে তীর্থ তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে।
স্নায়াত্তত্বর্থ ভাবেন তীর্থ নামা চ উচ্যতে॥"

যিনি যোগমার্গ নির্দিষ্ট লক্ষণ যুক্ত ও মুক্ত ত্রিবেণী তীর্থে স্নানপূর্ব্বক তত্ত্বার্থভাবে তত্ত্বমসি লক্ষণযুক্ত হইয়াছেন, তিনি 'তীর্থ' নামা সন্ন্যাসী।

২। **আশ্রম** - "আশ্রম গ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশ বিবর্জিতঃ।
যাতায়াত বিনির্ম্মুক্তি এতদাশ্রমলক্ষণঃ॥"

যিনি প্রৌঢ় (অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধ অবস্থায়) সংসারের সকল বাসনারূপ পাশ বিবর্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বিনির্মুক্ত হইয়াছেন এবং অন্তিম আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আশ্রম নামা সন্ন্যাসী।

৩। **বন** - "সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বন নামা স উচ্যতে॥"

যিনি আশাপাশ বিনির্ম্মুক্তো হইয়া সুষুম্নারূপ সুরম্য নির্ঝরযুক্ত প্রদেশে গুপ্ত কমলবনে বাস করেন, তিনিই বন নামা সন্ন্যাসী।

৪। **অরণ্য** - "অরণ্যে সংস্থিতে নিত্যমানন্দ নন্দনে বনে।
ত্যক্তা সর্ব্বমিদং বিশ্বং অরণ্য লক্ষণং কিল॥"

যিনি এই বিশ্বের সমস্তই ত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দ কাননরূপ সপ্তসরোজারণ্যে স্থিত হয়েন, তিনিই অরণ্য নামা সন্ন্যাসী।

৫। **গিরি** - "বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসেহি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচল বুদ্ধিশ্চ গিরি নামা স উচ্যতে॥"

যিনি সর্বদা গীতাভ্যাসে তৎপর ও গম্ভীর গিরির ন্যায় স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সব সময় সহস্রাররূপ সুমেরু পর্বতচূড়ায় বাস করেন, তিনি গিরি নামা সন্ন্যাসী।

৬। **পর্ব্বত** - "বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যান ধারণাৎ।
সারাৎসারঃ বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিত॥"

যিনি ধ্যান ধারণায় প্রৌঢ় হইয়া পর্বতমূলে (মেরুদণ্ডমূলে) বাস করেন, যিনি নিত্যানিত্য বস্তু বিচারে সারাৎসার জানিয়াছেন, তিনি পর্বতনামা সন্ন্যাসী।

৭। **সাগর** - "বসেৎ সাগর গম্ভীরো ধনরত্ন পরিগ্রহঃ।

মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥''

যিনি আত্মমর্যাদাদি বন্ধন লঙ্ঘন করিয়াছেন, রত্নাকর সদৃশ গম্ভীর আনন্দ সাগরে আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, তিনিই সাগরনামা সন্ন্যাসী।

৮। **সরস্বতী** - ''স্বরোজ্ঞান বসোনিত্যং সরবাদী কবীশ্বরাঃ।

সংসার সাগর-সারাভিজ্ঞো যোহি সরস্বতী॥''

যিনি সংসার সাগরের সারধন অবগত হইয়া ব্রহ্মবাদী কবীশ্বররূপে সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে তন্ময় হইয়া থাকেন, তিনিই সরস্বতী নামা সন্ন্যাসী।

৯। **ভারতী** - ''বিদ্যাভরণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।

দুঃখভারং ন জানতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥''

যিনি সংসারের সকল ভার পরিত্যাগপূর্বক বিদ্যা বা পরবিদ্যা রূপ আভরণে ভূষিত হইয়া ভবদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই 'ভারতী' নামা সন্ন্যাসী।

১০। **পুরী** - ''জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণ পূর্ণ তত্ত্বপদে স্থিতঃ।

পরব্রহ্ম রতো নিত্যং পুরী নামা স উচ্যতে॥''

যিনি জ্ঞানতত্ত্বে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া পূর্ণতত্ত্ব পদে স্থিত হইয়াছেন এবং সর্বদা পরব্রহ্মে রত হইয়া থাকেন, তিনিই ''পুরী'' নামা সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হন।

দশনামা সন্ন্যাসীদের কথা বলা হইল। ইঁহারা সকলেই তপস্বী জ্ঞানী ত্যাগী ও তত্ত্বজ্ঞানী। ইঁহাদের বাহ্য আচার বিচার নিম্নে কৌপীন পঞ্চকে দেখুন।

বেদান্ত বাক্যেস্থ সদা রমন্তো, ভিক্ষান্ন মাত্রেন চ তুষ্টি মন্তঃ।
অশোক মন্তঃ করণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্য বন্তঃ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তং কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ কুশান্তঃ সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মনং বলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মনামক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো ব্রহ্মাহহমস্মীতি বিতায়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

আচার্য শঙ্কর দুর্বলবাদীয় ভিত্তিসম্পন্ন বৌদ্ধবাদকে খণ্ডন করিয়া শক্তিবাদীয় বৈদিক ধর্ম প্রবর্তন করেন। আবাল্য সন্ন্যাসী ও তপস্বীর এই কর্মাদর্শ তিনি নিজের প্রবর্তিত সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রতিফলিত করেন নাই। আমরা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে বৈদিক ধর্মের প্রধান শত্রু মক্কাবাদীদিগকে এবং খৃষ্টানগণকে সংস্কার করিতে বলি এবং সমস্ত সমাজকে শক্তিবাদ ভিত্তিতে গঠনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে বলি। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ইহাতে তপঃ প্রতিভা মোটেই কমিবে না। দশনামী সন্ন্যাসীরা অনেকেই পরবর্ত্তী কালে গোঁসাই বংশ প্রবর্তন করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা এবং শক্তিবাদী মহাপুরুষ ছিলেন। দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে এখন তেমন প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। গোঁসাই বংশজগণেও তেমন প্রতিভার

কোনই সংস্কার লক্ষিত হয় না। আমরা আনন্দমঠের ধারার সাধক। আমাদের নামের সঙ্গেও "সরস্বতী" নাম যুক্ত আছে। তাহা হইলে কি আমরা শৃঙ্গেরী মঠের সাধক? উঃ - না। আমরা আনন্দমঠের সাধক। আমরা ব্রহ্মানন্দ সম্প্রদায়। আমাদের মতে আচার্য শঙ্করের পরম গুরু গৌরপাদই ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামে, আমাদের পরম্পরাতে প্রসিদ্ধ আছেন। গৌর দেশের (বঙ্গদেশের) পাদদেশে তিনি অবস্থান করিতেন বলিয়া ইনি "গৌরপাদ বাবা" বা "গৌরপাদ স্বামী" নামে পরিচিত আছেন। সাগর সঙ্গমে এই মহাপুরুষ কাকদ্বীপে থাকিতেন। গৌরপাদস্বামী লিখিত গ্রন্থ আমি পড়িয়াছি। গৌরপাদীয় আগম, গৌরপাদীয় কারিকা অতীব উপাদেয় গ্রন্থ। গুরুদেব বলিতেন, আচার্য শঙ্করের বৌদ্ধবাদ খণ্ডনের বহু কথা গৌরপাদ স্বামীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি, গৌরপাদ স্বামীর আশ্রম স্থানে এখনও বুড়ার মেলা বা 'বৃদ্ধস্বামীর' মেলা মকর সংক্রান্তি কালে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের গোত্র "পরব্রহ্ম"। আমাদের সমস্ত সাধনার ক্রম মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকা কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমাদের সাধনার ক্রমে ১৫টি দীক্ষা, মন্ত্র, হট, লয় ও রাজ যোগমূলক হইয়া থাকে। এই সব দীক্ষার ক্রম শেষ করিতে সাধারণ সাধকের ১২ বৎসর হইতে ২২ বৎসর সময় লাগে। তবে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সাধক হইলে এই সাধনা কম সময়েও শেষ হইতে পারে। গুরুদেব বলিয়াছেন, আচার্য শঙ্কর আনন্দমঠের শিষ্য ছিলেন। তিনি আমাদের ক্রমের সাধক ছিলেন, উহার প্রমাণ আমিও প্রচুর দিতে পারি। তাঁহার প্রবর্তিত চারটি ব্যক্তমঠের শিষ্যদের গোত্র চারটি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, আচার্য শঙ্কর কোন গোত্রীয় ছিলেন, বলিতে পারেন কি? গুরুদেব বলিয়াছেন, আচার্য শঙ্কর আনন্দমঠের সাধনার ক্রম তিনবৎসরে সম্পন্ন করিয়াছেন। গুরুদেব আমাদের গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত হস্তলিখিত গ্রন্থে আচার্য শঙ্করের সংক্ষেপ জীবন কথা পড়িয়াছেন। তিনি সেই হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে আচার্যের জীবনের মূল ও বিশেষ ঘটনার সময় ও তারিখ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই নোট গুরুদেব আমাকে দেখাইয়াছেন। কলির আদি গুরু গৌরপাদস্বামী (ব্রহ্মানন্দস্বামী) হইতে পরম্পরায় ১৪০ পর্যন্ত আমার পরমগুরুদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ পর্যন্ত সমস্ত গুরুগণের সংক্ষেপ জীবনকথা সম্বলিত হস্তলিখিত গ্রন্থ গুরুদেব আমার পরাপর গুরু স্বামী বশিষ্ঠানন্দ স্বামীর নিকট দেখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের নকল করিবার জন্য আমার গুরুদেব ভাটপাড়া নিবাসী রমণীকান্ত ভট্টাচার্যকে কয়েকখানা পত্র দিয়াছিলেন। গুরুদেবের নিকট কয়েকখানা পত্রের যে সব উত্তর রমণীবাবু দিয়াছিলেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। প্রত্যেক পত্রেই রমণীবাবু গ্রন্থের নকল করা সম্বন্ধে অনুকূল উত্তর দিয়াছেন। গুরুদেব প্রস্তাব দিয়াছিলেন, অর্থের বিনিময়ে লোক নিযুক্ত করিয়া নকল করাইয়া দিন। কিন্তু রমণীবাবু প্রস্তাব করিতেন, "আপনি আসিয়া নকল করিয়া লইয়া যান।" আমি গুরুদেবকে বলিলাম, "গুরুদেব, নাম ও জীবনকথা সম্বলিত বইখানা নকল করানো প্রয়োজন।" গুরুদেব খুব সংক্ষেপে বলিলেন, "ওদের গুরু ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য নিজেই ওই বই ছাপিবেন। আমাদিগকে দিবেন না, বলিয়াই ঐরূপ বিচিত্র উত্তর দিয়া থাকেন।" আমি বইগুলির সন্ধান করিবার জন্য "গরীবপুর" আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে জানিলাম, রমণীবাবুর কোন পুত্র সন্তান নাই। তাঁহার

ধর্মপত্নী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার একটা ঠিকানাও আমাকে গরীবপুর হইতে দিয়াছিলেন। আমি বারবার রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিয়াও কোন সংবাদ পাই নাই। গরীবপুরে জানিলাম, হস্তলিখিত সব গ্রন্থই উই পোকা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ন্যাকড়ার পুটুলী করা বহুসংখ্যক গ্রন্থ ছিল, সেগুলির কোন যত্ন হয় নাই। রক্ষা করিবারও ব্যবস্থা হয় নাই।

গুরুদেব হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে আচার্য শঙ্করের সংক্ষেপ জীবনঘটনার নোট লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমি হস্তলিখিত ওই নোট দেখিয়াছি। "ভগবান শঙ্করাচার্যদেব ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মতিথি বৈশাখী শুক্ল পঞ্চমী। যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৩৬ চৈত্র শুক্লা নবমীতে তাঁহার উপনয়ন হয়। ২৬৩৯ অব্দে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। ২৬৪০ অব্দে তিনি শ্রীগোবিন্দপাদের নিকট ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। ২৬৪৬ অব্দে তিনি শারীরক ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং উত্তরাখণ্ডে জ্যোতির্ময় (যোশীমঠ) মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬৪৭ অব্দে বারাণসী তীর্থে তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করেন। এই সময় পবিত্র জ্ঞান ব্যাপীর নিকট অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভগবান শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাস দেবের সঙ্গে তাঁহার বেদান্তালোচনা ও আশীর্বাদ লাভ হয়। ২৬৪৭ অব্দে মণ্ডল সহ শাস্ত্রালাপ ও বিচার। ২৬৪৮ অব্দে প্রথমে দ্বারকা মঠের প্রতিষ্ঠা এবং পরে দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬৪৯ অব্দে সুধন্বা রাজাকে কালীমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। ২৬৫০ হইতে তিনি দিগ্‌বিজয় করিতে আরম্ভ করেন, ২৬৫৩ অব্দে গঙ্গাসাগর সঙ্গম সমীপে বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন। ২৬৫৪ অব্দে পুরী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬৬৩ অব্দে তিনি মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে অন্তিম কৈলাস যাত্রা করেন। এই বৎসরে এই পবিত্র দিবসেই তদীয় শিষ্য রাজা সুধন্বা পূজ্যপাদ গুরুর অন্তর্ধানের সহিত এক তাম্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।"

গুরুদেবের নিকট আমি সেই তাম্রশাসনের ফটো দেখিয়াছি। ইহা যাদুঘর হইতে গুরুদেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনে প্রথমেই "ওঁ কাল্যৈ নমঃ" লিখিত আছে। এবং উহাতে যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখ আছে। এই লিপিকে কেন্দ্র করিয়া বিচার করিলে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের সঠিক সময় পাওয়া যায়। তিনি যে রাজা সুধন্বাকে শক্তিদীক্ষা দিয়াছিলেন সেটাও বুঝা যায়। সারদা, গোবর্ধন, বদরিকা এবং শৃঙ্গেরী মঠে শক্তিমূর্তি স্থাপিত আছেন। তাঁহারা ভদ্রকালী, বিমলা, পুণ্যগিরি এবং কামাখ্যা দেবী। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় আচার্য শঙ্কর শক্তিউপাসক ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন; কিন্তু সাধনার পথে তিনি শাক্ত বা শৈব ছিলেন। অনেক পণ্ডিতের ইহাই মত ছিল যে আচার্য শঙ্কর ৮, ৯ শত বৎসর পূর্বে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা সুধন্বার তাম্রশাসন প্রাপ্তির পর তাঁহাদের এই সব গবেষণাই ভ্রান্তিতে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ আচার্য শঙ্কর এই সময় হইতে অনেক পূর্বে আসিয়াছিলেন।

১৯০০ সনের ১৪ই জানুয়ারী, মকর সংক্রান্তি, শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে আমার জন্ম। অর্থাৎ শক্তিবাদ মতবাদের ইহাই আবির্ভাব সময়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ = কলের্গতাব্দা ৫০০১ = যুধিষ্ঠিরাব্দা ৪৪০১। অর্থাৎ ১৯০০ অব্দে = কলের্গতাব্দা ৫০০১ = যুধিষ্ঠিরাব্দা ৪৪০১।

এখন খৃষ্টাব্দ ১৯৬৪ = গতাব্দা ৫০৬৫ = যুধিষ্ঠিরাব্দা ৪৪৬৫। খৃষ্টাব্দ হইতে যুধিষ্ঠারাব্দ ২৫০১ বৎসর পূর্বকাল। এই ভাবে দেখা যায়, এ সময় হইতে প্রায় ১৮৬৪ বৎসর পূর্বে আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদি ১৯০০ সনের সঙ্গে তাঁহার আবির্ভাব সময় কষা যায় তবে তাঁহার আবির্ভাব সময় দাঁড়ায় প্রায় ১৮০০ বৎসর। আমাদের গুরুপরম্পরাতে এখন গৌরপাদ হইতে ১৪২ সংখ্যক গুরুধারা চলিয়াছে। এক একজন গুরুর কর্মকাল যদি ২০ বৎসর ধরা যায়, তবে ২৮৪০ বৎসর হয়। গোবিন্দপাদ ১০০০ বৎসর সমাধিস্থ ছিলেন। ২৮৪০ বৎসর হইতে ১০০০ বৎসর বাদ দিলে ১৮৪০ বৎসর হয়। আচার্য শঙ্কর যে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রবর্তন করেন, সেই সময় হইতে প্রায় ১৮০০ বৎসর পরে শক্তিবাদ ধর্মের পত্তন আরম্ভ হইল। ব্রহ্মবাদ ও শক্তিবাদ এক কিংবা দুই। ভারতের জন্য শক্তিবাদ কতটা প্রয়োজনীয় সে সব আলোচনার ইহা স্থান নয়। ব্রহ্মবাদের আবির্ভাবে বৌদ্ধবাদ ভাঙিয়া গিয়াছিল, শক্তিবাদের আবির্ভাবে দুর্বলবাদ ও জড়বাদ ভাঙিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। শঙ্কর এবং সত্যানন্দ একই গুরুধারার দুইজন শিষ্য।

রমণীমোহন ভট্টাচার্য স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী মহারাজের গৃহস্থাশ্রমের পুণ্যপুত্র। ভাটপাড়ায় ইঁহাদের বাড়ি ছিল। স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী মহারাজ গ্রন্থগুলি তাঁহার গুরু স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের নিকট পাইয়াছিলেন বলিয়া আমি শুনিয়াছি।

বশিষ্ঠানন্দ স্বামিজীর কথা আমি গুরুদেবর নিকট শ্রবণ করিয়াছি। গরীবপুরে যাইয়া শুনিলাম, তিনি দেশ বিদেশ তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। গুরুদেব বলিতেন, বশিষ্ঠানন্দজী মহারাজ ক্রিয়াবান সাধক, পণ্ডিত এবং ভাল বক্তা ছিলেন। তিনি একটু কম শুনিতে পাইতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। গুরুদেব বলিয়াছেন, বশিষ্ঠানন্দ স্বামীজী গুরুদেবকে বলিতেন, ‘‘সচ্চিদা, তোমার হাতে সরস্বতী থাকিবেন, তুমি দিব্যাচারের তন্ত্র প্রকাশ করিতে থাক।’’ গুরুদেব তাঁহার আদেশে সাধনপ্রদীপ, গুরুপ্রদীপ, জ্ঞানপ্রদীপ, পূজাপ্রদীপ, পুরশ্চরণপ্রদীপ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, গীতাপ্রদীপ প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আমার পরমগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছিলেন, ‘‘তোমার মুখে সরস্বতী থাকিবেন, তুমি তত্ত্বকথায় পারদর্শী হইবে।’’ গুরুদেব বলিতেন, ‘‘ঠাকুর সত্যই তত্ত্বকথায় ‘সরস্বতী’ই ছিলেন।’’ এখানেও দেখা যায়, গুরুগণে যোগ্যশিষ্যগণকে সরস্বতী নাম দিবার একটা প্রথা আমাদের পরম্পরায় রহিয়াছে।

গুরুদেব বলিতেন, আচার্য শঙ্কর, তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ, এবং গোবিন্দপাদস্বামীর গুরু গৌরপাদ যে আনন্দমঠের শিষ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের নামের সঙ্গে ‘‘সরস্বতী’’ থাকে। সাধনার ক্রম শেষ করিয়া বারো বৎসর পর, আমাদের এই ধারার সাধকগণ ‘‘সরস্বতী’’ হন। আমার গুরুদেবের এক শিষ্য, নাম ছিল সরলানন্দজী, তাঁহার সন্ন্যাসী হইবার খুব সখ ছিল। তিনি গুরুদেবকে সন্ন্যাস ও বিরজার কথা বার বার বলেন। গুরুদেব তাঁহাকে বলেন, ‘‘আমাদের এই ধারার ইহাই নিয়ম যে সাধনার ক্রম শেষ করিতে হইবে এবং তাহার পর ‘বিরজা’ হইবে।’’ সরলানন্দজী তাহাতে রাজী হন নাই। শেষ পর্যন্ত সরলানন্দজী এক দশনামী সন্ন্যাসীর নিকট বিরজা গ্রহণ করেন এবং

তুরীয়ানন্দ* স্বামী নাম গ্রহণ করেন। গুরুদেব বলেন, ‘‘আমি যে ভাবে পাইয়াছি, আমি সেই ভাবেই দিব। তোমরা শাক্তদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্য, মহাসাম্রাজ্য, যোগদীক্ষা ও মহাপূর্ণ দীক্ষায় সাধনার ক্রম সম্পন্ন করিয়া বিরজা করিতে প্রস্তুত হও, আমি বিরজা করাইয়া দিব।’’ মহাপূর্ণ দীক্ষার দুই বৎসর পরে আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘‘বিরজা সম্বন্ধে আপনার কি মত?’’ তিনি বলিলেন ‘‘তোমার বিরজার অধিকার হইয়াছে। তুমি বল তো আমি বিরজা করিয়া দিব। তবে বিরজার পর আর রান্না করিয়া আহার করিতে পারিবে না। অগ্নিকার্য করা চলিবে না। মাধুকরী অথবা সেবক রাখিয়া রান্নার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার মতে, মহাপূর্ণ দীক্ষার পর, বারো বৎসর কাল রাজযোগ সাধনায় অবস্থানের পর, তুমি পরমহংস স্তরে আসিবে। ইহা আনন্দমঠের পরম্পরার নিয়ম। আমার মতে তুমি সেই পথেই পরমহংস এবং সরস্বতীর স্তরে এসো।’’ তিনি আরো বলিলেন, ‘‘তুমি আবাল্য স্বয়ং পাকী, স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তুমি বিরজা করিয়া আমার মত পরাধীন জীবনে না আসিলেই তোমার পক্ষে বেশী সুবিধাজনক হইবে। তুমি মহাপূর্ণ দীক্ষার বারো বৎসর পর গঙ্গায় গিয়া শিখা সূত্র বিসর্জন দিলেই চলিবে।’’ আমি গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, ‘‘আপনি যেমন বলিবেন তেমনই হইবে।’’ বর্তমান দশনামী মহাত্মাদের সঙ্গে আমাদের দীক্ষা শিক্ষা সাধন তপস্যা কোনটারই মিল নাই। গোত্র প্রবরাদিরও মিল নাই। অথচ মঠাম্নার সাতটি পদ্ধতির মধ্যে আমাদের সাধনার অনেক কথাই কঙ্কালাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে।

‘সরস্বতী’ নাম সম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য আছে, সেটা অনেকের জিজ্ঞাস্য। আমি সরস্বতী উপনিষদে দেখিলাম জ্ঞান শক্তির উপাসনায় যে সব বীজমন্ত্রের দীক্ষা ও অনুশীলন আমাদিগকে করিতে হয় সেই বীজগুলির কথা সেই উপনিষদে রহিয়াছে। জ্ঞানশক্তি সরস্বতী বীজের শেষ দীক্ষার পরই বিরজা সংস্কার করিয়া সরস্বতী নাম গ্রহণ, অথবা জ্ঞানশক্তির শেষ দীক্ষার বারো বৎসর সাধনার পর সাধক সরস্বতী হইবেন। ইহাই যে সুন্দর ব্যবস্থা ইহাতে কি সন্দেহ আছে। জ্ঞান শক্তির উপাসনার পর এবং জ্ঞানশক্তির শেষ দীক্ষার পরই বিরজা, অথবা শেষ দীক্ষার বারো বৎসর রাজযোগ অনুশীলন কার্য শেষ হইলে যে ‘সরস্বতী’, ইহা আনন্দমঠের নিজস্ব ব্যবস্থা। বিরজা সম্বন্ধে গুরুদেব আমাকে আরও বলিলেন, ‘‘বিরজার পর আর কোন দীক্ষা নাই। মহাপূর্ণ দীক্ষার মন্ত্রই বিরজার পর নূতন করিয়া দিতে হয়।’’

‘‘ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ’’ আমাদের গুরুপরম্পরায় সমস্ত লেখার শিরোনামায় এই মন্ত্রটি লিখিতে হয়। পত্রাদির শিরোনামায় এই লেখাটি যেন আনন্দমঠের ট্রেড মার্ক। আনন্দমঠের সরস্বতী স্তরের মহাপুরুষেরা ‘‘ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ॥’’ লেখেন, এই মঠের শিষ্য, সাধক ও ব্রহ্মচারীরা লেখেন, ‘‘ওঁ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ॥’’ প্রথম মন্ত্রটির অর্থ ওঁ (নির্গুণ ব্রহ্ম), হংসঃ (সগুণ ব্রহ্ম। হং = পরমপুরুষ + সঃ = পরমাপ্রকৃতি)। অর্থাৎ যিনি নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ এবং সগুণ পরমেশ্বর স্বরূপ এবং যিনি ষট্ শ্রীমদ্ অর্থাৎ ছটি শ্রীর অধিপতি; এমন গুরুকে প্রণাম। ছয়টি শিবই ছয়জন গুরু।

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ‘‘তুরীনন্দ’’ স্থানে ‘‘তুরীয়ানন্দ’’ গৃহীত হল।

“ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। তথঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ তস্যোপরি মহাশক্তি মহাদেবী বিরাজিতা॥” মূলাধারের শিব ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানের শিব বিষ্ণু, মণিপুরের শিব রুদ্র, অনাহতের শিব ঈশ্বর, বিশুদ্ধার শিব সদাশিব এবং আজ্ঞাচক্রের শিব হইতেছে পরশিব। এই ছয়জন শিবই ষট্ শিব। এই ছয়জন শিবের উপরের স্তরে মহাশক্তি জ্ঞানশক্তি মহাদেবী ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যমান। জ্ঞানশক্তিই সরস্বতী, জ্ঞানশক্তিই গুরু। ঐঁ বীজ-ই গুরু-বীজ এবং ঐঁ বীজ-ই প্রাথমিক সরস্বতী বীজ। মহাশক্তি জ্ঞানশক্তিই হংসঃ রূপা। ইনিই পরমহংসঃ রূপা বা ব্রহ্মরূপা। কাজেই, আনন্দমঠের সরস্বতীর সঙ্গে দশনামা সরস্বতীদের প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতির সামঞ্জস্য নাই। জ্ঞানশক্তির প্রথম চারটি বীজকে কেন্দ্র করিয়া সাম্রাজ্য দীক্ষার সাধনা হয়। সাম্রাজ্য দীক্ষার সাধনাই জ্ঞানশক্তির সাধনা। এই সাধনায় নবকুট, সপ্তকুট এবং পঞ্চকুটের বিধান আছে। আমাদের আনন্দমঠের সাধনায় পঞ্চকুটের দীক্ষা হয়। মহাসাম্রাজ্য এবং যোগ দীক্ষার পর, শেষ দীক্ষায় সরস্বতী উপনিষদ নির্দিষ্ট সর্বশেষ বীজমন্ত্রের দীক্ষা হয়। এই দীক্ষার সাধনা বারো বৎসর অতীত হইলে “সরস্বতী” নাম ধারণ করিতে হয় এবং লেখাদির শিরোনামায় লিখিতে হয় “ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ”। “সরস্বতী” হইয়া সরস্বতী নাম ধারণ, আনন্দমঠের নিয়ম। এজন্য যতক্ষণ সাধনার ক্রম শেষ হয় না, ততক্ষণ আনন্দমঠের শিষ্যগণকে “সরস্বতী” বলা হয় না। মহাভারতের (দ্রঃ কালীসিংহী মহাভারত পৃ ৭৮০) শ্রীব্যাসদেবকে সরস্বতীর আবাসস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা আছে। ব্যাস দ্বাপর যুগের শ্রেষ্ঠ গুরু এবং আচার্য, সে কথাও আমি যথাস্থানে বলিব। তিনি নিশ্চয়ই দশনামী ছিলেন না। সাধন তপস্যা করিয়া যাঁহারা গুরুস্থানে আসিবার যোগ্যতা লাভ করেন, আনন্দমঠ সাধনায় তাঁহারাই সরস্বতী। গুরুদেব এই মহান আদর্শ যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন আমিও সেই ভাবেই উহা রক্ষা করিব। লৌকিক কার্য এবং অলৌকিক সাধন, তপস্যা, পূজা, পাঠ, তন্ত্রধারণ, যজ্ঞাদি এবং যজ্ঞাদি লিখনে আমার স্বভাবে কতগুলি অলৌকিক প্রতিভা ছিল। সেই সব প্রতিভা যখনই গুরুদেবের চক্ষে পড়িত, তখনই তিনি উৎসাহের সহিত বলিতেন, “সত্যানন্দ সাক্ষাৎ সরস্বতীর বাচ্চা।”

আনন্দমঠের প্রথম গুরু দেবাদিদেব মহাদেব। শিব পৃথিবীর প্রথম ধর্ম-প্রবর্তক, প্রথম আচার্য এবং প্রথম গুরু। ইনি অনাদি পুরুষ এবং অমর এবং অজর ও আদি মানব। সত্য যুগের তিন জন আচার্যের মধ্যে ইনিই প্রথম আচার্য। ইঁহাকে অমর বলা হইয়াছে, ইনিই আমাদের জ্ঞানময় আত্মা। মস্তিষ্ক-মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড রূপে এই শিবকেই মন্দিরে স্থাপনা করা হয়। এই মস্তিষ্কের মণিই শিবপিণ্ড এবং ইহাই শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গ উপাসনাই জ্ঞানের সাধনা এবং ইহাই মহাদেবের উপাসনা। গায়ত্রী উপাসনার সংক্ষেপ মূর্তি যে শিবলিঙ্গ মূর্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমি ক্রমবিকাশ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে করিয়াছি। এই মস্তিষ্ক মণি এবং ব্রহ্মনাড়ীর সংক্ষেপ মূর্তিই যে শিবমূর্তি এ সম্বন্ধে আমি এখানেও কিছু নির্দেশ দিব। গায়ত্রী উপাসনায় ব্যাহৃতি এবং মহা ব্যাহৃতির কথা আছে। বঙ্গদেশের শিবলিঙ্গ ব্যাহৃতি (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) বিজ্ঞানে নির্মিত হয়। কাশীর বিশ্বনাথ শিবও ঐ বিজ্ঞানে প্রস্তুত।

শিবলিঙ্গ মূর্তির নিম্ন অঙ্গ ভূঃ, বা মূলাধার চক্র। মধ্য অঙ্গ খুব চাপা থাকে, সেই চাপা স্থানে একটি গোলাকার পট্টি থাকে। এই পট্টিটি ভুবঃ (ইহা অনাহত চক্র)। শিবলিঙ্গে পীনেটই দ্বিদল বিশিষ্ট বৃহৎ মস্তিষ্ক। এবং ইহাই শিবলিঙ্গ মূর্তিতে স্বঃ। বঙ্গদেশের অনেক প্রাচীন শিবলিঙ্গ মূর্তিতে মূলাধার চক্রের উপরে খুব ছোট ছোট দুইটি গোলাকার পট্টি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পট্টি দুইটি স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রের প্রতীক। ঐ সব শিবলিঙ্গের ভুবঃ পট্টির উপর এবং স্বঃ নামক দ্বিদল চক্রের মধ্যস্থানে, একটি ছোট পট্টি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পট্টিটি বিশুদ্ধাখ্য চক্র। আমরা শক্তিবাদ মঠে (গড়িয়াতে) ষট্চক্র শিবলিঙ্গ বা সপ্তব্যাহৃতির মূর্তি সমন্বিত শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিয়াছি। এইরূপ একটি শিবলিঙ্গ চুনার দুর্গের ভৈরবগুহায় স্থাপনা করা আছে। আমি নিজে দোলপূর্ণিমার দিন পূজা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানসহ এই লিঙ্গ স্থাপনা করিয়াছি। পরদিন স্থানীয় বিদ্বান পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সমবেত অনুষ্ঠানে পূজা, প্রতিষ্ঠা, বেদপাঠ ও যজ্ঞাদির কার্য বৈদিক বিধানে সম্পন্ন হয়। চুনারে প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গের উপরে একটি পদচিহ্ন বিদ্যমান। চুনার দুর্গটি শ্রী বামন বিষ্ণু ভগবানের পদচিহ্ন রূপে সদা স্মরণীয়। এই দুর্গের অন্তর্গত (গোড়ালী স্থানে) ভৈরব গুহায় শ্রীভগবানের পদচিহ্ন সমন্বিত লিঙ্গমূর্তির স্থাপনা সত্যই এক শক্তিবাদীয় যুগের আবির্ভাব সূচিত করিতেছে। ইহাই গুরুমূর্তির উপাসনা। বামন ভগবানের পদস্পর্শে অসুরবাদী বলি রাজার পতন হইয়াছিল। সেই পদতলে আবার শক্তিবাদের উৎপত্তি হইল।

সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তা শিব বা শক্তি এবং প্রশ্নকর্তা শিব বা শক্তি। যত প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ষটকর্ম, বিদ্যা, যোগ, তপস্যা, সব শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ শিব। শিব জাগ্রত দেবতা। সত্য যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যত শক্তিধর মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, সকলেই শিবের উপাসক। শিব মানবরূপী সাক্ষাৎ সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, যোগ, সমস্ত শাস্ত্রে শিবের উপাসনার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে শিবের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের বাহিরেও শিব-মূর্তির অভাব নাই। শিব আনন্দমঠের গুরুধারার প্রথম গুরু। তিনি সত্যযুগের প্রথম আচার্য। সত্যযুগের দ্বিতীয় আচার্য বিষ্ণু এবং তৃতীয় আচার্য ব্রহ্মা। ত্রেতা যুগের প্রধান আচার্য তিন জন, বশিষ্ঠ, শক্তি এবং পরাশর। দ্বাপরের দুইজন প্রধান আচার্য, ব্যাস এবং শুকদেব। কলি যুগের প্রথম আচার্য গৌরপাদ (ব্রহ্মানন্দ স্বামী), দ্বিতীয় আচার্য গোবিন্দপাদ, তৃতীয় আচার্য শঙ্কর। গৌরপাদ হইতে গুরুধারার ১৪১ সংখ্যায় গুরু হইতেছেন আমার গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। গৌরপাদ হইতে ১৪০ সংখ্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী। ১৩৯ সংখ্যায় স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী। ১৩৮ সংখ্যায় স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী। গৌরপাদ (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) হইতে স্বামী শিবানন্দ পর্যন্ত এই গুরুধারার নাম আজ অজ্ঞাত।

আমরা গুরুদেব স্মরণে বা সংকল্পমন্ত্রে বা তর্পণে সরস্বতী বা স্বামী শব্দের ব্যবহার করি না। গুরুদের স্মরণের নিয়ম : শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দনাথ গুরবে নমঃ। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দনাথ পরম গুরবে নমঃ। শ্রীমদ্ বশিষ্ঠানন্দনাথ পরাপর গুরবে নমঃ। শ্রীমদ্ শিবানন্দনাথ পরমেষ্ঠি গুরবে নমঃ। (১৪২ সংখ্যা হইতেও এই নিয়মই চলিবে। যথা

শক্তিবাদ প্রবর্তক দিব্যৌঘ গুরু তথা সিদ্ধৌঘ গুরু শ্রীমদ্ সত্যানন্দনাথ গুরবে নমঃ। ইত্যাদি)।

শাস্ত্রে সপ্ত কুলগুরু [যথা (১) শ্রীমৎ প্রহ্লাদানন্দনাথ, (২) শ্রীমৎ সনকানন্দনাথ, (৩) শ্রীমৎ কুমারানন্দ, (৪) বশিষ্ঠানন্দ, (৫) ক্রোধানন্দ, (৬) স্থখানন্দ, (৭) বোধানন্দ], দিব্যৌঘ গুরু [(১) মহাদেবানন্দ, (২) মহাকালানন্দ, (৩) ত্রিপুরানন্দ, (৪) ভৈরবানন্দ, (৫) সত্যানন্দ], সিদ্ধৌঘ গুরু [(১) ব্রহ্মানন্দ, (২) পূর্ণদেবানন্দ, (৩) চলচ্চিদানন্দ, (৪) চলাচলানন্দ, (৫) কুমারানন্দ, (৬) গোরক্ষানন্দ, (৭) ভোজদেবানন্দ, (৮) প্রজাপত্যানন্দ, (৯) মূলদেবানন্দ, (১০) রন্তিদেবানন্দ, (১১) বিঘ্নেশ্বরানন্দ, (১২) হুতাশনানন্দ, (১৩) সময়ানন্দ, (১৪) নকুলানন্দ, (১৫) সন্তোষানন্দ, (১৬) সচ্চিদানন্দ, (১৭) সত্যানন্দ]-গণের স্মরণ ও প্রণাম করিতে বলিয়াছেন। আমরা এ সব মহাপুরুষদের জীবন-কথা ও কর্মপ্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই জানিতে পারি নাই। শ্রীগৌরপাদ স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া আমার গুরু শ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামী পর্যন্ত এই লম্বা ধারায়, ইঁহারা যে বিশেষ শক্তিমান গুরু হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গৌরপাদ স্বামী লিখিত কয়েকখানা মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ আমরা পাঠ করিয়াছি। গৌরপাদীয় কারিকা, গৌরপাদীয় আগমে, আচার্য শঙ্করের চিন্তাধারার সবটা উপাদানই রহিয়াছে। গোবিন্দপাদ স্বামীর কোন গ্রন্থ নাই, তবে অনেকের ধারণা ইনিই পতঞ্জলি ঋষি। তবে ইনি যে আচার্য শঙ্করকে সনাতন ধর্ম রক্ষার অনুকূল করিয়া গড়িয়া দিয়াছিলেন, ইহাই এই মহাপুরুষের প্রধান অবদান। আচার্য শঙ্কর তো যুগান্তরকারী সীমাহীন শক্তিবাদী মহাত্মা। আচার্য শঙ্করের অসংখ্য ধর্মবিষয়ক রচনা আছে। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "প্রস্থান ত্রয়"। অর্থাৎ বেদান্তভাষ্য, উপনিষদভাষ্য এবং গীতাভাষ্য।

গুরুধারায় সত্যযুগের মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর পর্যন্ত যে সব আচার্যগণের নাম উল্লেখ করা আছে তাঁহারা সমাজের এক ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণে এবং ভয়ঙ্কর সমস্যাকালে নূতন রকমের সমাজবাদ স্থাপনার বীজ দান করেন এবং দুর্বল এবং অস্থরবাদের মূলোচ্ছেদ করিবার ভিত্তি দান করিয়া যান। আমরা ভারতের ধর্ম, সমাজ এবং ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রসংকটের সন্ধিক্ষণে, দুর্বলবাদ ও অস্থরবাদকে উচ্ছেদ করিবার জন্য, শক্তিবাদের ভিত্তি দান করিলাম। ইহাও এক ভীষণ সন্ধি-স্থানীয় ধর্মস্থাপনা। শক্তিবাদসূত্রম্, ক্রমবিকাশ, শক্তিবাদ, শক্তিশালী সমাজ, শক্তিবাদভাষ্য গীতা, শক্তিবাদভাষ্য উপনিষদ, ধর্ম্মশিক্ষা, আনন্দমঠের সিদ্ধসাধক প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে এই মতবাদ আলোচিত হইয়াছে।

এই মহান কার্য যে আদিগুরু শ্রীমহাদেবের ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে আমার একটুও সন্দেহ নাই। যখন আমি নিরালা জঙ্গলে আমার গুরুদ্বারা আনন্দমঠ সংস্থাপনার কথা স্মরণ করি, তখন আমার সত্যই বিস্ময় মনে হয়। এই মঠে নানাপ্রকার কর্মের ভিত্তি এবং সাধনার মধ্য দিয়া গুরুদেব আমাকে গঠিত করিতে অগ্রসর হন। কথায় কথায় বলিতেন, "আমি তোমাকে পিটানো লোহা গড়িবার নীতিতে গঠিত করিব।" এই ভাবেই শক্তিবাদ ধর্মের কেন্দ্রটি গঠিত হইয়াছিল। সত্যানন্দ-গঠন-কার্য শেষ হইবার পর চুনার পাহাড়ের আনন্দমঠ বনজঙ্গলে বিলীন হইয়াছেন।

আমাদের আদিগুরু মহাদেব মানুষ, কি দেবতা, কি ঈশ্বর অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম, ইহা আমি জানি না। তিনি মানুষরূপে এই পৃথিবীতে কোনও দিন ছিলেন কি না, সেটাও আমি জানি না। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব আমি সদাই অনুভব করি। পার্বতী, গৌরী, সতী ইঁহারা ওই মহাদেবতার ধর্মপত্নী। সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের বক্তা শিব এবং উহার প্রশ্নকারিণী মহাদেবী পার্বতী। যোগ, তপস্যা, সাধনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি, চিকিৎসা, মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, শান্তিকরণ, ঔষধ, রসায়নাত্মক সূক্ষ্ম চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিষ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান, সঙ্গীত, রাগ, রাগিণী, অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞান, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই দেখা যাইবে, মহাদেব শিব এবং মহাদেবী পার্বতী, সেই বিষয়ে কথা বলিতেছেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মনুগণ, ঋষি, মহর্ষিগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অবতারগণ, ভগীরথ, দশরথ, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষই আদি-গুরু শিবের উপাসক। ভারতের গ্রামে গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বাহিরে তিব্বত, চীন, আরব, ইষ্টইণ্ডিজ, মার্কিন, জাপান, কোথায় শিব উপাসনার কথা নাই, বলুন! এই শিব আমাদের মস্তকের মণি শিবপিণ্ড কি, আদিগুরু মহাদেব, ইহার বিচার করিবার বা ভেদ করিয়া বুঝিবার বা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। আমি ইহাই বলিতে পারি এই শিব শক্তিবাদ ধর্মের মূল উৎস। মহাদেবের অশেষ আশীর্ব্বাদ এবং গুরুগণের সীমাহীন স্নেহ এবং বিশ্বকল্যাণকর আশীর্ব্বাদই সত্যানন্দের ‘‘শক্তিবাদ ধর্ম’’।

দ্বাদশ অধ্যায়

সদ্‌গুরু প্রসঙ্গ

আমার গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী ইং ১৮৬৬ সনে জীতাষ্টমীতে জন্মগ্রহণ করেন। আশ্বিনের দুর্গাপূজার পূর্ব কৃষ্ণাষ্টমীর নাম জীতাষ্টমী। জীতাষ্টমী বা জ্যোতিয়ার পূজা সমস্ত ভারতেই অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে জ্যোতি-দেবতার (সূর্য পূজার) এই পূজা বেশী প্রচলিত নহে। ৮নং শ্রীনাথ দাস লেনে (কলিকাতা শিয়ালদহের নিকটবর্তী স্থানে) তাঁহার জন্ম। স্থানটি পূর্বাবধিই শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডীর বাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যখন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তখন ঐ অঞ্চলে পাকা বাড়ি বিশেষ ছিল না। সেই সময় মঙ্গলচণ্ডীর গৃহখানিও সাধারণ গৃহ ছিল। এখন ঐস্থানে পাকা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির বিদ্যমান। আমি মঙ্গলচণ্ডীর বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছি। ইং ১৯৩২ সনে কার্তিক মাসে গুরুদেব কাশীধামে শরীর ত্যাগ করেন। শরীর ত্যাগের নয় দিন পূর্বেও আমি তাঁহার নিকটে ছিলাম।

তাঁহার জীবন-কথার লৌকিক দিকটার কিছুটা বলা প্রয়োজন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গুরুদেব ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল স্থাপনা করেন। তখন ছাত্র ছিল তিনজন, তাহার মধ্যে একজনকে আহার দিতে হইত। ১৮৯৫ সনে ছাত্রসংখ্যা আটজনে দাঁড়ায়, তখন ইহা নিয়মাবলীর ভিত্তিসহ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলরূপে দাঁড়ায়। অনেক কঠোরতার মধ্য দিয়া, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া, আজ বিখ্যাত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

গুরুদেব ভাল সাহিত্যিক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সভার গঠনে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মাত্র কয়েকজন সভ্য লইয়া এই সভা গঠিত হয়। তিনি প্রত্যেকটি সাহিত্য সভায়ই যোগদান করিতেন। চিত্রবিদ্যা ও ফটোগ্রাফী বিষয়ে গুরুদেব লিখিত অনেক বই আছে। চিত্রবিদ্যা ও সাহিত্যকলার সামঞ্জস্যময় প্রতিভা সম্বন্ধে, তাঁহার কিরূপ প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনার কথা মনে হইতেছে।

পাহাড়ের আশ্রমের নিকট, সেই দিনের পূর্বদিন খুব বৃষ্টি বর্ষণ হইয়াছিল। পাহাড়ের ঝরণা ও নালার সঙ্গে বর্ষিত বারির চাপের ফলে পাহাড়ের উপরিস্থিত উচ্চ সমভূমি একাকার হইয়া গিয়াছিল, ফলে, চারিদিকের ঝরণা ও নালার মাছ, মনের আনন্দে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। পরদিনই দেখা গেল, জলের চাপ নাই, পাহাড়ের উপরে স্থানে স্থানে জল আটকাইয়া গিয়াছে। একস্থানে একটি ছোট বালিকা সামান্য জলের একটি ছোট ডোবার মত স্থানে মাছ ধরিতেছে। চারিদিকে নবীন ঘাসের সবুজ মাঠ, উজ্জ্বল রবির কিরণে উদ্ভাসিত বনভূমি, উহারই মধ্যস্থানে সামান্য জলের একটি

ডোবাতে মেয়েটি মাছ ধরিতেছে। মেয়েটির মাথায় একটা নেকড়ার ফালি, কয়েক ফেরায় বাঁধা, কোমরে ঐরূপ চার আঙুলী নেকড়ার একটি ফালী। সেই ফালীর এক দিকটা ঘুরাইয়া সে কৌপীনের মত আঁটিয়া পরিধান করিয়াছে। তাহার শরীরে স্থানে স্থানে কাদা মাখা। দূর হইতে দেখিয়া আমার খুব ভাল লাগিল। আমি গুরুদেবের দৃষ্টি ঐদিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলাম, দেখুন বাবা, কিরূপ সুন্দর পরিবেশ। গুরুদেব তাঁহার লিখিত চিত্রকলা বিষয়ক একখানা বই বাহির করিয়া আমাকে ঠিক ঐ দৃশ্যখানারই একটি বিবরণ দেখাইলেন। ফটোতে চিত্র গ্রহণ এবং চিত্র অঙ্কনের আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন এবং কিরূপ দৃশ্যকে কেন্দ্র করিতে হয়, সেই বিষয়ক একটি অধ্যায়ে ঐ দৃশ্যের হুবহু বিবরণ লেখা ছিল। আমি বুঝিলাম, ধন্য সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যা। গুরুদেব অঙ্কিত বহু দেবদেবীর ছবি গুরুদেব লিখিত ধর্মগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সেই সব জীবন্ত প্রাচ্যকলা বিদ্যার প্রতিভা দেখিয়া আমি আজও মুগ্ধ হই। চিত্রকলা ও সাহিত্যে ভিন্নও আমি তাঁহার অদ্ভূত প্রতিভা ধ্রুপদ গানে দেখিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে নিভৃত পর্বতের নিস্তব্ধ নীরবতাকে ভঙ্গ করিয়া একাকী নিজের আসনে বসিয়া সঙ্গীত গাহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট স্বর এবং এস্রাজের ঝঙ্কার এখনও আমার প্রাণে বাজিতেছে। তাঁহাকে আমি একদিনও আসরে বসিয়া বা দশের সামনে গান গাহিয়া বা বাজাইয়া শুনাইতে দেখি নাই; কিন্তু নিজের মনে তিনি মধ্য রাত্রে যখন বাজাইতেন এবং গাহিতেন, সেই আলাপন মনে হয়, আজও চূনার পাহাড়ে রেকর্ড হইয়া রহিয়াছে। একদিন দুর্গাপূজার পর আমি পূজার আসনে বসিয়াই গাহিতেছিলাম 'কি দিয়া পূজিব মাগো কি আছে আমার।' ইত্যাদি। গুরুদেব অনেক দূর হইতে আমার গান শুনিয়া দেবু-মাকে বলিলেন দেখো তো মায়ের মন্দিরে মৃদু স্বরে কে গায়? দেবু-মা আসিয়া আমাকে দেখিয়া গুরুদেবকে যাইয়া বলিলেন, "সত্যানন্দ", গুরুদেব স্তম্ভিত হইলেন, এবং বলিলেন বাধা দিও না। তাঁহার হাতে পাথরে ও লোহায় গড়া সত্যানন্দ এত মধুর স্বরে গান গায়, ইহা তাঁহার জীবনে আজ নূতন কথা। পূজার পর গুরুভাই ও ভগ্নিরা সকলেই আমাকে গান গাহিবার অভ্যাস করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম "সব রসই শেষ হইয়া গিয়াছে।" গুরুদেব বলিলেন, "সত্যানন্দ সব বিষয়েই সরস্বতীর বাচ্চা।" গুরুভাইরাও বলিলেন, "এতদিন তাহাই জানিতাম; কিন্তু আজ পূজার মন্ত্রে ও সঙ্গীতে বুঝিলাম, সত্যানন্দজী সরস্বতীর বীণা।" গুরুর সাহিত্য, কলাবিদ্যা এবং সঙ্গীত প্রতিভা হয়তো আমাতে কিছুই প্রতিফলিত হয় নাই; কিন্তু আমি গুরুর আশীর্বাদে সর্বতোভাবে তৃপ্ত। তিনি আমার মধ্যে কোথাও কোনই অভাব রাখেন নাই। প্রথমটায়, একদিন এস্রাজ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা, তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। তিনি সেটা পছন্দ করিলেন না, দেখিয়া, আমিও আর চেষ্টা করি নাই। এক সময়, আমার মনে সেতারের ঝঙ্কারের একটা জীবন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল। জঙ্গলে সেতার কে আমাকে শিক্ষা দিবে? সেতারই বা কোথায়? একদিন কথাপ্রসঙ্গে এই কথা আমি শঙ্কর মিশ্রকে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, গঙ্গার ধারে যেদিন যাইবেন সেইদিন আমাকে ওখানে দর্শন দিবেন, আমি শুনাইব। এবং শিক্ষা করিতে চান শিক্ষাও দিব। আমি গঙ্গার ধারে একদিন যাইয়া শঙ্কর মিশ্রের সেতারের গদ্ শুনিলাম। আমার মনে হইল, মস্তিষ্কের সমস্তগুলি নাড়ীতে সেতার বাজিতেছে এবং নাড়ীগুলি স্নিগ্ধ হইতেছে,

আমার সেতারক্ষুধাও মিটিয়া যাইতেছে। শঙ্কর মিশ্র আমাকে সেতার ও একটা সহজ গদ্ লিখিয়া দিলেন। আমি কয়েকদিন একটু একটু অভ্যাসও করিলাম। কিন্তু আমার ক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছে; মা আমাকে তৃপ্ত করিয়া দিয়াছেন, বুঝিলাম। সেতার ফেরত দিলাম এবং বলিলাম, আর প্রয়োজন নাই। এস্রাজ শিক্ষার ক্ষুধা এবং রাগ-রাগিণীর তৃষ্ণা আমি গুরুদেবের গান ও এস্রাজ ঝঙ্কারেই মিটাইয়াছিলাম। গুরুদেবের কণ্ঠের স্বর এবং হাতের এস্রাজ ঝঙ্কার, আমার সঙ্গীত এবং এস্রাজ তানের ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে প্রচুর হইয়াছিল। গুরুর দানশক্তি এবং শিষ্যের গ্রহণশক্তির ক্ষমতা থাকিলে, তৃপ্ত হইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

গুরুদেব প্রায় বাইশ বৎসর কাল ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইহার পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের এক বৎসর মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমার চুনার গঙ্গাতটে প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

গুরুদেব বাল্যকাল হইতেই সাধক ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকটায় তিনি পঞ্চানন ভট্টাচার্য বা লাহিড়ী মহাশয়ের ধারায় যোগ অভ্যাস করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি আমার পরমগুরু শ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এবং পরাপর গুরু শ্রীস্বামী বশিষ্টানন্দ সরস্বতী মহারাজের সংস্পর্শে আসেন। গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেই তিনি শাক্ত, পূর্ণ, ক্রম, সাম্রাজ্য, মহা সাম্রাজ্য, যোগদীক্ষা ও মহাপূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরে যথাবিধি বিরজা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন। গুরুদেব আমাকে বলিয়াছেন, "লাহিড়ী মহাশয়ের ধারার সাধনা বা যোগাভ্যাস আমি সবটাই করিয়াছি। কিন্তু সাধনার আসল কঙ্কালখানি, আনন্দমঠের ধারায়ই পাইয়াছি।" গুরুদেব সন্ন্যাস গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন এবং গ্রন্থাদিও সন্ন্যাস নামেই প্রকাশ করিতেন। আনন্দমঠ সাধনার ধারায় পূর্ণাভিষেক কাল হইতেই সন্ন্যাসজীবন এবং কৌলজীবন আরম্ভ হয়। সাধনার এবং জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় শেষ দীক্ষার পর, ঠিক ঠিক সন্ন্যাস ও বিরজা গ্রহণ করিতে হয়। গুরুদেব এই ভাবেই সংসার জীবনে পরিপক্ক হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর, তিনি চুনার গঙ্গার ধারে ব্রহ্মগঞ্জ গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। এখানে দেড় বৎসর অবস্থানের পরই তিনি চুনার পাহাড়ে আশ্রম করিতে আরম্ভ করেন। পাহাড়ের আশ্রম তাঁহার মত সুখী মানুষের জন্য যে ভয়ঙ্কর কঠোর জীবন, ইহা আমি ভালভাবেই বুঝিতে পারি। পাহাড়ে আশ্রম প্রস্তুত করিয়া তিনি 'সত্যানন্দ' নামক একটি পাথর এবং 'লৌহমানব' ভিন্ন অন্য কি করিয়াছেন, সেটা আমার জানা নাই। প্রাণহীন পাথরের মধ্যে জঙ্গলের পরিবেশে, তিনি বারো বৎসর কি যে করিলেন, সেই হিসাব আমি খুঁজিয়া পাই নাই। তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন, ভবিষ্যৎ সাধক ও সাধিকার জন্য বহু মূল্যবান সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। আনন্দমঠের সাধনার ধারায় যে সাধনার বৈজ্ঞানিক কঙ্কাল লুপ্তপ্রায় অবস্থায় ছিল, সে সব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল গড়িয়াছেন। সেখানে প্রতি বৎসর শত শত কলাপিপাসু কলাজ্ঞান ও কলাশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে তিনি যে আশ্রম করিলেন, উহা কাহার কোন্ কাজে লাগিল? আমার তো মনে হয়, তিনি যদি চুনারের গঙ্গা তটের ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমেই থাকিতেন, তবে বেশী আরামে থাকিতে পারিতেন।

পাহাড়ে আশ্রম করিবার জন্য তিনি সিরকী ঢাকা দিয়া একটি ছোট চালা করিলেন। পরে ইক্ষুপত্রে প্রস্তুত একটি ছাতার মতন চালা করিলেন। জঙ্গলী খড়ে ঘেরা করিয়া উহাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। পত্রে ছাওয়া ছত্রটি যথেষ্ট বলবান ছিল না। বৃষ্টি হইলেই তাহাতে জল পড়িত। তিনি ছাতা মাথায় দিয়া বর্ষার রাত কাটাইতেন। আমি এখনও ভাবি, এত সব পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ছিল?

প্রথম বৎসর আনন্দমঠের অশ্বত্থবৃক্ষ তলে ত্রিপাল খাটাইয়া দুর্গাপূজা হইল। পূজায় মুরারীবাবু পূজক, গুরুদেব তন্ত্রধারক। আমি তখনও নূতন সাধু। গুরুদেব তন্ত্র ধরিয়া অন্তর মাতৃকা ন্যাস বলিতেছেন, মুরারীবাবু যথাযথভাবে উহা করিতেছেন। তিনি সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। তিনি স্থির পাথরের মত বসিয়াই আছেন, শ্বাসও বন্ধ আছে। পনেরো মিনিট পর মুরারীবাবু আবার স্বাভাবিক হইয়া যে মন্ত্রটি শ্রবণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন ঠিক সেই মন্ত্রটি অতি ধীরে উচ্চারণ করিলেন। গুরুদেব আবার মন্ত্র বলিতে থাকিলেন। জঙ্গলের মধ্যে খুব ভালভাবে পূজা হইল। পূজার প্রভাবে পাহাড়ের আকাশ বাতাস সতেজ হইল। আমার সাধনার খুব সুবিধা হইল।

পাহাড়ে বারো মাস থাকিবেন, ভাবিয়াই তিনি মাটির বাড়ি করিলেন। গৃহমধ্যে গুহা করিলেন, গ্রীষ্মকালে, আত্মরক্ষা করিবেন বলিয়া। তাহাতে তিনি একদিনও ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি গুহায় অবস্থান করিয়া দেখিয়াছি, গরমে থাকা যায় না। আমি বরং বাইরে লুর মধ্যে খালি গায়ে, ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাজকর্ম করিয়া ভাল থাকিতাম। সেইসব বাড়ীঘর তাঁহার চক্ষের সামনেই ধ্বসিয়া গেল। তিনি "সরস্বতী ভবন" করিয়া, হাজার হাজার পুস্তক সংগ্রহ করিলেন, সবই বৃষ্টির জল ও উইপোকায় শেষ করিয়া দিয়াছে। তিনি পাকাবাড়ি করিলেন, পাকা মন্দিরও করিলেন, সে সব আজ মাটির সঙ্গে কানাকানি করিতেছে।

চুনার পাহাড়ে সাধনার কেন্দ্র করিবেন, সাধক প্রস্তুত করিয়া দিকে দিকে আনন্দমঠের সাধনার বিজয়ডঙ্কা বাজাইবেন। সেইসব পরিকল্পনার কি হইল, গুরুদেব? আপনার পরিকল্পনার সেইসব দিব্যাচারী তান্ত্রিক সমাজ কোথায়? আচার্য শঙ্করের মতই না আপনি দিব্যাচারী নবীন তান্ত্রিক সাধকসমাজ গড়িবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন?

পাকাবাড়ি প্রস্তুত হইবার পরও গুরুদেব সেটা বেশীদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং নানাস্থানে বেড়াইয়া জীবনের শেষ অংশ কাটাইয়া দিলেন।

পাহাড়ের আশ্রমে গুরুদেব যতদিন থাকিতেন, ততদিন আমি ও গুরুদেব কুকারের রান্নায় আহার করিতাম। বিকেলবেলায় গুরুদেবকে লুচি তরকারী রান্না করিয়া দিতাম। গুরুদেব অব্রাহ্মণের হাতের রুটি এবং ভাত রান্না আহার করিতেন না এবং টাকা স্পর্শ করিতেন না। অসুবিধা বুঝিয়া আমিও রান্নার ব্যবস্থা নিজের মত করিয়া লইয়াছিলাম, বনে কাঠেরও অভাব নাই, ঘুঁটেরও অপ্রাচুর্য নাই। গুরুদেবের অন্নগ্রহণ সমস্যা যে গুরুদেবের জীবনকে জটিল করিয়াছিল ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার সমস্যা আমার জীবনকে কতকটা সমস্যাহীন করিয়াছিল। আমি সহজ রান্নার পথ বাহির করিবার চিন্তায় মন দিলাম এবং সহজ রান্নাযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া জীবনযুদ্ধ যথেষ্ট সহজ করিয়া লইলাম।

বৎসরে, গুরুদেব খুব বেশী সময় পাহাড়ের আশ্রমে থাকিতেন না। যে সময়টুকুই থাকিতেন সেই সময়টাতেও তাঁহার আহারের অসুবিধা হইত। কারণ কুকারের সিদ্ধ আহার্য তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল হইত না। আমি চেষ্টা করিয়া কাশীবাসিনী আমার গুরুভগ্নী দেবু-মাকে গুরুদেবের রান্নার ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করিতে বলিলাম। তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহার পর হইতে গুরুদেবের সঙ্গে কয়েকজন গুরুভাইও আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহারের অসুবিধা রহিল না, আমি অবশ্যই রান্নার সব ব্যবস্থাই স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলাম, দেবু মা অত্যন্ত উন্নতস্তরের ভক্তিমতী সাধিকা ছিলেন। তিনি আশ্রমে আসিবার পর, নিত্য সন্ধ্যাবেলা গুরুদেবের নিকট আরতি হইত। সন্ধ্যাবেলা আমি মায়ের মন্দিরে আরতি করিতাম। সেই আরতিতে বিশেষ কেহ যোগদান করিতেন না। কিন্তু গুরুদেবের ওখানে আরতিতে সকলেই যোগদান করিতেন এবং স্তোত্র পাঠও করিতেন। স্তোত্রপাঠের কোন স্বর তাল ছিল না। তালেগোলে ঘণ্টা কাঁসর আরতি স্তোত্র পাঠ, সবই হইত। স্তোত্রপাঠের পর গুরুদেব আমাকে একক স্তোত্রপাঠ করিতে বলিতেন। আমি স্তোত্র করিবার পর প্রায়ই গুরুদেবের সমাধির মত হইত। তিনি কাষ্ঠবৎ বসিয়া থাকিতেন। গুরুদেবের নির্দেশ ছিল, যতক্ষণ তিনি কথা বলিতেন না ততক্ষণ কেহ যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে। তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিলে, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতাম।

গুরুদেব বিরজা গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরই চুনারের ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে আসেন। তিনি ওইখানে আসিবার পর আমিও ওইখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হই। তাঁহার সঙ্গে আমি বহুদিনই ছিলাম। তাঁহার নিত্য জীবনপ্রবাহের সব কথাই আমার জানা আছে। যখন আমি তাঁহার নিকটে আসি তখন তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত প্রেত্যভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। উপনয়নের পর যেমন বালক ব্রহ্মচারীকে সাত দিন তীর গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সেইরূপ আনন্দমঠের ইহাই নিয়ম যে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় হইতে এক বৎসরকাল পর্যন্ত প্রেত্যভাব রক্ষা করিতে হয়। এই অবস্থায় স্নান আহার ও শৌচাদিতে শুদ্ধাচার থাকে না। ইহাও তিনি খুব সাবধানে এবং আত্মগোপনের নীতিতেই রক্ষা করিতেন। আমি তখন প্রথম তাঁহার নিকট ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে আসিয়াছি। গঙ্গার তটে তিনি সকালে বৈকালে অনেকক্ষণ বসিয়া বা পাথরের চৌকিতে কাত হইয়া শুইয়া থাকিতেন। নরম শরীর পাথরের আসন ও পাথরের খাট, সুন্দর পরিবেশ, সাম্যস্থান, গঙ্গার ধারে মহান ঋষির অনাড়ম্বর মঠ। এখনও আমার মানসচক্ষে সেইসব চিত্র ভাসিতেছে। সামনে দিগন্তব্যাপিনী মা গঙ্গা ও তটভূমি। সেইসব চিত্র ভাসিতেছে। মনে হয়, গুরুদেব ওইখানে এখনও বসিয়া শুইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন আছেন। প্রশ্ন না করিলে তিনি কখনও কোন কথাই বলিতেন না। কখনও নিজে সাধু বা সিদ্ধ মহাত্মা, এমন ভাবের কথাও তিনি বলিতেন না। তাঁহার কথাবার্তায় আত্মম্ভরিতা থাকিত না। হিন্দী এবং বাংলা ভাষায়, একই ভাবে কথা বলিতেন। কোন ভাষায়ই কোন জড়তা ছিল না। তিনি কখনও দুই তিন মাস এবং কখনও দুই-এক সপ্তাহ ব্রহ্মগঞ্জ অবস্থান করিয়া চলিয়া যাইতেন।

ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে টবের মধ্যে গুলঞ্চফুলের দুইটি ছোট গাছ ছিল (দেড় ফুট উঁচু হইবে)। গ্রীষ্মকালের গরমে এবং জলের অভাবে গাছ দুইটি মৃতপ্রায় ও শুষ্ক অবস্থায় কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিত। আমি কখনও গাছ দুইটিতে পাতা জন্মিতে দেখি নাই।

ইহার কারণ, এরা নিয়মিত জল পাইত না। গুরুদেব যেদিন উপস্থিত হইতেন, তাহার পর দিনই দেখা যাইত অর্দ্ধ শুষ্ক গাছ দুইটিতে কলি ও ফুল দেখা দিয়াছে। এরা কি পূর্ব হইতে জানিতে পারিত যে গুরুদেব আসিবেন?

পাহাড়ের আশ্রম হইতে নামিয়া গুরুদেব সমতলে আসিবেন বলিয়া যাত্রা করিয়াছেন। আশ্রমের কয়েকটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষ। বৃক্ষের তলা দিয়াই, পায়ে হাঁটা সংক্ষেপ পথ। গুরুদেব আগে আগে চলিয়াছেন, আমি পিছনে পিছনে। গাছের একটি বেশ মোটা ডাল একটু নত হইয়া গুরুদেবের মাথায় ঠেকিল। গুরুদেব ডালটিকে কয়েকটি মৃদু চাপড় মারিয়া আদর করিলেন। বলিলেন, ব্যস্ত হইও না, আমি আবার আসিব। ডালটিতে মাথা ঠেকিবার কথাই ছিল না। অন্ততঃ সাত আট ইঞ্চি ডালটি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। মহাপুরুষকে বৃক্ষরা কিরূপ ভালবাসিত, আজও ইহা ভাবিতেছি।

একদিন একটি পত্রের কথা বলিতেছিলেন। কোন ভদ্রসন্তানের লেখা পত্রখানা। বলিলেন ওরা দুই ভাই গুরুদেবের নিকট আসিতেন। ওদের দেশের জমিদার কোন সামান্য কারণে, যুবক দুইটিকে অপমান করিয়াছিলেন। দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দুইজনেই লেখাপড়া করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন, এবং ইহার প্রতিশোধ লইবেন। এজন্য গুরুদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গুরুদেব বলিলেন, তোমরা উচ্চ প্রতিষ্ঠ হও, ইহা সুখের কথা। কিন্তু এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লাভ নাই। এসব ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর নির্ভরই শ্রেয়ঃ। কোন শক্তিমানকে প্রতিশোধ দেওয়া সহজ নহে। কারণ তাঁহাদেরও পুণ্যবল থাকে, প্রতিশোধের চেষ্টা বিপরীত ফলও হয়তো দিতে পারে। মনে কর, তোমরা ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পূর্বেই জমিদার মারা গেলেন, তখন তোমরা কি করিবে? এইরূপ জেদ এবং এইরূপ প্রতিজ্ঞা জন্মান্তর এবং কর্মবন্ধনকে জটিল করে। গুরুদেবকে প্রশ্ন না করিলে কখনও কিছু বলিতেন না, কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতেন।

গুরুদেব বলিতেছিলেন - "সাধকদশায় তিনি প্রায়ই কাশীতে থাকিতেন। তিনি রীতিমত পূর্ণিমা অমাবস্যার রাত্রিতে যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞকালে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী নিকটে থাকিতেন। ময়দাগিনের নিকটে জয়নারায়ণ স্কুলের কাছে একটা জঙ্গলা বাগান-বাড়িতে এঁরা অবস্থান করিতেন। সেই বাগানে বেলগাছ ছিল। প্রতিটি যজ্ঞকালে বেলগাছ হইতে একটা বেল পূর্ণাহুতির প্রাক্‌কালে ভূমিতে পতিত হইত। বৃদ্ধা মা বেলটি কুড়াইয়া আনিয়া গুরুদেবকে দিতেন এবং পূর্ণাহুতিতে সেই বেলটি গুরুদেব প্রদান করিতেন।"

সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিকটবর্তী হইলে, গুরুদেব তাঁহার ধর্মপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন - "আমি এখন বিরজা সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।" এতে তাঁহার (ধর্মপত্নীর) কি বক্তব্য আছে, বলিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তো পূর্বেই সন্ন্যাস বিষয়ে জানিতাম, আপনি যেমন ইচ্ছা করিতে পারেন, ধর্ম-বিষয়ে আমার দিক হইতে কোনই বাধার কারণ নাই।" গুরুদেব আমাকে বলিলেন - "তোমার গুরুমার এইরূপ অস্বাভাবিক উক্তির কথা শুনিয়া আমি নিজেই অবাক হইলাম। তোমার গুরুমা চিরদিনই একটু সোজা প্রকৃতির নারী ছিলেন, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তাঁহার এইরূপ সরলতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।"

একদিন আমি পাহাড়ের আশ্রমে তাঁহাকে পেছনে রাখিয়া আমাদের সম্মুখস্থিত একদল বিচরণশীল হরিণ দেখিতে দেখিয়াছিলাম। গুরুদেব পিছনে, আমি সম্মুখে। পিছন হইতে তিনি আমার সবটা পিছন অস্পষ্ট দেখিতেছিলেন, বলিলেন, "তোমার মস্তকের আবরণটা অতীব অস্বাভাবিক। এর মধ্যে সংসারের কোনই স্থান নাই। সংসার স্থানটি যেন প্রকৃতি বাদ দিয়াই তোমাকে গড়িয়াছেন। তোমার শরীরের মধ্য অংশের গঠনও অসাধারণ", গুরুদেব দ্বারা চিত্রিত ষট্চক্র চিত্র পূজাপ্রদীপে তিন রং-এ ছাপা হইয়া স্থান পাইয়াছে। এই চিত্রটিকে আমার শরীরের পিছনের ফটো বলা যায়। সদাকর্মমগ্ন ও ষট্চক্রসাধক সত্যানন্দ যেন খেলাচ্ছলে নিবিষ্ট মনে ঐ ছবিতে ষট্চক্র ধ্যানে মগ্ন। চিত্রটির বসার ভঙ্গীতেও সত্যানন্দরই আকৃতিটি স্থান পাইয়াছে; সেইরূপই ঢিলাঢালা এবং উদাসীন ভঙ্গীতে স্বখাসনে উপবিষ্ট। জানি না, সত্যানন্দকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদের পরিকল্পনা পরাপ্রকৃতি মহামায়াই করিয়াছিলেন, অথবা ইহা আমার পরমপূজ্য গুরুদেবের পরিকল্পনা! এই পরিকল্পনা সর্বতোভাবে আমার জীবনে সার্থকতা আনিয়াছে। তিন রঙে রঞ্জিত ছবিটির একটি ফটো ব্লক এইখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

গুরুদেবের কয়েকটি ভাইকেই আমি দেখিয়াছি। তাঁহার তিনটি ভাই-ই সন্ন্যাসী ছিলেন। এক মায়ের গর্ভজাত তিনটি সন্তানই সন্ন্যাসী। বৃদ্ধা কিন্তু বহুদিন জীবিতা ছিলেন। আমি বৃদ্ধা মাকে কাশীতে বহুবার দেখিয়াছি। আমাকে তিনি স্নেহাবেগে জড়াইয়া ধরিতেন এবং আদর করিতেন। বৃদ্ধা মায়ের পিতাও সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শুনিয়াছি তিনি কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। একবার নাকি কয়েকদিনের জন্য কাশীতে আসিয়াছিলেন, ইহার পর তাঁহার কোনই সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার সন্ন্যাস নাম ছিল "ঠাকুর সদানন্দ স্বামী"। গুরুদেব সদানন্দ স্বামীজীর একটি পেন্সিল অঙ্কিত ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছবিটি প্রায় দুই বৎসরে অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রথমে উহা পেন্সিলে অঙ্কিত হইয়া পরে রঙে রঞ্জিত হইয়াছিল। আমি অঙ্কনকালে এবং পরে বহুবার ছবিটি গুরুদেবের নিকট দেখিয়াছি। ঠাকুরমার মুখের সঙ্গে ছবিটির বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। গুরুদেবের সন্ন্যাসী ভাই শ্যামানন্দ স্বামীকে বহুবার দেখিয়াছি। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক আলাপ আলোচনা ও হৃদ্যতা ছিল। অন্য ভাই শ্রীপ্রণবানন্দ স্বামীকে আমি দেখি নাই। প্রণবানন্দ স্বামী সাধকদশায় অধিকাংশ সময় শ্মশানে থাকিতেন এবং ঘড়ি মেরামতের কার্য করিয়া জীবিকার্জন করিতেন। পরে তিনি ঘড়ি মেরামতের দোকান ছাড়িয়া দেন এবং গৃহত্যাগ করেন। প্রণবানন্দ স্বামী মোটেই শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অনেক অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল বলিয়া আমি শুনিয়াছি। আমার গুরুভাই সরলানন্দ স্বামীজী প্রণবানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। সরলানন্দজীকে তিনি বলিতেন "তিনি পৃথিবীর যে কোন ভাষার যে কোন শব্দের মানে বলিয়া দিতে পারেন।" সরলানন্দজী প্রণবানন্দজীকে তিনটি ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, উহার একটি শব্দ ছিল "ক্র"। তিনি বলিলেন -"আপনি এমন একটি কথা বলিতেছেন, যাহা কাল কাল এবং বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়ায়।" সরলানন্দজী বলিলেন, তিনি তিনটি শব্দেরই ঠিক ঠিক মানে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, আমার সঙ্গে প্রণবানন্দজী মহারাজের

সাক্ষাৎ হইলে আমি এই সব স্ফুটের বিজ্ঞান সম্বন্ধে সব রহস্যই জানিয়া লইতে পারিতাম। তিনি যেভাবে ভাষার অর্থ বলিতেছেন, উহা ঠিক টিক অর্থ নয়, উহা ভাষার স্ফুট।

গুরুদেব নিজের জীবন-কথা খুব কমই আলোচনা করিতেন। সে সম্বন্ধে আমার সুদীর্ঘ একত্র নিবাস হওয়া সত্ত্বেও আমি কমই জানিতে পারিয়াছি। একদিন বামাচার সম্বন্ধে বলেন, গুরুদেব আমার পরম গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর নিকট ক্রমদীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার দিনই ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী একটি থালার একদিকে মলত্যাগ করেন এবং অন্যদিকে অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইয়া গুরুদেবকে আহার করিতে দেন। গুরুদেব অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলেন। আমার বিষয়ে গুরুদেব বামাচার পরীক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি মলত্যাগ করিয়া আসিয়া হাতে মাটি দিতেছি; ঠিক এমন সময় তিনি আমাকে ডাকিলেন, ‘‘শীঘ্র এসো’’। আমি দুই-তিন সেকেণ্ডের মধ্যে হাত ধুইয়া অতি শীঘ্র তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, ‘‘তাড়াতাড়ি জল দাও, পান করিব’’। আমি মাটির স্বরাহি হইতে গ্লাসে জল ঢালিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি পান করিলেন। আমি গ্লাসটি যথাস্থানে রাখিয়া বলিলাম, ‘‘এখনও পায়ে জল দেই নাই, দাঁতুন করি নাই, হাতও ঠিকমত ধোয়া হয় নাই। বস্ত্র পরিবর্তনও করি নাই।’’ তিনি বলিলেন, ‘‘অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছিল বলিয়াই ডাকিয়াছিলাম।’’ তিনি জানিতেন, আমি আবাল্য শুদ্ধাচারী, আজ তিনি ভালভাবেই বুঝিলেন, শুদ্ধাচার আমাকে বন্ধন দিয়া রাখে নাই। শ্মশান-সাধনা সম্বন্ধে আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ‘‘আমার শ্মশান-সাধনা বিষয়ে গুরুদেবের মত কি?’’ গুরুদেব বলিলেন, ‘‘বাল্যকাল হইতেই তুমি ভয়ঙ্কর নির্জন বনে একা অবস্থান করিতেছ। বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে দিনরাত অবস্থান করিতেছ, আমি তো তোমার মধ্যে ভয় বা ভাবনার কোন চিহ্নও দেখি নাই, শ্মশান কি ইহা হইতেও ভয়ঙ্কর?’’ আমি কোনই উত্তর দিলাম না। এখানে বলা প্রয়োজন যে অনেকদিন আমি শ্মশানে অবস্থান করিয়াছি। কিন্তু আমার মত দিব্যাচারী সাধুদের পক্ষে শ্মশানে অবস্থান করা বেশ অসুবিধাজনক। যাঁহারা আমিষ আহারী, তাঁহাদের পক্ষেই শ্মশানে অবস্থান সহজ। পোড়া শবদেহের গন্ধ আমার মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে দিত না। শ্মশানে অবস্থানকালে আমি কখনও কোনও প্রকার অলৌকিক কিছু দেখি নাই। শ্মশান আমার ভালই লাগিত; কিন্তু শবদাহকালীন গন্ধ আমার ভাল লাগিত না। নিজের শ্মশান-সাধনার কথাও গুরুদেব কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ এক রাত্রে গুরুদেবকে শ্মশানে পাঠাইয়া দেন। বলিয়া দিলেন, যেন কোন অবস্থায়ই আসন ত্যাগ না করা হয়। যাহা কিছুই ঘটুক না কেন, ‘‘আসন কিন্তু ত্যাগ করিও না’’। গুরুদেব শ্মশানে বসিয়া আসন বিছাইয়া আসনশুদ্ধি দিকাবন্ধন ও ভূতাপসরণ করিয়া আসনে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গুরুদেবের সামনে একটি ছাগল ‘ম্যাঁহ্‌হ্‌’ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। গুরুদেব তাকাইলেন, দেখিলেন ছাগল নাই, এবার পেছন দিক হইতে ‘ম্যাঁহ্‌হ্‌’ ধ্বনি আসিল। গুরুদেব ঘাড় ফিরাইয়া পেছনে তাকাইতেই ডান দিক হইতে ছাগলের ডাক আসিল। তিনি এবার ডান দিকেই তাকাইলেন। ডান দিকে তাকাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাম দিকে ধ্বনি উঠিল ‘ম্যাঁহ্‌হ্‌’। এবার কোন্ কোন্ দিক হইতে ডাক আসিল! উহার পর ছাগলটি গুরুদেবের আসনকে ঘেরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া

ঘুরিয়া ডাকিতে লাগিল এবং দৌড়াইতে লাগিল। গুরুদেব ছাগল দেখিতে পাইলেন না, পায়ের শব্দ ও 'ম্যাঁহ্‌হ্‌' ধ্বনিই শুনিতে লাগিলেন। গুরুদেবের শরীর রোমাঞ্চ হইল। তিনি চুপ করিয়া আসনেই বসিয়া রহিলেন। এমন সময়, আমার পরম গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ দূর হইতে ডাকিয়া বলিলেন - "সচ্চিদা! ভয় পাইও না, আমি আসিতেছি।" তিনি আরও বলিলেন - "মা! তুমি সন্তানকে ভয় দেখাচ্ছ?" এইরূপ বলিতে বলিতে পরম গুরু শ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামীজী গুরুদেবের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন - "সচ্চিদা! চল, তোমার কাজ হইয়া গিয়াছে।"

গুরুদেব নিত্য একশত হইতে একশত পঁচিশ খিলি পান খাইতেন। এবং অনেকবার চা পান করিতেন। পরম গুরুদেব একদিন মাত্র বলিয়াছিলেন, "চা পান করা এবং পান সেবন দিব্যাচারসম্মত নহে।" গুরুদেব সেইদিন হইতে জীবনে একদিনও এ সব স্পর্শ করেন নাই।

গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাসীর মত ত্যাগী ও অনাসক্ত এবং গৃহীর মত সঞ্চয়শীল, কর্মী এবং হিসেবী প্রকৃতির করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য কতটা এ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছিলেন সেটা বুঝিবার শক্তি আমার নাই। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা রহিল। যদি স্থবিধা হয় তো অন্য অধ্যায়ে বলিব।

চুনারের পাহাড়ে আশ্রম করিবার পর প্রথম কয়েক বৎসর গুরুদেব পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতেন এবং পায়ে হাঁটিয়াই নামিয়া যাইতেন। একবার পাহাড় হইতে তিনি হাঁটিয়া ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে যাইতেছেন, সঙ্গে শ্যামবাবু এবং কয়েকজন কলিকাতাগামী ভদ্রলোক। আমি তাঁহাদিগকে কতকটা অগ্রবর্তী করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিব বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি। আধ মাইল যাইবার পরই গুরুদেব আমাকে বলিলেন, "আমার ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছে চলিতে পারিতেছি না।" আমি বলিলাম, "চলুন ফিরিয়া যাই, অন্যদিন যাইবেন, খাটের ব্যবস্থা করিয়া দিব। এখন জঙ্গলে কোন ব্যবস্থাই অসম্ভব।" তিনি ফিরিলেন না। আমার এখনও তাঁহার সেই কষ্টপূর্ণ মুখখানি মনে ভাসিতেছে। কী করুণ দৃশ্য। ইহার পর তিনি যতবার পাহাড়ে উঠিতেন, ততবারই আমি খাটিয়ার ব্যবস্থা করিতাম এবং যতবার নামিতেন ততবারই খাটিয়ার ব্যবস্থা করা হইত।

তাঁহার পাহাড় হইতে সমতলে যাত্রাপথের আরও একটি ঘটনা আমার মনকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তিনি বেশ অস্থস্থ, তিনি কাশী যাইবেন। খাটে শয়ন করিয়া তিনি চুনার স্টেশনে চলিয়াছেন। মজুরেরা তাঁহাকে বহন করিতেছিল। হঠাৎ খাটখানা ভাঙিয়া গেল। আমি একটু পেছনে পেছনে যাইতেছিলাম। মজুররা তাঁহাকে জঙ্গলের ধারে রাখিল এবং একজন দৌড়াইয়া আসিল। ছোট কুড়ুল তাহাদের সঙ্গেই ছিল। আমি গুরুদেবের নিকটে গেলাম। গুরুদেব খুব ম্রিয়মাণ এবং চিন্তিত। আমি বলিলাম আমি এখনই খাট ঠিক করিয়া দিতেছি, আপনার অস্থবিধা হইবে না। কথাটা তাঁহার মনঃপূত হইল না। যাহা হউক, আমি তাড়াতাড়ি বনের লতা এবং গাছের ডাল কাটিয়া খাট ঠিক করিয়া দিলাম, তিনি চলিয়া গেলেন। আমার মনে তাঁহার বিষাদ ছবি অঙ্কিতই রহিল। পরে একদিন দেবু-মা আমাকে বলিলেন, "চলার পথে ওইভাবে খাট ভাঙিলে, সেটা অমঙ্গলসূচক ঘটনা। এইরূপ খাট ভাঙ্গিলে যাত্রাকারী আর ফিরিয়া আসে না।" তখন

আমি বুঝিলাম গুরুদেবকে সেই যাত্রায় যাইতে দেওয়াই ঠিক হয় নাই। যাহা হউক, মহামায়ার অসীম কৃপা, গুরুদেব ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যাওয়ার সময় গুরুদেব বার বার আমার দিকে তাকাইতেছিলেন এবং কি যেন ভাবিতেছিলেন, কিন্তু আমার দৃঢ়তাপূর্ণ মুখভঙ্গী দেখিয়া তিনি কিছুই বলিতে ভরসা পান নাই। খাটিয়া ভাঙিয়া যাওয়া যে অমঙ্গলসূচক ইহা আমি জানিতাম না। অসুস্থ অবস্থায়, চিকিৎসার সুবিধার মধ্যে যাওয়া যে কর্তব্য, এ বিষয়ে, আমি তখন সত্যই দৃঢ় ভাব পোষণ করিতেছিলাম। তিনি নিজের মনের দ্বন্দ্ব এবং আমার মনের দৃঢ়তার মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া চুপ করিয়াই ছিলেন।

গুরুদেব দিব্যাচারী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চালচলনে বা কথাবার্তায় কোনদিনই ইহা বুঝা যাইত না যে তিনি তান্ত্রিক যোগী। তাঁহাকে শঙ্করপন্থী বেদান্তবাদী মহাত্মার মতনই মনে হইত। তাঁহার আহার, তাঁহার সাজসজ্জা, এবং চালচলনে কোথাও কোন তান্ত্রিকতা ছিল না। আমার স্বভাবেও আজ পর্যন্ত বৈদান্তিকতা বা তান্ত্রিকতার কোনই ভেদ পরিলক্ষিত হয় নাই। আমি অনেক সময় আজও বিস্ময়ে এ কথা ভাবিয়া থাকি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী। এই মহাপুরুষের জন্মস্থান গরীবপুর। রাণাঘাট বনগাঁ লাইনে মাঝেরহাট রেল স্টেশনের নিকটবর্তী গ্রামে। শুনিয়াছি, বাহান্ন হইতে পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। আমি গরীবপুর গ্রামে গিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনকথা কিছু জানা যায় কিনা, সেটা বুঝিবার জন্য। শ্রীঅমরনাথ মুখার্জী স্বামীজী মহারাজের সম্বন্ধে পৌত্র। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহারা মহাপুরুষের জীবনকথা অনেকটা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেটাই আমাকে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের গড়িয়া মঠে আসিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনকথার কোন কথাই জানিতে পারি নাই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ "কুমার বাবা" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা ডাঃ যদুনাথ মুখার্জী বিখ্যাত ডাক্তার এবং অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। ডাঃ যদুনাথ মুখার্জী লিখিত 'সরল শরীর পালন' নামক একখানা পুস্তক ছিল। এঁদের এখনও বেশ জায়গা জমি আছে, শুনিয়াছি। ডাঃ যদুনাথ অনেকদিন সন্তানহীন ছিলেন। কার্তিকপূজায় বরদান রূপে তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন। কার্তিকের প্রসাদে পুত্র লাভ করিয়া তিনি পুত্রের নাম 'কুমার নাথ' নামকরণ করিয়াছিলেন। সাধু ও সাধক জীবনে এই মহাপুরুষ সর্বত্র "কুমার বাবা" নামে পরিচিত ছিলেন। এঁকে দেখিলেই মনে হইত, ইনি সাক্ষাৎ ভৈরব। ইঁহার চালচলন, বেশভূষণ সবই তান্ত্রিক যোগীর মতন ছিল। ইঁহাকে দেখিলেই লোকের গভীর শ্রদ্ধা ও ভয় হইত।

কুমার বাবার শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল এবং মনেও ছিল অসাধারণ সাহস। আমি তাঁহার সাহস ও শক্তি সম্বন্ধে অনেক ঘটনার কথা শুনিয়াছি। একবার তিনি কোন গ্রাম্যদেশে রাত্রে যাইতেছিলেন। রেলষ্টেশনে নামিয়া তিনি সেই গ্রামে যাইবার কথা প্রকাশ করিলে স্টেশন মাষ্টার যাইতে নিষেধ করেন। বলেন, "সেই গ্রামে যাইবার পথে একটা স্থানে ডাকাতের আড্ডা আছে, সব সময় গোলমাল হয়, শুনা যায়, আপনি যাইবেন না।" তিনি স্টেশনের ধারে একটা ভাঙা খোলার ঘরের চালা হইতে একটি শক্ত বাঁশ সংগ্রহ করিয়া একাই সেই পথে চলিলেন। সত্যই পথে ডাকাতদের দ্বারা তিনি

আক্রান্ত হইলেন। তিনি দলের সর্দ্দার সহ কয়েকজনকে জখম করিলেন। সেই রাত্রে সব ডাকাতদিগকে সঙ্গে করিয়া গন্তব্যস্থানে চলিলেন। জখমপ্রাপ্ত কয়েকজন ডাকাত অশক্ত বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ছুটি চাহিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "একজনকেও আমি ছাড়িব না, তোমরা ছুটি পাইলেই আবার লোক সংগ্রহ করিয়া পথে আমাকে আক্রমণ করিবে।" গন্তব্যস্থলে যাইয়া বাড়ির কর্তাকে ডাকিতেই তাঁহাদের ধারণা হইল, তাঁহাদের বাড়িতে ডাকাত আসিয়াছে। তাঁহারা গেট খুলিতে বার বার ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কুমার বাবা বাহিরে থাকিয়া আত্মপরিচয় দেন এবং বলেন, "ভয় নাই ডাকাতরা সঙ্গেই আছে।" গৃহকর্তা শেষ পর্যন্ত দ্বার খুলিয়া তাঁহাদের পরিচিত ও পূজ্য কুমারবাবাকে দেখিয়া ও সব শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন। এই ঘটনা এবং আর কয়েকটি ঘটনার কথা কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামক এক মহাশয় আমাকে বলেন। তিনি কাশীতে বিখ্যাত চশমার ব্যবসায়ী ছিলেন। বাল্যকালে এবং যৌবনকালে এঁরা প্রায়ই একস্থানে থাকিতেন। কালীবাবু আমার গুরুদেবের ছোট ভাই ছিলেন।

দুইখানা মোটর গাড়ির মধ্যস্থানে অবস্থান করিয়া দুইখানাকে দুই হাতে ধরিলেন এবং দুইখানাকেই তিনি পূর্ণশক্তিতে চালাইতে বলিলেন। ড্রাইভারগণ কিছুতেই গাড়ি দুইখানাকে নাড়াইতে পারিলেন না। এই ঘটনা স্বামী আত্মানন্দ নামক এক মহাত্মা আমাকে বলিয়াছিলেন। এই মহাত্মা কুমার বাবার শিষ্য ছিলেন এবং কাশীতে এবং চুনারে অনেক দিন আমার সঙ্গে ছিলেন।

গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি, কুমার বাবা বাঘের বাচ্চা পুষিয়াছিলেন। সে এত পোষা ছিল যে বাড়ির কুকুরের মত সব সময় বন্ধনহীন ভাবেই থাকিত। গুরুদেব ওকে দেখিলে ভয় পাইতেন, বলিতেন, ঠাকুর! এ কি পুষিয়াছেন? এর ভয়ে আপনার নিকট আসাই মুশকিল। ঠাকুর অমনি ডাকিতেন, বিজয়, এদিকে এস। বিজয় পোষা বিড়ালটির মত ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসিয়া থাকিত। অনেক বড় হইবার পর একদিন বিজয় এক ভদ্রলোককে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। কুমার বাবা উহা লক্ষ্য করেন এবং তৎক্ষণাৎ বিজয়কে ডাকিয়া গৃহে বন্ধ করেন এবং পরে সুন্দরবনে লইয়া যাইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসেন। আসিবার সময় বিজয় ঠাকুরের পিছনে পিছনে আসিবার চেষ্টা করিলে, তাহাকে বন্দুকের আওয়াজের ভয় দেখাইয়া বিতাড়িত করিয়া চলিয়া আসেন। গুরুদেব বলিতেন, ঠাকুরের পোষা পেচক ছিল। সে নিত্য ঠাকুরের নিকট আসিত। মাঝে মাঝে তাহাকে ব্যাঙ খাইতে দিতে হইত। গুরুদেব বলিলেন, জান সত্যানন্দ! ঠাকুরের সব অদ্ভুত রকমের খেয়াল ছিল। তিনি খড়ম পায়ে চলিতেন এবং ত্রিশ সের ওজনের ত্রিশূল লইয়া চলিতেন। প্রতি দুই-তিনদিনে এক এক জোড়া খড়ম ভাঙিতেন এবং নূতন খড়ম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত গম্ভীর এবং দৃঢ় ছিল। মনে হইত বড় একটা ঝালার মধ্যে বসিয়া কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর ডাক্তারী পড়িতেন, তাঁহার সেই সব নরকঙ্কাল একটা বাঁশের বাক্সে রাখা ছিল। একদিন খট্ খট্ শব্দে সেই কঙ্কালগুলি সজ্জিত হইয়া এক মানব কঙ্কাল মূর্তি দাঁড়াইয়া যায়। ইহা দেখিয়া ভয়ে এক ভক্ত চিৎকার করিয়া উঠেন। তিনি জানিতেন না যে

বাক্সের মধ্যে নরকঙ্কাল রহিয়াছে। ঠাকুর যাইয়া দেখেন, কিছুই নাই। বাক্স তালাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। এখনও নাকি মাঝে মাঝে কঙ্কালের বাক্সে খট্ খট্ শব্দ হয়।

আত্মানন্দজী পরমগুরু ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের অন্তিম সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেহত্যাগ কালে সকলকে ডাকিলেন এবং প্রত্যেককেই আশ্বাস দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং চুপ করিলেন, কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই তিনি শরীর ছাড়িয়া দিলেন। শরীর ত্যাগের পর তাঁহাকে তাঁহার নির্মিত এক মন্দিরের মধ্যেই সমাধি দেওয়া হইল। সমাধির বাক্সটি প্রস্তত করিবার জন্য যে সব কাঠের প্রয়োজন ছিল, দেখা গেল, সবই সংগ্রহ রহিয়া গিয়াছে।

কুমার স্বামীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে অমরবাবুর মত এবং অন্য একজন সাধুর মত একরূপ নহে। অমরবাবু বলিয়াছিলেন, কুমার স্বামীর দেহত্যাগ ইং ১৯১৯ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ বেলা ১২টা, কিন্তু অন্য এক সাধুর মতে তাঁহার দেহত্যাগ ১৯১৬ সনে। এই মহাত্মার অলৌকিক শক্তি বিষয়ে আমি বহুস্থানে নানা কথা শুনিয়াছি। কুমার বাবাকে সকলে সাক্ষাৎ ভৈরব বা সাক্ষাৎ শিবরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, এ কথা বহু লোকই আমাকে বলিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার মুখার্জী নামক এক ভদ্রলোক জলপাইগুড়িতে অবস্থান করিতেন। তিনি বলিতেন, কুমার বাবা তাঁহার বংশের লোক। এবং তাঁহারই ভাইয়ের ছেলে। ছেলেকে ডাক্তারী পড়িতে পাঠানো হয়। সেখানে মানুষের কঙ্কাল সম্বন্ধে আলোচনা কালেই কুমার বাবার মনে অধ্যাত্ম পিপাসা দেখা দেয়। তাঁহার ডাক্তারী পড়া আর হইল না। তিনি তাঁহার জীবনলক্ষ্য অধ্যাত্মপথে প্রবাহিত করেন। মানুষের মেরুদণ্ড ও মস্তকের অস্থি লইয়াই তিনি বেশী মত্ত থাকিতেন এবং শক্তিসাধনা ও যোগাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন যখন আমার গুরু সচ্চিদানন্দস্বামীর বিরজা হয় তখন তিনি এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।

গরীবপুর আশ্রমে যাইয়া মা কালীর মূর্তি, শিবের মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ও কুমার বাবার সমাধি, সব দেখিলাম। শ্রীঅমরবাবু সবই আমাকে তন্নতন্ন করিয়া দেখাইলেন। কুমার বাবা যে মন্দিরে অবস্থান করিতেন আমি উহাতে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরের এক দিকে কুমার বাবার আসন ছিল। গুরুদেব বলিয়াছিলেন সন্ন্যাস ও বিরজার পর ঠাকুর তাঁহাকে কোলে বসাইয়া বলেন, ‘‘সচ্চিদা! একদিন আমরা বাল্যবন্ধু ছিলাম, কত খেলা দুইজনে খেলিয়াছি আজ তোমার বিরজার পর, আমাদের বন্ধুত্ব পূর্ণ হইল।’’ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যে সখা ছিলেন আজ তাহাই পূর্ণ হইল। কুমার বাবা গুরুদেবকে এই কথা বলিলেন, এবং দেওয়ালে সেই কথাগুলি তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন। গুরুদেব বলিতেন, তিনি ওই দেওয়ালটির ফটো তুলিবেন, আমি সেই লেখাটির খোঁজ করিলাম, কিন্তু কোন দেওয়ালেই উহার চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পূর্বের লেখা কোন দেওয়ালেই থাকিতে পারে না, যদি উহা রক্ষা করিবার বিশেষ ব্যবস্থা না করা হয়। অমরবাবু আমাকে কালী মন্দিরের পেছনে শিবের স্থান দেখাইলেন। শিবের উপরেই বিল্ববৃক্ষ। ওই বৃক্ষ হইতে একটি লতা শিবের লিঙ্গমূর্তি পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। ইহা কী বৃক্ষের লতা উহা আমি জানি না। দেখিলে মনে হয়, সত্যই একটি পাতলা রকমের জটা বিল্ববৃক্ষ হইতে নামিয়া শিবের মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

কালীমন্দির খোলা স্থানে অবস্থিত। মূর্তির নিম্নে অনেকগুলি নরশির কঙ্কাল নানা রঙে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মায়ের মূর্তির সামনেই সাধকের বসিবার আসনবেদী। অমরবাবু বলিলেন, এই বেদীর নিম্নে একটি আস্ত শব সমাহিত করা আছে। আরও তিনি বলিলেন, মায়ের মূর্তি স্থাপনের জন্য ওই মন্দিরটি করা হইয়াছিল। পরে মায়ের আদেশ হইল, “তিনি মন্দিরে থাকিবেন না, বাইরে তাঁহার আসন করা হউক।” তাহাই করা হইল, এবং ওই মন্দিরে কুমার বাবার সমাধি স্থান করা হইল। আমাকে বলিলেন, “এই মঠে গঙ্গাজল তুলসীপত্র ব্যবহার ও হরিনাম কীর্ত্তন চলে না।” আমি শুনিয়াই আসিলাম, কোন কথারই আলাপ আলোচনা করা আমার শক্তির বাহিরে। আমি কুমার বাবার সমাধির দ্বারে বসিয়া উপাসনা করিলাম এবং শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়া মনে মনে স্নেহ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিলাম। অমরবাবুর গৃহখানিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নানাপ্রকারের বই পুস্তক সাজানো রহিয়াছে। এতেই বুঝা যায়, অমরবাবু মার্জিত রুচিসম্পন্ন বিদ্বান লোক।

ভৈরবী মা নাম্নী এক বৃদ্ধা মহিলা কাশীধামে থাকিতেন। ইনি কুমার বাবার আশ্রমে থাকিতেন। যখন এই সাধু মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন এই মহিলার বয়স একশত বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ভৈরবী মা বলিতেন, তিনি রাত্রে জপে বসিলেই এক কালো শেয়াল শিবমূর্তির উপর পা রাখিয়া বেলগাছের তলায় আসিয়া বসিত। ভোরে ফুল তুলিবার সময় প্রেতাত্মারা তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিত। কখনও কখনও চক্ষু টিপিয়া ধরিত। ভৈরবী মা বলিতেন, “তখন এ সব অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া মনে হইত কতবড় মহাত্মাই না জানি হইয়া গিয়াছি, এখন দেখিতেছি, ওইসব ফাঁকা বস্তু। জ্ঞানই সব এবং শান্তিই সমস্ত কথার মূল কথা।” ভৈরবী মা আমার নাম মাত্রই শুনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কাশীর গুরুভগ্নীরা, আমি কাশী গেলে, ভৈরবী মাকে সংবাদ দেন এবং তিনি আসিয়া আমাকে দর্শন দেন। বৃদ্ধা ভৈরবী মা শরীরে বেশ শক্তি রাখিতেন। তিনি বেশ দ্রুত চলিতে পারিতেন। জানি না, ভৈরবী মা কোথায় জানিয়াছেন, সত্যানন্দ জ্ঞানলক্ষ্যসম্পন্ন সাধক। এ জন্যই সত্যানন্দকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ ও স্নেহ করিলেন এবং বলিলেন, “জ্ঞানলক্ষ্যে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ কর।”

গুরুদেব বলিতেন, গৌরপাদ স্বামীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত একশত একচল্লিশ সংখ্যক গুরুজন কেবল সাধনার কঙ্কালই রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, ইহার কোন ভাল প্রচার ব্যবস্থা সমাজে আজ পর্যন্তও হইল না। আমার মনে হয়, শক্তিবাদের মাধ্যমে এই সাধনার ধারা সমাজে আবার প্রচলিত হইবে। মতবাদ পেছনে না থাকিলে, কোন সাধনাই সমাজে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইতে পারে না।

আমি অমরবাবুর নিকট কুমার বাবার কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্যের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করিলাম। তাঁহাদের কয়েকজনের নিকট আমি লোক পাঠাইলাম এবং পত্রও লিখিলাম। কোন পত্রেরই উত্তর পাই নাই। লোক পাঠাইয়া যে সংবাদটুকু পাইলাম, উহাও আমাকে একটু চিন্তিত করিয়াছে। তাঁহাদের নিকট কুমারস্বামীর একখানা ফটো পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই।

অনেক বিদ্বান ব্যক্তিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “অনেক বিখ্যাত সাধকেরই পরবর্তী ধারায় আর সেইরূপ কোন সাধক বা সাধনার কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি?” গুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি কুমারস্বামীর প্রায় পাঁচ হাজার গৃহী শিষ্য ছিলেন। কুমারস্বামীর গুরু বশিষ্ঠানন্দ স্বামীর শিষ্য সংখ্যা উহা হইতেও অধিক ছিল। আমার গুরুদেবের শিষ্য সংখ্যাও তিন চার হাজারের মতন ছিল। গুরুদেব বলিতেন, গৌরপাদ হইতে এই ব্রহ্মানন্দ সম্প্রদায়ের ধারায় কখনও একজনের বেশী যোগ্যসাধক হন নাই। আমার মনে হয়, সাধনার ধারা ভিন্নও জনসমাজে সমস্ত স্তরের মানবের জন্য একটা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক ভিত্তিসম্পন্ন সাধনা ও উপাসনা দেওয়া প্রয়োজন। যাহাতে বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্বস্তরে ইহার প্রবল প্রচার হইতে পারে, এ জন্য জনসমাজে প্রচুর উৎসাহ এবং অধিকারও দেওয়া কর্তব্য। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে যে মতবাদের ভাল ও শক্তিসম্পন্ন ভিত্তি থাকে না এবং যে সব মতবাদের প্রবল প্রচারের ব্যবস্থা থাকে না, সেইসব মতবাদ বেশীদিন দাঁড়ায় না। যাঁহারা শুধু সাধনাকেই ভিত্তি করেন এবং মতবাদকে অবলম্বন করেন না, তাঁহারা যতই উচ্চস্তরের মহাত্মা হউন না, তাঁহাদের সাধনার ধারা সমাজে প্রচলিত থাকে না। আমি শক্তিবাদ, অসুরবাদ এবং দুর্বলবাদ চিন্তাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়াছি, শক্তিবাদ ধারার প্রত্যেকটি শিষ্যেরই কর্তব্য উহার ব্যাপক প্রচারে আত্মনিয়োগ করা। পৃথিবীর সর্বস্তরের মানবের জন্য আমার নির্দিষ্ট ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান এবং গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার ব্যাপক প্রচার হইলে সমাজজীবন এবং সাধকজীবন বরাবর গড়িয়া উঠিতে সুবিধা হইবে এবং মানবের পরম কল্যাণ হইবে।

কুমার বাবার গুরুর নাম স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী, একথা আমরা বলিয়াছি। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে আমি গুরুদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছি, ইহা হইতে বেশী আমি কোন কথাই জানি না। গরীবপুরের অমরবাবুদের মুখে শুনিলাম, বশিষ্ঠানন্দ স্বামীজীকে সকলে গিরীশ মহারাজ বলিতেন। ইনি স্বাস্থ্যবান এবং ভ্রমণশীল মহাত্মা ছিলেন। আনন্দমঠের সাধনার কঙ্কালরক্ষা সম্বন্ধে বশিষ্ঠানন্দ স্বামীজী বেশ চিন্তিত ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর পর আমার গুরুদেব সচ্চিদানন্দ স্বামীই যে পরম্পরা রক্ষা করিবেন; ইহা তাঁহারই পরিকল্পনা ছিল। গুরুদেবের পর মুরারীবাবু নামক এক যুবক সাধক এই ধারা রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বশিষ্ঠানন্দ স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু মুরারীবাবু সমস্ত বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি হইয়াও এ পথে আসিলেন না। আটত্রিশ বৎসর বয়সে এই সাধক যুবক সংসারে প্রবেশ করেন। গুরুদেব মুরারীবাবুকে সংসারে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন। আমি ইহা জানিতে পারিয়া গুরুদেবকে আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলাম। গুরুদেব আদেশ প্রত্যাহার করিয়া মুরারীবাবুকে পত্র দিয়াছিলেন, এবং মুরারীবাবু সেই পত্রের যাহা উত্তর দিয়াছিলেন উহাও আমাকে দেখাইয়া ছিলেন। মুরারীবাবু লিখিলেন, “আপনি পূর্বে যে আদেশ করিয়াছেন, যেভাবে আমার বোনকে ও ভাইকে পত্র দিয়াছেন, এবং যেভাবে তাঁহারা পাকা কথা দিয়াছেন, এখন সেটা আর উল্টানো যায় না।” কমলা মা কিন্তু আমাকে একথা বহুদিন পূর্বেই বলিয়াছিলেন।

কমলা-মা বলিয়াছিলেন, "দেখিবে সত্যানন্দ! মুরারী সংসারেই যাইবেন। তাঁহার মত সুখী মানুষ ত্যাগী হইতে পারিবেন না। ত্যাগীরা স্বভাবতঃই শক্তভাবে গড়িয়া উঠেন।"

কুমার বাবার নিকট একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল, ধন সংগ্রহ করেন অলৌকিক কিছু দেখাইয়া এবং মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া। তিনি কুমার স্বামীকে প্রস্তাব করেন তাঁহার উপার্জনের সহায়ক হইবার জন্য দুই বৎসর সময় দিতে। তাঁহার পরিকল্পনা, কুমার স্বামীকে তিনি বোম্বাইতে লইয়া যাইবেন। কুমার স্বামীর বিরাট শরীর, শক্তিশালী শারীরিক গঠন এবং দীপ্ত চেহারা ও জটাযুক্ত শিবতুল্য সুন্দর বপু, সেই ভদ্রলোকের লক্ষ্যের বিশেষ অনুকূল। ভদ্রলোক সাধুই ছিলেন। সাদা বস্ত্র পরিধান করিতেন। বেঁটে সুন্দর চেহারা ছিল। তিনি কোন ভাল সাধনা করেন নাই, শান্তিও পান নাই। কিন্তু একটি অলৌকিক বিভূতি শিক্ষা করিয়াছেন। লোককে আকর্ষণ করিবার মত কোন শক্তিই তাঁহার ছিল না। কুমারস্বামীকে বলেন, "আপনি মৌনী থাকিবেন।" কথাবার্তা সবই সেই ভদ্রলোক বলিবেন। স্বামীজীর বয়স তিন শত বৎসর হইয়াছে এবং ঐ ভদ্রলোকের বয়স এক শত হইয়াছে, ইহা প্রচার করা হইবে। তিনি নিজেকে স্বামীজীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবেন। ভদ্রলোকের কি বিভূতি অর্জন হইয়াছে সেই সম্বন্ধে তিনি সেইদিনই রাত্রি দশটার সময় কিছু একটা দেখাইবেন। এই কথা বলিয়া ভদ্রলোক সাধু চলিয়া গেলেন। রাত্রি দশটা হইল, দেখা গেল, "একটা জ্যোতিরেখা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু, স্বামীজীর দিকে ধীরে ধীরে আসিতেছে।" ক্রমে জ্যোতিটি স্বামীজীর খুব নিকটস্থ হইবার পর দেখা গেল, জ্যোতিটি অস্তিত্বহীন হইয়াছে এবং সেই ভদ্রলোকই দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীজী বলিলেন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার মিথ্যা রটনা করা হইবে এবং তিনি কাঠের পুতুলের মতন নির্বাক হইয়া এ সব মৌন সম্মতির লীলা করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। এ সব সাধুতার নীতি হইতেই পারে না; কারণ, ইহার সবই মিথ্যা ঘটনার ষড়যন্ত্র মাত্র।

কুমারস্বামীর নিকট আরও এক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তিনি একটি ছোট বালিকাকে কুমারী পূজা করিতেন। পূজার পর কুমারীকে তিনি কোলে বসাইয়া তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতেন এবং সেই কুমারী সেই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বলিয়া দিতেন। এই ভদ্রলোকও সাধুভাবাপন্ন পুরুষ ছিলেন। সাধুভাবাপন্ন পুরুষের ধারণা, কুমারস্বামীর মত শক্তিমান গুরুর নিকট দীক্ষা ও অভিষেক গ্রহণ করিলে তাঁহার এ সব কুমারী পূজার ব্যবসা আরও ভাল হইবে। কুমারস্বামী তাঁহাকে বলেন, "আমরা দিব্যাচারের ঘরের শিষ্য। যোগ, জ্ঞান, শান্তিই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে ত্যাগ করিয়া এ পথে আসিলে তোমার সুবিধা হইবে না।" তবুও তিনি দীক্ষা ও অভিষেক গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার পর তিনি কুমারী পূজা করিলেন। কুমারী সেইরূপ কোন কথারই উত্তর বলিতে পারিলেন না। ইহাতে হতাশ হইয়া ভদ্রলোক সাধু স্বামিজীর নিকটে আসেন। স্বামিজী বলিলেন, "এ সব কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম। যদি তোমার জ্ঞান এবং শান্তি লক্ষ্য থাকে তবে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর, এবং যদি কুমারী পূজা ব্যবসা করিবার ইচ্ছা থাকে তবে এখানকার দীক্ষার মন্ত্র বেল পাতায় লিখিয়া গঙ্গা বা নদীতে বিসর্জন দিলে তোমার ব্যবসা আবার জমিবে।"

গরীবপুর মঠ হইতে প্রতি অমাবস্যায়, সন্তান হইবার জন্য তাবিজ দেওয়া হইত। একদিন ভৈরবী মা বলিলেন, ‘‘বাবা! যে শেকড় সন্তান হইবার জন্য দেওয়া হইতেছিল উহা আর পাওয়া যায় না।’’ কুমার বাবা বলিলেন, ‘‘যদি সেই বৃক্ষ অপ্রাপ্য হয় তবে ভিণ্ডি ফুলের মূল দাও; মায়ের আশীর্বাদে উহাতেই কাজ হইবে।’’ গুরুদেব বলিলেন, ‘‘সেই মূলেই তাবিজ চলিতে লাগিল এবং ফলও হইতে লাগিল। সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য এবং আদেশই ফলদায়ক।’’

কঠোর তপস্যা

এখন আমার বয়স প্রায় ঊনত্রিশ-ত্রিশ হইয়াছে। কিছুদিন হইল আনন্দমঠের সাধনার শেষ দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। গুরুদেবকে আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, সাধনার শেষ হইলে মঠ ছাড়িয়া দিব। কিছুদিন হইতেই আমার শরীর বলহীন হইয়াছে। সামান্য কিছুদিন পূর্বেই আমার টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল। জ্বরের পরও বিশ্রাম বা যত্ন কিছুই সম্ভব হয় নাই। একটু নিদ্রাভাব আসিলেই আমার হাত ও পায়ের অর্ধাংশ অসার হইয়া যায়। মাথা মোটেই রোদ সহ্য করে না। শরীরে বল পাই না। গুরুসেবা সাধনা ও কর্ম অধ্যায় এবার শেষ করিয়া অন্য অধ্যায় গ্রহণ করিবার কথা ভাবিতেছি। আমি জানি, গুরুদেব ইহা আন্তরিকভাবে সমর্থন করিবেন না। বাল্যকালে যে কল্পিত তপঃভূমির আকর্ষণে আমি গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম, যাঁহাদের মধ্যে আমার জন্ম হইয়াছিল, যাঁহাদের স্নেহে আমি বাঁচিয়াছিলাম, সেই আকর্ষণীয় তপঃভূমির জন্য আমি সব ছাড়িয়াছিলাম, সেই তপঃভূমি আজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। চলিয়া আমাকে যাইতেই হইবে। ইহার পরবর্তী জীবন আমার কিরূপ হইবে সেটা আমার জানা নাই। আবাল্য কর্মীপ্রকৃতির মানুষ, কার্য ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব কিনা, সেটাও আমাকে বুঝিতে হইবে। আবার কর্মের দায়িত্ব লইয়া আশ্রম সেবা ও শরীর রক্ষাও সম্ভব নয়, ইহা আমি প্রতি মুহূর্তেই বুঝিতেছি। কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি সাত দিনের জন্য মির্জাপুর থাকিয়া আসিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আমি চারখানা পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করিলাম (প্রতিখানা দুই পয়সা) এবং আমি পাহাড়ের আশ্রম ছাড়িয়া দিলাম। কিছুদিন হইতেই আমি আমার মনের ইচ্ছার কথা অনেককে বলিতে ছিলাম। প্রায় সকলেই চুপ থাকিতেন এবং কেহ কেহ বলিতেন, একজন যদি চিরদিন গদী ধরিয়া বসিয়াই থাকে তবে অন্য লোক গড়িয়া উঠিতে সুযোগ পাইতে পারে না। ভবেশ্বরানন্দজীও চান, এবার তাঁহার হাতে আশ্রম দেওয়া হউক। তাঁহার এই চাওয়ার অনুকূলে লোকের সমর্থনও বেশ আছে।

আমি সকালবেলা পূজা পাঠ শেষ করিয়া আশ্রম ছাড়িয়া মা গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলাম। তেন্দুয়া পাহাড়ের ধার দিয়া বড় রাস্তা ধরিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়াছি, ওভারসিয়ার রঘুবীর সহায় ভার্গব সড়ক মাপিতেছেন। তিনি নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি খুব সংক্ষেপে বলিলাম, ‘‘আশ্রম ছাড়িলাম, গঙ্গার ধারে কোথাও আশ্রয় লইব এবং আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শরীর রক্ষা করিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিব।’’ ইহা শুনিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইলেন, এবং বলিলেন, আপনি

যখন সত্যসত্যই অন্যত্র যাইতেছেন, তখন চলুন আমার সঙ্গে, এবেলা আমার সঙ্গে আহারাদি করিবেন। বৈকালবেলা দুইজনে মিলিয়া দেখিয়া একটা স্থান দেখা যাইবে। আপনি সম্মানিত সাধু, আপনি শিক্ষিত ও ভদ্রলোকের সংস্পর্শে কোন স্থান নির্বাচন করুন। তখন গ্রীষ্মকাল আসিয়া গিয়াছে। আমি ভার্গবের সঙ্গে তাঁহার বাসায় আসিলাম। এবং বৈকালবেলা দুইজনে বহুলোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া একটা পুরাতন মন্দির নির্বাচন করিলাম। এবং তখনই সেই মন্দিরে চলিয়া আসিলাম। জগদীশ নারায়ণ শ্রীবাস্তব আমার অবস্থানের প্রাথমিক ব্যবস্থা সবই করিয়া দিলেন। আমি দিনের বেলায় ঐ মন্দিরে থাকি এবং রাত্রিকালে, রাত্রি নয়টার পর গঙ্গার তটে কাঠের খাটে শয়ন করি। এইভাবেই ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকালটা কাটিয়া গেল। শ্রীবাস্তব এবং শ্রীভার্গব কয়েক মাস পর্যন্ত আমার নিকট আর আসেন নাই। একজন ছুতার মিস্ত্রী আমাকে একখানা কাঠের হালকা চৌকী করিয়া দিয়াছিলেন। সেটাই আমার আসন হইল। পাহাড় আশ্রমের সংস্পর্শে আমি যাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তাঁহারা আমার নিকট খুব কমই আসিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে খুব কম কথাবার্তাই হইত। আমি দিনরাত্র ধ্যান ধারণা এবং আত্মচিন্তা লইয়াই থাকি। বর্ষা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি স্থান পরিবর্তন করিয়া ভৈরব গুহায় আশ্রয় লইলাম। আমি চুনারের বহু পুরাতন মন্দিরে অবস্থান করিয়াছি। লোকের ভাল মন্দ ব্যবহারও অনেক বুঝিয়াছি। তবে ভৈরব গুহায় আসিবার পর চার বৎসরকাল আমি বিনা বাধায় এবং বিনা অসুবিধায় কাটাইয়া ছিলাম। কোন স্থানে অবস্থান বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দিলে, আমি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিতাম।

আমি কাশীতে আমেঠী রাজার বাগান বাড়ি, যেখানে স্বামী ভাস্করানন্দজীর সমাধি আছে, সেইস্থানে বহুদিন ছিলাম। সে স্থানে অবস্থান কালে বানরের উপদ্রব খুব বেশী ভোগ করিয়াছি। তাহারা সুবিধা পাইলেই আমার পুঁথি পুস্তক এবং দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া দিত। কাজেই এ স্থানও আমাকে ত্যাগ করিতে হইল। কাশীতে অবস্থান কালে শ্রীমহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমি বই লিখিতে আরম্ভ করি। একজন গৃহী সাধু, স্বামী আত্মানন্দজী তখন গোদোলিয়া মানিক শীলের সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এবং শ্রীগোপীবাবুর অনুরোধে আমার গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হয়। আত্মানন্দজী এখন আর ইহজগতে নাই। পরম সৌভাগ্য যে গোপীনাথবাবু এখনও জীবিত আছেন এবং আমি কখন কি লিখিলাম বা ছাপিলাম, উহার সংবাদ গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থও তাগাদা করিয়া চাহিয়া লন। কাশী আমেঠী রাজার বাগান বাড়িতে অবস্থান কালে আমি দিনের বেলায় বাগানে থাকিতাম এবং রাত্রিবেলায় গঙ্গার ঘাটে বিশ্রাম ও তপস্যায় কাটাইতাম। চুনারের ভৈরব গুহায় এবং আমেঠী রাজার বাগান বাড়িতে অবস্থান কালে, আমি ইহা স্পষ্টই বুঝিলাম যে আমার বই পুস্তক এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য একটা নিজস্ব স্থান চাই। উহার প্রয়োজন বুঝিয়াই আমি ভৈরব গুহার সন্নিকটে একটা মাটির বাড়ি প্রস্তুত করিয়া লই। আমি সুবিধামত ভৈরব গুহায় বসিতাম কিন্তু দ্রব্যাদি সবই নীচে কুটিয়াতেই থাকিত। কুটিয়াটি যাহাদের জমির উপর নির্মিত, তাহাদের সকলেই আমার শিষ্য এবং অনুগত। ওই জমির উপর আমার কোনই অধিকার নাই। কিন্তু ওই জমি সংযুক্ত পশ্চিমদিকের

টুকরা জমিখানি আমি কুঞ্জনলালের নামে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছি। যদি ভবিষ্যতে ওইস্থানে কোন কুটীরাদি নির্মাণের প্রয়োজন হয় তবে ওই জমিতে করা যাইবে। চুনার পাহাড়ে গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত আমার স্বহস্ত নির্মিত বিখ্যাত আনন্দাশ্রমটি আজ ভাল ভাবেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কাজেই ভৈরব গুহার নিকটবর্তী স্থানে আমার তপোজীবনের একটা কেন্দ্রস্থান নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। ওইস্থানে ইতিমধ্যেই ঈশ্বরীয় নিয়মে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্ম লইয়াছে। আমি ইহা রোপণ করি নাই। ইহা নিজে নিজে কি ভাবে জন্ম লইয়া এখন বেশ ভাল বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। বলা প্রয়োজন, এই বৃক্ষতলেই আমার বাসস্থান বা কুটিয়া অবস্থিত।

ভৈরব গুহার নিকটে আমার অবস্থানের কুটিয়া প্রস্তুত হইবার পরও ভৈরব গুহা, কেল্লার ঘাট, বালুয়া ঘাট, চার খাম্বাঘাট, সোন পাহাড়ী, ফুলবাড়ী, দুর্গা বাড়ির পাহাড়, দুর্গা ঝরণা, তেন্দুয়া পাহাড় এবং বুন্দা পাহাড়, আমার প্রিয় তপঃভূমি হইল। আমি প্রত্যুষে যেদিকে মন চাহিত চলিয়া যাইতাম, বেলা আটটায় ফিরিতাম। আবার বৈকালবেলায় বাহির হইতাম এবং সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিতাম। এইভাবেই মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। আমি প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে নানা দেশে নানা তীর্থে বেড়াইয়া আসিতাম। আমি যেখানেই গিয়াছি, সেইখানেই বহুদিন অবস্থান করিয়া স্থানের শক্তি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক মহাপুরুষও দর্শন করিয়াছি, তাঁহাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ আহরণ করিয়াছি। যতদিন ভৈরব গুহায় থাকিতে হইত, ততদিন মধ্যাহ্নকালে আমাকে সংস্কৃত পাঠশালার নিম্ব বৃক্ষতলে অথবা শহিদ সমাধিস্থানে নিম্ব বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে হইত। শহিদ বেদী অত্যধিক সর্পসংকুল স্থান। এই বেদীর চারিদিকটা ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সব সময়ই সেইসব ফাটাগুলি হইতে বিষধরগণ মুখ বাহির করিয়া অবস্থান করিত। ফুলবাড়িয়ার পুকুরটাও ভয়ঙ্কর সর্পপূর্ণ স্থান ছিল। তাহারা আমার সামনে সর্বদা নিঃসংকোচে বেড়াইয়া বেড়াইত। এদের চালচালন দেখিলে মনেই হইত না, যে এরা আমাকে কোন মানুষ মনে করে।

ভৈরব গুহায় অবস্থান কালে, গুরুদেব যখনই পাহাড়ের আশ্রমে অবস্থান করিতেন, তখনই প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া আমি অন্ধকার ও নির্জন বনপথ অতিক্রম করিয়া গুরুদেবের নিকট চলিয়া যাইতাম এবং রাত্রিকালটা আশ্রমে কাটাইয়া সকাল বেলায় আবার গুহায় ফিরিয়া আসিতাম। গুরুদেবের হয়তো কৌতুহল হইয়াছিল, এই চার পাঁচ মাইল অতিক্রম করিতে কোন ভয়ের কারণ ছিল কিনা। তাঁহার শিষ্য দুর্গাপ্রসাদ ক্ষত্রি আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘আমি হাঁটিয়া আসি, না কি কোন অলৌকিক শক্তির সন্ধান পাইয়াছি, যে শক্তিতে আকাশ গমনে আসা যায়?’’ আমি সংক্ষেপে বলিলাম, ‘‘হাঁটিয়াই আসি, পায়ে খড়ম থাকে।’’ তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, কোনপ্রকার ভয় মনে জাগে কিনা। আমি বলিলাম, ‘‘ভয়ের কোন কারণ এ পর্যন্ত দেখি নাই, দেখিলে ভয় হইবে কি না জানি না, এ পর্যন্ত তো ভয়ের কিছুই দেখি নাই। দুই একবার ‘মচ্ছর মায়াতে’ বন্য শুকরের অস্তিত্ব বুঝিয়াছি, তাহারা জলপান করিতে আসিয়াছিল। আমি খড়ম পায়ে চলিয়া আসিয়াছি।’’ তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অলৌকিক শক্তি, যাহার প্রভাবে আকাশে বাতাসে চলা যায়, উহার সন্ধান পাইয়াছি কিনা?

আমি বলিলাম, যতবারই চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই শরীর অসুস্থ হইয়া যাইত। কাজেই সেদিকে আর চেষ্টা করিতে চাই না। এমনই শরীর অপটু, তাহার উপর অসুস্থতা ভয়ঙ্কর অসুবিধার কারণ হয়। আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিব কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আর ফিরিব না। খুবই শান্তিতে আছি। কাজকর্মে হাত না দিয়া শুধু শান্তি লইয়া এখানেই থাকুন না? আমি বলিলাম, গুরুর আশ্রয়ে থাকা এবং অলৌকিক আশ্রয়ে থাকা এক নয়। গুরুর আশ্রয়ে ঐভাবে থাকা ঠিক নয়। উহা শোভনীয় নীতিও নয়। গুরুসেবা ও আশ্রমসেবাও এক জাতীয় তপস্যা। গিরিগুহায় আকাশ বৃত্তিতে অবস্থান করিয়া আত্মচিন্তা অন্যরকম তপস্যা।

একদিন গুরুদেব বলিলেন, "তুমি নিকটে না থাকিলে ভয়ঙ্কর কষ্ট ও অসুবিধা হয়। আমার সেবা করা তোমার কর্তব্য।" আমি বলিলাম, "আপনি কোন নির্জন স্থানে চলুন, আমি যথাসাধ্য আপনার সেবা করিব। এখানকার পরিস্থিতি আমার স্বাস্থ্যের ও মানসিক স্থিতির প্রতিকূল। আমার শরীর ও মন খাটিতে চায় না, আমি এখন বেশ অপটু হইয়াছি। আমার এখন লম্বা বিশ্রাম চাই।"

একদিন দেবু-মা বলিলেন, গুরুকে রুষ্ট করা তোমার অন্যায়, "শিব রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরু রুষ্টে ন কশ্চনঃ।" আমি বলিলাম, দেবু-মা! বিনা কারণে গুরু কেন রুষ্ট হইবেন? কারণ না থাকিলে রুষ্ট হইবার তাঁহার কোনই অধিকার নাই। জানেন দেবু-মা! "বরাভয় করংশান্তং কারুণ্যেনাবোলোকিতং।" "গুরু বরাভয়কর হইবেন, শান্ত হইবেন এবং করুণা দৃষ্টিতে দৃষ্টি দিবেন।" ইহা গুরুর ধর্ম।

দেবু-মা আরও বলিলেন, "আমরা অতুল বসুর নিকট শুনিয়াছি, তুমি বই লিখিতেছ।" সে বিষয়ে গুরুদেব বলিয়াছেন, জান দেবু, সত্যানন্দ বই লিখিতেছে। সে বসিয়া থাকিবার ছেলে নয়, তবে সে আমার ধারা লইবে না। আমি দেবু-মাকে বলিলাম, গুরুদের ধারা একই আছে। কেহ সে ধারা ধরিয়া কোনও প্রকারে পাস করেন, কেহ স্কলার হয়। আমি গুরুর ধারার বাইরের মানুষ নই। দেবু-মা বলিলেন, তবে তুমি বাবাকে বই দেখাও না কেন? আমি বলিলাম, আমার চিন্তাধারা গবেষণামূলক, যখন সময় হইবে, তখনই বাবা দেখিবেন।

অতুল বসু নামক এক যুবক স্বদেশকর্মী, আমার নিকট গুহায় আসিতেন এবং পাহাড়ের আশ্রমে গুরুদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি আমাকে বলিলেন, বড় স্বামিজী আপনার উপর গভীর স্নেহ রাখেন, আপনার অভাব অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করেন। তিনি বলেন, "সত্যানন্দ বসিয়া থাকিবে না, সে বসিয়া থাকিবার ছেলেই নয়। সে যতদিন এই মঠে ছিল, ততদিন মনে হইত এক শত লোক আছে। এখন আমরা অনেকে থাকি; কিন্তু মনে হয় না যে অনেকে আছি। সে এমনই প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ যে একলাই একশত।" আমি অতুল বাবুকে বলিলাম, "গুরুদেবকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। ঐ স্নেহময় মহাপুরুষ আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি সব রকমে অক্ষম। জানেন অতুলবাবু। আমি পাহাড় ত্যাগ করিয়া অনেক অসুবিধা ও দুঃখ বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সবচেয়ে বড় কথা, গুরুদেব আমার উপর যথেষ্ট প্রসন্ন থাকিতে চান না। এখানে এক দেড় মাইলের মধ্যে যত রাস্তা, সবগুলির ধারেই লোকে পায়খানা করে,

সকালবেলা পালিত শুকরের দল সেই ময়লা আহার করিবার জন্য ছুটাছুটি করে। সমস্ত দেশকে যেন দুর্গন্ধে প্লাবিত করিতে থাকে। বর্ষা হইলে মনে হয় ময়লার গন্ধে সমস্ত দেশটা দুর্গন্ধময় হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গ্রামের কুকুরগুলি বিনা প্রয়োজনে চীৎকার করে। লোকের কোলাহলও আমি মোটেই সহ্য করিতে পারি না। আমি সবই নীরবে সহ্য করিতেছি। পাহাড়ের পরিস্থিতির সহিত তুলনা করিলে মনে হয় আমি কষ্টেই আছি। বাহ্য দৃষ্টিতে আমি কোন রকমে বাঁচিয়া আছি মাত্র। পথের দুর্গন্ধ হইতে বাঁচিবার জন্য আমি শেষ রাত্রে পাহাড়ে এবং জঙ্গলে চলিয়া যাই এবং আটটায় ফিরি। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, বাতাস, কোলাহল সবই আমি নীরবে সহ্য করি। সময় হইলে কিছু ফুটাই বা কিছু সিদ্ধ করি এবং আহার করি। মা রক্ষা করেন, তাই আকাশ বৃত্তিতেও অন্নবস্ত্র সবই পাই। এই নির্জন গুহাটিতে বেলা দশটার পর আর থাকা যায় না। পাথর গরম হয়, স্থানটা অবস্থানের অযোগ্য হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে আমি সব রকমেই মরিয়া গিয়াছি, অন্তরাত্মা সজাগ ও সজীব আছেন। সেইটুকু লইয়াই আমি এখনও বাঁচিয়া আছি। ওইটুকুই আমার জীবনের সবটুকু জীবন, উহা লইয়াই আমি সমস্ত জীবন শান্তিতে ও আনন্দে থাকিতে পারিব, জানিবেন। গুরুদেব জ্ঞানী পুরুষ। তিনি তপস্বী সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট থাকিলে, সেটা অশোভন হয়।”

আমি বই লিখিতেছিলাম, সে কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। ক্রমবিকাশের পথে বইখানা ক্রমে ক্রমে চারি খণ্ডে লিখিত হইল। বইগুলি আমারই জীবন কথা এবং বিভিন্ন সময়ে আমারই অনুভূতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ। আমি প্রথম খণ্ড ছাপাখানায় ছাপিতে দিলাম। আমি আমার তপোভূমি চুনারের বনে জঙ্গলে এবং নানা স্থানে অবস্থান করিয়া আমার এই বই লেখার কার্য শেষ করিলাম। এই ভাবে আমার বয়স বত্রিশ বৎসরে আসিল। গুরুদেব আমার বই দেখেন নাই। তিনি আজ বহুদিন ধরিয়াই অসুস্থ। এই ভাবে ১৯৩২ সনের মধ্যবর্তী সময় নিকটবর্তী হইল।

আকাশ বৃত্তি

পাহাড়ের আশ্রম ত্যাগ করিবার পর কয়েক মাস পর্যন্ত আশ্রম সংশ্লিষ্ট পরিচিত ব্যক্তিরা বিশেষ কেহই আমার নিকটস্থ হন নাই। কয়েক মাস কাটিবার পর সেই সব সজ্জনদের মধ্যে কেহ কেহ কখনও কখনও দর্শন দিয়াছেন এবং অযাচিত উপদেশও দিয়াছেন। সাধুরা শরীর ধারণের জন্য যাঁহার যেমন সুবিধা তিনি সেইরূপ বৃত্তি গ্রহণ করেন। কেহ আকাশ বৃত্তি, কেহ ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ মাধুকরী বৃত্তি, কেহ উঞ্ছ বৃত্তি, কেহ তাবিজ কবচ ও জড়ি বুটি চিকিৎসা বৃত্তি, কেহ কেহ দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মজুরী বৃত্তি গ্রহণ করিয়া বাকী সময়টা নির্জন তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধুদের গ্রহণীয় আরও অনেক প্রকারের বৃত্তি আছে। আমার পূর্বাবধি পরিকল্পনা ছিল “আকাশ বৃত্তি”। গুহার মধ্যে তিনটি ছোট হাঁড়ি ছিল, উহার একটাতে চাল আর একটাতে ডাল ও অন্য একটাতে আটা থাকিত। ইহা ভিন্ন ঘি রাখিবার ও নুন লঙ্কাদি রাখিবারও আধার ছিল। রান্না করিবার জন্য কেহ কেহ কাঠ কয়লাও দিয়া যাইতেন। যদি শ্রদ্ধা কাহারও কখনও হইত, তিনি ওই সব যাহা আনিতেন আধারে রাখিয়া যাইতেন। আমার শরীরযাত্রা

চলিয়াই যায়, কোন অসুবিধা হয় না। আনন্দাশ্রমবাদী সজ্জনেরা এখন প্রায়ই আসেন। গুহার নিকটস্থ গ্রামে কত ঘর লোক আছেন, উহার হিসাব করেন, এক একজন যদি একদিনের ব্যবস্থা হাতে লয় তবে চলিয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বিরক্তিকর মিথ্যা কথা বলেন এবং আমার সম্মতি আছে কি না ইহা জানিতে চেষ্টা করেন এবং চলিয়া যান। কেহ কেহ আবার এক গ্রামের নিকট বেশী দিন থাকিলে তাহাদের উপর বেশী চাপ পড়িবে মনে করিয়া অন্য গ্রামে যাইবারও পরামর্শ দেন। আমি এ সব সাধুসজ্জনসেবী ভয়ঙ্কর জীবগণের মনোবৃত্তি দেখিয়া বুঝিলাম, এঁরা বৃথাই পাহাড়ের আনন্দাশ্রমের খাতায় নাম লিখাইয়াছেন। এঁরা আকাশ বৃত্তি কথাটাও বুঝেন না। কোন কোন সজ্জন আবার ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অহংকার ক্ষীণ করিবারও পরামর্শ দেন। আমি কিছু বলি না। চুপচাপ শ্রবণ করি। একদিন আনন্দাশ্রমসেবী এক সজ্জন, নাম তাঁহার মাতাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব। আমাকে আসিয়া বলেন, আমাকে বলিতেই হইবে, আপনার কি ভাবে শরীর যাত্রা চলে। আমি বলিলাম, দেখুন, আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে বৃত্তিই হইতেছে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরীয় রূপ। চণ্ডীর বিভূতি অধ্যায়ে দেখিবেন "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ ইত্যাদি।" আপনি মোক্তার মানুষ, আইনজীবী। সেইটাই আপনার তৃপ্তি আপনি এটা ভালভাবেই মনে রাখিবেন। আমি যদি "আকাশ বৃত্তি" বুঝিতে পারি, তবে মায়ের বিভূতি যে "আকাশ বৃত্তি" উহাই আমাকে রক্ষা করিবে। আকাশ বৃত্তিটা কি; ইহা আমি অন্ততঃ দশ বৎসর চিন্তা করিয়াছি। যতদিন উহা গ্রহণ করি নাই ততদিন সেটা আমার কল্পনার মাতৃমূর্তি ছিল, এখন বৃত্তিরূপা মহাশক্তি আমাকে কি ভাবে রক্ষা করেন, উহা আমি নিত্যই দেখিতেছি। এ গ্রামে কতজন মানুষ, ওই গ্রামে কতজন ধনী, এ দেশে কতজন ভক্ত, অন্য গ্রামে কতজন ধার্মিক এ সব বিচার করা কি আকাশ বৃত্তি? আপনি যে যে গ্রামে যাইতে চান, একবার ঘুরিয়া আসুন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন, আমার আকাশ বৃত্তির যোগকে এঁরা কস্মিনকালেও কিছু দিয়াছেন কিনা। অথবা আমার আকাশ বৃত্তি সম্বন্ধে এঁরা কেহ কিছু জানেন কিনা বা শুনিয়াছেন কিনা? যোগদর্শনে এ সম্বন্ধে একটি সূত্র রহিয়াছে - "নিষ্পৃহ প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্"। যোগী যদি নিষ্পৃহ প্রতিষ্ঠ হন, তবে তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত রত্ন তাঁহার নিকট আপনিই উপস্থিত হয়। এই সম্বন্ধে গীতার শ্লোক দেখুন, যেখানে বলা হইয়াছে, "অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" ৯ অঃ, ২২ শ্লোঃ॥ "যাহারা অনন্যচিন্তাযুক্ত হইয়া আমার (আত্মার) উপাসনা করেন তাঁহাদের যোগক্ষেম (আমিই) আত্মাই বহন করেন।" মাতাপ্রসাদজী জিজ্ঞাসা করিলেন, পাহাড়ের মঠে আপনি ফিরিয়া যাইবেন কিনা? আমি বলিলাম, না। ব্রহ্মগঞ্জ আশ্রমে আপনি থাকুন না? আমি বলিলাম, "আমার মত আকাশ বৃত্তিধারী সাধুদের জন্য কেল্লার গুহাই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ইহা কাহারও বাড়ি নয়, ইহা মিলিটারী বিভাগের স্থান। এখানে আমি আহার করি বা অনাহারে থাকি সে বিষয়ে কাহারও কোন অসুবিধা নাই।" মাতাপ্রসাদজী তখন নিষ্পৃহ যোগীদের দান করিলে কি লাভ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, যজ্ঞের ফল সুখ, তপস্যার ফল জ্ঞান এবং দানের ফল প্রাপ্তি। নিশ্চিন্ত যোগীকে দান করিলে অনন্তপ্রাপ্তি হয়। অন্নপূর্ণা মূর্তি দেখুন।

মহাযোগী শিবকে মা অন্নপূর্ণা অন্নদান করিতেছেন এবং তিনি অখণ্ড ভাণ্ডার লইয়া অবস্থান করিতেছেন। বাস্তবিক নিশ্চিন্ত ও নিস্পৃহ যোগীকে দানই ''অন্নপূর্ণা পূজা''। মাতাপ্রসাদজী বলিলেন, স্বামী পাগলানন্দজী মাসে একদিন মাত্র একজনের অন্নগ্রহণ করেন এ বিষয়ে আপনার কি নীতি? আমি আকাশ বৃত্তি মাত্র বুঝি। মা এক হাতে দিবেন কি দশ হাতে দিবেন সেটা মা জানেন। ''আপনার কখনও কোনদিন অনাহার গিয়াছে কিনা?'' আমি বলিলাম - না। তবে নুনভাত, নুনহীন ভাত এবং শুধু ডালসিদ্ধ কখনও কখনও মা জুটাইয়াছেন। হাঁড়ি ভরা অন্ন থাকিলে আমি ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীদিগকে লইয়া যাইতে বলি। তাহারা লইয়া যায়। একদিন হাঁড়িতে কিছুই ছিল না। আমি দশটায় উনুনে আগুন দিয়া দেখিলাম, কিছুই নাই। উনুনে জল ঢালিয়া দিয়া আসনে বসিয়াছি অল্পক্ষণ মধ্যে লুচি ও তরকারী সঙ্গে লইয়া এক ব্যক্তি উপস্থিত হন এবং আমাকে আহার করাইয়া চলিয়া যান। আপনি এ সব ঘটনাকে অলৌকিক কিছু মনে করেন কিনা; মাতাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমার সবই আকাশ বৃত্তি। এবার আপনি আর কি জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন। মাতাপ্রসাদ বলিলেন, আজ আর জানিবার নাই। তবে আমার মনে হয়, আকাশ বৃত্তিতে যোগীর জীবনযাত্রা চলিলেও, মহাযোগীর কোন কর্ম প্রারব্ধে থাকিলে সেটা চলিবে না, তখন আপনার আকাশ বৃত্তি থাকিবে না। আমি বলিলাম, যদি কর্মের প্রারব্ধ দেখা দেয়, তবে সেটাও আকাশ বৃত্তিতেই চলিতে পারিবে। আমার আকাশ বৃত্তিতে কোন ভুল নাই।

গুরুদেবের সঙ্গে শেষ দেখা। শরীর ছাড়িবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে গুরুদেব বেশ অসুস্থ হন। কিছুদিন এদেশ ওদেশ অবস্থান করিবার পর তিনি কাশীতে আসেন। আমি তখন চুনার ফোর্টের বিখ্যাত ভৈরব গুহায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমি স্থির করিলাম, গুরুদেবকে দর্শন করিব। কাশীতে কয়েক দিন অবস্থান করিবার মত ব্যবস্থাও আমি করিয়া লইলাম। কাশী যাইয়া দেখিলাম, গুরুদেব শেষ অবস্থার নিকটবর্তী হইয়াছেন। অন্যের সাহায্য লইয়া তিনি পাশ ফিরিতে পারেন, কিন্তু আর বসিতে পারেন না। আমি প্রণাম করিবার পরই বলিলেন, ''বড়ই মিষ্টি স্পর্শ, আমার পায়ে একটু হাত বুলাইয়া দাও।'' দুই-তিন মিনিট হাত বুলাইয়াই বলিলাম, ''বাবা! আপনার শরীরে ঘুষঘুষে জ্বর, আমি বেশীক্ষণ আপনাকে স্পর্শ করিলে আমার শরীরে এখনই জ্বর হইবে।'' তিনি আমার শরীরের এই দুর্বল প্রকৃতির বিষয়ে পূর্বেই জানিতেন। এবার তিনি অন্য কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, ''ওরা সকলে মিলিয়া আমাকে মিথ্যা কথা বলে। আমার ধারণা, আমার শরীর অতি দ্রুত ক্ষীণ হইতেছে, কিন্তু ওরা বলে, আমি দিন দিন সুস্থ ও পুষ্ট হইতেছি। তুমি কি বল?'' আমি বলিলাম, ''বাবা! আমরা সাধু সন্ন্যাসী মানুষ; শরীর সম্বন্ধে কে কি বলে, না বলে, সেই দিকে মন না দিয়া আমাদের প্রস্তুত থাকাই ভাল।'' ওরা কেন মিথ্যা বলে, আমার নিকট জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, ''অজ্ঞানীরা সকলকেই অজ্ঞানী মনে করে, মিথ্যা বলিবার ইহাই কারণ।'' তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, ''তুমি কি মনে কর আমার শরীর এবার টিকিবে?'' আমি বলিলাম, ''বাবা! চিরজীবন চিকিৎসা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি, শরীরের পতন বা রক্ষা পাওয়া

বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। নিশ্চিন্ত থাকাই শ্রেয়ঃ।'' শরীরের কথা ছাড়িয়া তিনি অন্য কথা তুলিলেন।

বলিলেন, ''দেখ, আমার কতগুলি জিনিসের প্রয়োজন। ওরা বলে, কিনিয়া দিবে, কিন্তু দেয় না। ওরা এত বেশী মিথ্যা কথা বলে যে আমার মন তাহাতে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করে।'' আমি বলিলাম, ''আপনার কি কি দ্রব্যাদির প্রয়োজন, আমাকে বলুন, আমি সব কিনিয়া আনিয়া দিব।'' আমি সব বস্তুর একটা তালিকা করিলাম। সামান্য সামান্য দ্রব্যাদির কথা তিনি বলিলেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম তিন চার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি তিনি চাহিতেছেন। তাহার মধ্যে একটা ফাউনটেন পেনের কালির কথাও রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, ''দেখ, প্রায় এক মাস ফাউনটেন পেনের কালি নাই। একটু লিখিব ভাবি, কিন্তু যখন মনে হয় কালি নাই, তখন আর কি লিখিব, বল?''

গুরুদেবের কথা শুনিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত সিক্ত হইল; কিন্তু মনের কথা চাপিয়া কেবলই ভাবিলাম, হায় রে শরীর, তুমি কি এত ছল যে আত্মার কর্মশক্তি মনের সক্রিয়তা তোমাতে একটুও প্রতিফলিত হইতেছে না! গুরুদেবের শরীর শেষ অবস্থায়; কিন্তু তাঁহার শরীর ও মনের অংশ একভাবেই সতেজ রহিয়াছে। আমি ইহা বিস্ময়ের সহিতই লক্ষ্য করিতেছি। যাঁহারা গুরুদেবকে ঘেরিয়া আছেন, তাঁহারা গুরুদেবের আত্মার সংবাদ জানেন না, মনের কথাও বুঝেন না। তাঁহারা শরীরের বাহিরাস্থিত আত্মজীবনের অন্য কিছুই জানেন না। গুরুদেব বলিলেন, ''ওরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে একই রকম মিথ্যা কথা বলে। আমার মনে হয়, আমি পাগল হইয়া যাইব।'' আমি কেবলই ভাবিতেছি, আমি যদি শেষ অবস্থায় এইরূপ অচল হই এবং এইরূপ মিথ্যাবাদী দ্বারা ঘেরিয়া যাই, তবে আমার যে কি দশা হইবে, উহা ভাবিতেই পারি না। আমার মনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমি স্তম্ভিত হইতেছি যে একজন বুদ্ধিমান অধ্যাত্মবাদী মহাপুরুষ কি ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এভাবে কাটাইতে পারেন। আমি ২, ৩ মাস দোকানে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম। কোন কোন দিন দুই এক আনার দ্রব্যাদি কাউকে দিয়া আনাইলে ২, ৪ জন বাদ সকলেই মিথ্যা কথা বলিত। দেড় আনার বস্তু আনিয়া দুই আনা বলিত, এক আনাটার দাম দেড় আনা বলিত। আমার মনে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল। আমি দেখিলাম, মিথ্যাবাদী এবং চোরের সংস্পর্শ ত্যাগ করিবার জন্য নিজেকেই দোকানে যাওয়া প্রয়োজন। এ জন্য ঐ ২, ৪ জন লোককে দিয়া দোকানের কাজ করাইতাম অথবা নিজে করিতাম। মিথ্যাবাদী ও ছুটকা চোরের সংস্পর্শ আমি কিন্তু ২, ১০ দিনও সহ্য করিতে পারি নাই।

গুরুদেব বলিলেন, দেখো, ডাক্তার প্রায়ই আসেন, পরীক্ষা করেন, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন; কিন্তু আমাকে ঔষধ আনিয়া দেয় না। রোজই বলে, ঔষধ আনিয়া দিব, কিন্তু কেহই ঔষধ আনিয়া দেয় না। আমি বলিলাম, ''আজই আমি ব্যবস্থাপত্র ও শিশি লইয়া বাহির হইব, এবং ঔষধ আনিয়া দিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'' এবার তিনি এক জোড়া তাকিয়ার কথা বলিলেন। শিমূল তুলায় তাকিয়া দুইটি প্রস্তুত হইয়াছে। তাকিয়াগুলির তুলাগুলি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া খোলে ভরা হয় নাই। হাতে ধরিলেই বীজগুলি হাতে ঠেকে। আমি বলিলাম, ''আমি এখনই তাকিয়া দুইটা খুলিয়া তুলা বাহির করিব এবং

বেশ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া খোলে ভরিয়া দিব। কিন্তু আপনি তো জানেনেই শিমূল তুলার বীজ নিঃশেষে ঝাড়া যায় না। কিছুটা থাকিবেই।'' আমি তাঁহার আদেশ মত তাকিয়া দুইটি আনিলাম, তিনি টিপিয়া দেখিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ ছাদে উঠিয়া তুলাগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া আবার পূর্ণ করিয়া গুরুদেবের সম্মুখে আনিলাম। তিনি ভাল করিয়া টিপিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, দেখ তো, এখন আর বীজ হাতে লাগে না। আমি বলিলাম, দুই চারটা বীজ থাকিবেই, তবে সেগুলি আর হাতে পাওয়া যাইবে না, গায়েও ফুটিবে না।

গুরুদেব এবার আহারের কথা তুলিলেন। বলিলেন, ''আমার কোন বস্তুই ভাল লাগে না, স্বাদও পাই না, সব তিতো মনে হয়। আমার কেবলই মনে হয় তোমার মতন একত্র এক আঁচে ডাল-ভাত একত্র দুই বাটিতে রান্না হয়, এবং আমি আহার করি। তোমার বাসনগুলি সঙ্গে আছে তো?'' আমি বলিলাম, ''হ্যাঁ আমার বাসন সঙ্গে আছে। উহা কাঠ কয়লার উনুনে বসাইয়া দিব। ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই আঁচটা নিবিয়া যাইবে, রান্নাও হইয়া যাইবে। বসাইবার সঙ্গে একটু ছোঁক দিয়া বসাইলে আর ছোঁক দিবারও প্রয়োজন হইবে না। আজ তো আহার হইয়াই গিয়াছে। কাল সকালে দশটায় আপনি আমার বাসনে আহার করিবেন।''

এর মধ্যে অতি বৃদ্ধা আমার গুরুভগ্নী নিস্তারিনী-মা আসিলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন, ''বাঃ! আজ বাবা সত্যানন্দের সঙ্গে হাসিয়া খুশিয়া কথা বলিতেছেন। আজ কয়েকমাসের মধ্যেও বাবার মুখে হাসি ও সহজ সরল ভাব দেখি নাই।'' বুলা-মা গুরুদেবের সেবায় চব্বিশ ঘণ্টাই আছেন। তিনি বলিলেন, ''দুই জনকে হাসিয়া খুশিয়া কথা বলিতে দেখিয়া আমি নিকটেই আসি নাই। বাবার মুখে হাসি দেখিয়া আজ যে সকলে কত আনন্দে আছে, উহার তুলনা নাই। সকলেই দূরে দূরে ও আড়ালে থাকিয়া দুই জনের কথা শুনিতেছেন।''

আমি বাজার হইতে গুরুদেবের আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিলাম। বলিলাম, এবার ডাক্তারখানায় যাইব। গুরুদেব বলিলেন, ডাক্তার আসিবেন, তখন নূতন ব্যবস্থা মত ঔষধ আনিয়া দিও।

আমি পরদিন সকালবেলা আমার রান্নার বাটি দুইটা ও কাঠ কয়লার ছোট উনুনটি আনিয়া ডাল-ভাত, ডালে পটল, আলু সিদ্ধ রান্না বসাইয়া দিলাম। নিস্তারিনী-মা সব ঢালিয়া বাড়িয়া সাজাইয়া দিলেন। আমি একটু বেশী করিয়াই চাউল ছাড়িলাম। গুরুদেব, আশ্চর্য, সব তরকারী এবং ভাতই আহার করিলেন। বলিলেন, খুব ভাল খাইলাম, একটুও তিতো ছিল না। আমি এখন হইতে এই ভাবেই আহার করিব। আমাকে বাটি ও উনুন ও কাঠ কয়লা আনিয়া দাও। আমি বাজার হইতে সব কিনিয়া আনিলাম। সেই দিন বৈকালে গুরুদেব পরিষ্কার ও সরল পায়খানা করিলেন। তিনি খুবই আরাম বোধ করিতেছেন এবং প্রসন্ন আছেন।

আমার শরীর খুব অপটু হইয়াছে। কাশীতে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। দুই চার দিন কাশীতে অবস্থান করিবার পর আমি চুনার যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল, আরও কিছুদিন নিকটে থাকি। কিন্তু এ ভাবে থাকা আমার শরীর ও মনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তের বৎসর বয়সে যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার খোঁজে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। ষোল বৎসর বয়সে যাঁহাকে চুনারের ব্রহ্মগঞ্জ ঘাটে শ্মশানের ধারে এবং গঙ্গাতটে দর্শন করিয়া অভিভূত হইয়াছিলাম, আজ আমি সেই প্রিয়তম মহামানবকে শেষ বারের মত দর্শন করিয়া চুনারের ভৈরব গুহায় ফিরিয়া যাইতেছি। আমার বিদায় আমাকে যতটুকু আঘাত দিয়াছিল, গুরুদেবকে উহা হইতে শতগুণ অধিক আঘাত দিয়াছিল। কিন্তু কোনই উপায় ছিল না, আমার শরীর ভয়ঙ্কর অপটু। গুরুদেব ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে শরীর ছাড়িলেন। কদিন পূর্বেও আমি নিকট ছিলাম।

দেহত্যাগের সংবাদ হিন্দী 'আজ' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। আমি ভৈরব গুহার সামনে পাথরে বসিয়া আছি, এক মহিলা আসিয়া ঐ সংবাদ আমাকে দিলেন। এমন একটা ঘটনা ঘটিতে পারে, উহা কিছুতেই মন মানিতেছিল না। দুই এক দিন এ ভাবেই কাটিল। তাহার পর মন মানিল গুরুদেবের শরীরটা আর নাই। তাঁহার ইচ্ছাটা, কাশী বড় গণেশের মঠে তাঁহাকে সমাহিত করা হইবে এবং সেখানে মন্দির করা হইবে। তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহাকে অতি সত্বর গঙ্গায় সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। আমার মন ক্রমে বিশ্বাস করিল, স্নেহময় মহাপুরুষ আর নাই, এ বিশ্বে আর স্নেহস্পর্শ দিবার মত আমার কেহ রহিল না। আমার মনে ভয়ঙ্কর আঘাত দেখা দিল এবং তিন মাস পর্যন্ত শরীর এই ভাবে বেশ শীর্ণ হইল; গুরুদেবের সঙ্গে আমার প্রারব্ধ ভোগ এখানেই শেষ হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমি অন্য অধ্যায়ে বলিব। গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদ মঠে এখনও গুরুদেবের জন্মোৎসব হয়। সেখানে এক আঁচে ডাল ও ভাত তরকারী ছাড়িয়া, সিদ্ধ করিয়া, গুরুদেবকে ভোগ দেওয়া হয় এবং মহাপুরুষের তৃপ্তির জন্য বৈকালবেলা যজ্ঞ করা হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রারব্ধ

ক্রিয়মান ও সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ এইরূপ তিন প্রকারের কর্মবেগে আমাদের মন এবং কর্মজীবন পরিচালিত হইয়া থাকে। এই তিন প্রকারের কর্মবেগ এত গভীর ভাবে একে অন্যের সঙ্গে জড়িত থাকে যে ইহাদের একটি হইতে অন্যটির সম্বন্ধভেদ বুঝানো অত্যন্ত কঠিন।

পথে চলিতে চলিতে কোন বস্তু বা লোককে দেখিয়া সেই বস্তু প্রাপ্তির জন্য মনে আকর্ষণ হইল, আবার কিছুক্ষণ বাদই উহার প্রভাব চলিয়া গেল। প্রতিনিয়ত এইরূপ কর্মবেগের উত্থান ও পতন বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে হইতে থাকে। ইহাই ক্রিয়মান কর্মের প্রভাব। ক্রিয়মান কর্মবেগ খুব গভীর কর্মবেগ নহে।

সঞ্চিত কর্মের প্রভাব অন্তরজগতে প্রথম দেখা দেয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জীবের মনের মধ্যে মিলন এবং ভালবাসার বেগ জাগ্রত হইতে দেখা যায়। মোটামুটি ইহাই সঞ্চিত কর্মের মূল স্থান। সঞ্চিত কর্মবেগ মানুষকে বেশ ভালভাবে সংসারে বাঁধিয়া ফেলে। সঞ্চিত কর্মফলের পরিণতিতে শেষকালে মানুষ কোন না কোনও স্থানে বিবাহ সংস্কারে বদ্ধ হইতে পারে। সাধনা তপস্যা এবং অভ্যাস দ্বারা সঞ্চিত কর্মবেগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ক্রিয়মান কর্মবেগ হইতে ইহার প্রভাব গভীর।

কোনও জন্মের মৃত্যুকালে যে সব কর্মবেগ মনে জাগ্রত হয়, সেইসব কর্মবেগ দ্বারা পরজন্মের অনেক অংশ নিয়মিত হয়। সেইসব কর্মবেগের নাম প্রারব্ধ। প্রারব্ধ কর্মবেগ কখনও আপনি আপনি মিটিয়া যায় না। প্রারব্ধ কর্মবেগকে সাধনা বা তপস্যা দ্বারাও অতিক্রম করা যায় না। প্রথমেই বলিয়াছি, ক্রিয়মান, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ এত গভীর ভাবে একে অন্যের সঙ্গে জড়িত থাকে যে একটির সঙ্গে অন্যটির ভেদ করা কঠিন। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় খণ্ডে তন্মাত্রবোধের কথা বলা হইয়াছে। তন্মাত্রবোধের স্তর অতিক্রম করিলে ক্রিয়মান কর্মবেগ এবং সঞ্চিত কর্মবেগ সাধকের মনে কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম নহে। "প্রারব্ধ" নিশ্চয়ই সিদ্ধ মহাত্মাকেও প্রভাব দান করিতে সক্ষম। সঞ্চিত কর্মভাণ্ডারে বহু প্রকার সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির ফল জমা থাকে। বার বার দুষ্কার্যদ্বারা দুষ্কৃতির ফল ফলোন্মুখ হইতে পারে। সৎকর্মে, সৎসঙ্গ এবং তপস্যার প্রভাবে সঞ্চিত সুকৃতি কর্মের ফল ফলোন্মুখ হয়। সিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট সুকৃতি কর্মফলগুলি সহজেই ফলোন্মুখ হয়। এজন্যই যদি ভয়ঙ্কর কোন প্রারব্ধ ইঁহাদের জীবনে না থাকে, তবে বেশ ভালভাবেই ইঁহাদের জীবন কাটিয়া যায়।

প্রারব্ধ মানে পূর্বে যাহা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে যে যে অংশ সেই সেই জন্মে শেষ হয় নাই, সেই সব কর্মের প্রভাব। অনেক জন্মের টুকরা টুকরা প্রারব্ধ কর্ম প্রভাব, যোগী ও জ্ঞানীর এক জন্মেই আসিতে পারে। গুরুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কেবল যে

এই জন্মেরই ইহা মানা যায় না। আমার মনে হয়, এই সম্বন্ধ অত্যধিক কঠোর প্রারব্ধ কর্মের যুক্ত। তিনি আমার উপর অত্যধিক স্নেহশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনেক ব্যবহার যুক্তিহীন কঠোর ছিল। গুরুর নিকট মাথা নত রাখাই আমার জীবনের নীতি, কাজেই সেই সব আলোচনার বাইরের বস্তু।

তাঁহার দেহত্যাগের পর, তাঁহাকে আমি বহুবার স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখা যায়, তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট। ওই সব স্বপ্নের পর বহুদিন পর্যন্ত আমার মনে ওই সব স্বপ্নের প্রভাব থাকিত। তাঁহার এইরূপ মনোবৃত্তির কি প্রতিকার করা যায়, সে সম্বন্ধে আমি চিন্তিত হইলাম। শেষ পর্যন্ত স্থির করিলাম, আবার স্বপ্নে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে ইহার কারণ জানিবার জন্য বেশ ভালভাবেই প্রশ্ন করা হইবে। ইহা সত্য ঘটনা যে আমি পাহাড়ের আশ্রমের সংস্পর্শ ছাড়িয়া দিয়াছি। সে সঙ্গে ইহা অতীব সত্য কথা যে আমি আশ্রমের চিরদিনই শুভ চিন্তক। তিনি আশ্রমটাকে একটা বিচিত্র রকমের দলিলে স্বাক্ষর দান করিয়া উহার ভবিষ্যৎ নিজেই নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আশ্রমটা আমি দেখিব, ইহা তিনি কখনও চাহিতেন না। তাঁহার আশা ছিল, মুরারীবাবুকে তিনি আশ্রমের ভার দিবেন। গুরুদেব আশ্রমকে উইলের দলিলে স্বাক্ষর করিয়া আশ্রমটা শ্যামবাবুর হাতে দিয়া যান এবং সেই দলিলে তিনি ইহা স্পষ্ট বলিয়া যান, শিষ্যরা ইহাতে কোন সংস্পর্শেই থাকিবে না। আমার সম্বন্ধে এ সব অসন্তুষ্টিপূর্ণ স্বপ্নের মানে কি? আশ্রমটা তো গড়িয়াছিল সত্যানন্দ, শ্যামলালকে ইহা দিবার মানে কি? সত্যানন্দ তো আশ্রম ছাড়িয়া দিয়া কঠোর তপস্যায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। একজন কঠোর তপস্বী আশ্রম দেখিবে, ইহাই অধিক বাঞ্ছনীয় নয় কি? সত্যানন্দ কি তাঁহার নিকট আশ্রম করিবার জন্য আসিয়াছিল? না কি তপস্যার উচ্চ লক্ষ্যে আসিয়াছিল? আশ্রম করা এবং গুরুসেবা একই বস্তু, এই নীতিতেই সত্যানন্দ আশ্রম আঁকড়াইয়াছিল, ইহা তিনি ভাল ভাবেই জানিতেন। আশ্রমটা ছিল পৌরোহিত্যবাদীয় প্রতিষ্ঠান, ইহা গুরুদেব ভাল ভাবেই জানিতেন যে সত্যানন্দ পৌরোহিত্যবাদকে কোন উচ্চ স্তরের সমাজবাদ বলিয়া স্বীকার করে না। গুরুদেব জানিতেন, পাহাড়ের আনন্দাশ্রম কখনও সত্যানন্দের কর্মক্ষেত্র হইতে পারিবে না। আমি মনে মনে এই ভাবে নানা যুক্তিতে শক্ত ও দৃঢ় হইলাম। আমি জানি, গুরুদেবকে আবার স্বপ্নে দেখিব। সব কথা মনে মনে গুছাইয়া লইলাম। কারণ আমি জানিতাম, তিনি আবার স্বপ্নে দর্শন দিবেনই।

আমি যে অবস্থার চাপে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই সব কথাই আমি গুরুদেবকে পত্রে জানাইয়াছিলাম। উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যেমন ভাল বুঝ তেমন কর।" আমি নিশ্চয়ই খামখেয়ালী কাজ করি নাই। তাঁহার হয়তো ধারণা ছিল, আকাশ বৃত্তির অবলম্বনে শরীরযাত্রা চালানো সত্যানন্দের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কাজেই সত্যানন্দ আবার আশ্রমের কর্ম-নীতিতে প্রবেশ করিবে। আশ্রমটা তিনি মুরারীবাবুকে দিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, মুরারীবাবু ঘোর সংসারী। তিনি শ্যামবাবুকে আশ্রমটা দান করিয়া শিষ্যদের জন্য "ট্রেস পাশ" আইনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। এ সব হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেব কেন অসন্তুষ্ট থাকেন? তিনি কি ভাবিয়াছেন যে সত্যানন্দ এখনও চোদ্দ বৎসরের বালকই রহিয়া গিয়াছে? চোদ্দ বৎসরের বালক কি অন্যের বাড়ি ঘরে প্রবেশে

যে "ট্রেস পাশ" হয় ইহা কি জানে না? একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সব ভাল, নিখুঁত চরিত্র, নিখুঁত ব্যবহার, অসীম কর্মশক্তি, নিখুঁত বুদ্ধি, নিখুঁত প্রতিভা, কিন্তু তোমার দোষ তুমি নির্বিচারে গুরুর কথা মানো না।" আমি বলিলাম, দুই চারটি ঘটনা ভিন্ন সমস্ত জীবনে এমন কোনই দৃষ্টান্ত নাই, যাহাতে আমাকে ওই কথা বলিতে পারেন। আপনি জানেন, অনেক কর্মের সঙ্গে সমাজের দৃষ্টিকোণও বিচার করিতে হয়, নয় তো মঠের অপ্রতিষ্ঠা হইবে। ওই সব ক্ষেত্রে আমি দুই একদিন নীরব থাকি, এবং দেখা গিয়াছে, আপনি বুঝিয়া নিজেই নির্দেশ সংশোধন করিয়াছেন। এতেও যদি আপনি মনে করেন যে আমি নির্বিচারে গুরুর আদেশ মানি না, তবে আপনি ওইটুকু দোষকে এখনকার মতন থাকিতে দিন। দুই একদিনের নীরবতায় আপনার ক্ষতি কি?

আমি গুরুদেবকে আবার স্বপ্নে দেখিলাম। সেই রাহুগ্রস্ত মলিন বদন এবং সেই অসন্তুষ্টির মনোবৃত্তি। আমি নিকটে যাইয়াই প্রণাম করিলাম এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, আপনি অসন্তুষ্ট থাকেন, ইহার মানে? আমায় ইহার সদুত্তর দিতেই হইবে। ইহা বলিয়া আমি তাঁহাকে উরু, হাঁটু ও পা পর্যন্ত জড়াইয়া ধরিলাম। এবং বলিলাম, যদি আপনি সদুত্তর না দেন তবে আমি ভয়ঙ্কর ভাবে কান্নাকটি করিব। এই ভাবেই আমার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। এখানে স্বপ্নেও দেখা যায়, আমি বিনয়ের মাত্রা অক্ষতই রাখিয়াছি।

দেহ ত্যাগের দুই বৎসর পূর্বে একদিন আমাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র কর্মক্ষেত্রে নামিও না। তোমার যেরূপ চিন্তাধারা, বহু শত্রু হইবে।" আমি বলিলাম, আপনি যদি বলেন, আমি এ জন্মে কিছু না করিয়া এবং না বলিয়া মৌনীভাবেই জীবন কাটাইয়া দিব। তিনি বলিলেন, তোমাকে করিতেই হইবে, কারণ তুমি ছাড়া আর কেহই নাই। তোমাকে সাবধানে কর্মে নামিবার কথাই বলিতেছি, কর্ম ছাড়িবার কথা বলি নাই। আমার চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমি কিছু না বলিলেও তাঁহার নিশ্চয়ই স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল। নয় তো এ সব কথা আসে কোথা হইতে? আমার মনে হয়, অতুলবাবুর নিকট তিনি সব শুনিয়াছেন। আমার চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি কি ভাবে সামঞ্জস্য করিতে পারেন। এজন্য তাঁহার মনে বরাবরই একটা চিন্তাপ্রবাহ ছিল। আমি শক্তিবাদকে খর্ব করিয়া এবং পৌরোহিত্যবাদকে সমর্থন করিয়া কর্মের ভিত্তি দিব না। এ বিষয়ে আমি বরাবরই দৃঢ় ছিলাম। যদি তাঁহার পৌরোহিত্যবাদ প্রীতি শক্তিবাদ ধর্মের ক্ষতি করে ইহা ভাবিয়াই আমি তাঁহাকে হাতে লেখা বই দেখাই নাই। আমি সাধ করিয়া আবার একটা প্রারব্ধে জড়িত হইতে পারি না। তিনি যদি আমার বইয়ের উপর কলম ধরেন, তখন কি হইবে?

আমি আবার গুরুদেবকে স্বপ্নে দেখিলাম। "একটা বাসের মত গাড়ি, পাহাড়ের আনন্দাশ্রমের পূর্ব উত্তর কোণে রহিয়াছে। তিনি তাহাতে চলিয়াছেন, আমাকে তাড়াতাড়ি চলিতে বলিলেন। আমি চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা জোর চলিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, চল, আমরা চলিয়া যাই, এখানে আর থাকিব না, শ্যামলাল অত্যন্ত ছোট কার্য করিয়াছে। গুরুদেবের উজ্জ্বল মূর্তি, পুষ্ট দেহ, অন্যায় বিরুদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ মনোভাব।"

ইতিমধ্যে আমি কলিকাতার সন্নিকটে গোড়িয়া নামক স্থানে স্থান ক্রয় করিয়া মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আনন্দমঠের সাধনার ধারা এবং শক্তিবাদীয় কর্মধারা মিশ্রিত করিয়া ইহার পরিচালনা করিবার কথাই আমি চিন্তা করিতেছি।

আমি গুরুদেবকে আবার স্বপ্নে দেখিলাম। একটা বাড়ির মধ্যে তিনি রহিয়াছেন। আমি সেই বাড়িরই একদিকে বসিয়া আহার করিতেছি। আমার খাবার অর্ধেকটা খাদ্য এখনও খাওয়া শেষ হয় নাই। হঠাৎ তিনি আসিয়া আমাকে কিছু না বলিয়াই আমার সঙ্গে আহার আরম্ভ করিলেন। আহার শেষে আমি বলিলাম, "আপনার এরূপ করিবার কি প্রয়োজন ছিল?" ইহার পর আমি গুরুদেবকে আর স্বপ্ন দেখি নাই। তাঁহার নিজ হস্তে গড়া ও তাঁহার প্রিয় সন্তান সত্যানন্দের শক্তিবাদ এবং আনন্দমঠের সাধনার ধারা মিলিয়া এক বেগবান বন্যা প্রস্তুত হইয়া ভারত ও বিশ্বকল্যাণের পথ করুক আজ বিনয়ের সহিত ইহাই প্রার্থনা করি। গুরুর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সেটা কত জন্মের সেটা আমার জানা নাই। সেই সম্বন্ধ কেন যে এত গভীর স্নেহময়, সেটাও আমার জানা নাই। সেই সম্বন্ধের মধ্যে এতটা কঠোরতা ও সামান্য একটু মতভেদ যে কেন ছিল, সেটাও আমি জানি না। মানুষের শরীর ত্যাগের পরও মতভেদ থাকিয়া যায় এবং মতৈক্যও হয়। ইহাও আমার জীবনে এক বিস্ময়কর ঘটনা। যদি এই ঘটনার মীমাংসা না হইত, তবে গুরুকে এবং আমাকে আবার এক জন্ম চক্কর লইতে হইত।

ধীরে ধীরে আমার জীবন তখন প্রায় আটত্রিশ বৎসর বয়সের নিকটবর্তী হইল। আমি অন্যান্য জন্মের লেন দেন জনিত আরও ঘটনার সংস্পর্শে আসিলাম। সেই জন্মের সাধক সমাজের ধারণা, ভৈরবী না হইলে কোন সাধকই সিদ্ধ হইতে পারিবেন না। আমি ভৈরবী গ্রহণের বিপক্ষে ছিলাম। কিন্তু সাধকমণ্ডলী ইহা সমর্থন করিলেন না। তাঁহারা আঠার উনিশ বৎসর বয়সের এক সাধকের জন্য কোথাও হইতে এক আট নয় বৎসর বয়সের কন্যা সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার চক্ষু বাঁধিয়া কতগুলি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সাধকের হাত ধরাইয়া দিয়া বলিলেন, ইনি তোমার স্বামী। মেয়েটি বলিল, "আমার চক্ষু খুলিয়া দাও, স্বামিকে দেখিব।" তাঁহারা বলিলেন, তুমি স্বামী দেখিতে পাইবে না। ইহা শুনিয়া মেয়েটি স্বামিকে জড়াইয়া ধরিলেন। ওই স্পর্শের মধ্য দিয়া তিনি স্বামির একটা স্পর্শ ও রূপ বুঝিতে পারিলেন। স্বামী তাহাকে কোনরকমে ছাড়াইয়া পালাইয়া চলিয়া গেলেন। এ ঘটনার কেন্দ্র হইতেছে কাশীস্থিত তীল ভাণ্ডেশ্বর শিবের বাড়ীতে। এইরূপ আরও একটি ঘটনা অন্যজন্মের আছে। উহার ক্ষেত্র ছিল, বিন্ধ্যাচলের মন্দির প্রাঙ্গণে। সে ঘটনায়ও একটি কচি বালিকাকে* সাধকের সঙ্গে গাঁঠবন্ধন করিয়া ভৈরব নীতিতে বিবাহ দেওয়া হয়। সাধক সেই কন্যাকে গাঁঠবন্ধন খুলিয়া পালাইয়া যান। তাঁহারও চক্ষু বাঁধা ছিল। মানুষের জীবনে ভালবাসাই সব নয়, ভালবাসার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার কথাও স্বামী বা স্ত্রীর মনে জাগ্রত হয়। ভালবাসার পরিণতি মিলন, নিষ্ঠুরতার পরিণতি প্রতিশোধ। প্রারব্ধ চক্করে এই দুইপ্রকার ঘটনারই পরিণতি আমাকে সামনা করিতে হইয়াছিল। সাধু হে! ভাবিয়াছ, বউ ছাড়িয়া পালাইয়া বনে চলিয়া গেলেই তুমি বাঁচিয়া গেলে? বউ যদি সতীত্ব ধরিয়া থাকে এবং পথ ছাড়িয়া না দেয়, তবে কিন্তু বাঁচিতে পারিবে না। আমি

---

* প্রকাশকের নিবেদন - এস্থলে "এবং" শব্দটি বর্জিত হল।

ঘটনাচক্রে ভয়ঙ্কর মনোযুদ্ধের পর বেশ ভাল ভাবেই বুঝিলাম, ‘‘টিকটিকী কয়, পারবি না রে পারবি না।’’ কাজেই আমি আবার শক্তি আহরণে প্রস্তুত হইলাম। আমাকে ভালবাসা, সংযম, ব্রহ্মচর্য এবং সহিষ্ণুতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল। আমি বুঝিলাম, আমার তপস্যার জটিল অংশগুলি এখনও শেষ হয় নাই। যাহাকে ভৈরবী বলিয়া হাতে ধরিয়াছিলাম, সে বেচারী কোথায় যাইবে? যাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে যদি সতীত্বকে ধরিয়া থাকে তবে সাধ্য কি যে তাহাকে পথ না ধরাইয়া স্বামি চলিতে পারেন? তাঁহাদের অসীম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য যে তাঁহারা স্বামীর তপঃশক্তি নষ্ট করেন নাই। এই ভৈরবী গ্রহণ ঘটনার মধ্যে যে শক্তিবাদের বীজ রহিয়াছে, ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই। ‘‘ভারতে শক্তিবাদ ধর্মের প্রবর্তন হইবে।’’ এই নীতিতে সাধু সন্ন্যাসীরা বহু যুগ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহারা একজন ত্যাগী তপস্বীকে কুমারী ভৈরবীর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন, যাহাতে এই তপস্বী এক জন্মে এ সব সতীত্বের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে আসিতে বাধ্য হয়। মহাযোগী শিবকে পার্বতীর প্রভাবে বিবাহ এবং কর্মজীবন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শিবের উপর পার্বতীর প্রভাব যদি না থাকিত তবে শিব শিবই থাকিয়া যাইতেন, তাঁহাকে কেহই জানিত না; অসুরবাদও ধ্বংস হইত না। শিবকে সংসার কর্মচক্রে নামাইয়া অসুর ধ্বংসের একটা পরিকল্পনা বহুযুগ ধরিয়া দেবতা ও ঋষিদের মনে প্রবাহিত ছিল। গুরুর আশীর্বাদ এবং মহাশক্তিরই অনেক করুণা যে ‘‘সত্যানন্দ’’ হারে নাই। অনেক সময়ই মনটা অণিমা লঘিমা আদি বিভূতির কথা ভাবিত। কিন্তু অন্যান্য জন্মের শেষ কৃত্যগুলি এমন ভাবে একটির পর অন্যটি সামনে আসিতেছিল যে আমি সেইদিকে আর মন দিতেই পারিলাম না। শিবস্তর লইয়া থাকা আমার আর চলিল না, আমাকে শক্তিস্তরের ভিত্তি ধরিতেই হইল। আমি যতই সাবধানে থাকি না কেন, আমার জীবনে শিববাদ আর চলিবে না - আড়ালে দাঁড়াইয়া গুরু হাসিলেন - মা জানিলেন এবং আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া ধ্বনিত হইল ‘‘শক্তিস্তর, শক্তিস্তর’’।

আবার কোন জন্মের ঘটনা। যোগীর বাল্যকালের বিবাহিত স্ত্রীকে ছাড়িয়া তপস্যায় চলিলেন। স্ত্রী কিন্তু মন হইতে ছাড়িল না। স্বামীর যোগ তপস্যার কিছুই হয় না, স্ত্রী টানে। স্ত্রীর টানে, স্বামীর যোগ তপস্যার সাধ ভালভাবেই রুদ্ধ হইবার পথ হইল। স্বামীর সংসারাসক্তি এবং এক জন্মের ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া মৃত্যুকাল আসিলে, পরজন্মে সেই ভালবাসা রূপ বায়ুর চাপ হৃদয়ে থাকিয়া যায়। যোগীর অন্য জন্মে ঠিক সেই বয়সের সময় সেই ঘটনা, সংযোগ এবং সেই চাপ আবার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। মিলন ভিন্ন এই বায়ু সাম্য করা যায় না। এই বায়ু স্ত্রী বা স্বামী হৃদয়ের একস্থানে কম্পিত হইলে অন্য স্থানেও কম্পিত হয়। যোগীর পক্ষে ইহা ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর ও যাতনাদায়ক অশান্তি। স্ত্রী যদি সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলেন, তবে সে যত জন্ম ইচ্ছা, স্বামীর তপস্যার বিঘ্ন করিয়া চলিতে পারেন। কিন্তু এ ভাবে ভালবাসার বায়ুকে সাম্য না করিয়া স্ত্রীরও লাভ নাই। তাহাকেও ভয়ঙ্কর যাতনাময় জীবনযাপন করিতে হয়। যোগী স্বামীরাই চেষ্টা করিয়া এর একটা হেস্তনেস্ত করেন। এই হেস্তনেস্ত কার্য শেষ হইলেই স্ত্রী বাঘিনী হন এবং যোগীর সম্মান নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। যোগী স্বামী ইহাতে বিচলিত হন না।

কারণ তিনি মুক্তির পথ করিয়া লইয়াছেন। যোগী বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পরম লাভ। স্ত্রী যোগী স্বামীর সঙ্গে ছলনার খেলা খেলিয়া কি যে হারাইলেন, সেটা তিনি অনেক জন্ম ধরিয়াই বুঝিতে থাকিবেন। অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রী উচ্ছৃঙ্খল জীবন গ্রহণ করেন, এবং স্বামী মুক্তিলাভ করেন। এখানেও যোগী স্বামীর অনেক কথা বুঝিবার আছে, যদি স্ত্রী শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং গুরুকে তিনি স্বামীরূপে সাধনার জগতে ধরিয়া রাখেন, এইরূপ ক্ষেত্রে, গুরুকে সম্ভব মত স্নেহশীল থাকিতেই হইবে। শিষ্যার ভুলের জন্য গুরু কাহারও সাধনার ক্ষতি করিতে পারেন না।

প্রারব্ধবশে, আমি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের সম্মুখীন হইয়াছি। শুনিয়াছিলাম, ‘‘নারী নাকি, নরকের দ্বার।’’ ‘‘নরকের দ্বার কি সাক্ষাৎ নরক’’ ইহার বিচার করিয়া লাভ নাই। কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে এক জন্মের ভাবধারার প্রতিক্রিয়া এবং এক জন্মের প্রতিশোধ স্পৃহা। আমার জীবনে এমন বহু ঘটনা আছে, যাহাতে একাধিক জন্মের প্রারব্ধ জড়িত অনেক ভয়াবহ ঘটনা রহিয়াছে।

যেখানেই অন্য জন্মের কর্মযোগ বিদ্যমান সেখানেই স্ত্রীর কর্তব্য যোগী স্বামীর সঙ্গে মীমাংসা করিয়া শুদ্ধ মনে যোগসাধনার পথ অবলম্বন করা; অথবা একটা মীমাংসা করিয়া সংসারে চলিয়া যাওয়া। কিন্তু এ সব ঘটনায় আলাপ আলোচনা বা মীমাংসা করিয়া কোন কিনারা করা যায় না, যেমন কর্মনীতি প্রারব্ধ কারণে সাজানো থাকে, সেই সব ঘটনাই পর পর আসিতে থাকে। মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, মিত্র, শত্রু, দাস, দাসী, গুরু, শিষ্য, ভৈরবী, বহু সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া যোগীর জন্মান্তর ঘটনা দেখা দেয় এবং সুখ দুঃখ মান অপমানও দেখা দেয়। এক জন্মের আত্মীয়তাবোধ অন্য জন্মে অত্যন্ত গভীর হয় এবং শত্রুদেরও শত্রুতাবৃদ্ধি এতই প্রবল হয় যে ইহার তুলনা হয় না। যোগী মহাপুরুষদের সমাজ গঠন ও ধর্মরক্ষা বিষয়ক কার্যে জন্মান্তরীয় সম্বন্ধযুক্ত নরনারীরাই প্রধান সহায়ক হইয়া থাকেন। এক জন্মের ঘটনা : এক বালিকা মনে মনে স্থির করিল ওই যোগীই তাহার স্বামী। যোগীকে নিকটে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যোগীর সঙ্গে পিতা এবং গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সেই সময় সেই যোগীর সঙ্গে তাঁহার একজন গৃহীশিষ্যও ছিলেন। মনোবিজ্ঞানে সিদ্ধযোগী বালিকাকে কোন বাধাই দিলেন না। কন্যা অত্যন্ত পবিত্র এবং সংযত জীবন গ্রহণ করিলেন, যোগীও সংযমের মধ্যেই যোগিনীকে সাধনার লক্ষ্যে লইয়া চলিলেন। কন্যা কিছুতেই পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে বা অবস্থান করিতে রাজী ছিলেন না। যোগীর ধারণা, যখন সংযম জীবনের ভিত্তি, তখন পিতার নিকট থাকা বা যোগী স্বামীর নিকট থাকা দুই-ই এক। পিতা এই ঘটনাকে ভয়ঙ্কর শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তিন জনকেই ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ দিবার দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিতেন। কন্যা পিতাকে চিনিত এবং তাঁহার নীতিহীন মনোভাবও জানিত। এক কুমারী কন্যাকে যখন তুমি স্ত্রীর অধিকার মানিয়া লইয়া আশ্রয় দিয়াছ, তখন কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পিতার নিকট দিবার তোমার কি অধিকার আছে? এই ঘটনার পরিণতিতে এ জন্মে ওই শিষ্য, আমি এবং আমার বুদ্ধির দোষেই ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের সম্মুখীন হই। ইহা সত্য ঘটনা যে আমাদের সম্বন্ধ অটুটই রহিয়াছে। কিন্তু ভুলের প্রতিফল হইতে কেহই মুক্তি পাই নাই। এক জন্মের প্রতিশোধ স্পৃহা একজন পিতাকে

কত অমানুষ করিতে পারে, এই ঘটনার পরিণতিতে উহা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পৃথিবীতে কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন যে, কোন স্বাভাবিক মস্তিষ্কসম্পন্ন পিতা, সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা লইয়া নিজের নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক বয়স্থা কন্যাকে ব্যবহারিক সমাজ দৃষ্টিতে কোন অছুঁত ও হীন বংশজ ব্যক্তির সঙ্গে ভয়ঙ্কর চরিত্রহীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাজ দরবারে দাঁড়াইতে পারেন? অন্য জন্মের ভালবাসা যেমন গভীর, অন্য জন্মের প্রতিশোধ স্পৃহাও তেমনই সাংঘাতিক হইয়া থাকে। পিতা নির্দোষ কন্যাকে একটা ভয়ঙ্কর মিথ্যা ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া এক জন্মের প্রতিশোধ স্পৃহা তৃপ্ত করেন। এই মিথ্যা কথায় যাঁহারা বর্বর পিতার সহায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। প্রকৃতি ভালভাবেই প্রতিশোধ দিয়াছেন।

আরও এক জন্মের কথা : এক ভদ্রলোকের দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী নীচ বংশের, শেষের স্ত্রী উচ্চ বংশের। দ্বিতীয় স্ত্রী গৃহে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমা স্ত্রী গৃহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী (বালিকা) যখন জানিলেন তাঁহার সতীনের গৃহে বিবাহ হইয়াছে, তিনিও সংসার করিলেন না; কিন্তু পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন, "যেহেতু প্রথমা স্ত্রী সংসার করিবেন না এজন্য কর্তা আর সংসারই করিবেন না, আমিও আর সেখানে যাইব না।" তিনি পিতাকে মিথ্যা কথাই বলিলেন। ভদ্রলোকের দুই স্ত্রীই চলিয়া গেলেন। দুইজনেই দুঃখ ও দরিদ্র জীবন গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া ভদ্রলোকও সব ছাড়িয়া দরিদ্র ও যোগজীবন গ্রহণ করিলেন। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া স্ত্রীগণ কোন সুখময় জীবন গ্রহণ করেন নাই। মন হইতে স্বামীকে ছাড়িতেও পারেন নাই। ভদ্রলোক যোগজীবনে শান্তির সন্ধান পাইলেন। স্ত্রীগণও অনেক কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করিয়া আবার যোগিনী হইয়া স্বামীকে পাইবার কথা ভাবিতে লাগিলেন। স্ত্রী যদি সতীত্ব রক্ষা করেন তবে কোন প্রকারের বিচ্ছেদই বিচ্ছেদ নয়। তাঁহারা যদি স্বামীর যোগজীবনের নীতি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারাও সিদ্ধ মহাত্মার স্তরে থাকিতে পারিবেন। বাল্যজীবনে ত্যাগ তপস্যা যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে আমার যেরূপ আদর্শগত ধারণা ছিল, শেষ জীবনের প্রারব্ধ টক্করের সম্মুখীন হইয়া ইহাই বুঝিলাম, উহার সঙ্গে সেই সব কথার কোনই মিল নাই। নরনারীর মিলিত জীবন অত্যন্ত বিস্ময়কর নীতিতে সংযুক্ত। যোগ ত্যাগ তপস্যা তোমাকে জ্ঞানী ও মহাত্মা করিতে পারে; কিন্তু এক জন্মের সম্বন্ধযুক্ত স্বজনগণকে তাঁহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার শক্তি রাখে না। বুদ্ধ ও চৈতন্যের স্ত্রী যদি বুদ্ধ ও চৈতন্যকে না ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, তবে বুদ্ধ ও চৈতন্যকে কোন না কোন জন্মে তাঁহাদের তুষ্টি ও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে। আবার বিবাহিত যোগীর তপস্যায় স্ত্রীর ভাগ থাকিবেই। এবং স্ত্রী যদি স্বামীনিষ্ঠ থাকেন, তবে কোন না কোন জন্মে তাঁহার লৌকিক তৃপ্তি পাইবারও অধিকার থাকিয়াই যাইবে। এক জন্মের গৃহিণী স্ত্রী যোগী স্বামীর যোগফলের ভাগী হইবার জন্য অন্য জন্মে যোগিনী হন। সতী স্ত্রী এই ভাবেই যোগী স্বামীর যোগফলের ভাগিনী হন। যোগফলের ভাগ সতী পাইবেনই। কিন্তু যোগফলের ভাগ পাইলেও যাঁহারা যোগভ্রষ্টা হন তাঁহারা অতুল সম্পদ পাইয়াও স্বামী ও সংসার সুখ হইতে বঞ্চিতা হন। এইরূপ ঘটনা আমার বহু বহু জানা আছে। তবে এ জন্মের ছোট

স্ত্রীর মনে যে স্বামীর ডবল স্ত্রী হইবার প্রতিক্রিয়াতে ‘‘ডবল স্বামী’’ করিবার প্ল্যান খুবই প্রবল ছিল বুঝা যায়। ইহা যে অধ্যাত্মজীবন গঠনে বেশ বাধা, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আরও এক জন্মের ঘটনা : এক ধনী ভদ্রলোক ও ভগ্নী। ভদ্রলোক বোনকে বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক। তাহার মতে, পিতার রক্ষিত ধনে সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করা এবং সাধনা ও ধর্মাচরণ করিয়া জীবন পবিত্র রাখাই শ্রেয়ঃ। ভগ্নীর, পরে বিবাহের ইচ্ছা কোন এক যুবককে কেন্দ্র করিয়া প্রবল হইল। ভাই বিবাহের প্রতিকূল। তাই বিবাহ হইল না। এ জন্মে দেখা গেল, সেই ঘটনাই সম্মুখে আসিল। ভগ্নী বিবাহ করিলেন। বাল্যকাল হইতে এক বিখ্যাত যোগীর নির্দেশে সম্মানিতা সাধিকা হঠাৎ বিবাহে ঝুঁকিয়া গেলেন। ঘটনায় এক অজ্ঞ সমাজ কিছুদিনের মত যোগীর যোগশক্তির বিরুদ্ধে দুই কথা বলিবার সুযোগ পাইলেও ভাই ও বিবাহিতা বোনের সম্বন্ধে কোনও প্রকার ত্রুটি দেখা দেয় নাই।

আরও এক জন্মের ঘটনা : যোগী তখনও বালক। যোগী জানেন এবং তাঁহার মা-ও জানেন, ‘‘বালক ভবিষ্যতে সংসারী হইবেন না।’’ ইহা জানা সত্ত্বেও মা একটি অনাথ বালিকাকে পালন করিবার জন্য আনেন এবং ছেলেকে সেই বালিকা কন্যার সামনেই তাঁহার সংসার পরিকল্পনার কথা বলেন। এই ঘটনায় বালিকার ওই ছেলের উপর গভীর আকর্ষণ হয়। বালকের এই আকর্ষণে সম্মতি থাকিলেও বিচারে বালক দেখিল, মায়ের পূর্বের কথা ও নীতি এবার বিরুদ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছে। সে মায়ের পূর্ব নীতিকে ঠিক মনে করিয়া যোগজীবন গ্রহণ করিল। বালিকা বাস্তব জীবনে, অনেক সংঘাতের সম্মুখীন হয়। কিন্তু বালক স্বামীর উপর আকর্ষণ হেতু অন্য সংসার গ্রহণে বিরত হন। এ জন্মেও দেখা গেল, সেই আকর্ষণ এবং সেই সংসার জীবনের কথা সামনেই আসিয়াছে। বালিকা এ জন্মে শেষ পর্যন্ত যোগীর উপর প্রতিশোধের পথ গ্রহণ করিয়া যোগীকে মুক্তি দেন। বালকের মনের মধ্যে বালিকার মানসিক আকর্ষণ শক্তির প্রভাব পড়িবার ফলে যোগীকে প্রতিশোধ স্বীকার করিতেই হইয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্য ও তপঃক্লিষ্ট ত্যাগী ও যোগীকে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত এক ধনী গৃহস্থ গুরু করেন। এই ঘটনায়, সেই পরিবারেই অন্য ভাই-এর মনঃপীড়া দেখা দেয়। যোগী ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাতবশতঃ শিষ্যদেরই বাড়ীতে আসেন। শিষ্য বাড়ীতে, তাঁহাদের পরিবর্তিত মনোভাবের একটা আভাষ, তিনি প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কঠোর তপস্বী গুরু, স্বয়ং রান্না করিয়া, অতি সাধারণ খাদ্য আহার করিতেন। বাড়ী প্রবেশ করিবার পরই যোগী বুঝিলেন, ইহা এক ধনী শিষ্যেরই বাড়ী। গুরুর মাথায় পিঙ্গল জটা, কোমরে কৌপীন এবং হাটু পরিমিত বহির্বাস। শিষ্য পত্নী (তিনি ও শিষ্য) গুরুর রান্নার ব্যবস্থা ঝিকে দিয়া করিয়া দিলেন। মনস্তত্ত্ববিদ্ গুরু অনেক ইতস্ততঃ করিয়া রান্নায় হাত দিলেন। তিনি বুঝিলেন, যদি এখানে আহারাদি না করিয়া চলিয়া যান, তবে শিষ্যের ক্ষতি হইবে। শিষ্যবাড়ির বালকোচিত হীন মনোবৃত্তি গুরুকে বিচলিত করিলেও, তিনি শিষ্যের মঙ্গলের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক, রান্না হইল, এবার স্নানাহারের সময়। বাড়ীতে স্নানের ঘাট কোথায় এবং রন্ধিত অন্ন জীব জন্তু হইতে কে রক্ষা করিবে, এ কথা ভাবিয়া যোগী শিষ্যাকে এবং ঝীকেও ডাকিলেন। ইতিমধ্যে শিষ্যার দেবর শিষ্যাকে শিক্ষা দিলেন যে, যোগীর আহারের ব্যবস্থা করা অন্যায় হইয়াছে।

সেখানে তাঁহার (শিষ্যার) আর যাওয়াই চলিবে না। শিষ্যা অগত্যা তাহাই মানিলেন। যোগী গুরু ভাবিলেন, অপমানকর হইলেও "আহার তাঁহাকে করিতেই হইবে", নয়তো শিষ্যের ক্ষতি হইবে। তিনি পক্বান্ন আদি ওই ভাবে রাখিয়াই স্নানের স্থান খুঁজিতে বাহির হইলেন। বাড়ির কোণে শিষ্যপত্নীর দেবর দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার বয়স আঠার হইবে। যোগী তাঁহাকে স্নানের স্থান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। কোনই উত্তর পাইলেন না। যোগী স্নানার্থে বাহির হইয়া আর স্নানের স্থান পাইলেন না, এবং চলিতে থাকিলেন। এ ভাবে দিনটা কাটিয়া গেল। তিনি আর স্নানের ঘাটও পাইলেন না, ফিরিলেনও না। শিষ্যার দান, গুরু গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার ফলে শিষ্য প্রচুর পাইলেন। গুরুর আহার হইল না, ইহা যজ্ঞের বা আহারের বিঘ্ন, যজ্ঞের ফল সুখের। অর্থাৎ শিষ্যার দেবর এবং শিষ্যা এই ঘটনায় সুখ প্রাপ্তি বিষয়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। সেই জন্মেও আমি আকাশ বৃত্তিধারী মহাযোগীই ছিলাম। কিন্তু একজন রাজতুল্য সম্পদশালীর মনে এতটা ধর্মবিদ্বেষ, সাধুবিদ্বেষ এবং যোগীবিদ্বেষের কথা আমি এখনও বিস্ময়ের সহিতই ভাবিয়া থাকি। যোগী সদা সন্তুষ্ট, সদা তৃপ্ত, যোগীকে একবেলা অন্ন দিলে গৃহীর আত্মতৃপ্তি এবং সুখ বৃদ্ধিই হয়। যোগীর সেবা করিলে গৃহীর জ্ঞান ও বুদ্ধি মার্জিত হয়। যোগীকে আহার ও সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে গৃহীর তাহাতে সুখ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। গৃহী! তুমি এত ধর্মবিদ্বেষী ও হীন স্তরের কৃপণ কেন হইবে ?

আরও এক জন্মের কথা, আমি গৃহী। স্ত্রীকে খুবই ভালবাসি। স্ত্রী সুন্দরী ও অল্প বয়সী, সে তুলনায় স্বামীর বয়স বেশ একটু বেশী। সে যুবক স্বামী চায়। স্বামী ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে স্ত্রী অন্য সুন্দর যুবককে ভালবাসিতে চায়। স্বামী কোন বাধা দিলেন না। এই জন্মে সেই মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি যুবতী সুন্দরী ও বালবিধবা। সংসারের বহির্মুখী সব আশা আকাঙ্ক্ষাই তিনি পোষণ করেন; কিন্তু সংসারের নিয়মে তাঁহার সাধন তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই। তিনি খুবই ভাল সাধিকা ছিলেন। এবং অল্প বয়সেই মারা যান। এই মহিলার সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হয়। এ জন্মে তিনি বাল্যকাল হইতেই সাধিকা এবং অতীব চরিত্রবতী ও বুদ্ধিমতী কন্যা। ইনি বিবাহিত জীবনে সুন্দর স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদ সম্পন্ন ভাল স্বামী পান; কিন্তু আশ্চর্য ইনি নিজের পরিস্থিতিতে মোটেই সুখী ভাবিতে পারেন না।

আরও এক জন্মের ঘটনা। স্বামী ও স্ত্রীর মত এক স্থানেই আছি। স্ত্রীর মন অন্য যুবকের দিকে আকৃষ্ট। কিন্তু স্ত্রী দুইদিকেই মনের কথা গোপন রাখিতে চায় এবং দুই দিকেই ফাকী দিতে চায় এবং ঠিক সংসার জীবন বা ধর্মজীবন গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে। সব ঘটনাগুলির মধ্যেই আমি বহু অংশ প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম।

আরও এক জন্মের ঘটনা, আমি সেই জন্মেও গৃহী, কিন্তু সাধু ভাবাপন্ন। বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে যাহাতে ভাব ও ভালবাসা না জমতে পারে এ জন্য সর্বদাই দুইটি মহিলা পাহারা দিতেন। স্ত্রীর মধ্যে সেই ভাবীর প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। সেই প্রতিক্রিয়াটি কিরূপ, সেটা আমি জানিতে চেষ্টা করি নাই। যাঁহারা বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা বিশেষ অনুকূল হইলেও কন্যাটি সুখী হতে চায় না। এ জন্মেও দেখা গিয়াছে, সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া, সেই কন্যার মনের মধ্যে রহিয়াছে, সে কিছুই প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নয়।

ঘটনারাশি যাহাই থাকুক, উহার প্রতিক্রিয়া যাহাই থাকুক, আমাকে সবই দেখিয়া যাইতে হইবে। আমার দিক হইতে সেইসব সম্বন্ধযুক্তগণের প্রতি জ্ঞানই প্রধান দেয় বস্তু। তাঁহারা আমার প্রচুর আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার পথ হইতে সরিয়া গিয়া সংসারেও যাইতে পারেন।

অন্যান্য জন্মের বহু বহু ঘটনা আমি প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম। জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিলে এঁরা সকলেই পূর্ণ জ্ঞানী হইতে পারিবেন। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পূর্ণ সতীত্ব রক্ষা করিবেন, তাঁহারা জ্ঞানের পথে পূর্ণ লৌকিক সুখও প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহাদের সতীত্বনিষ্ঠা যত কম, তাঁহারা লৌকিক সুখ ততটাই কম পাইবেন।

গুরুগণের অসীম আশীর্বাদ, আমি আমার অন্য জন্মজনিত সব সমস্যাই অতি সহজে অতিক্রম করিয়াছি এবং সবই অতিক্রম করিব। অন্য জন্মের সম্বন্ধযুক্তগণের সেবা স্নেহ মমতা ও শ্রদ্ধা একটু বেশী গভীর হয়। গুরুগণের চরণে একান্ত প্রার্থনা, এঁরা অন্তরকে আরও বিশুদ্ধ করুন এবং জ্ঞান ও শান্তির ধারায় মহান হইয়া মহান জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত হউন, জীবন ধন্য করুন। প্রারব্ধ অধ্যায়ে, আমি যাহা লিখিলাম, উহা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা। এ সব ঘটনার সব কথা আমি ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ করিলাম না। ইহা লইয়া কেহ কাহারও সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে আলোচনা করে, ইহা আমি চাই না। এ সব ঘটনা ভিন্নও অন্য জন্মের সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনা আমার জানা আছে, আমি সে সব আর আলোচনা করিব না। ঘটনার বহু অংশ গোপন করিবার জন্যই এ অধ্যায়ের ভাষাও অস্পষ্ট রহিয়া গেল।

প্রারব্ধ অধ্যায়ে প্রবেশ করিতে আমি ভীত হইয়াছিলাম। কারণ, আমার অন্তর আদর্শবাদের ভিত্তিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিত, এখনও শ্রেষ্ঠই মনে করি। প্রারব্ধ আমার কোন ক্ষতি করে নাই; কিন্তু প্রারব্ধ আমাকে নানাভাবে শক্তিমান করিয়াছে এবং ভয়ঙ্কর জটিল পথের মধ্য দিয়া আমাকে শক্তিমান তপস্বী করিয়াছে। আমার পাহাড়, জঙ্গল, নির্জ্জন গঙ্গাতটের আকর্ষণ আমাকে যতটা শান্তি মুক্তি ও জ্ঞান ঢালিয়া দিয়াছে, প্রারব্ধ আমাকে উহা হইতে মোটেই কম দেয় নাই। প্রারব্ধ বন হইতেও গহন বন, পর্ব্বত হইতেও উচ্চ ও গম্ভীর পর্ব্বত, পতিতপাবনী মা গঙ্গা হইতেও সর্ব্বমলনাশক জগত্তারিণী মা গঙ্গা।

এই প্রারব্ধ অধ্যায়ে যোগীর আত্মীয়গণ কিরূপ যোগীর তপস্যার ভাগ প্রাপ্ত হন, উহার হিসাব পৃথক পৃথক করিতে হইলে, অনেক কথা লিখিতে হয়। এক কথায় বলিলে, যোগীর উপর আকর্ষণ হেতু, সব আত্মীয়গণই তপস্যার ফলের ভাগ প্রাপ্ত হন। যে শক্তির বলে তাঁহারা এ জন্মে বা অন্য জন্মে সম্পদ সুখ ও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে স্ত্রী সবচেয়ে অধিক ফল প্রাপ্ত হন। স্ত্রী যতদিন সতীত্ব রক্ষা করেন, ততদিনের স্বামীর তপঃফলের ভাগী হন; যদি স্ত্রীর মনে ভ্রষ্টাচার দেখা দেয় তবে স্ত্রী জ্ঞানের ভাগ হইতে বঞ্চিত হন। স্ত্রী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করেন তবে যোগভ্রষ্টা হন। যোগভ্রষ্টা নারী প্রায়ই খুব সুন্দরী ও অনেক সৎগুণের ক্ষেত্র হন। ইঁহারা স্বামীত্যক্তা বা স্বামী সুখে বঞ্চিতা হন। আমি কুষ্ঠি দেখিয়াই অনেক যোগভ্রষ্টার কথা বলিয়া সাবধান করিতে চেষ্টা করিয়া অনেকের নিকট অপ্রিয়ও হইয়াছি। কিন্তু কর্মফল সব স্থানেই ঠিক ঠিক ফলিতে দেখিয়াছি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কোন কুমারী কন্যা কোন সিদ্ধ যোগীকে স্বামীরূপে বরণ করিলে, যোগী তাঁহাকে কিরূপ দেখিবেন? পূর্ব জন্মের সম্বন্ধহীন কোন কন্যাই যোগীর দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। অনেক নারীকে যোগীর দিকে কারণহীন আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। তাঁহাদের ঘরে, প্রায়ই যোগের সম্বন্ধযুক্ত সুসন্তান বা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে। অসতী নারীরা যোগীর শক্তিহানির কারণ। কাজেই যোগী সাধক নিজেকে সব সময় অনাসক্ত রাখিবেন। অন্য জন্মের সম্বন্ধযুক্ত শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধযুক্ত বহু ঘটনাই আমার জীবনে আসিয়াছে। আমি অতি সাবধানে তাহাদের সঙ্গে আমার কর্মবন্ধন অতিক্রম করিয়াছি। আমি তাহাদিগকে জ্ঞান ও শক্তির দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কোথায়, কি ভাবে কতটুকু করিয়াছি, আমি এখানে তাহার হিসাব দিতে চাই না। একটা জটিল কথার আলোচনা করিয়া আমি এই বিস্ময়কর অধ্যায় শেষ করিব।

মুক্তির পথে শিবজ্ঞান ও শক্তিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। একজন নারী জন্মে জন্মে অনেক শিবকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে। নানা স্তরে শিব অনেক; আবার নানা স্তরে শক্তিও অনেক। উন্নত স্তরেও শিব অনেক; উন্নত স্তরে শক্তিও অনেক; কিন্তু ব্রহ্মশক্তি এবং নির্গুণ ব্রহ্ম এক। দুর্গাপূজা কালীপূজা এবং চণ্ডীতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়, সর্বশক্তির সমষ্টিভূত মহাশক্তিই ব্রহ্মশক্তি। ইনি এক এবং অদ্বিতীয়। মহাযোগীকে শিবরূপে পাইয়া চঞ্চলতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ যে সব নারীরা আবার অন্য শিব চায়, তাঁহারাও যোগভ্রষ্টা হন। যে নারীর শিব নির্গুণব্রহ্ম এবং যে নারী জানে সমস্ত শক্তি তাঁহারই অংশ, সেই নারীই যোগেশ্বর শিবকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন এবং মহাশক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন। শ্রীমতী রাধিকা, সীতা, সাবিত্রী এবং সতী মোটেই একটুখানী কথা নহে! এক জন্মের যোগী স্বামীকে অন্য জন্মে পাওয়া হইতেও স্বামীকে যোগেশ্বর নির্গুণ ব্রহ্মরূপে এবং নিজেকে সমস্ত শক্তির সমষ্টিরূপে জানা অনেক তপস্যা এবং পুণ্যের ফল। কোন মহাযোগীর প্রারব্ধে এইরূপ শক্তিসম্পন্না নারী আসিলে যোগীর শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি হয়। ব্যভিচারিণী বা দ্বিচারিণীগণ যোগীর শক্তি কম করিয়া দেয়। যোগীর নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান এবং শক্তিজ্ঞান না থাকিলে প্রারব্ধ তাঁহাকে ভালভাবেই সংস্কারের স্তরে এবং সাধারণ ভোগী গৃহীর স্তরে নামাইয়া দিবে এবং তিনি ভোগ ও মোহ জগতে অনেক জন্ম ধরিয়া চক্কর খাইতে বাধ্য হইবেন। কোন যোগীর প্রারব্ধকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদীরা মোটেই মাথা ঘামাইবেন না। দুর্বলবাদ ও অসুরবাদকে অতিক্রম করিয়া কর্ম উপাসনা এবং জ্ঞানে শক্তিবাদকে আঁকড়াইয়া রাখাই প্রধান কথা। জীবনের এক সময় আমার সংস্পর্শে আসিয়া পরে সংসারে গিয়াছে, এমন অনেক নরনারীর কথা আমার মনে জাগে। সকলেরই বোঝা প্রয়োজন, সংস্পর্শে আসা এবং প্রারব্ধ ফল প্রাপ্ত হওয়া, এক কথা নয়। ঈর্ষা ও নীচতার আশ্রয় না লইয়া, সাধনা করিলে, সকলেই শান্তি ও তৃপ্তির পথ পাইবে; কিন্তু "ঈর্ষা" সাধনার ফলপ্রাপ্তিতে বাধা দিবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

নানা স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

চুনার কেল্লার ভৈরব গুহা বিখ্যাত সিদ্ধস্থান। বিক্রমাদিত্যের ভাই ভর্তিহরি রাজ্যত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসেন এবং তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার সময়ে কেল্লার গাত্রদেশে অনেক গুহা ছিল। সেই সব গুহায় সাধু ও যোগীগণ অবস্থান করিতেন। সেই সব গুহার মধ্যে এখন মাত্র দুইটি গুহা কেল্লাগাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গার ধারে, এই কেল্লার গায়ে অসংখ্য গুহার অস্তিত্ব-চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। কেল্লার মধ্যে ভর্তিহরির সমাধিস্থান এখনও জনপূজ্য তীর্থস্থান।

চুনারের সঙ্গে ভর্তিহরির নামের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংস্কারে জনসাধারণে জড়িত রহিয়াছে। ভর্তিহরি নাথের স্বরচিত কয়েকখানা পুস্তক এখনও পাওয়া যায়। ইহার তিনখানার নাম নীতিশতক, বৈরাগ্য শতক ও শৃঙ্গারশতক, অন্যখানার নাম 'বাক্যপদীয়'। বইগুলি আমি দেখিয়াছি।

ভর্তিহরি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন এক যোগী মহাত্মা ভর্তিহরিকে একটি ফল প্রদান করেন এবং বলেন, ইহা আপনি আহার করুন, ইহার ফলে আপনি হাজার বৎসর জীবিত থাকিবেন। ফলটি পাইয়া ভর্তিহরি ভাবিলেন, এই অমর ফল ভক্ষণ করিয়া আমার কোনই লাভ নাই। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এতকাল জীবিত থাকিবেন না এবং আমাকে তাঁহার অভাব সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি স্ত্রীকে ফলটি আহার করিতে দিলেন। স্ত্রী ভাবিলেন, আমি নগরপালকে (কোতোয়াল) ভালবাসি। আমি বাঁচিয়া থাকিলে আমাকে নগরপালের অভাব সহ্য করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া রাণী ফলটিকে নগরপালের হাতে দিলেন। নগরপাল ভাবিলেন, এই ফল আমি আহার করিলে আমার প্রিয় বেশ্যার অভাব আমাকে সহ্য করিতে হইবে, কাজেই তিনি ফলটি বেশ্যাকে দিলেন। বেশ্যা ভাবিলেন, এই ফল আহার করিয়া আমার লাভ নাই। আমি পাপ জীবন হাজার বৎসর বহন করিলে আমাকে নানা ভাবে দুঃখ পাইতে হইবে। তিনি ফলটি রাজাকে আহার করিতে দিলেন। রাজা পরিচিত ফলটি হাতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বেশ্যার ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, নগরপাল তাহাকে ইহা দান করিয়াছেন। নগরপালকে ডাকিয়া জানিলেন, ফলটি নগরপাল রাণীর নিকট হইতে পাইয়াছেন। এই ঘটনায় মহারাজ ভর্তিহরি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া যোগী হইলেন। মন্ত্রী ও সদস্যগণ মহারাজাকে আবার বিবাহ করিয়া রাজ্য করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু রাজা কাহারও কথা না শুনিয়া ছোটভাই বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য দান করিয়া, নিজে তপস্যার জন্য চুনার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ভালবাসায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনেক মহাপুরুষই তপস্যার জীবনে

চলিয়া আসিয়াছেন দেখা যায়। স্বরদাসের জীবনীও এইরূপ। ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া সিদ্ধ যোগিনী ও সাধিকার জীবনও অনেক আছে। অকৃত্রিম ভালবাসা শেষকালে ঈশ্বরীয় প্রেমে পরিণত হইয়া প্রেমী জীবনকে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে মহান করে। চুনারের অনেকেরই বিশ্বাস ভর্তিহরি এখনও জীবিত আছেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি কেল্লার মধ্যে জীবন্ত সমাধি রচনা করিয়া উহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, কোন কোন ভাগ্যবানকে ভর্তিহরি দর্শন দান করিয়াছেন।

চুনার দুর্গ অত্যন্ত প্রাচীন দুর্গ। ইহা একটি পায়ের আকারবিশিষ্ট পাহাড়। এই পায়ের গোড়ালীটাই ভৈরব গুহা। পায়ের পাঁচটি অঙ্গুলী গঙ্গার ধারে অবস্থিত। কথিত আছে, ইহা বামন ভগবানের বাম পদের স্বরূপ। এই দুর্গ এক কালে মহারাজ বলি রাজার রাজধানী ছিল। ভগবান বামন এই রাজধানীতে বাম পদ স্থাপন করিয়া বলিরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য চুনারের একটি প্রাচীন নাম চরণাদ্য (আদি চরণ) গড়। বামন অবতারেই ভগবানের প্রথম মানব-চরণ-রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ পর্যন্ত কোন অবতারেই ভগবানের মানব-চরণ হয় নাই। এই কারণেই চুনারের নাম চরণাদ্য গড়। পাহাড়টি চরণের আকারবিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম চরণাদ্রি গড়। এই চুনার এক যুগে রামের মিত্র গুহক চণ্ডালের রাজধানী ছিল বলিয়া ইহার এক নাম চাণ্ডাল গড়। এই দুর্গে বামনের বাম পদের পদচিহ্নের প্রতীক স্বরূপ একটি পদচিহ্নের পূজা হইত। ইংরেজ যখন এই দুর্গ অধিকার করেন তখন ওই পদচিহ্নটি দুর্গের নিকট একটি মসজিদের ধারে মুক্তস্থানে রক্ষিত হয়। এখনও চরণ চিহ্নটি সেইখানেই আছে। আমি প্রথমে পদ চিহ্নটি মুক্ত আকাশের তলেই দর্শন করিয়াছিলাম। এখন পদ চিহ্নটির উপর একটা পাকা কুঠরী করা হইয়াছে। পূর্বে এই চরণে হিন্দুরা পূজা অর্চনা করিত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দুরা ওই পদচিহ্নটি পাইবার জন্য মামলা করেন। জজের আদেশে পদচিহ্নটি এখন মুসলমানের অধিকারেই রহিয়াছে, তবে হিন্দুরা উহাতে পূজা করিতে পারেন। এখন হিন্দুরা খুব কমই ওই পদ চিহ্নে পূজা করিতে যান। চুনার দুর্গ, গঙ্গা এবং দরগাহ্ নামক গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানটি একটি ত্রিকোণাকার ভূমি। এই ভূমি এখন ‘‘টেকোর’’ (ত্রিকোণ) নামক গ্রাম নামে পরিচিত। ভৈরব গুহার ঠিক পশ্চিম স্থানে এই ত্রিকোণ ভূমিতে, আমি একটি কুটিয়া প্রস্তুত করিয়া ভৈরব গুহা অবস্থানের অসুবিধাগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া লই। এই কুটির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কুটিয়ার এককোণে ক্ষুদ্রাকার একটি অশ্বত্থবৃক্ষ দেখা দেয়। উহা এখন একটি সবল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। চুনারে ‘‘ভর্তিহরি’’ সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তি শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা, তিনি জীবন্ত আছেন। ভৈরব গুহায় অবস্থান কালে আমি ত্রিশূলধারী এক ভয়ঙ্কর ভৈরবমূর্তি দর্শন করিয়াছিলাম। ইহার রঙ ছায়ার মতন ধূম্রবর্ণ। ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্তি বলিয়া, আমি প্রথমটায় একটু চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইলাম। ভৈরব গুহায় অনেক সর্প দেখিয়াছি। একদিন একটি ভয়ঙ্কর অজগর সর্প দেখিয়াছি। সন্ধ্যাবেলা আমি গুহার সামনে পাথরে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলাম। অজগরটি আমার আসনরূপী পাথরের ধারে নির্বিকারে লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। ভৈরব গুহা অতীব পবিত্রস্থান। ভৈরব গুহার অবস্থান এবং খিড়কীঘাটে স্নান, অর্থাৎ দুর্গের একদিকে অবস্থান অন্যদিকে নির্জন ঘাটে আমার স্নানঘাট। গুহা হইতে চারিদিকের দৃশ্য

অতীব সুন্দর এবং অতীব পবিত্র। আমি যখন ইহাতে আশ্রয় লইয়াছিলাম তখন ওইস্থানে ছাগলের দল অবস্থান করিত। আমি একটু পরিষ্কার করিয়া ইহাতে অবস্থান আরম্ভ করিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামবাসীরা ওইস্থানে প্রতি সোমবার সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পরে ওইস্থানে নিত্য পূজা ও আরতির ব্যবস্থা হইল। আমি ওইস্থানে, "ভৈরব ভগবানের যন্ত্রমূর্তির স্বরূপে" ষট্‌চক্র সমন্বিত শিব প্রতিষ্ঠা করিলাম। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দোল পূর্ণিমাতে এই অনুষ্ঠান যথাবিধি সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সমস্ত গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং জনতা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত নর্মদেশ্বর শিবমূর্তিটিকে একটি পদচিহ্ন প্রাকৃতিক ভাবেই চিহ্নিত করিয়াছে। চুনার দুর্গের পদচিহ্ন চরণমূর্তি যবনেরা অধিকার পাইবার পর, শ্রীঈশ্বরের দৈত্যবিমর্দনকারী পদচিহ্ন এই শিবলিঙ্গ মূর্তিতে আবার প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ভাবিতে আমার সত্যই আনন্দ হইতেছে এবং আমার বিশ্বাস, এই স্থান এবং এই ভৈরব গুহা একদিন সমস্ত ভারত ও বিশ্বের পূজ্যতীর্থ কেন্দ্রে পরিণত হইবে। আমি গুহায় আসিবার পরই বুঝিলাম, দুপুর বেলায় এখানে থাকা চলিবে না।

সাড়ে দশটার পরই গুহাটি গরম হইয়া যায় এবং বাসের অযোগ্য হয়। সে সময় গুহা হইতে নামিয়া আসিয়া এই টেকোর গ্রামেরই এক সংস্কৃত পাঠশালার বাহিরে, এক নিম্ব বৃক্ষতলে অবস্থানের স্থান করিলাম। ভাগীরথী দেবী এই বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ভাগীরথীদেবী নিঃসন্তান বিধবা ছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভাগীরথীদেবীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করিয়া থাকেন। উহা দেখিতে আমার খুবই ভাল লাগিত; বিদ্যালয়ের দশা ভাল ছিল না। অধ্যাপক, পূজা, ছাত্রদের বৃত্তিদান, পাঠন এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থাই একটা খেলোয়াড়ী ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। বৃক্ষতলে অবস্থানকালে অতুলকৃষ্ণ বসু নামক এক বাঙ্গালী যুবক আমার নিকট আসিতেন। অধ্যাপক প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। আমি কথা প্রসঙ্গে, এই সব কথা কাশীস্থিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে বলিয়া দিলাম। তিনি তখন উত্তর প্রদেশের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন। অতুলবাবু এসব অব্যবস্থার কথা একটি দরখাস্ত আকারে শিক্ষা বিভাগকে জানাইয়া দেন। তাঁহারা এই ঘটনাকে ইনস্‌পেক্টার পাঠাইয়া তদন্ত করেন। পাঠশালার অব্যবস্থার কথা লিখিয়া ইনস্‌পেক্টার রিপোর্ট দান করেন। ট্রাষ্টির মধ্যে মাত্র তিনজন; মির্জাপুরের কালেক্টার, স্থানীয় দুইজন উচ্চ প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। দুইজনের মধ্যে একজনই সর্বেসর্বা ছিলেন। ইনস্‌পেক্টারের রিপোর্ট বার বারই ট্রাষ্টিগণের হাতে যাইতে লাগিল। কিন্তু কোনই প্রতিকার হইত না। এভাবে বারো বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং অব্যবস্থার রিপোর্ট হইবার পর মিঃ গুণ্ডাভিয়া নামক এক কালেক্টারের হাতে একটা রিপোর্ট পৌঁছিল। তিনি প্রধান কেরাণীকে সব ব্যাপার বলিবার অনুরোধ করিলেন। কেরাণী বলিলেন, গত কয়েক বৎসরই এইরূপ অব্যবস্থার রিপোর্ট হয়, কিন্তু প্রধান ট্রাষ্টী নির্বিকার আছেন। মিঃ গুণ্ডাভিয়া সব বুঝিলেন, তিনি সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান ট্রাষ্টের বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ করিয়া দিলেন। মামলায় প্রধান ট্রাষ্ট হারিয়া যান এবং ভাগীরথী দেবীর সমস্ত সম্পত্তি ও সংস্কৃত বিদ্যালয় কাশীর কুইন্‌স কলেজের হাতে চলিয়া যায়।

ইনস্‌পেক্টারের অব্যবস্থার প্রথম রিপোর্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আমার বিরুদ্ধে বিরক্তিকর ও অপমানকর আন্দোলন ও অভিযান আরম্ভ করেন। তাঁহারা রাস্তাঘাটে আমাকে দেখিলেই অসভ্য ব্যবহার, অসত্য কথন এবং হাততালি দেওয়া, আরম্ভ করেন। পাঠশালার নিম্ব বৃক্ষতলে আমার প্রবেশ অত্যন্ত অভদ্র এবং ইতর ভাষায় নিষিদ্ধ হইল। সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শে এই অধঃপতন আমাকে যথেষ্ট বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। আকাশবৃত্তিধারী এক নির্দোষ তপস্বীর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অভিযান আরম্ভ হইল। প্রবীণ ট্রাষ্ট, সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগে ইনস্‌পেকশন প্রথা বিলোপের জন্য আইনকে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কারণ, তিনি উত্তর প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী বিভাগের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ভোটযুদ্ধে তিনি হারিয়া যান। বারো বৎসর বাদ, আরও দুই বৎসর পর্যন্ত মামলা চলিয়া ছিল। টিকোর গ্রামের সংস্কৃত পাঠশালা পরে এক শক্তিশালী সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল। এই ঘটনায় আমাকে বিনা কারণে যে সব অপমানকর ও বিরক্তিকর ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, সেটাও আমি আকাশবৃত্তিরই একটা প্রাপ্য বস্তু মনে করিয়া সুদীর্ঘ বারো বৎসর নীরব ছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত প্রধান ট্রাষ্ট এই ঘটনার পরিণতিতে ভয়ঙ্কর অপমান এবং অপ্রতিষ্ঠার সম্মুখীন হইলেন। আমি ইচ্ছা করিয়া এই ঘটনার সব কথা প্রকাশ করিতে নীরব হইলাম।

ত্রিকোণ গ্রামের (টিকোর) পাঠশালায় আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবার পর আমি রু সাহেবের বাংলোর এক কোণে, প্রাচীন নিম্ব ছায়াবিশিষ্ট এক বিখ্যাত কবরস্থানে মধ্যাহ্ন কাল যাপনের কেন্দ্র করিলাম। স্থানটি গঙ্গার ধারে, কিন্তু স্থানটি ভগ্নদশা গ্রস্ত হইবার দরুণ ভয়ঙ্করভাবে সর্পসঙ্কুল। গ্রীষ্মকালে বৃহৎ সর্পগণ সেই সব ফাটলে মুখ বাহির করিয়া থাকিত। কোন কোন সময় কোন কোন সর্প বাহিরেও চলিয়া আসিত। সেই সময় পাখীরা সর্পগণকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিত। ত্রিকোণ গ্রামের এক কোণে ভৈরব গুহা, উহা আমার বাসস্থান, ত্রিকোণ গ্রামের অন্য কোণে নির্জন খিড়কীঘাট, উহা আমার গঙ্গাস্নান ঘাট। ত্রিকোণ গ্রামের এক কোণে রু সাহেব বাংলো এবং কবরস্থান, সেটা আমার মধ্যাহ্ন অবস্থানকেন্দ্র। আমি ত্রিকোণ (টিকোর) গ্রামের এই তিন কোণস্থানে এভাবে বহু বৎসর কাটাইলাম।

চুনার দুর্গ যে বামন ভগবানের পদস্বরূপ, এই কথা আমি বলিয়াছি। বহু বৎসর চুনার দুর্গে রিফর্মেটারী স্কুল ছিল। এখানে অপরাধী বালকগণকে আবদ্ধ রাখিয়া ইহাদের দীক্ষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমি মাঝে মাঝে ভিতরে প্রবেশ করিতাম, আমার জন্য কোন বাধানিষেধ ছিল না। আমি অনেক সময় এই শ্রীভগবানপদের অঙ্গুষ্ঠ স্থানের নিকটেও অবস্থান করিয়াছি। তখন অঙ্গুষ্ঠস্থানের নিকটে বালুয়াঘাটে স্নানাদি করিতাম এবং দুর্গে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতাম। এমন সুন্দর স্থান এবং সুন্দর দৃশ্য, কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবানের গোড়ালীর তলে ভৈরব গুহায় আমার বাসস্থান, তাঁহার কনিষ্ঠা স্থানে খিড়কীঘাট আমার স্নানের ঘাট এবং কখনও অঙ্গুষ্ঠ স্থানে বালুয়া ঘাটে আমার স্নানের এবং রাত্রি নিবাসের স্থানও হইয়াছিল। শ্রীভগবানের পদতলে এইভাবে আমি বহু বৎসর কাটাইলাম এবং ত্রিকোণ গ্রামের তিন কোণে আমি তিনটি তপঃকেন্দ্রে বিচরণ করিলাম। এখানে আমি আমার সমস্ত শক্তিবাদ

গ্রন্থাবলী লিখিয়াছি। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী সবই গবেষণা মূলক মৌলিক গ্রন্থাবলী। শ্রীভগবানের শক্তিশালী পদতলে (বাম পদতলে) শক্তিবাদের ধারা নির্গত হইয়াছিল। ত্রিকোণ গ্রামে একটি শক্তিবাদপীঠকেন্দ্র করা এবং এই শক্তিপীঠে মহাশক্তি বা মহাকালের মন্দির নির্মাণ করা এবং শ্রীভগবানের একপদ চিহ্ন স্থাপনার কথা আমি অনেকদিনই ভাবিয়াছি। (মহাকাল) ভৈরব গুহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। মহাকাল ভৈরব এবং শক্তিবাদ ধর্মের কেন্দ্রও মহাশক্তির আশীর্বাদ হইলে, এই ইচ্ছাও আমার জীবদ্দশায়ই পূর্ণ হইবে, আমার এই বিশ্বাস ছিল। দেওয়ালী উৎসব তো সমস্ত ভারতেরই শক্তিবাদ উৎসব। এই উৎসবের দেবতা মহাশক্তি কালী। সুতরাং কালশক্তি কালী সমস্ত ভারতেরই উপাস্য দেবী। মহাকাল মহাকালীর নামান্তর, এবং ইহাই মহাকাল তত্ত্ব। তিব্বতীরা সকলেই মহাকালীর উপাসক। তিব্বতের মহাকাল মূর্তিগুলি এই ভৈরবগুহার মূর্তিটিরই মতন।

ত্রিকোণ গ্রামে অবস্থান কালে, আমি এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। পূর্ব্বেই ভারত খণ্ডিত হইয়া স্বাধীন হইয়াছে। কংগ্রেসের মহাপুরুষগণ দেশের রাজা হইয়াছেন। একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার মধ্যস্থিত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমি বুঝিতেই পারি নাই যে সমাজ এবং পুলিশ বিভাগ ইহা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে। ফলতঃ, এই সত্য কথা প্রকাশের ফলে জনতা, সমাজ, রাষ্ট্র এবং পুলিস বিভাগ উপকৃত হইয়াছিল। কিন্তু শেষকালে এক মিথ্যা ষড়যন্ত্রের জাল প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় পুলিস অফিসার এবং সরকারী অফিসার আমাকে দুর্গের মধ্যে নিষ্ঠুরের মত অত্যাচার করেন। বাহিরে আগমনকালে আমি চুনার দুর্গের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম, ‘‘আমি মূর্খ ও বর্ব্বরদের প্রতিশোধ লইব।’’ প্রতিশোধ প্রাকৃতিক নিয়মে নিশ্চয়ই হইয়াছে। কিন্তু আমার অন্তরাত্মার বিচারে উহা যথেষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয়, সংশ্লিষ্ট বর্বরগণ বহু জন্ম ধরিয়া এই দুষ্কার্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে থাকিবে। আমি মন্ত্রিসভার দৃষ্টিলাভ আকর্ষণ করিবার জন্য আবেদনও পাঠাইয়াছিলাম। তদন্তে, সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারীরা ‘‘আমরা করি নাই’’ বলিয়াই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক ভীষণ প্রতিশোধ এইসব বদমাইসদের কাউকেও ছাড়িয়া দেয় নাই।

পূর্ববঙ্গে জন্মহেতু এবং বাল্যকালে গৃহত্যাগ এবং নির্জন বনবাস হেতু, ইংরেজ রাজ্যের গুপ্ত পুলিস বিভাগ বহুদিন আমার পেছনে ছিলেন। অফিসারগণ বহুবার আমার নিকটে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বার বার আমাকে বলিয়াছেন, ‘‘আপনি তপস্বী পুরুষ, আপনাকে আমরা কোনও প্রকারেই বাধা দিব না। তবে আপনার বিষয় আমরা তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত করিব। আপনি যদি নির্দোষ হন, তপস্যায় নিশ্চিন্ত থাকুন।’’ তাঁহারা বার বার আমাকে বলিয়াছেন, ‘‘আপনি নির্দোষ সাধু। আমাদের তদন্তের ইহাই ফল।’’ কিন্তু স্বরাজ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আমার উপর যে অত্যাচার হইল, উহাতে বুঝিলাম - ইহা সাক্ষাৎ ‘‘কংসরাজ্য’’। ‘‘কং(গ্রে)সের’’ রাজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমার হয়তো ইহাই প্রথম। দেশবাসী ইহার স্বরূপ অদূর ভবিষ্যতেই বুঝিতে পারিবে, ইহাও বলিয়া রাখি।

চুনার দুর্গের ত্রিকোণ পাদপীঠে এবং ত্রিকোণ গ্রামের মধ্যস্থানে অবস্থান কালে, আমি শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছি। ভারতীয় নেতাগণের দুর্বল নীতি গ্রহণের ফলে ভারত ভাগ, এক তরফা রেফিউজী, ভারতীয় জাতীয়তার শত্রু মক্কাবাদিগণের তোষণ,

এবং ভারতীয় সভ্যতার সর্বনাশকারী বহু দুষ্কার্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রশ্রয়দাতা নেতাগণের আচরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে মূর্খদের সম্মিলিত অভিযান। আমি জীবনে একদিনও ভিক্ষা করি নাই, চাঁদা করি নাই, সুখ দুঃখের কথা বলিয়া কাহারও কোনওপ্রকার বিরক্তিরও কারণ হই নাই। আমি আত্মচিন্তা এবং মহাশক্তির কথাই ভাবিয়াছি। মহাশক্তি মহামায়া আমাকে কোন অভাবেও রাখেন নাই। তবুও দুর্বলবাদী রাষ্ট্র ও অপুষ্ট অসুরবাদীদের অভিযান আমাকে আহত করিয়াছিল। মহাকাল ভৈরবের পদতলে আমার ইহাই শেষ অভিজ্ঞতা কিনা, আমি তাহা জানি না।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ ও বঙ্গভঙ্গ

চুনার দুর্গের মহাকাল ভৈরব গুহায় অবস্থানহেতু আমার শরীরের রুক্ষতা বৃদ্ধি হইল। আমি বুঝিলাম গ্রীষ্মকালে আমার স্নিগ্ধদেশে যাওয়া প্রয়োজন। বহুদিন পূর্বে গৃহত্যাগ করিয়াছি। এবার গ্রীষ্মে জন্মভূমি দর্শন করিব, স্থির করিলাম। সেই সময় ইংরেজের রাজ্য। বঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর টেরোরিজম এবং ভয়ঙ্কর দমননীতি চলিয়াছে। ষ্টিমারে আমার ঝোলা কম্বল সবই তল্লাস করা হইল। জন্মভূমিতে ভালভাবেই পৌঁছিলাম। দুর্গামায়ের মণ্ডপে আশ্রয় লইলাম। পিতৃদেব তখনও জীবিত। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন - ‘‘তুমি যোগী হইয়াছ, ইহাতে আমি সুখী আছি।’’ অগ্রজ, সরকারী ডাক্তারী চাকুরী করেন। জানি না, তিনি কোন সূত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন - ‘‘মানুষ যোগী হইলে কি হয়, জানি না। কিন্তু এর সরল হাসি দেখিলে মনে হয়, এ খুবই সুখের সন্ধান পাইয়াছে। ইহাতে আমি সত্যই সুখী।’’ খুব একান্তে আমাকে পাইয়া ডাক্তার গৃহিণী বলিলেন, ‘‘বহুদিন বাদ আপনাকে পাইয়াছি, কিন্তু আপনি একটুও বদলান নাই। মনে হয়, আপনাকে একটুও হারাই নাই।’’ এক জ্যাঠাই মা কাঁদিয়া বলিলেন - ‘‘তোমাকে পূর্বের মতনই আদর করিতে ইচ্ছা হয়। সব বদলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তুমি এক রকমই আছ।’’ আরও এক জ্যাঠাইমা বলিলেন - ‘‘ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী সবই আছে, কিন্তু আপনার মতন কেহই নাই; কিন্তু তুমি খুব আপনার মতনই রহিয়া গিয়াছ।’’ যাঁহাদের সঙ্গে গভীর ভাবে স্নেহসূত্র ছিল, যাঁহাদের যত্ন ও সেবায় এবং আদরে প্রতিপালিত হইয়াছি, বুঝিলাম তাঁহাদের কাহারও কোনও প্রকার বিরক্তি আমার উপর নাই। কাজেই দেখা যায়, কয়েক দিনের জন্য হইলেও আমার জন্মভূমি দর্শনের অর্থ ব্যর্থ হয় নাই। এক পিসা মহাশয়, নাম হরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার। এঁরা শামসিদ্ধির মজুমদার বংশ। পূর্ববঙ্গে এঁরা বিখ্যাত প্রতাপশালী বংশ, এঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং ধার্মিক বংশ। শামসিদ্ধি গ্রামের গগনস্পর্শী শিবমন্দিরের চূড়া সাত আট মাইল দূর হইতেও দৃষ্টিগোচর হয়। হরেন্দ্র মজুমদার মহাশয় খুবই ভক্তিমান লোক, খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘পূজা ও জপাদি কালে মন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহার প্রতিকার কি?’’ আমি বলিলাম, ‘‘এখন আর প্রতিকার শিখিয়া কি করিবেন? ঈশ্বর তো সব। মন যেখানেই যায়, যাহাই ভাবে, সবই তো ঈশ্বর। কাজেই, ইহাতে অস্বস্তি লইবেন না।’’ মন ঈশ্বরকে যেভাবে ডাকিয়া তৃপ্তি

পায়, সেইভাবেই ভাবিতে থাকুক। ‘‘মন যাহা ভাবে সবই ঈশ্বর, জানিয়া রাখুন এবং তৃপ্ত থাকুন।’’ তিনি বলিলেন - ‘‘সমস্ত জীবন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিলাম এবং ঈশ্বরই যে সব এ কথা কত শতবার জানিলাম, কিন্তু আজ তুমি যাহা শুনাইলে, উহা এতদিন কেন বুঝিলাম না, বল তো?’’ আমি বলিলাম, ‘‘আর জানিয়াও প্রয়োজন নাই।’’ তিনি বলিলেন, ‘‘একবার মৃত্যুশয্যায় শেষ অবস্থায় ছিলাম। শেষ সময় বুঝিয়া আত্মীয়রা আমাকে বাহিরে আনিয়াছে। আমি তখন কিছুই জানি না। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন। দেখিতেছি, দুইটা কালা রঙের মানুষ, হাতে লোহার ডাণ্ডা, নিকটে স্টিমারের বয়লারের মতন একটা অগ্নির চুলা। ভীষণ ভাবে আগুন জ্বলিতেছে, আমাকে বলিতেছে, ওই আগুনের মধ্য দিয়া লইয়া যাইবে। বলিতেছে এবং লোহার ডাণ্ডা মারিবে, বলিতেছে। আমি অসহায় হইয়া গুরুকে স্মরণ করিলাম, তৎক্ষণাৎ গুরু আসিলেন। আমি বলিলাম বাবা! ওরা আমাকে এই আগুনের চুলার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবে, ইহা বলিয়াই আমি কাঁদিতে লাগিলাম। গুরুদেব বলিলেন, চল, আমিও সঙ্গে যাইতেছি। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নির চুলা পার করিয়া দিলেন। আমি একটু তাপও অনুভব করিলাম না। আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলাম, সকলে আমার শেষ অবস্থা জানিয়া কান্নাকাটি করিতেছে।’’

আমাকে একা পাইয়া, এক ভাই (পিসীমার ছেলে) আমাকে তাঁহার এক ছেলের টেরোরিজম প্রীতির এক লম্বা ইতিহাস বলিলেন এবং ইহার প্রতিকার করিয়া দিতে হইবে, বলিলেন। আমি বলিলাম, ‘‘দেশের নেতারা সব অদূরদর্শী ও মূর্খ, ইঁহারা মুসলমানদের ইতিহাস জানেন না। মুসলমান চিরদিন ভারতের শত্রু, জাতীয়তার শত্রু। হাজার বৎসরে ওরা বদলায় নাই, কোন দিনই বদলাইবে না। নেতা ও পত্রিকাওয়ালারা মুসলমানদের তোষণ করিবার জন্যই ‘‘অহিংস’’বাদের ভণ্ডামী ধরিয়াছে। এমন অবস্থায় যুবকরা কোন সাহসে টেরোরিজম করে, আমার মাথায় আসে না। যাহা হউক, আমি ধীরে ধীরে বদলাইয়া দিব,’’ বলিলাম। ইহা সত্য কথা যে, আমি ধীরে ধীরে বদলাইয়া দিয়াছিলাম। একটা গ্রীষ্ম, পূর্ববঙ্গে অবস্থানের পর বুঝিলাম - আমার শরীর রক্ষা ও সমাজ কল্যাণ, দুই লক্ষ্যেই, গ্রীষ্মকালে বাংলায় থাকা আমার প্রয়োজন। সুতরাং আমি পর পর কয়েক বৎসরই বাংলায় আসিলাম। পরে রংপুরে একটা আশ্রমও করিলাম। রংপুরে এবং নারায়ণগঞ্জে কম্যুনিজম, মুসলমান তোষক এবং রামকৃষ্ণ বাদ-ধর্মের মুখোস পড়া কয়েকটি যুবকদল দ্বারা কয়েকবার আক্রান্তও হইলাম; তবে কোন আক্রমণেই শরীর আহত হয় নাই। বা তাহারাও আহত হয় নাই। নারায়ণগঞ্জের প্রসূতি ভবনটি প্রফুল্ল ব্যানার্জীর দানে প্রতিষ্ঠিত সরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহার চারিদিকেই মুসলমান বস্তি। হিন্দু নার্শ, হিন্দু ডাক্তারের পরিবার, প্রসূতি ভবনে গমনাগমন করিতে বাধ্য হিন্দু নারীরা সব সময়ই আক্রান্ত হয় ও ভীতভাবে চলাফেরা করিতে বাধ্য হয়। ঢাকা কলেজের হিন্দু কন্যাগণকে মুসলমান যুবকরা সর্বদা প্রকাশ্যভাবেই অপমান করিয়া চলিয়াছে। কোন হিন্দু যুবক প্রতিবাদ করিলেও মুসলমান ছাত্র এবং কম্যুনিষ্ট, এবং কংগ্রেস ভাবাপন্ন হিন্দু যুবকরা একজোট হইয়া প্রতিবাদপরায়ণ হিন্দু ছাত্রগণকে ‘‘আদর্শবাদী! আদর্শবাদী!’’ বলিয়া হাততালী দিতে থাকে। এ ভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর, ঐ দেশে আরও নূতন রূপ দেখিলাম। নারায়ণগঞ্জের আশেপাশের হিন্দু

বাড়িগুলি সবই কাঁটা তারে ঘেরা হয়েছে। তাহাদের হয়তো ধারণা, এই কাঁটা তার ভেদ করিয়া মুসলমানেরা ইঁহাদের বাড়িতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, স্ত্রী কন্যাগণকে এবং সম্পদও ছিনাইতে পারিবে না। ইতিপূর্বে বহু খণ্ড গ্রামে হিন্দুদের উপর ব্যাপক আক্রমণ ও লুট হইয়া গিয়াছে। গান্ধিবাবা এবং অহিংসার মহিমায় এখনও বঙ্গদেশের পত্রিকা এবং যুবকগণ আচ্ছন্নই আছে। শেষ পর্যন্ত কলিকাতা এবং নোয়াখালীতে ব্যাপক গুণ্ডামী আরম্ভ হইল। অহিংসাবাদী মূর্খ হিন্দু নেতারা এখন ভাবিল "এখন দেশ ভাগ করিয়া দেওয়াই ভাল, অহিংসার মুখোসটি যদি আরও ফাঁস হইয়া যায়, তবে হয়তো খণ্ড ভারতে স্থখের রাজ্য চালানো কঠিন হইবে।" গান্ধীবাবা সদলবলে নোয়াখালীতে প্রবেশ করিলেন এবং পাকিস্তানের অনুকূলে সব ব্যবস্থাই করিয়া দিলেন। পাকিস্তান হইয়া গেল; আমারও পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ আরও দুই-এক বারের মতন হইল। গৃহত্যাগ কালে দেখিলাম, মুসলমানেরা মসজিদে মসজিদে হিন্দু বিদ্বেষের আলোচনায় তৎপর হইয়াছে। গৃহত্যাগের পর তেরো বৎসর বাদ বঙ্গদেশে দেখিলাম, ইংরেজ রাজপুরুষ ও পুলিসবাহিনীর ভয়ঙ্কর অত্যাচার হিন্দুদের উপর চলিয়াছে। ইহার পর যতবারই পূর্ববঙ্গে গিয়াছি ততবারই দেখিয়াছি, পথেঘাটে হিন্দুর সঙ্গে কোনও প্রকারে একটা ছিদ্র খুঁজিয়া মারপিট ও লুটের ফন্দী চলিয়াছে। এইভাবে পাকিস্তান হইবার পরও আমি দুইবার পূর্ববঙ্গে গিয়াছি - শেষ দুইবার দেখিলাম, হিন্দু জনতার মুখের উপর পরাজয়ের ও হতাশার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। আমার অন্তরে শক্তিবাদীয় হিন্দুত্ব বিরাজমান, কাজেই এই দৃশ্য আমাকে ভয়ঙ্কর ব্যথা দেয়। সমস্ত ভারতের হিন্দুই একদিন দুর্বলবাদী ও মূর্খের ষড়যন্ত্রে ঐ পরাজয় এবং হতাশার মলিন রঙে রঞ্জিত হইবার পথে দাঁড়াইয়া আছে!! পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হইল, পূর্ববঙ্গও প্রায় হিন্দুশূন্য হইতে চলিয়াছে। আসাম পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরাতে উল্টা মুসলমান জনতা পাকিস্তান হইতে ভর্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অশোকের পাথরের স্তম্ভ ভারতের রাজা হইয়াছে। টাকায়, পয়সায়, ডাকখানার টিকিটে, রাজ্যের ও কোর্টের সমস্ত কাগজপত্রে পাথরের ছাপের আড়ালে মুসলমান তোষণ, মূর্খের রাজ্য ও শাসন চলিয়াছে। আজ ভারতব্যাপী নাকি রাম-রাজত্ব হইয়াছে। অহিংসার পঞ্চশীলের বন্ধনে আবদ্ধ ও অন্তরঙ্গ মিত্র চীন ভারতকে আক্রমণ করিয়া ভারতের দুইদিকে দুইটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এই দুর্দিনেও ভারতের নেতাগণের মস্তিষ্কে শক্তিবাদের নীতি প্রবেশ করিল না। মনে হয়, অশোকের পাথরের স্তম্ভ ভিন্ন নেতাগণের মস্তিষ্কে অন্য কোন পদার্থই নাই। সন্তান যখন পিতামাতার সৎ উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া পথভ্রষ্টের নীতি গ্রহণ করে, সেই সময়ে, হাজার সৎ উপদেশ ও চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নীতিভ্রষ্টের নীতি হইতে সন্তান যেমন ফিরিয়া আসে না, ভারতের নেতাগণের চিন্তাশক্তির হীনতাও সেই পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গ এবং ভারতের এক অংশে হিন্দুর দুর্দশার জন্য যে নীতি দায়ী ভারত আজও উহার সংশোধন করে নাই। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া রাখি, যবনের তোষণ, ভারতের আরও ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করিবে।

আলমোড়া ভ্রমণ

চুনার পাহাড়-আশ্রমে অবস্থানকালে আমার মস্তিষ্কে একটা শুষ্ক অস্বস্তিও স্থান পাইয়াছিল। ইহার কি প্রতিকার আছে, অনেকদিন চিন্তিত ছিলাম। শেষ পর্যন্ত এক বৎসর গ্রীষ্মকালে আলমোড়া যাইবার কথা নিশ্চয় হইল। ইহার ফল, আমার মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ সুখদায়ক হইয়াছিল। কাঠগোদাম হইতে আলমোড়া বিরাশি মাইল, এই পথে বাসে চলিবার পথেই আমার মস্তিষ্কের শুষ্কতা নির্মূল হইল। আলমোড়ার জনতা আমার সঙ্গে যেমন সৎ ও সরল ব্যবহার করিয়াছে, উহা আমার মনে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। ওই স্থানের নরনারীর ধর্মভাব অত্যন্ত সুন্দর। আসিবার দিন, বহু নরনারী আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তাঁহারা ক্রন্দনপরায়ণ হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন। তাঁহাদের সহজ, সরল, সুন্দর ও সংযত জীবনের স্মৃতি আজও আমার মনে অঙ্কিত আছে। পথে চলিবার কালে, কোন নারীকে মুখ তুলিয়া তাকাইবার চেষ্টা, আমি একদিনও দেখি নাই। কথাপ্রসঙ্গে, আমি এ বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, এই বিষয়ে সাত আট বৎসর পূর্বে রাস্তাঘাটে আরও সংযমের ভাব ছিল। এখন মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিতে রাস্তাঘাটের এই সংযমতা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন যুবকগণের মধ্যে এই নীতির অপলাপ দেখা দিয়াছে। আলমোড়া খুবই ছোট শহর, দেখিতে খুবই সুন্দর। এখানের চালচলনের একটা ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ অভ্যাস আমার মনকে আজও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রাতঃভ্রমণ কালে যখনই আমি শহর বা বাজারের পথে বাহির হইয়াছি, তখনই দেখিতে পাইয়াছি, পথ চলিতে ময়লাভরা কাগজে পথটি আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহারা ঘরের মধ্যে বা ছাদে বসিয়া পায়খানা করে এবং সেই কাগজটা ধরিয়া পথে ফেলিয়া দেয়। যতক্ষণ মেথরগণ পথ পরিষ্কার না করে ততক্ষণ পথে চলা অত্যন্ত কঠিন। মধ্যভারত এবং উত্তরভারতে প্রায় সব স্থানেই মলত্যাগ বিষয়ে বেশ সভ্যতার অভাব দেখা যায়। ইহার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। আলমোড়ার নরনারীগণ আমার নিকটে প্রচুর পরিমাণে ধর্ম আলোচনার জন্য আসিত। আসিবার সময় তাঁহারা আমার সেবার জন্য চাল, ডাল, আটা, নুন, তেল, ঘি, মিষ্টি, ফল, তরকারী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে আনিতেন। যাহার ফলে, ওইখানে অবস্থান কালে আমার "আকাশবৃত্তি"র কোনই অসুবিধা হইত না। আসিবার সময় তাহাদের বিদায় বাণী "মহাত্মা! মহাত্মা! আবার আসিবেন।" আমার অন্তরে আজও ধ্বনিত হইতেছে। ওখানে মেয়েদের জীবন একটু কঠোর ও পরিশ্রমময়, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে খুবই স্বাধীন।

পুরীধাম

একটা গ্রীষ্ম আমার পুরীতে অবস্থানের ব্যবস্থা হইল। মুক্তাগাছার জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরীর ব্যবস্থায় আমি কয়েক মাস পুরীধামে অবস্থান করিলাম। বীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার ধর্মপত্নী সুনীতিবালা দেবী চৌধুরাণী এবং বালিকা-কন্যা প্রতিমা দেবীর সেবাযত্ন এবং আন্তরিক ভক্তিভাব আমার অন্তরে আজও গভীর স্মৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি নিত্য সমুদ্র-স্নান করিতাম এবং একজন উড়িষ্যাদেশীয় বৈষ্ণব

সাধুর কুটিয়াতে অবস্থান করিতাম। বীরেন প্রভৃতিদের সমুদ্রের ধারে ‘‘স্বরেন্দ্র স্মৃতি’’ নামক বাড়ী আছে। তাঁহারা ঐখানেই অবস্থান করিতেন। সমুদ্র দর্শন করিয়া আমি প্রথম দিন সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। এত বড় দৃশ্য আমি এই প্রথম দেখিলাম। পুরীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দর্শন ছিল - এক যোগী মহাপুরুষের দর্শন। তিনি লোকনাথ নামক স্থানে এক বালির ঢিপির উপর একটা খড়ের ঘরে অবস্থান করিতেন। এমন প্রভাবশালী যোগী মহাপুরুষ আমি জীবনে আর দর্শন করি নাই। দর্শনের পর তাঁহার একটা দিব্য ও শান্ত প্রভাব আমার অন্তরে কয়েকদিন পর্যন্ত একভাবেই বিদ্যমান ছিল। পুরীর জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর শিব মন্দির, অ্যালিফ্যাণ্টা গুহা, সাক্ষীগোপাল, সবই আমি দর্শন করিয়াছি; কিন্তু বীরেনদের আন্তরিক ভক্তি এবং ঐ যোগী মহাপুরুষের যোগ প্রতিভার মত কোন দর্শনই আমার অন্তরে ততটা গভীর স্মৃতি আঁকিয়া দেয় নাই। বালিকা প্রতিমা দেবীর দাবী ছিল, ‘‘সে একটি ভাই পাইবে।’’ আমিও বলিয়াছিলাম ‘‘হ্যাঁ পাইবে।’’ সেও এক স্মরণীয় ঘটনা। প্রতিমা দেবী ভাই পাইয়াছে, ইহা সত্য ঘটনা। পুরীর সমুদ্রধারে আমি একদিন মরীচিকা (মৃগ তৃষ্ণা) দেখিয়াছিলাম। শূন্য বালির চড়ে বাড়ীঘর, বন, জঙ্গল, বাগান সব রহিয়াছে। জীবনে ইহা একটা নূতন দর্শন। পুরীর স্মৃতির মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধযুক্ত স্মৃতিও আমার মনে থাকিবে। গ্রীষ্মকালে মৎস্যজীবী জেলেরা লক্ষ লক্ষ মণ মৎস্য শিকার করে এবং সেইগুলিকে সমুদ্রের ধারে শুষ্ক বালির উপর রাখিয়া শুষ্ক করে। শুষ্ক মৎস্যের দুর্গন্ধের কথা যতদিন মনে থাকিবে ততকাল আর গ্রীষ্মকালে পুরীবাসের ইচ্ছা আর জাগ্রত হইবে না। এখানে নির্জন তপস্যা খুবই ভাল হইয়াছে। বীরেনের মত গুরুসেবা সত্যই দুর্লভ। পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসর পরেই বীরেন মারা যায়।

বীরেনের ব্যবস্থায় এবং আকর্ষণে আমি তাহার জন্মভূমি মুক্তাগাছায়ও গিয়াছিলাম। সেখানে রাজোচিত সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় আমি আট নয়দিন ছিলাম। বীরেনের এক কাকা, নাম মনে নাই অনেক সময়ই আমার কাছে কাছে থাকতেন। তাঁহার ধারণা টিয়ার (বীরেনের নাম) স্মরণযোগ্য গুরু তাঁহার বংশের কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। এ কথা তিনি সর্বদাই বলিতেন। আহারান্তে আমি আমার আসনখানা পা দিয়া সরাইয়া দিয়া থাকি। এ ঘটনাও তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, মা আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘‘আহারের পর আসন সরাইয়া দিবে।’’ আমি সেই কথা মতই আসন সরাইয়া দিই। আহারের পরই মাকে স্মরণ হয়। ভালই তো। তিনি বলিলেন, ‘‘আমি মুগ্ধ হইয়া আপনার সমগ্র কার্য লক্ষ্য করি, আপনার আচার বিচার ব্যবহার ও শুদ্ধাচার একজন শুদ্ধাচারিণী বিধবা হইতেও স্বচ্ছ।’’ নিত্য সন্ধ্যার পর আঠারো ঊনিশ ঘর জমিদার সকলেই আসিতেন এবং নানারকম প্রশ্ন করিতেন। সকলেই মুগ্ধ হইয়া উত্তর ও মীমাংসা শ্রবণ করিতেন এবং যাইবার সময় টিয়াবাবুকে সকলে এক বাক্যে ধন্য ধন্য করিয়া চলিয়া যাইতেন। আজও আমি বীরেনের মত শিষ্যের অভাব নিত্য অনুভব করি। তাহার মহান্ আত্মার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। সে নিত্য আমাকে আসনে বসাইয়া পা দুইটা পাথরের বৃহৎ থালায় রাখিয়া অন্ততঃ দুইঘণ্টা পূজা করিত। শান্তির ছটায় তাহার মুখচোখ ভরিয়া যাইত।

ব্রহ্মদেশের কথা

কয়েক বৎসর পূর্বেও ব্রহ্মদেশে প্রবেশের জন্য পাশপোর্ট লাগিত না, এখন লাগে। আমি স্থির করিলাম ব্রহ্মদেশ দর্শন করিব। পবিত্র 'ইরাবতী' নদীতে স্নান করিব। পাশপোর্টের দরখাস্ত করিলাম। ছয় মাসেও কোন সাড়া নাই। শেষকালে কোন অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শে নিজে মির্জাপুরের কালেকটরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি ফর্ম নিন, আবার আবেদন করুন।" আমি ফর্মখানা হাতে লইয়া বাহির হইয়াছি, এমন সময় এক মুসলমান উকিল ভদ্রলোক আমাকে প্রণাম জানাইয়া কিসের কাগজ, জিজ্ঞাসা করিয়াই কাগজখানা হাতে লইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি আপনার ফর্মটি লিখিয়া দিতেছি, এবং আমি আপনার বিদেশে ভ্রমণের টাকার জামিন হইতেছি। আমি ছাড়াও আপনার আরও একজন জামিনদার লাগিবে। আমাকে দয়া করিয়া এই সেবাটুকু করিতে সুযোগ দিন।" ওখানেই একজন হিন্দু উকিল আপনিই জুটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আমার ব্যাঙ্কে টাকা আছে, আমি আপনার দ্বিতীয় জামিনদার হইলাম।" আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম এবং মাসেকখানেক পরই পাশপোর্ট আসিল। পাশপোর্টের সংবাদ ব্রহ্মদেশে জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শক্তিবাদী শিষ্য শ্রী পি.এম. বসু এয়ারে যাইবার ও আসিবার টাকা জমা দিয়া এয়ারের পাশ পাঠাইয়া দিলেন। কোন একটা কাজের ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের সংস্পর্শে যাতায়াত করার কোন সংযোগ আমার জীবনে খুবই কম আসিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও অনেক স্থানেই বেসরকারী এবং সরকারী কর্মচারীরা অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে আমার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন স্বরাজ হইবার তারিখ যতদূরে যাইতেছে, ততই লোকের ব্যবহার এবং কর্মে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে। আমি এই কয় বৎসরের মধ্যে ভারতের বুকে শিক্ষিত মূর্খের দাম্ভিকতা এবং আস্পর্ধা বেশ ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ব্রহ্মদেশে পৌঁছিয়া আমি শক্তিবাদ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক সেখানে অবস্থান করে। ভারতীয় সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ই সেখানে বেশ শক্ত কেন্দ্র করিয়া লইয়াছে। বাঙালীদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ধর্মস্থান দুর্গাবাড়ী। সেখানে দুর্গাপূজার সময় সমস্ত ভারতীয় হিন্দু ও ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ অসংখ্য সংখ্যায় সমবেত হইয়া থাকেন এবং পূজা ও অঞ্জলি দান করিয়া পুণ্য অর্জন করেন। দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুগণেরও মন্দির তাহাদের নিজেদের ডিজাইনে সেখানে কয়েকটি রহিয়াছে, আমি সবই দর্শন করিলাম। হনুমান মন্দির এবং গোশালাও দর্শন করিলাম। চীনদেশীয় ধর্মমন্দিরও সেখানে প্রচুর রহিয়াছে। আমি সবই দর্শন করিলাম। সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই আমি দোভাষীর সাহায্যে মিশিবার এবং ভাববিনিময়ের চেষ্টা করিয়াছি। চীনদেশীয় মন্দিরগুলিতে বহু সংখ্যক বুদ্ধ মহাপুরুষের মূর্তি রহিয়াছেন। সেই সব বৌদ্ধ মূর্তিতে গৌতম বুদ্ধেরও মূর্তিটি বিরাজমান। এক বুদ্ধ মহাপুরুষের আপাদলম্বিত চুল জটা এবং সেই অনুপাতে লম্বা দাড়িগোঁফ, হাতে লম্বা বর্শা। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বুদ্ধ মহাপুরুষের হস্তে বর্শা কেন? মঠবাসীরা বলিলেন, বৌদ্ধবাদীদের উপর অন্য সম্প্রদায়ের

সংঘবদ্ধ অত্যাচার হইয়াছিল, তিনি তখন বৌদ্ধগণকে শক্তিপ্রয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি নালন্দায় বর্বর মুসলমানদের দ্বারা তিন লক্ষ অহিংসবাদী বৌদ্ধের শিরচ্ছেদের মর্মান্তিক ইতিহাসের কথা ভাবিলাম এবং বুঝিলাম, ভারতের বৌদ্ধদের মধ্যে শক্তিবাদ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। অনেকে বলেন, বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের লীলাখেলার জন্যই নাকি বৌদ্ধবাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি - ভিক্ষু এবং ভিক্ষুনীদের লীলাখেলায় বৌদ্ধবাদ ভাঙে নাই। পৌরোহিত্যবাদী মূর্খগণ এইরূপ মিথ্যার প্রচার করিয়াছে। শক্তিহীনতাই বৌদ্ধবাদের পতনের কারণ। মুসলমান ও খৃষ্টানেরা ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের চেয়ে অনেক বেশী লীলাখেলায় পটু, কিন্তু তাহারা শক্তিহীনতা হইতে অসুরবাদকে বেশী আঁকড়াইয়া আজও বলবান, কিন্তু হিন্দু জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্বলবাদ প্রবেশ করিয়াছে। ইহার যদি ক্ষালন না হয় তবে হিন্দুসভ্যতা ও অধ্যাত্ম সভ্যতাই বিলুপ্ত হইবে। আমি তাঁহাদিগকে শক্তিবাদের কথা বলিলাম। আমার সাথী গুজরাটী দোভাষী তাঁহাদিগকে আমার শক্তিবাদ মতবাদের পরিচয় করাইয়া বলিলেন, "ইনি একজন তপস্বী এবং যোগী মহাত্মা। ইঁহার প্রবর্তিত ধর্মের নাম 'শক্তিবাদ'; সত্য, প্রেম, শান্তি এবং অভয় গ্রহণ এবং অসুরবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ; ইঁহার প্রবর্তিত ধর্মের মর্মকথা। এই সমস্ত বুদ্ধ ভগবানদের ধর্মকথার যাহা মর্ম, শক্তিবাদ ধর্মেরও তাহা মর্মই।" আমি বহুবার চীনবাসী বৌদ্ধদের মঠে গমন করিয়াছি। সব সময়ই মঠবাসী এবং মঠবাসিনীগণ অত্যন্ত দিব্য ও উজ্জ্বল মুখ ও চক্ষে আমাকে "হিন্দুলামা, হিন্দুলামা" বলিয়া আদর যত্ন করিতেন ও আনন্দের ধারায় হাসিতে থাকিতেন। আমাকে দেখিলেই, আমাকে সকলে মিলিয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেন। মালায় তাঁহারা কি জপ করেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা ইংরেজী টাইপে ছাপা একখানা পুস্তিকা আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। পড়িয়া দেখিলাম বৌদ্ধ মহাপুরুষের নামের সঙ্গে 'নমহ্' যোগ করিয়া অনেক মন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। বুঝিলাম, এ সব জপের মধ্যে কোনই গভীর তত্ত্ব নাই। প্রত্যেক চীনামঠেই দুইখানা কাঠ এবং একটি চোঙার মধ্যে রক্ষিত অনেকগুলি বাঁশের চটার সাহায্যে গণনা করিবার রীতি বিদ্যমান। প্রত্যেক মঠেই আমাকে তাঁহাদের গণনায় নিজের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য তাঁহারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। চোঙার মধ্যে রক্ষিত বাঁশের চটাগুলির সংখ্যা হয়তো একশত হইবে (ঠিক জানি না)। প্রথম কাঠের টুকরা দুইটি মাটিতে বা টেবিলের উপর দুই হাতে লইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। কখন উহারা দুইখানাই চিৎ হয়, কখনও বা দুইখানাই উপুর হয় এবং কখনও একখানা উপুর এবং একখানা চিৎ হয়। দুইখানা চিৎ হইলে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এবং চোঙার মধ্যস্থিত বাঁশের চটাগুলিকে ঝাকিতে থাকেন। কিছুক্ষণ ঝাকিবার পরই একখানা চটা বাহির হইয়া আসিবে। প্রত্যেক চটাতেই কিছু না কিছু লেখা থাকে। যে চটাখানা বাহির হইয়া আসিল, উহা পড়িয়া প্রশ্নের উত্তর বলা হয়। আমি চীনাদের প্রত্যেক মঠেই তাঁহাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। ইহাতে আমার হাস্যরসের সুবিধা হইত এবং ওঁদের সঙ্গে মিশিবারও সুযোগ হইত। আমার প্রশ্ন থাকিত, 'শক্তিবাদের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে। সব মঠের উত্তরেই দেখা যাইত, "ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং

বহু লোকের দানে ইহার প্রভাব বৃদ্ধি হইবে।'' কোন কোন মঠের বাণী ''বিশিষ্ট কোন দাতার অর্থে ইহা হঠাৎ ব্যাপক প্রচারের সম্মুখীন হইবে। ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় মতবাদ হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।''

ব্রহ্মদেশের প্রধান ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। সেখানে স্বরাজ হইবার পর উহাকে এখন বৌদ্ধরাষ্ট্র বলা হয়। তাঁহাদের রাষ্ট্রধর্ম বৌদ্ধধর্ম। রেঙ্গুন শহরে অনেক বুদ্ধমন্দির রহিয়াছে, প্রধান বুদ্ধমন্দিরটি স্বর্ণপাতে মোড়া। শুনিলাম, ওই মন্দিরের ছায়া নাই। আমি অনেক বার স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছি। প্রধান মন্দিরের চারিদিকে সংলগ্নভাবে বহু মন্দির বিদ্যমান। প্রত্যেকটি মন্দির উজ্জ্বল স্বর্ণপাতে মোড়া। আমি মন্দিরে যত বারই গিয়াছি তত বারই মন্দিরের কেন যে ছায়া নাই, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। উজ্জ্বল স্বর্ণাবরণে আবরিত বলিয়াই মন্দিরগুলির ছায়া হয় না। স্বর্ণের মন্দিরগুলিতে দিনরাত আকাশের জ্যোতি প্রতিফলিত হয় বলিয়াই সূর্য বা চন্দ্রের আলো দ্বারা উৎপন্ন ছায়াগুলির প্রভাব থাকে না। মন্দিরের চারিদিকেই ফাঁকা খোলা স্থান রহিয়াছে। বেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়া দর্শন করা যায়। মন্দির বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া ধূলিকণাগুলি মন্দিরের চারিদিকের নালায় পতিত হয়। সেইখানে ধূলিগুলি জমা থাকিয়া জলটা বাহিরে চলিয়া যায়। প্রতি বৎসর এই ধূলিরাশি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হয়। এই ধূলিকণা ধুইয়া ইহা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণকণা সংগ্রহ করা হয়। প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজ ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন রাজাই এই স্বর্ণমন্দির ধ্বংস করিয়া ইহার স্বর্ণাবরণ লুটিয়া লইবার বা ইহাকে গীর্জায় পরিণত করিবার আদেশ দেন নাই। আমি কাশী বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দিরে বহু বার প্রবেশ করিয়াছি। বর্বর মুসলমান শাসনাধিকারে ইহাকে রাজশক্তির বলে মসজিদে পরিণত করা হইয়াছিল। মক্কাবাদী বর্বরদের বিরোধিতায় আজ পর্যন্ত ইহার উদ্ধারের কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। ওই মন্দিরে প্রবেশ করিলে আমার মনে ও শরীরে অগ্নির সঞ্চার হইত। বর্বররা ইহাকে আজও মসজিদের আকারে রাখার পক্ষপাতি। আমি বলিতে পারি, ইহার ফল ভাল হইবে না। এই তেজ এবং অগ্নি একদিন ভারত এবং পৃথিবী হইতে বর্বরবাদ ধ্বংসের কারণ হইবে। ইংরেজ রাজত্বে কেন বর্বরের শাসনের দুর্নীতির প্রতিকার হইল না? তথাকথিত ভারতীয় স্বাধীনতার যুগেও এই বর্বরতার প্রতিকার নাই। রেঙ্গুনের স্বর্ণমন্দির দেখিয়া আমি ইংরেজ শাসনের মহান আদর্শ অন্তর ভরিয়া অনুভব করিলাম। বুদ্ধ মন্দিরের আঙিনায় জুতা বা খড়ম পরিধান করিয়া প্রবেশ করা নিষেধ। কিন্তু জুতো বা খড়মজোড়া হাতে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। বৃহৎ মন্দিরসংযুক্ত প্রত্যেকটি ছোট মন্দিরেই বুদ্ধ মূর্তি রহিয়াছেন। এ সব বুদ্ধ মূর্তির সম্মুখে জলের ঘট রহিয়াছে। সেই ঘটে নিত্য জল ফেলিয়া দিয়া নিত্য জল ভরিয়া দেওয়া হয়। ইহা যে আমাদের দেশে দেবতার সামনে রক্ষিত ঘট স্থাপনারই নমুনা, ইহাতে সন্দেহ নাই। সকালবেলা ঝাড়ুদারেরা মন্দিরের আঙ্গিনা পরিষ্কার করিবার সময় এই জলপাত্রগুলির জল ফেলিয়া দেয় এবং পাত্রগুলিতে টাটকা জল পূর্ণ করিয়া দেয়। এই সব ঘটেই দর্শকগণ পুষ্প পত্রাদি দান করেন। ঝাড়ুদারের এক হাতে রাস্তা পরিষ্কারের ঝাড়ু এবং অন্য হাতে পূজার ঘটটি রহিয়াছে ইহা দেখিতে আমার পবিত্র সংস্কারে একটু বাধা মনে হইয়াছিল। পৌরোহিত্যবাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া একেবারে ঝাড়ুদারের ঝাড়ু হস্তে ঘটের জলের পূর্ণকরণ

কার্য, আমার দেখিতে ভাল লাগে নাই। ইহাদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের কোনই অমিল নাই। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নিয়ম একই প্রকার রহিয়াছে। এদের মধ্যে চার বর্ণ সংস্কার নাই। কর্মেরও ভাগ বিভাগ নাই। কর্মের ভাগ বিভাগ না থাকিবার দরুণ কাজকর্মের শৃঙ্খলা নাই। বংশগত উচ্চ আদর্শ নাই। এরা গোবধ করে না, কিন্তু গোমাংস কসাইয়ের দোকান হইতে সংগ্রহ করিয়া আহার করে। মুসলমানেরা মসজিদে গো-কোরবানী করে, বৌদ্ধ ব্রহ্মবাসীরা উহা সমর্থন করে না। এজন্য ব্রহ্মবাসীদের মুসলমানদের উপর ভয়ঙ্কর রোষ। আমি থাকাকালে মুসলমানদের বকর ঈদ উৎসব হইয়াছিল। সেই সময় অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে একটা মারপিট দেখা দিবে। কিন্তু উহা হয় নাই। কোরবানীর পর দেখা গেল, বড় বড় রাস্তার ধারে ধারে শত শত গোমুণ্ডগুলি জমা হইয়া পড়িয়া আছে। ইহা সত্যই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। যাহারা গোমাংস আহার করে, তাহারা কেন যে মুণ্ডটাকে নিজেদের উদরে স্থান দিতে পারিল না, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। অসহায় পশুগুলির বধকালীন অসহায় করুণ ভাবটি সেই মৃত মুণ্ডগুলির দৃষ্টিতে তখনও যেন বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্বত্র মুসলমানদের মসজিদ রহিয়াছে। মসজিদগুলির আকার একটু অস্বাভাবিক বৃহৎ। অভিজ্ঞ লোকের কথা, মারপিট করিবার জন্য এখানে নাকি দূর দূর হইতে বলিষ্ঠ লোকেরা একত্র হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রও সংগৃহীত হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে দুষ্কার্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশে খ্রীষ্টানরাও বেশ সঙ্ঘবদ্ধ। খ্রীষ্টানদের ধর্মস্থানগুলি আরও বৃহদাকার বিশিষ্ট। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পর বর্মীরা সেই সব বৃহদাকার বাড়ি গুলিতে বাসস্থান ও সাহায্য পায়। প্রতি রবিবার খ্রীষ্টানগণ সমবেতভাবে মিলিটারী ভঙ্গীতে কুচকাওয়াজ করিতে করিতে উপাসনাস্থানে গমন করে। তাহাদের বেশভূষাও একই রকমের থাকে। ব্রহ্মদেশের রাজশক্তি যে কেন পাকিস্থানী রাষ্ট্রের মত অমুসলমানদের বহিষ্কারনীতি অবৌদ্ধগণের উপর প্রয়োগ করে না, সেটা বুঝা গেল না। ভারতের নেতারা মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান করিয়া দিয়াও ভারতে মুসলমান পোষণ ও তোষণলীলা চালাইতেছেন এবং মুসলমানেরাও ভারতের এক অংশে মুসলমান রাষ্ট্র গড়িয়া লইয়া আবার প্রস্তুত হইতেছে। রাষ্ট্রশক্তি, সমাজশক্তি ও জনশক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্তব্য বিপজ্জনকদিগকে সংস্কারসাধন করা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও আমিষ আহারী। এদেশে ভিক্ষা চাওয়া নাই। কিন্তু প্রধান মন্দিরের চার দ্বারেই লোককে মন্দিরের কার্যে কিছু দিবার জন্য মন আকর্ষণ করিবার জন্য একটি করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করা হয়। আমি দেখিলাম, বারবারই লোকটা আমার দিকে তাকাইতেছে এবং মন্দিরের কার্যে কিছু দিবার জন্য এক একটি ঘণ্টাধ্বনি করিতেছে। তাহার সামনেই অর্থ এবং পয়সার আধারটি খোলাভাবেই পড়িয়া আছে। এদের সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করেন না। গৃহীরা সন্ন্যাসীদের জন্য খাদ্য নিজের খাদ্য হইতে সংগ্রহ রাখে। সন্ন্যাসীরা খুব ভোরের সময় রাস্তার কোণে একটিমাত্র ঘণ্টাধ্বনি করিয়া রাস্তা ধরিয়া হাটিয়া চলিয়া যান। গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের জন্য রক্ষিত অন্ন তাঁহাদের পাত্রে দিয়া দেন। রান্না বিষয়ে ইঁহাদের কোনও প্রকার উচ্ছিষ্ট সংস্কার নাই। বৃহৎ রান্নাকালে দেখা যায়, ডাল তরকারীগুলি বড় বড় বাসনে ঢাকা রহিয়াছে। সেই ঢাকা খাদ্যের উপর একটি হাতও রহিয়াছে। পরিচিত ও আত্মীয়গণ সেই হাতা দ্বারা খাদ্য একটু বাহির করিয়া হাতাটি ঠোঁটে লাগাইয়া চাটিয়া দেখেন এবং হাতাটি সেইভাবেই

ঢাকনার উপর রাখিয়া দেন। এক বর্মিণী মহিলা আমাকে আহার্য্য দিবার প্রস্তাব করেন। আমি বলিলাম, আপনি একদিন এখানে আসুন, আমার বাসনে রান্না করুন এবং আমাকে আহার করাইয়া দিন। আপনাদের বাড়ীর রান্নার খাদ্য গ্রহণে আমার মনের তৃপ্তি হইবে না। আপনি রন্ধনকালে হাতার খাদ্যের অংশ তুলিয়া নিজের মুখে চুমুক দিয়া বা লেহনে স্বাদ পরীক্ষা করিবেন এবং বাকীটুকু রান্নার হাঁড়িতে রাখিয়া দিবেন, এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত অন্ন আহার করিতে আমার সংস্কার বাধা দেয়। পরদিন মহিলা একটা নূতন এ্যালোমিনাম বাসনে আমার জন্য আলু ভাজিয়া আনিয়া আমার সামনে রাখিলেন এবং আমিও উহা তাঁহার সামনেই আহার করিলাম।

বুদ্ধ ইহাদের পূজ্য ভগবান হইলেও ব্রহ্মদেশের জাতীয় দেবতা আছেন। জাতীয় দেবতার মূর্তি ইঁহারা মন্দিরে রাখেন না। বাড়ীর সামনে একটু উঁচু টেবিলে অনেক স্থানেই জাতীয় দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয় দেবতার পূজা উৎসবে ইহারা বহুলোক সমবেত হয়, পূজাদি বাদ্যসহ আরতির নৃত্যে, বেশ ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় দেবতারা ভাইবোন। এদের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। ইহাতে সমাজের সমর্থন ছিল না। ফলে, ভাইকে আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই অগ্নিতে ভগ্নীও স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেন। ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবেই ভাইবোন মৃত্যু বরণ করেন এবং ইহাদিগকেই জাতীয় দেবতা বলিয়া সকলে মানিয়া লয়।

সঙ্গীত বিষয়ে সমস্ত ব্রহ্মদেশে মাত্র একটিই সুর আছে। ব্যক্তিগত গানে সিনেমার গানে এবং রেডিওতে ঐ একটি সুরই বিদ্যমান। এরা হাতের কারুকার্য কর্মে খুবই নিপুণ এবং বেশভূষা এবং সাজসজ্জায় খুবই সুন্দর। গ্রাম্যদেশে ভ্রমণকালে দেখিয়াছি, গৃহস্থ বাড়ীর সামনে একটি মাটির কলসীতে জল সাজানো রহিয়াছে, কলসীর মুখে একটি গ্লাস রহিয়াছে। পথিকরা সেই কলসী হইতে জল ঢালিয়া জলপান করে এবং গ্লাসটি না ধুইয়াই কলসীর উপর রাখিয়া দেয়। গ্রাম্যদেশ ভ্রমণকালে আমি হঠাৎ একটি আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমার পায়ে খড়ম ছিল। আমি মৌনী ছিলাম (মঙ্গলবার)। ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়, খড়ম পায়ে মঠের বাগানে প্রবেশ করিবার অপরাধে, আমাকে ক্রুদ্ধ ভাষায় গালি দিতে ছিলেন। কেহ কেহ আমাকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে ভীষণ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বলিলেন, "খড়মটা ছাড়িয়া দিন।" আমি খড়মটা ছাড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শান্ত হইলেন। আমি মৌনী ছিলাম, কাজেই ধীরে ধীরে খড়ম দুইটা হাতে লইয়া মঠের বাগান হইতে চলিয়া আসিলাম। ইঁহাদের ভাষার বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালার মত। ইঁহারা ক গাজী, খ গাজী, গ গাজী, ঘ গাজী ইত্যাদি বর্ণমালার উচ্চারণ করেন। ইঁহারা দুধ পান করেন না। গাভীও পোষেণ না। বাচ্চাগণকে মায়ের দুধ, ফলাফল এবং নিজের মুখে চিবাইয়া পাখীর মত বাচ্চার মুখে আহার্য্য প্রদান করিয়া, বাচ্চা পোষণ করেন। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা হইলেও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধরা যজ্ঞ মানেন না। হীনযানী বৌদ্ধরা কোথাও যজ্ঞ মানেন না, কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধরা যজ্ঞ মানেন। ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধরা পায়খানার পর জলশৌচ করেন না। ইঁহারা দুইখানা বাঁশের নেল দ্বারা মলদ্বার চাছিয়া পরিষ্কার করেন এবং নেল দুইখানা পায়খানার মধ্যেই ফেলিয়া দেন। বিবাহের পর, ছেলেরা মেয়ের বাড়ী চলিয়া আসেন এবং তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ীতেই আড্ডা করিতে

হয়। এই প্রথায় রাজকর্মচারীদের আফিসের কার্য্য চালানো বিষয়ে ভয়ঙ্কর অসুবিধা হয়। কাজেই কর্মচারীদিগকে বাসস্থান দিবার জন্য সর্বত্র সরকারী কোয়ার্টারস্ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। বর্মীরা সভ্য এবং ভদ্রজাতি। তবে অনেক বিষয়ে একটু বেশী ভাবপ্রবণ বলিয়া মনে হইত। আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি, ভদ্রলোকটি কর্মান্তে বাড়িতে ফিরিয়াই একটা বড় কুকুরীকে কোলে লইয়া বেড়াইতেছেন এবং তাঁহার স্ত্রীও বাড়ীর বড় কুকুরকে কোলে তুলিয়া লইয়া হাটাচলা করিতেছেন। স্বরাজ হইবার পর এঁদের জাতীয়তার ভাবপ্রবণতা মুসলমান তোষক এবং অহিংসাবাদী ভারত রাষ্ট্র হইতেও একটু বেশী গভীর বলিয়া মনে হইল। অনেক স্থান হইতেই ইঁহারা বিদেশী পরিচালিত ধানের চাষ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে ধানের চাষ কমিয়া গিয়াছে। রেঙ্গুন শহর হইতে ইঁহারা ট্রাম কোম্পানীকে বিতাড়ণ করিয়াছেন; ফলে শহরের ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়াছে। সেইখানে বাস চলে, উহার ভাড়া প্রায় আটগুণ বেশী। স্বরাজ হইবার পর, বহুস্থানের গ্রামবাসীরা সন্ধ্যাবেলা ইলেক্‌ট্রিক তারের সঙ্গে বাড়ীর তার চুরিপ্রথায় সংযোগ করিয়া সমস্ত রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থা করেন এবং কোম্পানীকে ঠকাইয়া থাকেন।

বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হইবার দরুণ ষ্টেট বৌদ্ধধর্মের জন্য প্রচুর ব্যয় করেন। জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানেরাও সরকারী সাহায্য আদায় করেন। সেই অর্থে তাহারা সর্বত্র মোক্তব পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। সরকারী অর্থে মুসলমানেরা যে ব্রহ্মদেশে একখানা পাকিস্তান গড়িবার ভিত্তি প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা ঐ দেশের অনেক বৌদ্ধনেতারাও উপলব্ধি করিতেছেন; ঐ দেশে, নেতৃস্থানীয় অনেক বিশিষ্ট লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। ধর্মমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রধান মন্ত্রীর এক বন্ধু সর্বদা আসিতেন। ভারতব্রহ্ম এক থাকাকালে ব্রহ্মদেশের বিশিষ্ট নেতা ঊ বা মং ও আমার নিকট আসিতেন। এঁরা সকলেই ভারত ভাগ হইয়া পাকিস্তান হওয়া এবং ভারত হইতে ব্রহ্মের বিচ্ছেদ হওয়াকে দুই দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর মনে করিতেন। এঁরা সকলেই শক্তিবাদের অনুকূলে ছিলেন, এবং ভারত ভাগ বিষয়ে যে গান্ধিজী এবং নেহেরুজী দায়ী, একথা বলিতেন। মুস্‌লিম্ তোষণ এবং ভারত ভাগে রাজী না হইতে, ঊ বা মং বহুবার গান্ধী এবং নেহেরুজীকে অনুরোধ করিয়াছেন, বলিয়া, বলিলেন। এঁরা আমাকে বার বার বলিয়াছেন, ‘‘আপনি যদি শক্তিবাদ প্রচার করিতে চান, তবে ব্রহ্মদেশের নাগরিক হউন, এখানে বাস করুন, এটা ছোট দেশ, এখানে বসিয়া আপনি অতি সহজে সমস্ত পৃথিবীকে শক্তিবাদে দীক্ষা দিতে সক্ষম হইবেন। ভারতে শক্তিবাদের আদর হইবে না, ভারতের দূরদৃষ্টি নাই।’’ ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে, একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আমার নিকটে সর্বদাই আসিতেন, ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া গিয়াছেন। ভাল হিন্দী বলিতেন। ব্রহ্মদেশে আমি শ্রী পি. এম. বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতাম। সে এবং তাহার ধর্মপত্নী মায়া দেবীর সেবায় এবং ব্যবস্থায় আমার ব্রহ্মদেশের ভ্রমণ সফলতার সহিতই সম্পন্ন হইয়াছিল। ডাঃ সমর রায়, শুক্লাজী, পটল দত্ত, মিস রিবন এবং অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য লোক আমাকে নানাভাবে সেবা ও সাহায্য করিয়াছেন। আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, দুর্গাবাড়ী সংস্থা, আমার অনেক বক্তৃতার সব রকম ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের প্রধান

সেক্রেটারী শ্রী (নাম মনে নাই) আমার নিকট অনেকবার আসিয়াছেন এবং আমার সঙ্গে অ্যামেরিকায় ধর্মের ব্যাপক সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রী সেক্রেটারী বলিলেন, "খৃষ্টবাদের মত যুক্তিহীন মতবাদ অ্যামেরিকার শিক্ষিত সম্প্রদায় পছন্দ করেন না, তাঁহারা বৌদ্ধ বা হিন্দুধর্মের কথাই ভাবিতেছেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব অ্যামেরিকায় সর্বাধিক। আপনি হিন্দুধর্মের শক্তিবাদ অংশকে প্রধানতা দিয়া ধর্মসংস্কারের পক্ষপাতী। আপনার কথায় বুঝিলাম, আপনি পৃথিবীকে ঐ ধর্মে প্লাবিত করিতে চাহেন। আপনি অ্যামেরিকায় চলুন, আপনি আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, আমার মা আপনার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, সব রকম সেবা করিবেন। আমার মা হিন্দুভাবাপন্ন এবং ধার্মিক। বর্তমান অ্যামেরিকা আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দ হইতেও অধিক আপনার করিয়া লইবে।" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলাম। আমি দেখিলাম, এইরূপ বিপ্লব ঘটাইতে হইলে রাজশক্তির চেষ্টা না থাকিলে সম্ভব নহে। ব্রহ্মদেশ যে ১৬ আনা বৌদ্ধ দেশ হইয়াছিল, ইহার মূলে রাজশক্তির বল না থাকিলে সম্ভব হইত না। আমরা সমস্ত ভারতে এবং সমস্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ও ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন চাই। এবং সমস্ত সমাজ রাষ্ট্র এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে শক্তিবাদের আলোচনার প্রবর্তন চাই। শ্রীসেক্রেটারীজী খুব বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি অতি সহজে আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অ্যামেরিকার জন্য ঐরূপ একটি শক্তিশালী ধর্মের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। স্বদেশ, ধর্ম এবং মানুষকে ভালবাসার এইরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত আমি অনেকই পাইয়াছি। তবুও আমি জানি না, সেইদিন কখন আসিবে, যখন ভারতের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শক্তিবাদ দুর্বলবাদ ও অস্থরবাদ বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থা হইবে এবং ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান হইয়া পাঠ আরম্ভ হইবে। ভারতে আমি বহু বৎসর শক্তিবাদ ধর্মের কথা প্রচার করিয়াছি। লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছি। এদেশে কি অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূতের সম্পাদকের মত একজনও রাষ্ট্রহিতৈষী ও চিন্তাশীল জন্মায় নাই? এদেশের নেতারা কি সকলেই যবনের পদে তৈল মর্দনকারী পাপিষ্ঠ! এরা কি সকলেই অমানুষ? ঐ দেশে আমার যে সব বক্তৃতা হইয়াছে, এবং সেই উপলক্ষ্যে যে সব লেখা ও বক্তৃতা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে, আমি সেইগুলি হইতে কয়েকটি লেখা ও বক্তৃতা "বর্মন" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আমি ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মদেশ গমন করিয়া প্রায় আড়াই মাস ছিলাম।

DURGA PUJA IS NOT FOR BUDDHISTS

Sir, We, Buddhists were surprised to read the lecture of Swami Satyananda delivered at Durgabadi Temple on July 23 and published in the Burman. In his interesting lecture, he said about introducing Durga Puja to the Burmans and preaching Shaktibad together with the knowledge of Lord Buddha's teachings.

Buddhists will easily understand that Durga Puja cannot be introduced into the sacred religion of Burmans.

Hinduism and Buddhism are quite different. A greater part of Buddha's teachings is based on the facts of "Ahinisa" and "Anatta". There is no Creator in Buddhism, and Buddhist "Nibbana" is quite different from Hindu "Moksha".

"Durga" is only a Hindu Goddess and it has nothing to do with Buddhists. There are several legends describing the origin of this Goddess; some as that, the gods troubled by the demon "Mahishasura" came together to the presence of Creator Brahma and asked for protection. By the power of the holy Trinity, Brahma, Vishnu and Mahadeva appeared Durga and slayed the "Mahishasura" demon.

Durga goddess is generally described as Mahishamardini. This figure shows Durga on her lion vahana and killing the buffalo headed demon "mahishasura" with her ten hands which hold the dreadful weapons.

Even an ordinary Buddhist layman knows the meaning of above Durga legend and it is very different from Buddhist teachings.

Killing or doing violence to others is not allowed by Sammasambuddha. Our Enlightened-One taught to spread the boundless of Maitta – Karuna – Mudita towards all living beings.

Hindus will worship Durga but Durga Puja cannot be introduced to Buddhists.

Peace to all Beings.

Yours etc.,
Brahmacari M. Bokay

Basseni.
July 30, 1952.

DURGA PUJA AND PHILOSOPHY OF SAKTI CULT

Durga Puja is performed in many parts of the world. It is the most cherished religious function in India. Shakti Puja is celebrated in Bengal with the greatest pomp and show. The worship is executed under well arranged rules, and observances. Everywhere the Bengalees take the leading parts in Durga Puja and all other Hindus join the celebration. In Burma the Buddhists also join with the Hindus in Durga Puja celebrations.

All the observances which are performed in Durga Puja are full of mystery and are in consonance with the regulations of the ancient scriptures. Durga Puja has been in vogue in India since the Vedic age. Furnished below, are the main heads of observances in Durga Puja.

1. Bodhan or awakening may be called the first ceremony of Durga Puja. (In the heart of every man there is a seat of Maha Shakti or Ultimate Energy. So long as this energy lies dormant, the strength or power of the individual remains in a stupor.)

"Om Rakshohanam Bala Gahanam Baisnabimidamham Tang Balagam Utkirami", (Yaju Veda, Kandika 11, Mantram No. 20.)

2. Saptami Puja, is the name of the Second day of observances of Durga Puja. It is performed in the seventh Solar Waxing or Saptami Tithi. Saptami Puja is divided into several branches :-

(A) Naba Patrika Prabesh – The Goddess here is worshipped in the shape of some trees...some of which are producers of principal food grains and some of essential medical properties.

(B) Ghata Sthapana – Placing of the Water Pot. That water is the source of knowledge and Energy is recognised by scientists in these days.

(C) Maha Snan or Great ablution, is another part of Saptami Puja. Water exists in all parts of the Earth. Water washes and purifies all animals and the earth.

(D) Abahan – Welcome hymns are still another important part of Saptami Puja. All the Mantrams of welcome hymns are the repositories of high philosophy of Sakti cult.

(E) Pran Pratistha – Infusion of life, is another part of the Saptami Puja. Brahman is all pervading and it is also the main object of the Pran Pratistha Mantras.

(F) Next step in the worship is called "Upachar" or collection of ingredients for the worship. All things are the reproduction of all pervading Brahma tatwa. To know the things on this line, is the real meaning of sacrifice.

(G) Aratrik is a very important and the last ceremony in the Puja. It may be described as the devotional entertainment, and singing of hymns and prayers with choicest articles of offering is absolute surrender to the Goddess.

3. Maha Astami Puja is the third ceremony in Durga Puja. On this day also Ablution, Offering of ingredients, Aratrik etc. are performed. But the principal observance of Maha Astami is Abaran Puja. It consists in revealing the deep meaning of Maha Sakti Cult. The highest function of Maha Astami is Sandhi Puja. Goddess Maha Kali is worshipped in Sandhi Puja.

4. Maha Nabami Puja is the 4^{th} day function of the great Puja. All the ceremonies are similar to those of Maha Astami except the sacrificial fire – the main observance of Maha Nabami. Goddess of forces is welcomed as Fire and the Goddess is propitiated by offering of sacrifice in the Fire.

DURGA PUJA

Srimad Swami Satyananda Saraswati Maharaj visited Burma and delivered various religious lectures. One of his lectures was 'Durga Puja' and Philosophy of 'Sakti Cult' which we have published elsewhere in this paper in an abridged form for lack of space. Although the philosophy of Sakti Cult is not the same as Buddhist philosophy, the ethical doctrines enumerated in the said Cult are more or less akin to those prescribed by the Buddha. Gautama is an incarnation of their God Vishnu, and as such the people of India are giving their best homage to the Buddha. Every year the Durga Puja Ceremony is held all over India, where many lakhs of men and women assemble and make offerings to the Goddess. Here in Burma too, the Durga Puja Ceremony is being held in Park Street, Rangoon, and thousands of people are attending the ceremony to worship the Goddess and make offerings to her.

SHAKTIBAD

I am very glad to see an article under the heading "Durga Puja is not for the Buddhists" in your daily of 3-8-58. Since I was away from Rangoon I could not give an early reply. In the following article I shall give you a reply.

First of all I wish to point out that Shaktibad sociology was the topic of the lectures for some days. Durga Puja is one side of the sociology of Shaktibad. Shaktibad is based on

strongly founded philosophy and philosophical action on the human character. A portion of the lecture thus delivered has appeared in the newspapers. It is unfortunately, not possible for a newspaper to publish a sociology in a day. It is essential for everybody to know Durbalbad and Asurbad, if he wishes to know Shaktibad clearly. The writer says, "Hinduism and Buddhism are quite different." In answer I would affirm that Buddhism is a branch of Hinduism only. Hinduism has got many branches from ancient times up to now. Many ideologies came and vanished in it. I can say that Buddhism is a religion of mental practice and has been described in Hindu books as Buddhiyoga. Buddhiyoga is in abundance in Hinduism. I can quote many slokas from Gita about Buddhiyoga and Nibbana. Therefore I am not going to argue with the writer for "Moksha" of Hinduism and "Nibbana" of Buddhism. I shall deal with Shaktibad only in this article.

Shaktibad has a strong philosophy behind it and only because of limited space I am unable to discuss that philosophy. The whole structure of ancient Dharma is based on Shaktibad. It has its own philosophy, its own sociology, its own constitution of states, its own economy and its own education etc. etc. Under it, men have been divided firstly in five divisions and they are called the Panchayet. There are subdivisions of these five, which amount to fourteen. According to Shaktibad, men are gradually evolving towards perfection and all men are not in the same stage of evolution. In society, we have men of all stages and very few of them may be candidate for Moksha and Nibbana. The writer says that there is no creator in Buddhism. Whether there is a creator or not that is theme for the philosophers only. General mass has nothing to do with that philosophy. We must have a social order, a state and economy and a religion for living peacefully, hopefully and happily in it.

There are two kinds of Asuric evolutions also in these fourteen divisions. Of those two, one class of Asuras and their supporters are uncontrollable by "Maitri" "Karuna" etc. for which the writer is pleading and of those two kinds of Asuric evolutions one must be checked by force. Therefore it is essential for the society to adopt Shaktibad.

The Panchayeti system of Dharma is the most ancient culture of India. I request the writer to enter the Bishwanath Temple of Banaras to see the Panchayet. They are Ganesh, Surya, Bishnu, Shiva and Shakti. All those are evolutions of human character. There is a natural development of fighting instinct in every man and even in highly developed human beings also against the Asuric elements. In Durga Puja, the anti-Asuric spirit of Brahma, Bishnu and Shiva is the main factor in which all the forces of the Devas assembled and became organisd. And this is Shakti Durga to fight the Asuras. The Shakti in the Panchayet System and the anti-Asuric instinct of human beings are the same. I request the writer to attend our Shaktibad Durga Puja in Calcutta (at present Shaktibad Math Goria) to know something about the Durga Puja, when every stage of the Durga Puja will be explained.

The mental character on the basis of Panchayet, i.e. Ganesh, Surya, Bishnu, Shiva and Shakti, can not be described in this short article. We are going to point out the five divisions of the Panchayet in the society in practical shape in a very compact form. Those who wish to know elaborately should study our literature.

Ganesh: - Judiciary; Science; Engineering; Men of Ganesh character are in abundance in these departments.

Surya: - Education, Medicine, Journalism, Preaching etc. Men of Surya character are in these departments.

Bishunu: - Home, Police, Civil administration, Commerce, Industry, Agriculture etc. All men concerned with this department are of Bishnu character.

Shiva: - No. 1 Lower Stage, Labour workers etc. No. 2 Higher Stage, Yogis, Sanyasis, Rishis.

Shakti: - Military and men concerned with martial departments.

Human character has been described in fourteen divisions as I have said above. I wish to point out that in society, the men of lower evolutions are thousand times more than those of higher evolutions. Men's character starts from 41/4 Kalas to 16 Kalas and men of 41/4 Kalas are in greatest number in society. Therefore it is natural that the democratic form of government can not be a satisfactory solution for the welfare of human society. We plead for Panchayeti System of states.

Every department of the Panchayet i.e. every worker or man of separate division of society will select his representative to the crown. The crown must be hereditary. In democracy we find that only rich men can stand for election and there is no provision for the proper education from childhood for a Prime Minister, but if the State-Head is hereditary man, the provision of education can be made from his boyhood. In ancient times, the sons of the kings had to lead a large part of their lives with the sages to form their character.

The elected Panchayet with a hereditary State-Head for Government is the most beneficial for the people of the society.

We find, in democracy that a party becomes a State-Head and the Ministry is formed out of party members. Men having no knowledge of judiciary, education, religion, military, science etc. become heads of these departments and it is natural that the efficiency of the administration suffers.

Durga Puja is concerned with the Panchayet and every man, every nation, every state should know the symbolic character of the Puja. It is based on a well founded ideology, sociology, philosophy and mental science. Lord Buddha was a son of warrior class. It is well known that before the Lord we had 26 Buddhas by succession. If society is founded on Shaktibad, many Buddhas will arrive in the world to show the light. But if the social structure is made conquerable by the Asuras, not a single man will be found at some later date, to say the name of Buddha.

In India, we have deep respect for Lord Buddha and Buddhiyoga. Indians have also considerable respect for the Government of this country for the lead it has taken in the world for the propagation of Buddhism. I commend Shaktibad and Durga Puja to the Burmans since it will benefit them, their country and their Government.

দার্জিলিঙ্গ

বিশ বৎসর বয়সে আমি দার্জিলিঙ্গ গিয়াছিলাম। দুর্জয় লিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ হইয়া দার্জিলিঙ্গ হইয়াছে। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলির নামের সঙ্গে শিব এবং পার্বতী নিবিড়ভাবে জড়িত। দার্জিলিঙ্গ বঙ্গদেশের অংশ। কিন্তু ওইখানকার দৈনন্দিন জীবনে বাঙালীর কোনই প্রভাব লক্ষিত হয় না। বাঙালীরা ভাবপ্রবণজাত। ইঁহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট দুর্বল। দার্জিলিঙ্গকে বিহারী এবং নেপালীদের দেশ বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র বাঙালীদের সম্পদহীনতা ও শক্তিহীনতা লক্ষিত হয়। চাল, ডাল, নুন,

তেল, দুধ, ঘি, মাছ, মজুর, দারোয়ান, চাপ্রাসী, ব্যবসায়ী কুলি, মুঠে, সবই অবাঙালী। যাহা হউক, দার্জিলিঙ্গে আমি তিব্বত এবং ভারতের একটা সংযোগ স্থানে যে আসিয়া গিয়াছি, ইহা আমি দু একদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। দার্জিলিঙ্গের প্রধান দেবস্থান মহাকাল পীঠ। ইহা হিন্দুদের পীঠস্থান! মহাকাল পীঠে একজন হিন্দু পূজারী এবং একজন তিব্বতী লামা পূজা করেন এবং আজও ভক্তদের পূজা ও যজ্ঞাদি করাইয়া থাকেন। লামা পূজারীর সঙ্গে আমার খুব আলোচনা হইত।

একদিন লামা আমাকে একান্তে পাইয়া বলিলেন - ''আমাকে আমার সাধনা বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিতে হইবে।'' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ''আপনি কি সাধনা করেন, বলুন।'' তিনি বলিলেন। ''ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'' ইহাই আমার দীক্ষামন্ত্র। আমাকে ইহার ক্রিয়া বলিয়া দিতে হইবে। আমি ইহার কি মর্ম এবং ইহার কি যে সাধনা, উহা জানিবার জন্য অনেক ধর্মস্থানে গিয়াছি। লাডাকের বিখ্যাত ও প্রধান ধর্মগুরুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমার স্থবিধা হয় নাই।

আমি তাঁহাকে আজ্ঞাচক্র, মস্তিষ্ক, মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত গুরুপাদুকা স্থান সম্বন্ধে বুঝাইলাম। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডই শিবস্থান, এই শিবস্থানের উপরিভাগই মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠ স্থান। এই শ্রেষ্ঠস্থানই মস্তিষ্ক মণি। আজ্ঞা ও সহস্রার কমলের মধ্যস্থানে এই মস্তিষ্ক মণিস্থান বিদ্যমান। ইহার অন্য নাম মণিপীঠ। সহস্রার চক্রের নিম্নে অর্থাৎ ঊর্দ্ধ মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে এই মস্তিষ্ক মণি বিদ্যমান। এখান হইতে জ্ঞান ও শান্তির ধারা প্রবাহিত হইয়া নাড়ীপদ্মে সুষুম্না পদ্মে নামিয়া আসিতেছে। এইভাবে ধ্যান করুন। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। ইহার অর্থ ''হে পদ্মমধ্যস্থ মণি। আপনি নিরালা ঈশ্বর।'' হুঁ মানে নিরালা ঈশ্বর। (দ্রঃ ক্রমবিকাশ ৩য় ভাগ)। আমি একটি শিবমন্দিরে লামাকে যাইতে বলি এবং শিবমূর্তি দেখিয়া আজ্ঞাচক্রের মধ্যস্থিত অর্থাৎ পীনেট মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড দেখিয়া মস্তিষ্ক মণি বুঝিতে বলিলাম। এই শিবপিণ্ডের উপরিভাগই সহস্রার কমল। দ্বিদল মধ্যস্থিত মণি এবং সহস্রার মধ্যস্থিত মণি দুইই শিবপিণ্ডই জানিবেন। এইভাবে ধ্যান করুন, ওই শিবপিণ্ড এবং নিম্ন ধারা ধরিয়া জপ করুন এবং মন্ত্রের অর্থ ভাবুন। মহাকালের আসল এবং একাক্ষরী বীজমন্ত্র হইতেছেন ''ওঁ হুঁ''। দুই-তিনদিন বাদ আমি তাঁহাকে আরও একটু যোগের শিক্ষা দিলাম। তিনি আমাকে বলিতেন, ''আপনি আমার সব পিপাসার তৃপ্তি দিয়াছেন, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।'' তিনি আমাকে আমার এই ''ক্রমবিকাশের পথে'' গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, ''আমার জীবনকালে এতটা প্রসারের আশা আমি করিনা।'' মহাকাল এবং মহাকালী ভারত এবং তিব্বতের একমাত্র উপাস্য দেবতা। এমন সহজ সাধনা এবং এমন শিবমূর্তির অবলম্বনকে এবং সাধনাকে মধ্যযুগের মহাপুরুষেরা অকারণ বিকৃত করিয়াছেন। এ বিষয়ে খ্রীষ্ট মহাপুরুষগণ এবং মহম্মদ সাহেব বেশী অপরাধ করিয়াছেন।

আমি তিব্বতী ধর্মের বহু ধর্মস্থান দর্শন করিয়াছি। তাঁহাদের পূজা পদ্ধতি ও ধর্মভাব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ধর্মস্থান, শ্মশান এবং বহু দেবী ও ধর্মকেন্দ্র দেখিয়াছি। ইঁহাদের মহাপুরুষগণ যেভাবে ধর্মকে ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং ধর্মকে যেভাবে সকলের জন্য সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্ময়াবিষ্ট

হইয়াছি। প্রত্যেক ধর্মস্থানে এবং শ্মশানস্থানে আজ্ঞাচক্রের মধ্যস্থিত ‘‘মণিস্থানকে’’ মূর্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, মন্ত্রগুলিকে সর্বত্র ব্যাপক প্রচারের জন্য মন্ত্র-সমন্বিত পতাকা রোপণের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। মহাকালকে বস্ত্রদান মানে মন্ত্রগুলিকে বস্ত্রখণ্ডে ছাপিয়া একটা পতাকার আকারে ধর্মস্থানে রোপণ করা। আমরা দেবতাকে বস্ত্রদান করিলে পুরোহিত উহা ঝোলায় তোলেন। তিব্বতী ধর্মে দেবতাকে বস্ত্রদান মানে এক খণ্ড বস্ত্রে মন্ত্র ছাপিয়া আকাশে টাঙ্গাইয়া দেওয়া। মন্দিরগুলিতে দেখা যাইবে বহু দেবতার মুখগুলিকে একটি মূর্তির মধ্যে আনা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, কোনও সময় তিব্বতে বহু দেবতার আরাধনা হইত। সব দেবতার মুণ্ডকে এক করিয়া জাতীয় চিন্তাশক্তিকে সংহত করিবার জন্য এই মহান কার্যকে আমি প্রশংসা করি। আমি শিবপিণ্ড এবং যোগসাধনার ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানকে কেন্দ্র করিয়া বেদের গায়ত্রী, তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র এবং উপনিষদের মহামন্ত্রগুলির শুদ্ধ উচ্চারণকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এবং সমস্ত সাধনাকে একমুখী করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি, তিব্বতী মহাপুরুষদের কার্য সেইরূপ বহুদূর প্রসারী। আমি একটা মঠে প্রবেশ করিয়া ওদের গ্রন্থের মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, সেখানকার লামা আমাকে তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত বহু মন্ত্রের সংগ্রহ অধ্যায় দেখাইলেন। আমি দেখিলাম, সেই গ্রন্থে দশমহাবিদ্যার মন্ত্রগুলিসহ অন্যান্য বহু দেবতার মন্ত্র ও বীজমন্ত্রগুলি রহিয়াছে। আমি তিব্বতী ভাষার কোন অর্থই বুঝিলাম না, কিন্তু সকলকে একই মন্ত্রের স্তোত্র একই স্বরে সর্বত্র পাঠ করিতে শুনিয়াছি। এদের মধ্যে, এক সম্প্রদায় হাতের করে মন্ত্র জপ করেন না, মালাতেও জপ করেন না; কিন্তু একটি চাকার মধ্যে ওঁ মণিপদ্মে হূঁ লিখিয়া সেটা ঘুরাইতে থাকেন, ইহাই ইহাদের মালা জপ। বড় বড় মঠে সব সাধুরা নানা ডিজাইনে প্রস্তুত চরকার সাহায্যে জপক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ‘‘ওঁ মণিপদ্মে হূঁ’’ লিখিত মন্ত্রটি ঘুরিতে থাকিবে, ইহাই তাঁহাদের জপকার্য। কোন কোন মঠে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টার মতন আছে। ঘণ্টাটির মধ্যস্থানে মাটির উপর আসনে একটি বুদ্ধমূর্তি আছেন এবং ঘণ্টার গায়ে লেখা আছে ‘‘ওঁ মণিপদ্মে হূঁ’’। ঘণ্টার গায়ে অনেকগুলি শিকলের টুকরা ধরিবার জন্য লাগানো আছে, সেই শিকল ধরিয়া ঘণ্টাটি বহু লোক একত্র ঘুরাইতে থাকেন। ঘণ্টাটি একবার ঘুরিলেই একটা টং শব্দ হয়। এই ভাবেই সেই মঠে সমবেত জপ অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণ মালা জপ করেন, তিব্বতী বৌদ্ধগণ চড়কা ঘুরাইয়া জপানুষ্ঠানের কার্যটি সম্পন্ন করেন। দার্জিলিঙ্গ-এ ইংরেজ পরিচালিত অনেক স্কুল আছে। ছাত্ররা সেখানে থাকে এবং আহারাদিও করে। ইহাদের মধ্যে সেণ্ট পলস্ স্কুলটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ওখানে ইংরেজ এবং বিদেশী বহু জাতির বড় লোকদের ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদের শিক্ষাদীক্ষা সবই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাতটা হইতে আরম্ভ করিয়া সকাল আটটা পর্যন্ত বালকগণকে নিদ্রায় রাখা হয়। ফলে, বাচ্চাদের দৌরাত্ম্যটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টাই স্তব্ধ থাকে।

দার্জিলিংয়ের রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে এক প্রকার ছোট গাছ জন্মায়। উহাদের চেহারা দেখিলে অনেকটা চোত্রা গাছের মত মনে হয়। গাছগুলির ডাল পাতা সবই সূক্ষ্ম কাঁটায় আবরিত। নেপালী মহিলাগণকে সেই গাছ সংগ্রহ করিতে দেখা যায়।

একটি কাস্তে এবং একটি লোহার চিমটের সাহায্যে ডগাগুলিকে কাটিয়া ঝুড়িতে রাখেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই শাখ খুবই স্বাদবিশিষ্ট। এইগুলি হাতে ছোঁয়া যায় না, ভয়ঙ্কর জ্বালা করিবে এবং চুলকাইবে। গরম জলে ডগা ছাড়িয়া দিলে কাঁটাগুলি তৎক্ষণাৎ মজিয়া যাইবে। ইহার পর ইহাকে ইচ্ছামত কাটিয়া রান্না ও আহার করা যাইবে। দার্জিলিংয়ের থিয়েটার স্টেজে আমি শক্তিবাদ বিষয়ে একটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াছিলাম।

কেদার ও বদ্রিনারায়ণের কথা

গ্রীষ্মকালে আমার চুনার অবস্থান চলে না। কাজেই প্রতি বৎসরই আমি গ্রীষ্মকালে অন্যত্র গমন করি। এক বৎসর কলিকাতায় থাকিতেই স্থির হইল শীতকালে চুনার না যাইয়া কলিকাতা হইতেই রওনা হইয়া কেদার ও বদ্রিনারায়ণ দর্শন করিব। উত্তরা খণ্ডের ভ্রমণ কাহিনী খুবই প্রীতিপ্রদ। সে সম্বন্ধে হিমালয় ভ্রমণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমার হিমালয় ভ্রমণ সেইরূপ কোন সাহিত্য গ্রন্থ নয়। আমি অভিজ্ঞতা, শান্তি এবং দেবদর্শনে বাহির হইবার কথাই ভাবিয়াছি। কয়েক বৎসর ধরিয়াই হিমালয়ের পথে বাহির হইব ভাবিতেছি। গুরুদেব দুইবার হিমালয়ে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, আমি সেই সব কথা অনেকটা ভাবিয়াছি। আমার গুরুভাই জ্ঞানানন্দজী এবং অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ও হিমালয় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি নানা প্রকার শুষ্ক ফল, ঔষধ এবং শীতবস্ত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। এজন্য গুরুদেব দুইজন কুলী সঙ্গে লইয়াছিলেন। জ্ঞানানন্দজী এবং অনিলের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে মনে হইল, মাছির উপদ্রব অত্যন্ত বেশী এবং যাত্রীর দল পায়খানা প্রস্রাব করিয়া চটিগুলি এমন বিশ্রী এবং নোংরা করিয়া রাখে যে, রাত্রিতে যে চটিতে থাকা যায়, সকালবেলা সেই চটির পরবর্তী একটা দুইটা চটি ময়লায় নরক রূপ ধারণ করে। অনিল বলিল, ময়লার কথা ভাবিলে এবং মাছির উপদ্রবের কথা চিন্তা করিলে, আর ঐ পথে যাইতেই ইচ্ছা হয় না। পথ হাঁটিয়া আসিয়া বেশ কম্বল মুড়িয়া একটু বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে কম্বলের উপর দিয়া আরও একখানা কম্বলের ঢাকনা মাছিরা প্রস্তুত করে এবং কোনও প্রকার ছিদ্র পাইলে সেই পথে কম্বলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনের সুখে কামড়াইতে থাকে। চটিগুলিতে যে সব চাটাই থাকে, সেইগুলিতে পিষুর (উকুন জাতীয় সাদা পোকা) বাজার থাকে। সেইসব পিষু মনের সুখে যাত্রীদের রক্ত শোষণ করে এবং জামাকাপড় ও কম্বলে আশ্রয় লইয়া যাত্রীদের রক্ত শোষণ করিতে করিতে যাত্রীদের নিত্য জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ করিতে অগ্রসর হয়। পিষু এবং মাছির কামড়ে শরীর ক্ষতযুক্ত হইলে উহা সারিতে বহুদিন অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক চটিরই মেথর আছে। পায়খানার স্থানও আছে। কিন্তু পায়খানায় খুব কম লোকই গমন করে। অধিকাংশ লোকই চটির উপরই পায়খানা করে এবং মেথরকে এক বা দুই পয়সা দিয়া চলিয়া যায়। মেথর সেইসব ময়লা পরিষ্কার করে। এইভাবে পরিষ্কার হইবার পর আবার নূতন যাত্রীর আগমন হয়। তাহারা সেইসব পরিষ্কারকৃত ময়লার স্থানেই রুটি প্রস্তুত করিয়া মনের আনন্দে আহার করিয়া অগ্রসর হয়। সকালবেলা

যেস্থানে পূর্বদল পায়খানা করিয়া ময়লা করিয়াছে, পরবর্তী দল সেই স্থানকেই রন্ধন স্থান নির্ণয় করে। গুরুদেব কেদারবদ্রির পথে দুইবার গিয়াছিলেন। প্রথমবারের মহাতীর্থ ভ্রমণের সময় মুরারীবাবু সঙ্গী ছিলেন। গুরুদেব ডাণ্ডিতে বসিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বাক্স ও বিছানা বহনের জন্য মজুর ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যথেষ্ট দ্রব্যাদি ও চিকিৎসার জন্য ঔষধপত্র সঙ্গে না লইলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। অনেক সময় অসুস্থগণকে পথে ঔষধাদি দান করিতে হয়। তাঁহাদের নিকট সবই শুনিলাম, কিন্তু ঐ দেশের বাচ্চারা যে সুঁচ ও সূতা ভিক্ষা করে, ইহা আমি জানিতে পারি নাই। কাজেই সুঁচ সূতা সঙ্গে লইবার কথা ভাবি নাই। বেশ মিষ্টি স্বরে ছোট ছোট মেয়েরা সুঁচ এবং সূতা ভিক্ষা করে। অভিজ্ঞ যাত্রীরা সুঁচ সূতা সঙ্গে লইয়া যান, একটা করিয়া সুঁচ এবং পাঁচ-সাত হাত করিয়া সূতা দান করিতে করিতে যাত্রীরা অগ্রসর হইতে থাকেন। গুরুদেব দ্বিতীয়বারের ভ্রমণকালে কাণ্ডীতে গিয়াছিলেন। ডাণ্ডী এক প্রকার মোড়াবিশেষ। একজন মজুর উহার উপর যাত্রীকে বসাইয়া পীঠে বহিয়া লইয়া যায়। কাণ্ডী কাঠে প্রস্তুত করা ছোট একখানা নৌকার মতন। ইহাকে চারজন মজুর কাঁধে বহন করে। ঐ পথে চলিবার সময় পথে ঘোড়াও পাওয়া যায়। ঐ পথে ভ্রমণকালে বুঝিলাম ডাণ্ডী এবং কাণ্ডী সুখের বাহন নয়। ডাণ্ডী বরং ভাল, কিন্তু কাণ্ডী অত্যন্ত কষ্টদায়ক বাহন বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। অনেকে হৃষিকেশ হইতেই ডাণ্ডী বা কাণ্ডী ভাড়া করেন এবং অগ্রিম কিছু টাকা চুকাইয়া দিয়া রওনা হন।

উত্তরাখণ্ডের ভ্রমণে যাঁহারা বাহির হন তাঁহাদের বেশীর ভাগ লোকই বৈশাখ মাসে বাহির হন। কেহ কেহ বর্ষার শেষে এবং শীতের পূর্ব সময় কেদার বদ্রি দর্শনে নির্গত হন। শুনিয়াছি, বৈশাখ মাসে বাহির হওয়াই ভাল। যাঁহারা বর্ষার শেষে শীতের পূর্বে যান, তাঁহারা নাকি অনেকেই ফিরিয়া আসিয়া অধিক দিন বাঁচেন না। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বদ্রিনাথের দ্বার খোলা হয়। ঠিক ছয় মাস পর মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। যাত্রীদের গমনকাল ঐ দিন দুইটিকে কেন্দ্র করিয়াই ধার্য হইয়া থাকে।

আমি এবং আমার সাথী রমেন্দ্রকুমার মল্লিক ১৩৬০ সনের বৈশাখ মাসে রওনা হইলাম। আমরা ঔষধ, শুষ্ক ফল, স্টোভ, রান্নার বাসন, গ্যামোক্সিন পাউডার, কম্বল ও গরম জামা বেশ ভালভাবেই সঙ্গে লইলাম। আমাদের দুইজনের দ্রব্যাদির বোঝা প্রায় এক মণ হইয়াছিল। রাস্তায় বাহির হইয়া বুঝিলাম, দ্রব্যাদি প্রায় অর্ধেক কম করা যাইত। কারণ রাস্তার পরিস্থিতি অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। পিষু মাছি এবং পায়খানা বিষয়ে ঐ পথ বেশ ভাল হইয়াছে। চটিগুলিতে পায়খানার উপদ্রব বেশ একটু কম মনে হইল। মাছি, মশা এবং পিষু নাই। সব চটিতেই খুব ডি. ডি. টি.-র প্রয়োগ চলিয়াছে। মেথররা এখন একটু বেশী কর্তব্যশীল হইয়াছে।

কেদার-বদ্রিনারায়ণের পথে বাহির হইয়া আমরা প্রথমে হৃষিকেশের কালী কম্বলী বাবার ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এখানেই এক কুলীর ঠিকেদার একজন কুলীকে ঠিক করিয়া দিয়া গেলেন। কুলী দ্রব্যাদির ওজন করিয়া একশত টাকায় যাতায়াতের ঠিকা করিল। ঠিকেদার কুলীর নিকট হইতে পাঁচ টাকা দস্তুরী লইলেন। সাধারণতঃ লোকে কুলীদের বিশ্বাস করিতে পারে না; কারণ, কাহার কোথায় বাড়ি জানা যায় না। এ জন্য মধ্যবর্তী কারবারী থাকেন বা সরকারী ব্যবস্থায় কুলীদের নাম রেজিষ্টারী করা থাকে।

বিশ্বাস করিবার মত ব্যবস্থা কোন প্রকারেই ভাল মনে হইল না। কারণ কুলীরা বেশীর ভাগই নেপালী, তাহারা ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। কাজেই বিশ্বাসের উপর চলিতে হয়। কুলীরা ছয় মাস ধরিয়া যাতায়াত ব্যবসাই করিয়া থাকে। অনেকেই বৎসরে ছয় সাত বার যাতায়াত করে।

কালী কম্বলীবাবার ধর্মশালায় প্রায় সব ব্যবস্থাই মোটামুটি ভালই মনে হইল। এখানে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি রাখিয়া যাওয়া যায়। একটি পোঁটলায় আমরাও কিছু দ্রব্যাদি রাখিয়াছিলাম। রক্ষিত দ্রব্যের জন্য রসিদ দেয় এবং দ্রব্যাদির উপর নম্বর লাগানো থাকে। দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য নম্বর লাগানো, অনেক তাক আছে। রসিদটি ফেরৎ জমা দিলেই পোঁটলাটি ফেরৎ লওয়া যায়। ধর্মশালায় অসুবিধাটা দেখিলাম পায়খানার বিষয়ে। ছাতের উপর কয়েকটি মেথর খাটা পায়খানার ব্যবস্থা আছে। সেগুলি এবং সমগ্র ছাতটাই সব সময়ই নোংরা ও কদর্য থাকে। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই পায়খানা বিষয়ে অসভ্যতা* এবং অব্যবস্থা। ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। পূর্বে রেলের পায়খানাগুলিও নরকতুল্য ছিল। এখন কোন কোন স্থানে অসভ্যতার কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। রেলের পায়খানার কথা বলিবার প্রসঙ্গে স্বরাজের যুগে রেলের কোয়ার্টারগুলির অধঃপতন বিষয়ে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বেশ কয়েক বছর আগে রেলের কোয়ার্টারগুলিকে এত নিচু করা হইয়াছে যে সেগুলিকে শূকর পুষিবার গৃহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশ বলিয়াও কোন বিবেচনা করা হয় নাই। রেলের কর্মচারীরা স্বাধীন ভারতে যে কোন ব্যক্তি হইতে খুব কম বিদ্বান, ইহা বলা যায় না। মান্য ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই এতটা কম উঁচু গৃহে এখন আর থাকেন না। যাহা হউক, কালী কম্বলী বাবার ট্রাষ্টের অর্থশক্তি অতুলনীয়। আমরা ইহার সুব্যবস্থা এবং উন্নতি কামনা করি। এখানে আমরা কালী কম্বলীবাবার ধনভাণ্ডারে সামান্য কিছু দানও করিলাম। দেখিলাম, যাত্রীরা অনেকেই কিছু দান করিয়া যান। রাস্তায় কালী কম্বলীবাবার ধর্মশালা হইতে আমরা একখানা সার্টিফিকেটও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই সার্টিফিকেট পথে কোনই কাজে দেয় না। কারণ ধর্মশালাগুলিতে স্থানাভাব থাকিলে সার্টিফিকেটখানা কেউ পাহারা দিতে থাকে†। সমস্ত পথে কেদারনাথ এবং বদ্রিনারায়ণ ধাম ভিন্ন আমরা কোথাও কালী কম্বলীবাবার ধর্মশালায় আশ্রয় লই নাই। পথে খুব কম স্থানেই আমরা চটিতে আশ্রয় লইয়াছি। আমরা সাধারণতঃ নিকটস্থ গ্রামে বা গ্রাম্য পাঠশালায় বা সরকারী ডাক বাংলায় বিশ্রাম করিয়াছি। গৌরীকুণ্ডে আমরা এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের ছোট কুটিয়াতে ছিলাম। রাত্রিতে অবস্থান বিষয়ে আমাদের কোথাও কোন অসুবিধা হয় নাই। বরং আমরা আরামেই ছিলাম। গ্রামে অবস্থান কালে দেখা গিয়াছে গ্রামের পথগুলিতে পায়খানার অত্যন্ত অব্যবস্থা। এই গ্রাম্য পথে পরিষ্কার করিবার মেথরের ব্যবস্থা নাই; কাজেই গ্রাম্য পথগুলি চলিবার অযোগ্য থাকে। প্রত্যেক চটিতেই যাত্রী সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। চটির আয়তন ও গৃহের সংস্থান হইতে যাত্রী সংখ্যা এত বেশী যে দূরযাত্রী রেলগাড়িগুলির তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মত অতিকষ্টে তীর্থ যাত্রীদিগকে রাত্রি

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''অভ্যস্ত'' শব্দটি সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ। এ স্থলে ''অসভ্যতা'' গৃহীত হইয়াছে।

† প্রকাশকের নিবেদন - এই বাক্যটির গঠন অযথাযথ।

বাস করিতে হয়। সমস্তদিন পথহাঁটার পর সন্ধ্যাবেলা শরীর খুলিয়া শয়ন করা যায় না। এই পরিবেশে আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ যথেষ্ট বাধাজনক।

পথের অনেকস্থানে বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাত্রীরা সব সময়ই বাসে চলাচল করিতে চায়। ইহার ফলে, স্থানে স্থানে চটিগুলিতে যাত্রীরা বহু সংখ্যায় জমিয়া যায়। কাজেই সেই সব স্থানে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যাও পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাসরুট যতটা হইয়াছে, সেইসব রাস্তার চটিগুলির প্রয়োজন খুবই কমিয়া গিয়াছে। যাহারা পদযাত্রী তাহারা সেইসব চটিগুলিতে সুবিধাজনক ভাবেই আশ্রয় পায়। কিন্তু সেইসব চটির অধিকারীরা যাত্রীর অভাবে উপার্জনের অসুবিধা ভোগ করে। যে সব স্থানে বাসের টারমিনাস করা হইয়াছে, সেইসব স্থানের গৃহ সংস্থান ও দোকানপাট প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম; কাজেই সেইস্থানের রাত্রিবাস ও শৌচ স্নান ও আহারাদির ব্যবস্থা অত্যন্ত নোংরা। অবশ্যই এই অব্যবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন হয়তো হইয়া যাইবে।

ভারতের সব প্রান্তের যাত্রীরাই উত্তরাখণ্ডের তীর্থ দর্শনে যাত্রা করে। কাজেই একই হিন্দু সভ্যতার এই সুন্দর পরিবেশ আমার খুবই ভাল লাগিত। ভাষার বিভিন্নতা থাকিলেও ব্যবহার এবং ধর্মানুষ্ঠানের সমতা ভাল ভাবেই উপভোগযোগ্য। বহু লক্ষ যাত্রী একই পথে গন্তব্য লক্ষ্যে নির্গত হয়। তীর্থ যাত্রীদের গমনাগমনে সমস্ত হিমাচল প্রদেশই উপকৃত হয়। এই উপলক্ষ্যে, এই ভয়ঙ্কর গরীব প্রদেশের জনগণ নানাপ্রকার কাজ পায় এবং তাহাদের দুই পয়সা উপার্জন করিবার সুযোগ হয়।

সমস্ত উত্তরাখণ্ডের পথে রাত্রিকালের অন্ধকার বুঝা যায় না। ইহার কারণ, বরফের উপর আকাশের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয় এবং উহার প্রভাবে সমস্ত পথ এবং চটিগুলি মৃদু জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়। আমরা শেষ রাত্রের দিকেই পথে বাহির হইয়া পড়িতাম এবং সেই মৃদু আলোতে অগ্রসর হইতাম। মধ্য রাত্রের শেষের দিকেই আমি আসনে বসিয়া পড়িতাম। দিন-রাত সেই বরফের ঘেরা স্বচ্ছ প্রদেশের প্রতিচ্ছবি এবং স্নিগ্ধ পরিবেশ আমার অন্তরে প্রতিফলিত হইত, আমি সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ধ্যানে ডুবিয়া যাইতাম। সমস্তটা মস্তিষ্কই আজ্ঞাচক্র এবং সহস্রার, এই আজ্ঞচক্র এবং সহস্রার অতীব সরস স্নিগ্ধ এবং জ্ঞানময় প্রদেশ। বাহ্যদৃশ্য আমার অন্তর দৃশ্যকে উদ্‌ভাসিত করিত এবং আমার নিত্য সাধনা এবং ধ্যান ক্রিয়ার সুবিধা হইত। হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিবার পর আমার আর কোন তীর্থ যাত্রারই স্পৃহা নাই। শেষ রাত্রিতে আমি আমার উপাসনা স্তোত্র পাঠ করিতাম। মনে হইত, সেই স্নিগ্ধ সুমিষ্ট ধ্বনি সমস্ত হিমালয় প্রদেশে প্রতিফলিত হইয়া আমার মনকে একটা ব্যাপক স্নিগ্ধ জ্যোতির দেশে নিমগ্ন করিতেছে। এখনও আমার শেষ রাত্রির উপাসনা কালে সমস্ত হিমালয় প্রদেশের শীতল স্নিগ্ধ জ্যোতির কথা মনে প্রতিফলিত হয়। উত্তরাখণ্ডের ভ্রমণ আমার সার্থক হইয়াছে, ইহা আমি আজও অনুভব করি।

ভারতের বহু তীর্থস্থান মন্দিরই মক্কাবাদী ও পশু মানবের বর্বর স্মৃতি বহন করিতেছে। তীর্থ ভ্রমণে ও মন্দির দর্শনে আমি যতটা শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি, সেই অনুপাতে মক্কাবাদীদের ধ্বংসাত্মক দুষ্কার্য স্মৃতির প্রতিক্রিয়া আমি শতগুণ অধিক অনুভব করিয়াছি। মনুষ্য নামের অযোগ্য বর্বরদের বর্বরতার কথা আমাকে বিচলিত

করিত। মনে হইত, পৃথিবীর সমস্ত মানব যদি ওইসব দুষ্কার্যকারীদের বর্বরতার প্রতিশোধ দিবার জন্য পথেঘাটে উহাদিগকে চাবকাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে তবুও ওইসব দুষ্কার্যের প্রতিকার হইবে বলিয়া মনে হয় না। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণকালে মানুষের গড়া শিল্প ও সৌন্দর্যের কথা আমি একদিনও ভাবি নাই এবং শিল্প মাধ্যমে মানবকে তৃপ্ত করিবার কলাকৌশলের কথাও আমি ভাবি নাই। প্রকৃতি অফুরন্ত সৌন্দর্যের অতি গম্ভীর জ্ঞানরাশি হিমালয়ের বুকে এবং ভারতের মস্তকে সাজাইয়া দিয়াছেন, আমি পূর্ণ তৃপ্তির সহিত নিত্যই উহা অনুভব করিয়াছি। এখনও আমার অন্তর সেইসব সৌন্দর্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মক্কাবাদী বর্বরদের কথা এই হিমাচল ভ্রমণকালে আমার একদিনও মনে হয় নাই। মক্কাবাদী বর্বরগণ কেন যে অসির সাহায্যে এই প্রদেশের সৌন্দর্য ভাঙিয়া দিতে পারিল না ইহা আমার অন্তরে এক বিস্ময়ের কথা। রাজপুত, মহারাষ্ট্র, শিখ এবং ছোটখাটো অনেক মহামানবের আত্মরক্ষাকর কীর্তি ভারতকে রক্ষা করিয়াছে ইহা সত্য ঘটনা, কিন্তু এই বর্বরতার মূল উৎপাটনে তাঁহাদের চেষ্টা মোটেই যথেষ্ট হয় নাই। ঈশ্বরীয় জ্ঞান, শান্তি, ধ্যান, সুখ ও সৌন্দর্যরাশি অনুভব করা উহাকে সমাজে দান করিয়া মানবের অন্তরকে ঈশ্বরীয় সুন্দর রূপের সম্মুখীন করার মধ্যে যে মহান মানবতার বীজ প্রতিষ্ঠিত আছে, মানব সভ্যতার প্রধান শত্রু আসুরিকতা ও বর্বরতার মূল উৎপাটনের মধ্যে উহা হইতে কম সৌন্দর্য যে নিহিত নহে, ইহা ভারতবর্ষকে আবার অনুভব করিতে হইবে, তবেই বেদ, চণ্ডী ও গীতার অস্তিত্ব সার্থক হইবে। কেবল আত্মতৃপ্তিই ঈশ্বরভক্তি নহে, অসুরকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যে তেজভাব উহাও ঈশ্বর ভক্তি। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণকালে আমি কেবল যে উত্তরাখণ্ডই দর্শন করিয়াছি তাহা নহে; আমি সামগ্রিক ভাবে ওই সুন্দর দৃশ্যে হিন্দু সভ্যতার মর্মও অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দুরা মূর্তির মধ্যে কেবল মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিকতাই প্রতিফলিত করে নাই, তাহারা মনোজগতের দৈবী ভাবগুলি মূর্তির মধ্যে ফুটাইয়া মানুষকে ত্যাগী যোগী মহাত্মা তপস্বী এবং নিষ্কাম কর্মযোগী করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু হিমালয় যে আমাদের অতিমহান তীর্থ, আমাদের শিব ও শঙ্কর ধাম, ইহার সৌন্দর্য যে সীমাহীন এবং মক্কাবাদীদের মত মহা বর্বরবাদীরা যে উহার একটা কোণাও ভাঙিবার শক্তি রাখে না, ইহা ভাবিয়া আমি তৃপ্ত হইলাম।

হৃষিকেশে আমরা দুই দিন ছিলাম। স্বর্গাশ্রমের সাধুনিবাসগুলির কথা আমার এখনও মনে জাগে। কেবল আহার এবং সাধনার কেন্দ্রকে ভিত্তি করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর জীবন পরিকল্পনা করা আমার ভাল লাগে নাই। আমার মনে হইত, স্বর্গাশ্রম নিরাশ তপঃভূমি। সাধুরা এখানে মাঝে মাঝে দু-এক মাস অবস্থান করিয়া যান তো ভাল কথা; কিন্তু দিনের পর দিন কর্মহীন তপঃজীবন মানুষকে কতটা তৃপ্তি দিবে? হৃষিকেশের গঙ্গায় মৎস্যগণের ভয়হীন জীবন যাত্রা সত্যই অনুভবযোগ্য। এখানে সহস্র সহস্র মৎস্য মানুষের সঙ্গে এক জলে বিচরণ করে; জলে নামিলে মনে হয় সহস্র সহস্র মৎস্য ঠিক বালিশের মত জলের ভিতর অবস্থান করিতেছে। আমি জলে নামিয়াই বুঝিলাম ইহা মৎস্যেরই স্বাধীন রাজ্য। ওরা কেবল নির্ভয়ে বিচরণশীল জীবই নহে, ওরা যেন একটা সুশৃঙ্খল সুসভ্য জলজীব। একটির সঙ্গে অন্য মৎস্য গায়ে ঘেঁষিয়া, ঘাটে মানুষের দেওয়া আহার্য ভক্ষণকালের

মধ্যেও ঝগড়া বা হিংসার ভাব নাই। মনে হয়, ওই মৎস্যকুল একটা সুসভ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গড়িয়া লইয়াছে। ইহা ভিন্ন ওই স্থানের মৎস্যগণ এত সুসভ্য কি করিয়া হইতে পারে! মৎস্যদের কোর্ট কাছারী নাই; কিন্তু শাসন দ্বারা একটা সমাজ যতটা সভ্য হইতে পারে উহার সবটাই হৃষিকেশ ঘাটের মৎস্যকুলে বিদ্যমান। আজ ভারতের স্বরাজের যুগে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে। ধর্ম বিদ্বেষ এবং ধর্মহীনতাই যে ইহার মূল, ইহাতে সন্দেহ নাই। মৎস্যদের সুসভ্য জীবনযাত্রা দেখিয়া আমি ধর্ম প্রভাবই অনুভব করিলাম। দু-দিন ঘোরাঘুরি করিবার পর আমরা রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত বাসের টিকেট সংগ্রহ করিলাম। রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গার দুই দিক ধরিয়াই পথ বিদ্যমান। উহার একটা রাস্তা ধরিয়া পথযাত্রীরা গমন করেন; অন্য পথে বাসরুট বিদ্যমান। সন্ধ্যার বেশ পূর্বে আমরা রুদ্রপ্রয়াগে নামিলাম। এখানে কম্বলীবাবার ধর্মশালা রহিয়াছে, আমরা উহাতে আশ্রয় পাইলাম না, কারণ স্থান ছিল না। আমরা এক সন্ন্যাসীর বিদ্যার্থী ভবনে আশ্রয় লইলাম। সন্ন্যাসী বাবা বেশ বৃদ্ধ হইয়াছেন। বিদ্যার্থীরা সকলেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। বিদ্যার্থী ভবনে আমরা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রী ছিল না। স্থানীয় মন্দির এবং দেব দর্শনও আমরা করিয়া লইলাম।

পরদিন খুব ভোরে আমরা মন্দাকিনীর ধার ধরিয়া কেদারনাথের দিকে অগ্রসর হইলাম। পদ যাত্রীদের মধ্যে বহু হিন্দীভাষী মহিলা রহিয়াছেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে ধর্ম ও ভক্তি সঙ্গীত করিয়া চলিয়াছেন এবং ঘন ঘন "গড়ুল ভগবান" এবং "মহাবীর স্বামীর" নাম বলিতেছিলেন। পাহাড়-পর্বতদেশে হনুমান স্বামী এবং গড়ুল ভগবান যে বেশ ভাল আশ্রয়, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আমি মহিলাদের ভক্তির মধ্যে নির্বাচন প্রতিভার কথা সত্যই অনেকক্ষণ ভাবিয়াছিলাম। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারনাথের পথ প্রথমটায় মোটেই কঠোর পথ নয়। অনেকটা সমভূমির মত সহজ পথ। কিন্তু এই সহজ পথ বেশীক্ষণ থাকে না। তিন চার ঘণ্টা চলিবার পরই দুর্গম পথ আরম্ভ হইল। বড় বড় পাহাড়গুলি আকাশ ভেদ করিয়া শান্তভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পথগুলি সেইসব পাহাড়ের ধার ধরিয়া অবস্থিত। পথগুলি একবার পাহাড়খানার উচ্চতম শিখরে উঠিতেছে আবার সেই একই পাহাড়ের নিম্নতম প্রদেশে নামিয়া আসিয়াছে। এইভাবেই এক একটি বিরাট পর্বতকে অতিক্রম করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। পথ নির্মাতা স্থপতিগণ ইচ্ছা করিলে পথগুলিকে যথেষ্ট সহজ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে পথগুলির স্থিতি বিষয়ে দুর্বল হইয়া যাইত। পাহাড়ের মধ্যস্থান ধরিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া দিলে পথের চড়াই এবং উতরাই ভাব কমিয়া যাইত। এইভাবে পথ প্রস্তুত করিলে পথগুলি বৃষ্টির জলের চাপে ভাঙিয়া যাইবার ভয় থাকিত। প্রতি বৎসরই ভাঙিবার আশঙ্কা থাকিলে পথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়; এইজন্যই যে ইঞ্জিনিয়ারগণ পথকে সহজ করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। কেদারনাথের পথে সর্বত্র ছোট ছোট ঝরণার জল ধরিয়া উহাতে পাইপ লাগাইয়া পথের ধারে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিনরাত্র সেই জল পর্বত হইতে আসিতে থাকে এবং পথিকদের পানীয় জলের অভাব মোচন হয়। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারের অর্ধপথ অতিক্রম হইবার পরই এক বিরাট পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট পর্বত নির্মিত প্রাকৃতিক মন্দিরের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক

পর্বতে প্রস্তুত মন্দিরের মধ্য চূড়াটি অত্যন্ত উঁচু এবং উহারই চারিদিকে চারটি বিশিষ্ট পর্বত। পাঁচটি পর্বতে প্রস্তুত মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে বরফে ঢাকা। আমরা ধারণা হইল ওই পর্বত নির্মিত বিরাট মন্দিরটিই হয়তো কেদারনাথ। আমরা বেশ অনেকটা পথ ওই পাঁচটি পর্বত গঠিত মন্দির দৃশ্য লক্ষ্যেই অগ্রসর হইতেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য, কেদারনাথের প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্তী স্থানে আসিবার পরই সেই পঞ্চচূড় মন্দির পর্বতটি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে লুকাইয়া গেল। বুঝিলাম, উহা কেদারনাথ নহেন; উহা দুর্গম হিমালয় প্রদেশের মধ্যস্থানে অবস্থিত কোন দুর্গম স্থান। সেখানে মানব কোনদিনই গমন করে নাই এবং গমন করিবে না।

হিমালয়ের মধ্যস্থান বরফে আবরিত দুর্গম প্রদেশ। এই প্রদেশের নাম কুবেরের দেশ। কুবের মানেই খাদ্যদাতা মহান প্রদেশ। ভারতের প্রধান তিনটি জলধারা এই কুবেরের দেশ হইতে নির্গত হইতেছে। এই নদী তিনটি ভারতকে প্রচুর খাদ্য দান করিবার জন্য জল দান করিতেছে। কুবের রাজার এত দুর্গম দেশে কেহই গমন করে না। আমার মনে হয়, বর্তমান তিব্বত কুবেরের দেশের এক অংশ। তিব্বত স্বর্ণ প্রধান হিন্দু ধর্ম প্লাবিত প্রদেশ। এই প্রদেশের কর্তৃত্ব ভারতের কংগ্রেস নেতা "পণ্ডিতজী" চীনের হাতে সপিয়া দিয়াছেন। কুবেরের স্বর্ণ প্রদেশ, তাই আজ পরাধীন রাষ্ট্র। তীর্থ যাত্রীরা কুবের রাজার রাজ্যের বরফ অংশকে চারিদিক হইতে দর্শন করে। অমরনাথ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ এবং কৈলাসনাথ, সবই কুবেরের রাজার রাজ্যের বাহ্য প্রদেশ মাত্র। কুবের রাজ্য হইতে যে সব প্রধান প্রধান জলধারা ভারতের দিকে নির্গত হইয়াছে, সেইসব জলধারাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা আমাদের মহান দেশের খাদ্য প্রাণকেই দর্শন করি। কুবেরের দেশে নদীগুলিই আমাদের দেশে তীর্থ নদী।

নদীর ধারাকে অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারেই কুবেরের দেশের বরফের অংশে প্রবেশ করা যায় না। নদীগুলির অবলম্বন ত্যাগ করিলে পথকে নির্দিষ্ট করিবার আর কোনই উপায় নাই। কুবেরের দেশ হইতে জলধারাগুলি নির্গত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে শস্য-শ্যামলা এবং সম্পদপূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু যে মহান দেশ হইতে এসব নদনদীগুলি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দেশটির অধিবাসীরা প্রায় সকলেই গরীব। তীর্থ ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকায় এই দেশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রবেশ করে; কিন্তু তীর্থ যাত্রীদের নিকট হইতে এসব দেশবাসীরা খুব বেশী কিছু উপার্জন করিতে পারে না।

উত্তরাখণ্ডের ভ্রমণের এই দীর্ঘ পথে আমরা কোথাও কষ্টে রাত্রি কাটাই নাই। গ্রাম্যস্কুল, সরকারী ডাক-বাংলো বা স্থানীয় লোকের আশ্রয়ে আমরা বেশ সুখে ও সচ্ছলভাবেই বিশ্রাম করিয়াছি। পথটির সর্বত্র পর্বতগাত্রে "কংগ্রেস সরকার যে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া একটি চমৎকার রাম রাজ্য (?) স্থাপনা করিয়াছেন" এই কথা খোদিত বা লিখিত হইয়াছে। উত্তরাখণ্ড ভ্রমণকালে আমি শক্তিবাদ সম্বন্ধে আঠার, উনিশটি আলোচনা করিয়াছি। সভা করিয়াছি এবং শক্তিবাদ দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অনেক সভায় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ আমাকে এই চমৎকার রামরাজ্য সম্বন্ধে আমার কি বক্তব্য আছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি বলিলাম, "বিনা রামেই রাম রাজ্য! রাম কোথায়, যে রাম রাজ্য হইয়া গেল? মূর্খের আস্পর্ধা এবং আস্ফালন সব

যুগেই একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া থাকে। কিছুদিন যাইতে দিন, ইহা রাম রাজ্য, কি রাবণ রাজ্য, কি পাপিষ্ঠের রাজ্য, অথবা যবনের পদে তৈল মর্দনকারী দুর্জনের রাজ্য, সকলেই জানিতে পারিবেন। দেশের রাজা জমিদার উচ্ছেদ হইতে চলিয়াছে। ধর্ম ও মহাত্মার নিন্দা নেতাদের নিত্যকর্ম হইয়াছে। দেশ ভাগকারী দুর্জন ও অসুরদের প্রতিষ্ঠা সাধু সন্ন্যাসী হইতেও সম্মানজনক হইয়াছে। আপনারা মনে করেন সব রকম শাসনের মূল ভাঙিয়া দিয়া কম্যুনিজম স্তুতির দ্বারা এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ দ্বারা আপনাদের সমাজ ও শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে। দেখুন, চোর গুণ্ডা ও বদমাইশের রাজ্য হয়, কি রাম রাজ্য হয়! দুষ্ট মজুর এবং দুষ্ট ব্যবসায়ীরা মনের সুখে সমাজকে ধ্বংস করিতে চলিয়াছে। চোর গুণ্ডারাই আপনাদের রাম রাজ্য দেখাইয়া দিবে!" "আমি কেদার বদ্রিধামে আসিয়াছি। এখানকার আকাশ বাতাস ও সামান্য জনতার নিকট শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আমাকে করিতেই হইবে। কারণ ইহা শিবের দেশ! আমার মর্মকথা, আমার মর্মবেদনা আমি আমার আদি গুরু শিবকে বলিয়াই যাইব। যদি কোনও দিন সুদিন আসে, তবে সমস্ত ভারতই শক্তিবাদকে জানিতে পারিবে। দেশ সমাজ ও মানব সভ্যতাকে ভালবাসিয়াছিলাম, এই অপরাধে আমি ভিখারী এবং নিঃস্ব আছি। আমি যদি মূর্খ নেতাদের মত বিলাসপ্রিয় হইতাম, তবে বিলাসিতা করিবার মত আমার কোন বস্তুরই অভাব ছিল না। আপনারা রামরাজ্য দেখুন, আমি মানসচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিলাম।"

রামচটি। এই চটি হইতে কেদারনাথ ২০ মাইলের মত হইতে পারে। এখানে রাত্রিকালে এক গ্রাম্য পাঠশালায় অবস্থান করিলাম। প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা পূর্ব হইতে আমার আমাশয়। আমি রামচটিতে কাণ্ডির উপর বসিয়া চার মাইল আসিয়াছিলাম। নরবাহন কুবের রাজার দেশে আমিও নরবাহন লইলাম। শঙ্কর ভগবানের অশেষ স্নেহ, আমি অল্প দিনের মধ্যেই সুস্থতা অনুভব করিলাম। রামচটির নিকটবর্তী গ্রাম্য পাঠশালায় আসিবার পরও আমার কয়েক বার দাস্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহা যে অসুস্থতার শেষ অধ্যায় ইহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সঙ্গে ঔষধ পত্রও ভালই ছিল। রামচটির নিকট গ্রাম্য পাঠশালায় আসিয়াই আমার মনে হইল, স্থানটা খুবই পবিত্র এবং ইহা কোন দেবভূমি। পাঠশালার সামনেই একটি রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ। একটি খোলার চালা, মাটির দেওয়ালে গৃহ নির্মিত হইয়াছে। জানিলাম, ইহা শিবস্থান। আমি মন্দিরটিতে প্রবেশ করিলাম। ধূপবাতি জ্বালিবার সাধারণ বস্তু ভিন্ন উহাতে দেবমূর্তি ছিল না। আমি স্থানটিকে এতটা পবিত্র কেন মনে হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম; এখানে চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব হয়। সাতদিনব্যাপী যজ্ঞ হয়। সহস্র লোকের সমাগম হয়। সপ্তম দিবস পূর্ণাহুতির পর সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া প্রধান যজ্ঞকারী পায়ে হাঁটিয়া এক এক দিক হইতে অন্য দিকে চলিয়া যান। তাঁহার পায়ে বা গায়ে তাপ লাগে না। ইহাই এই স্থানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আপনি সাধু মানুষ, আপনার দিব্যচক্ষে ইহার পবিত্রতা দেখিয়াছেন, ঐ স্থানে দিব্যভাবের কোনই চিহ্ন ছিল না। কিন্তু স্থানের মধ্যে আমি একটা গম্ভীর পবিত্রতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই স্থানে শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা সভা হইল। রাত্রিতে নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামের লোক একত্র হইয়াছিল।

ত্রিযুগী নারায়ণ। ত্রিযুগী নারায়ণ শিব পার্বতীর বিবাহ স্থান। এখানে শিবের বিবাহ কাল হইতেই যজ্ঞাগ্নি রক্ষা হইতেছে। আমি এখানে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া যজ্ঞ করিলাম। পাণ্ডা এবং পুরোহিত আমাকে এখানে যজ্ঞ করাইয়া দিবেন বলিয়া জেদ করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আমি নিজেই যজ্ঞ করিতে জানি। নিজেই যজ্ঞ করিব। যজ্ঞের পর পুরোহিত ও পাণ্ডারা দক্ষিণার জন্য চাপ দিলেন। আমি বলিলাম দক্ষিণার জন্য আমার যাহা দেয় উহা বেদীর উপর রাখা আছে। যেটা যাঁহার প্রাপ্য লইতে পারেন। তাঁহারা শাপাশাপি আরম্ভ করিলেন। আমি এঁদের অযথা জেদ দেখিয়া একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম এবং বলিলাম, যদি আপনারা আকারণ জেদ করেন, শাপাশাপি করেন তবে আমিও আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিব না, একজন যোগী ও সাধুকে শাপাশাপি করিবার আপনাদের কোনই অধিকার নাই। শক্তিও নাই। এরূপ গোলমাল করিবেন না। গোলমাল করিলে আমি কি করিতে পারি, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম আপনাদের এক একজনকে ধরিয়া আমি অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিব। একথা বলিয়া আমি ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখন জনসাধারণ ও ওঁদের দলের সমস্ত লোক বুঝিলেন, এইরূপ গোলমাল করা অন্যায়। ঘটনার পরিসমাপ্তি হইল।

ত্রিযুগী নারায়ণের পাণ্ডা ও পুরোহিতকে কিছু দিবার কথা আমি পূর্বে ভাবি নাই। আমার ধারণায়ও এ সম্বন্ধে কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁহারা হঠাৎ এসব ব্যাপারে আমার স্বাভাবিক শ্রদ্ধাময় দৈব কার্যে বিঘ্ন করিবার চেষ্টা করিবার দরুণ, আমি ওঁদের হাতে কিছু দিবার প্রয়োজন স্বীকার করি নাই। ত্রিযুগী নারায়ণ আমার শক্তিবাদীয় দৃষ্টিতে অত্যন্ত উচ্চ স্তরের সিদ্ধ পীঠস্থান। মহাযোগী ও মহাতপস্বী শঙ্কর পার্বতীকে বিবাহ করিবার পর তাঁহার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা বিশ্ব সংসারের মঙ্গল কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। পার্বতীর প্রশ্নে শঙ্কর যে সব শাস্ত্ররাশি প্রকাশ করেন, আজ উহা তন্ত্রশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। পার্বতী ও শঙ্করের পুত্র গণেশ এবং কার্তিক অসুর নাশের জন্যই জন্ম লইয়াছিলেন। শিব পার্বতীর মিলন বিশ্ব কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছিল। ত্রিযুগী নারায়ণ সেই তীর্থের পীঠভূমি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগ ধরিয়া এই অগ্নি বিদ্যমান থাকিবার দরুণ, ইনি "ত্রিযুগী নারায়ণ" নামক অগ্নিদেবতা।

উত্তরাখণ্ড ভ্রমণে গঙ্গোত্তরীর পথে যাঁহারা বাহির হন, তাঁহারা দেবপ্রয়াগ হইতে ভাগীরথী গঙ্গার ধার ধরিয়া গঙ্গোত্তরী পর্যন্ত গমন করেন এবং সেই স্থান হইতে ফিরিয়া তাঁহারা ত্রিযুগী নারায়ণে আসেন এবং এখান হইতেই কেদারনাথ এবং বদ্রিনারায়ণ দর্শনে অগ্রসর হন। আমরা ত্রিযুগী নারায়ণ পীঠের সন্নিকটে চণ্ডী মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এখানে নিত্য চণ্ডীপূজা এবং চণ্ডীপাঠ হয়। এখানে গৌরী কুণ্ড চটিতে যাইবার পথে কিছুটা পথ নামিয়া আসিতে হয়। ইহার পর গৌরী কুণ্ডের পথ অত্যন্ত দুর্বল মনে হইবে। কারণ পথটা অত্যন্ত সংকীর্ণ, এবং ভয়ঙ্কর ভাবেই উঁচু।

গৌরী কুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইবার সময় আমাদের সঙ্গে এবং একটু আগে এক হিন্দুস্থানী মহিলা এবং তাঁহার স্বামী তীর্থ পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, পথটি ভয়ঙ্কর ভাবেই দুর্গম। মহিলার ক্ষুধা পাইয়াছে। তিনি কিছু আহার করিতে চান। খাদ্য তাঁহার মাথায়ই ঝুড়ির মধ্যে রহিয়াছে। স্বামী তাঁহাকে আহার করিতে দিবেন না; খরচা বৃদ্ধি হইবে, ইহা তিনি পছন্দ করিতেছিলেন না। পথ চলিতে চলিতে বেচারী

ভয়ঙ্কর কাঁদিতে ছিলেন। সংসার জীবনে স্বামী স্ত্রীর জীবন কিরূপ ভয়ঙ্কর জীবন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি পেছনে পেছনে অগ্রসর হইতেছিলাম। সমস্তটা পথই বেচারী একই দাবী করিতেছিলেন। "হায়! বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, আমার মাথায় বোঝা, আমার ভয়ঙ্কর ক্ষুধা পাইয়াছে, তুমি আমাকে আহার করিতে দিবে না, এ তোমার কিরূপ ধর্ম?" স্বামী বলিতেছিলেন, "তোকে তো আমি বাড়ি থাকিতেই বলিয়াছিলাম, যে তুই আমার সঙ্গে আসিস না, তুই পারবি না। তখন তুই না বলিয়াছিলি, আমি বোঝা লইয়া যাইব, রান্না করিয়া খাওয়াইব, তোর সেবা করিব, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। এখন রাস্তায় আসিয়া মাঝে মাঝে তোর ক্ষুধার বায়না উঠিতেছে। চল, গৌরী কুণ্ডে, সেখানে রান্না ও আহার হইবে।" স্বামী স্ত্রী এভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। আমরা রাস্তার ধারে বসিয়া যেখানে যেমন প্রয়োজন আহারাদি করিতেছিলাম। কাজেই ওঁরা একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন। আমরা গৌরী কুণ্ডে যাইয়া দেখি স্বামী স্ত্রী গাঁঠ বন্ধন বাঁধিয়া গৌরী কুণ্ডে স্নান করিতেছেন, পুরোহিত সংকল্প পাঠ করাইতেছেন। শিব পার্বতীর বিবাহ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এতটা নিষ্ঠুরতা ও কৃপণতা আমার মনকে চিন্তাযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু ওদের গাঁঠ বন্ধন এবং ধর্মানুষ্ঠান দেখিয়া আমি ভালভাবেই বুঝিলাম, পৌরোহিত্যবাদীয় ধর্মানুষ্ঠানে এবং সন্তান জন্ম বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর মতভেদ থাকে না। এবং এই ভাবেই সংসার বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের পালনলীলা সম্পন্ন হইয়া চলিয়াছে।

গৌরী কুণ্ডে তপ্ত জলধারা রহিয়াছে। গৌরী এখানে মহাযোগী শঙ্করকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। শিব তখন কেদারনাথে অবস্থান করিতেন। গৌরী রাজকন্যা সুন্দরী এবং ধর্মনিষ্ঠ তপস্বিনী। তিনি বালিকা হইলেও শিবকে ভালবাসেন। মহাযোগী শিব স্ত্রী চান না। জীব যে সব প্রাকৃতিক আকর্ষণে স্ত্রী কামনা করেন, শিব সে সব স্তর অতিক্রম করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য ক্রমবিকাশ ৫ম অধ্যায়)। দেবতারা তপস্বিনী কন্যার তপস্যায় বিচলিত। কুমারী রাজকন্যার কঠোর তপস্যায় বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষীরাও বিচলিত হইয়াছে। শঙ্কর ধ্যানমগ্ন। গৌরী ও শঙ্করের সন্তান জন্মিলে ত্রিপুরাসুর বধ হইবে। দেবতারা এ জন্যও চিন্তিত ও বিচলিত হইয়াছেন। শিবকে কাম জগতে আনা যায় কিনা, সেই চেষ্টার জন্যই কামদেবের পঞ্চশর নিক্ষেপ। মদন দেবতার এই স্পর্ধা মহাযোগী সহ্য করিলেন না। কামদেব ভস্মীভূত হইলেন। পঞ্চশর মহাযোগীর কি করিতে পারে? মানব সভ্যতার ইতিহাসে মহাযোগী শঙ্করের বিবাহ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। ত্রিযুগী তীর্থ, গৌরীর তপোভূমি এবং কেদারনাথ এই তিনটি তীর্থস্থান এই ইতিহাসকে হৃদয়ে বহন করিতেছে। আমরা গৌরীকুণ্ডের ধারে উষ্ণ জলের তটে এক ছোট কুটিয়াতে রাত্রি যাপন করিলাম। এই কুটিয়াটি এক ব্রাহ্মণ মহোদয় আমাদিগকে রাত্রি যাপনের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। সমস্ত রাত্রেই মহাতপস্বিনী গৌরীর কথা আমার মনে হইতেছিল। মহাতপস্বী মহাদেবকে যিনি শিবস্তর হইতে শক্তিস্তরে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন সেই মহাদেবীকে আমি সমস্ত রাত্রিই স্মরণ করিলাম। শক্তিবাদ তো আমি অনেক পূর্বেই আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার শরীর পতনের পর এই মহান মতবাদকে ভারতে এবং বিশ্বে স্থান করিয়া দিবার জন্য গৌরীর মত তপস্বিনী কে বা কাহারা? গৌরী শেষ পর্যন্ত পঞ্চাগ্নি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বালিকার শরীর ক্ষীণ হইল, মুখের চেহারা অগ্নি ও সূর্য

তাপে পুড়িয়া লাল হইল। কেদারনাথ শিব এক ব্রহ্মচারীর বেশে নামিয়া আসিয়া গৌরীকে (এই গৌরী কুণ্ডে) এরূপ তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন। গৌরী রাজকন্যা, অশেষ সুন্দরী, সর্বভাবে সর্বগুণ ও সর্বসম্পদে সম্পন্ন। একজন জাতি কুলহীন উলঙ্গ পর্বতবাসী অতিবৃদ্ধ তপস্বীকে স্বামী করা গৌরীর শোভা পায় না, কয়েকদিন, নানাভাবে, শঙ্কর একথা বুঝাইলেন। গৌরী স্বামী নিন্দা করিতে বার বার নিষেধ করিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মুহূর্তে শিব নিজের রূপ ধারণ করিয়া সতীর হাত ধরিলেন। সতী স্বামীকে পাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার বুকের উপরের বল্কল বন্ধন শিথিল হইল। শিব নন্দী ষাঁড়ের উপর গৌরীকে পাশে বসাইয়া চলিয়া গেলেন। গৌরী কুণ্ডে রাত্রিবাস করিয়া আমি প্রাতঃকালে কুণ্ডে স্নান ও এখানে শক্তিতীর্থ কি আছে উহার খোঁজে বাহির হইলাম। নিকটেই এক শক্তি মন্দির, পূজারীর সঙ্গে পূজাপাঠ ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথা বলিলাম। এবং তুঙ্গনাথ তীর্থের পথে যাত্রা করিলাম। তুঙ্গনাথের পথ আরও দুর্গম। উপরে আসিয়া মনে হইল চারিদিকে বরফের পাহাড়ে গড়া সীমাহীন পর্বত চূড়াগুলি দূর দূর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্থানটা এতই উঁচু যে, চারিদিকের পাহাড়গুলিকে আর পাহাড়ই মনে হয় না। মনে হয় অনন্ত জলধি বক্ষে অত্যন্ত উঁচু উঁচু সাদা জলের বিশালাকার তরঙ্গরাশি। চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলে মনে হয় হিমালয়ের মধ্যস্থানে আসিয়াছি। বৃক্ষাদির আর অস্তিত্ব নাই। পর্বতটির উপরে কোন কোন স্থানে বরফ গলা আরম্ভ হইয়াছে। সেইসব স্থানগুলি পোড়া মাটির মত কালা রঙ ধারণ করিয়াছে। বরফ গলা স্থানগুলিতে ব্রাহ্মী সাগ দেখা দিয়াছে। ইহাদের পাতাগুলি বড় বড় থানকুনী পাতার মত এবং হলুদ রঙের ফুল। এই সব ব্রাহ্মী ওষধী তুঙ্গনাথ ও কেদারনাথ প্রভৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া ভারতের নানাস্থানে পাহাড়ী ব্রাহ্মী বলিয়া বিক্রয় হয়। পাহাড়ী ব্রাহ্মী এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মী এক রকমের আকার বিশিষ্ট গাছ নহে। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মীর উপকারিতা বেশী বলিয়া বঙ্গদেশের কবিরাজগণ দেশী ব্রাহ্মীরই প্রয়োগ করেন। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মী মস্তিষ্ক শীতলকারী ও মস্তিষ্ক শক্তিবর্ধনকারী এবং জরঘ্ন ঔষধ। সঙ্গীতজ্ঞগণ এই ব্রাহ্মীকে স্বরসম্পদ বৃদ্ধির কার্যে নিয়োগ করেন।

তুঙ্গনাথ দর্শন করিয়া আমরা তুঙ্গনাথ পর্বত হইতে অন্য পথে নামিয়া কেদারনাথের দিকে চলিলাম। গৌরীকুণ্ড হইতে তুঙ্গনাথ বেশ দূর এবং উচ্চ পথ, কিন্তু নামিবার পথটি খুবই সহজ এবং ছোট। মনে হইল সোজাই নামিয়া আসিলাম এবং কেদারের পথে চলিলাম।

কেদারের নিকটস্থ হইবার পথে দেখা গেল, অনেক স্থানেই বরফ জমিয়া রহিয়াছে। বরফ তখনও গলে নাই। কোন কোন স্থানে আমরা বরফের উপর দিয়াই আসিলাম।

কেদারনাথে আসিয়াই বুঝিলাম, ইহার মধ্যভূমিটি দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিব-পিণ্ড এবং এই শিব-পিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া দুইদিকে দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্ক বিরাজমান রহিয়াছে। কেদার ভূমির দুইদিকে পর্বতগুলি সবই বরফে আচ্ছাদিত ছিল। ডানে বামে দুইদিকে ছয়টি করিয়া বরফ ঢাকা পর্বত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মধ্যভূমি ধরিয়া মন্দাকিনী মা একটি ছোট নালার মত প্রবাহিত হইতেছেন। যখন এই ক্ষীণ নদী-পথ ধরিয়া আমরা উপরে উঠিলাম তখন আমার মনে হইতেছিল আমরা সুষুম্নাশীর্ষকে (মেডুলা অব লঙ্গাটা)

অবলম্বন করিয়া বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিব-পিণ্ডে প্রবেশ করিতেছি। স্থানটির সঙ্গে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিব-পিণ্ড স্থান এবং শিব-পিণ্ডের দুইদিক স্থিত বৃহৎ মস্তিষ্কের আকার বিশিষ্ট ছয়টি বরফ-ঢাকা পর্বতকে আমি বিশেষ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছিলাম, প্রায় দুই মাইল দূর হইতেই কেদারনাথ মন্দির দেখিতে পাইলাম। যেন মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া, যে সব নাড়ী, দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের তুঙ্গস্থানে প্রবেশ করিয়াছে, কেদারনাথের প্রাকৃতিক গঠনের সঙ্গে উহার হুবহু মিল রহিয়াছে। মন্দিরটিও এমন একটি স্থানে নির্মিত হইয়াছে যে স্থানটির সঙ্গে মস্তিষ্কস্থিত নির্বাণা নাড়ীর সংস্থানের মিল আছে। এই নাড়ীটি মস্তিষ্কস্থিত উন্নত শিবস্থান দুইটিকে সংযোগ করিয়াছে এবং শিব-পিণ্ডকে ভেদ করিয়া অবস্থিত আছে। মন্দিরটি ঠিক নির্বাণা নাড়ীর স্থানটির সঙ্গে মিল রাখিয়া নির্মিত হইয়াছে। (ক্রম বিকাশ ৪র্থ ভাগ, মস্তিষ্ক চিত্র ৩০নং নাড়ী)। আমি কেদার তীর্থের প্রাকৃতিক গঠনের সঙ্গে বৃহৎ মস্তিষ্ক এবং শিব-পিণ্ডের অবস্থানের মিলের বিষয় যতই মিলাইতেছিলাম ততই বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছিলাম। সাক্ষাৎ শিব বা মহর্ষি ব্যাসদেব ভিন্ন এমন দূরদর্শী মহাত্মা কে আছেন, যিনি এই কেদার তীর্থের এমন স্বাভাবিক স্থানটি নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন? আমি কেদারনাথের দুইদিকস্থিত পর্বতগুলির অবস্থানকে আরও ভালভাবে বুঝিবার জন্য পর্বতগুলির উপরে যতটা উঠা যায় ততটা উঠিলাম এবং কেদার তীর্থ শঙ্কর ভগবান এবং ব্যাসদেবের দূরদৃষ্টির কথা ভাবিতে লাগিলাম। এক এক দিকস্থিত ছয়টি পর্বতকে যে সাধারণ উচ্চভূমি এক করিয়া রাখিয়াছে ও সেই স্থানটি দেখিলে মনে হয় কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এই পর্বতগাত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্যই নির্মিত হইয়াছে বলিয়াই আমার মনে ধারণা হইতেছিল। পাঠক জানিয়া রাখুন, ইহা অর্থ ব্যয়ে নির্মিত কোন তীর্থভূমি নহে। এখানকার মন্দির ভিন্ন সমস্ত পার্বত্য পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ মাত্র। দেবাদিদেব যোগেশ্বর এই ভূমিতে তপস্যা করিতেন। আমার অনেক পুণ্যবল যে আমি আমার সমস্ত জীবনের তপঃকেন্দ্র মস্তিষ্কের সঙ্গে এই যোগভূমির মিল দেখিতে পাইয়াছিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পর আমার ধারণা আরও দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মন্দিরস্থিত শিবমূর্তিটি একটা প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডেরই আকারে নির্মিত এবং স্থাপনা করা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি বুঝিলাম, এই শিবমূর্তি নিশ্চয়ই স্বয়ং শঙ্কর অথবা ব্যাসদেবের কীর্তি। আমি যতই তীর্থস্থান ও মন্দিরের মূর্তির কথা ভাবিয়াছি, ততই মনে হইতেছিল, ইহা নিশ্চয়ই কেদারনাথ স্বয়ং শিবেরই কীর্তি। মহাদেব এইস্থানে তপস্যা করিতেন এবং আমার মনে হয় মস্তিষ্ক মণিরূপে নির্মিত এই শিবকে তিনিই স্থাপনা করিয়াছেন। সমবেত দর্শনার্থীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন এবং পুষ্পপত্র জল, ফল-মূল মাখন দুগ্ধ শিবের উপর নিবেদন করিতেছেন। বিরাটাকার শিবের একদিকে জল ফুল দিলে অন্যদিক হইতে উহার অনুমানও করা যায় না। প্রদত্ত জলটুকু দুগ্ধ, ঘি, মধু বা দধিটুকু যেন কোথায় কোন এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। শিবের চারিদিক হইতেই দর্শকগণ পবিত্র নৈবেদ্য ঢালিতেছেন। আমি আমার মস্তিষ্ক-মণির সহিত এই বিরাটাকার শিবের রূপের মিল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আমার কেদার দর্শন সার্থক হইয়াছে। শিব সম্বন্ধে ম্লেচ্ছ যবন এবং মূর্খ পণ্ডিতদের কুৎসিত কথাও আমি জীবনে অনেক শ্রবণ করিয়াছি। যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণে সেইসব ভ্রান্ত কথার খণ্ডন করিয়াছি এবং

প্রমাণ করিয়াছি, দুইটি বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডই শিব। কেদারনাথে আসিয়া আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। আমি এখানে আসিয়া এক ব্রহ্মাণ্ডজোড়া শিবস্থান এবং মস্তিষ্কপীঠ দর্শন করিলাম।

কেদারনাথে থাকিবার স্থান নির্ণয় করিবার জন্য কালী কম্বলীবাবার ধর্মশালায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, মধ্যবয়সী এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ''আপনি সাক্ষাৎ কেদারনাথ শিব। আমি এই ধর্মশালার কর্মচারী, স্বামী শান্তানন্দজী এখানের কর্মকর্তা; আপনি যেখানে খুশি স্থান গ্রহণ করুন।'' আমাকে ''সাক্ষাৎ কেদারনাথ'' বলিবার দরুণ আমি মৃদু প্রতিবাদ করিলাম। তিনি বলিলেন - ''আপনি প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু আপনি জানিয়া রাখুন, আমি মিথ্যা বলি নাই; এখানে নিত্য শত শত দর্শনার্থী আসেন, নিত্য চলিয়া যান। আপনার মত মহাত্মা কমই আছেন।'' কেদারনাথে কিছুদিন অবস্থান করিবার জন্য শান্তানন্দজী আমাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গী শ্রী রমেন্দ্রনাথ মল্লিককে একা ফেরৎ পাঠান নিশ্চয়ই অন্যায় হইবে ভাবিয়া আমি সে প্রস্তাব রক্ষা করিলাম না।

বদ্রিনারায়ণ। কেদারনাথ দর্শন করিয়া আমরা বদ্রিনারায়ণের পথে অগ্রসর হইলাম। কয়েক স্থানে এ পথটি অতি দুর্গম, তাহা হইলেও তেমন কোন কষ্টসাধ্য মনে হয় নাই। পথে পদহীন এক সাধুকে দেখিলাম, তিনি হাতের দ্বারা অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার দুই হাতে দুইখানা হাত-খড়ম। তাহারই উপর শরীরের ভার রাখিয়া বসিয়া বসিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

বদ্রিনারায়ণে প্রবেশ করিয়াই বুঝিলাম, ইহা বেশ একটা ছোট শহর। সেই দিনই কে. এম. মুন্সীও বদ্রিনারায়ণ তীর্থে আসিয়াছেন। বদ্রিনারায়ণে প্রবেশ করিয়া আমি মনে একটুও শান্তি পাইলাম না। আসিয়াই, চারিদিকে সবই ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখিলাম। মন্দির, শ্রাদ্ধ করিবার কেন্দ্র, ব্রহ্ম কপাল, গরম জলের কুণ্ড প্রভৃতি সবই দেখিলাম। ঈশ্বরীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব নামক এক শিক্ষিত যুবক ওই স্থানে পূর্ব ব্যবস্থামত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে মনের ওই অবস্থার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, ''বিরুদ্ধ পরিবেশ সম্বন্ধে আপনার মনে প্রভাব পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক। কংগ্রেস সরকার এই পবিত্র ধর্মস্থানকে একটা ভাল ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। আমি কংগ্রেসেরই লোক, তাঁহাদের মধ্যেই অবস্থান করিয়া, অন্ন বস্ত্রও আমি সেখান হইতেই পাইয়া থাকি। কিন্তু সকল স্থানেই এঁদের ধর্মহীন চালচলন আমার ভাল লাগে না। যাহাতে প্রত্যেক যাত্রী হোটেলে আহার করিতে বাধ্য হয়, এজন্য এখানে ডাল চাল নুন সব পাইবেন, কিন্তু কাঠ বা স্টোভ জ্বালিবার তেল পাইবেন না। মন্দির হইতে প্রসাদের মূল পূর্বদিন জমা দিলে পরের দিন দশটার মধ্যেই পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন চারিটার পূর্বে সেই প্রসাদ ডেলিভারী পাইবেন না। চারিটার পর এখান হইতে বাহির হইয়া কেহই পরবর্তী ভাল চটিতে সেইদিন আর যাইতে পারে না। ফলে যাত্রীদিগকে আটকাইয়া থাকিতে বাধ্য করা হয়। ফলে হোটেলওয়ালাদের ব্যবসা এবং মাথা পিছু সরকারী আয় বৃদ্ধি হয়। মন্দিরের মধ্যে কয়েকজন লোক রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে সামান্য বেতন দেওয়া হয়। তাহাদের কাজ হইতেছে কয়েকটি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকা। যাত্রীরা যাহাতে ভাবে, মন্দিরে

সর্বদা বেদগান হইতেছে, সরকার ভাল ব্যবস্থাই করিয়াছেন ইত্যাদি।" মনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আমার মনে অনেক রাত্রি পর্যন্তই রহিল। আমি শ্রীবাস্তবকে বলিলাম, "কাল শেষ রাত্রে আমি তপ্ত কুণ্ডে স্নান করিব এবং ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দিব। আপনি সাহায্য করিবেন। আমি পিণ্ডগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিব আপনি একটি একটি করিয়া আমার হাতে দিবেন। আমি পরলোকগামীদের স্মরণ করিয়া ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদান করিব।" সেই অনুসারে আমি প্রায় একশ চল্লিশ জন লোকের নাম লিখিয়া লইলাম। শেষ রাত্রে আমি তপ্তকুণ্ডে স্নান করিলাম। স্নানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল শরীরের পাপের মলিনতাগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া আমার শরীর হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। স্নানান্তে শরীর এখন খুবই হালকা ও পবিত্র মনে হইতে লাগিল। আমি ব্রহ্মকপালে প্রবেশ করিলাম, তখনও ঊষাকাল হয় নাই। পিণ্ডদানের পর ঊষার আভাস বুঝা যাইতেছিল। আমি পিণ্ডগুলি তুলিয়া অলকানন্দায় ফেলিয়া দিয়াছি, ঠিক এমন সময় কোথা হইতে এই ভয়ঙ্কর শীত ভেদ করিয়া দুইটি দাঁড়কাক সেই পিণ্ডদান স্থানে আসিল এবং পিণ্ডের যাহা কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল উহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার করিয়া কা-কা করিতে করিতে চলিয়া গেল। পিণ্ডদান কালে আমার মনে এত শান্তি এবং তৃপ্তি নামিয়া আসিল যে আমি তীর্থ মাহাত্ম্য বুঝিতে লাগিলাম। ইহার পর আমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবদর্শন করিলাম। দেবতার মূর্তি কিরূপ উহা বুঝা যায় না। যাত্রীগণকে মন্দিরের মধ্যে দেবতার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্তি দর্শন করিয়াছেন। এখানে লিঙ্গের মূর্তি। তাঁহাকে এমন ভাবে সাজানো হইয়া থাকে যে উহা বুঝা যায় না। বাহিরে যজ্ঞাগ্নি প্রস্তুত করিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। আমি কিছু পয়সা দিয়া সেই অগ্নিতেই আহুতি দিলাম। বদ্রিনারায়ণ আমাকে প্রচুর শান্তি ও তৃপ্তি ঢালিয়া দিয়াছেন। আমরা আর অপেক্ষা না করিয়া এগারটার মধ্যেই ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

কেদার বদ্রির মত এমন সুন্দর তীর্থ আর হয় না। আমার তীর্থ সেবার সব কামনা এখানেই পূর্ণ হইল। আজও শেষ রাত্রের উপাসনার সময় আমার অন্তরে এই মহান তীর্থের পবিত্র ও স্নিগ্ধ স্মৃতি উদ্ভাসিত হয় এবং আমি সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির সঙ্গে অনুভূতি মিলাইয়া ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করি। হে তীর্থরাজ! তুমি আমাকে অমরত্ব দান করিয়াছ। তুমি হিন্দু জাতিকে অমর করিয়া রাখ। আবার যদি জন্ম হয় তবে যেন এই হিন্দু বংশেই জন্মগ্রহণ করি এবং বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া কেদার বদ্রি দর্শন করি।

কেদার বদ্রি দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে রাত্রিতে এক চটিতে বিশ্রাম কালে জানিলাম, শক্তিবাদ শিষ্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর রাজ্যে সেখ আবদুল্লার জেলে বন্দী আছেন। যতটা শুনিলাম তাহাতে ভালই বুঝিলাম, এই বন্দীদশা ষড়যন্ত্রমূলক। ভারতের যবনতোষক নেতারা ইহাতে জড়িত আছেন। তাঁহাকে যে আর জীবিত দশায় পাওয়া যাইবে না, ইহা আমি নিশ্চয়ই বুঝিলাম। ফিরিয়া কলিকাতায় আসিয়াই জানিলাম তিনি আর সশরীরে নাই। তিনি হত কি নিহত, অথবা অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চলিয়া গিয়াছেন, সেটা আর জানা যায় নাই, কারণ ইহা লইয়া তদন্ত করিবার কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। আমিও বুঝিলাম, এবার আমাকে শক্তিবাদ মঠের কেন্দ্র স্থাপনা করিতে হইবে।

বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত লইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সমাজের মধ্যে শক্তিবাদ ধর্মের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আঠার বৎসর কাল পরিচিত ছিলাম। আমি ভারতের বহু স্থানে বহু নেতার সঙ্গে ভারতে শক্তিবাদ প্রবর্তনের কথা আলোচনা করিয়াছি। বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছি, অনেক খড়মের কাঠ ক্ষয় করিয়াছি। মহাপাপীরা যবনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে হত্যা করিয়াছে। আমি এবার কোন নেতার সঙ্গেই আর মিশিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম এবং মঠ মন্দির ধর্ম স্থাপনার কার্যে আত্ম নিয়োগ করিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পথে-ঘাটে

(১) **স্বদেশ ভক্তি**। এলাহাবাদ আমিন গাঁও এক্সপ্রেসে আপের দিকে চলিয়াছি। গাড়িতে বিশেষ লোক ছিল না। আমি আমার কম্বলখানা একটু বড় করিয়া বিছাইয়া একদিকে বসিয়া আছি। এক ভদ্রলোক পাতলা গড়ন, সুন্দর চেহারা, ত্রিশ বত্রিশ বয়স, গায়ে খদ্দরের সার্ট, মাথায় গান্ধী টোপী। তিনি একটি মুসলমান বালককে হঠাৎ তাহার পিতার পাশ হইতে তুলিয়া আমার আসনে বসাইলেন। আমি একটু বিস্ময়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাইয়া হিন্দীতে বলিলাম; এ কি রকম কথা? এবং সঙ্গে সঙ্গে বালককে তুলিয়া দিলাম। সে নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। খদ্দরধারী ভদ্রটি আমাকে কটুভাষায় দেশদ্রোহী বলিয়া আক্রমণ করিলেন। আমি বলিলাম, আপনি কি জানেন না যে সাধুর আসনে বসিতে নাই। তিনি বলিলেন, আপনি আসন বড় করিয়া বিছাইলেন কেন? আমি তৎক্ষণাৎ আসনকে ছোট করিলাম, এবং বলিলাম এবার আপনার কি বলিবার আছে, বলুন। তিনি বলিলেন, আপনারাই দেশের শত্রু। আপনারা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করেন, এ জন্য মুসলমানেরা ভারতের শত্রুতা করে। আমি বলিলাম, আমি যদি অন্যায় করি, মুসলমানেরা আমার সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিতে পারে। কিন্তু বর্বররা নিজের মাতৃভূমির শত্রুতা করিবে কেন? যাহারা আট শত বৎসর ভারতে অবস্থানের পরও ভারতকে ভাগ করিতে চায়। তাহাদিগকে আপনি ভারতীয় মনে করেন! ঐ বালককে দেখুন, কিরূপ নোংরা ওর শরীর ও বসন ভূষণ? আট শত বৎসরে এরা দাঁতুন পর্যন্ত করিতে শিক্ষা করে নাই। এরা ভারতীয় বেশভূষা এবং পবিত্রতা ও শুদ্ধতা কেন শিক্ষা করে না! জানিয়া রাখিবেন, আপনারা ভয়ঙ্কর বিষধর লইয়া ছেলেখেলা করিতেছেন। ওদের ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি, বেশভূষা, ভদ্রতা, সভ্যতা শিক্ষা দিন। ভয়ঙ্কর শাসনের মধ্য দিয়া ইহাদিগকে গড়িয়া তুলুন, জাতীয়তার সংস্কার করুন, শুদ্ধি করুন। ভদ্রলোক যত পারিলেন সাধুর নিন্দা করিলেন এবং আমাকে বৃথা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া আবার মুখ খুলিলাম। আপনি কি বলিতে চান, দেশকে ভাগ করিবার জন্য যাহারা কোমর বাঁধিয়াছে, তাহারাই স্বদেশ প্রেমী, আর যাহারা ঐ বিজাতিবাদী ম্লেচ্ছদের চরণ কমলে তৈল মর্দন করিবার জন্য গান্ধিটুপী মাথায় দেন, তাঁহারাই স্বদেশ প্রেমী আর যে সব মহাত্মারা হিমাচল হইতে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমির প্রতিটি পর্বত, নদী, গ্রাম, শহর, নগর, বৃক্ষলতা, ধূলিকণা ও পশুপক্ষীকে পবিত্র বলেন এবং নিজেরা তপঃব্রত ধারণ করেন এবং জনতাকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা দেশদ্রোহী? আপনার ভয়ঙ্কর আস্পর্ধা তো? আপনি বিজাতিবাদী এবং মক্কাবাদীদের পায়ে তৈল মর্দন করিতে থাকুন এবং ঐ দুষ্কার্যকে পবিত্র দেশ ভক্তি বলিয়া কথায় ব্যবহারে ও পত্রিকায় জাহির করুন, আমাকে বেশী ঘাঁটিবেন না। আমি মক্কাবাদী বর্বর ও পাষণ্ডবর্গকে জানি,

আর যবন তোষক অদূরদর্শী মূর্খগণকেও চিনি। এখন চুপ থাকুন, ইতিহাস প্রমাণ দিবে, গান্ধিজী টুপীধারীরা এবং মক্কাবাদীরা ভারতের মঙ্গলকারী কি সর্বনাশকারী। ভদ্রলোক প্রায় এক ঘণ্টা চুপচাপ থাকিয়া দাঁড়াইলেন, আমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, ক্ষমা করুন, আমি এখানেই নামিব। আমি চুপ থাকিয়া ইঙ্গিতে আশীর্বাদ জানাইলাম।

(২) **নেপালীদের প্রভুভক্তি এবং পুরোহিতের স্থিত চিন্তা।** এক স্টেশনে নামিলাম। পরবর্তী গাড়ির সময় চার, পাঁচ ঘণ্টা পরে। আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে, নূতন জায়গা দেখিতে বাহির হইলাম। দেখিতে লাগিলাম, নিকটে কোন মন্দির আছে কিনা। কোন মন্দির বা সাধু সন্ন্যাসীই দেখিতে পাইলাম না। কোথাও বিশেষ পথ ঘাটও নাই; খোলা মাঠ, ছোট বড় ঘাসের জঙ্গল। এক নেপালী আমাকে অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় গালি দিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আপনার কি বলিবার আছে বলুন, এত কদর্য ভাষায় গালাগালির প্রয়োজন কি? ইহাতে সে আরও ক্রুদ্ধ হইল। তাহার কথা, আমি নাকি তাহার রুটি নষ্ট করিতে (চাকুরী নষ্ট করিতে) আসিয়াছি। এতক্ষণে বুঝিলাম, সে হয় তো চৌকীদার এবং আমি তাহার সীমার মধ্যে আসিয়া গিয়াছি। আমি বলিলাম, গালি দিয়া কি লাভ, এখন বল কোন দিকে কতটা যাইতে হইবে। সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তুমি স্টেশনের মধ্যে চলিয়া যাও, নয়তো ঢিল মারিয়া তোমাকে জখম করিব।

(৩) দার্জিলিঙে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি বর্ধমানের মহারাজের বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। কোথাও কোন লোকজন নাই। বাড়ির কোন গেটও নাই। বাড়ি ঘর খুব সুন্দর ভাবে সাজানো। অনেক শিক্ষার ব্যবস্থাও রহিয়াছে; কাঁচের বেড়ায় হল গৃহটি ঘেরা আছে। আমি সব দূরে দূরে থাকিয়াই দেখিলাম এবং কোন লোক আছে কিনা, খোঁজ করিতে লাগিলাম। এর মধ্যে একজন নেপালীকে দেখিতে পাইলাম। আমি অগ্রবর্তী হইয়া তাহার নিকটস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ঙ্কর কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল। মনে হইল, সে এখানের চৌকীদার, কিন্তু অন্য কোন কাজও করে এবং মাঝে মাঝে আসিয়া ঘুরিয়া যায়। সে বলিল, তোমাকে এই সদর পথে বাহিরে যাইতে দিব না। তুমি ঐ দিক দিয়া শীঘ্র বাহিরে চলিয়া যাও, নয়তো ঢিল মারিব। আমি তাহার নির্দিষ্ট সেই পথেই বাহির হইলাম, বুঝিলাম, ইহা কোন পথ নহে; নিকটেই বস্তির নরনারীদের ইহা পায়খানা করিবার স্থান। আমি ঘুরিয়া আবার মহারাজার বাড়ির সামনের দিকে আসিলাম। সেখানে কয়েকখানা ছোট মন্দির ছিল। (৪) প্রবেশ কালেই আমার মন্দির দর্শনের ইচ্ছা ছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়াই মন্দিরের নিকটস্থ হইলাম। পূজারী সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, সব দেবতার মন্দির দর্শন করাইলেন এবং বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে নেপালীর কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, নেপালীরা চৌকিদারীর কাজ পাইয়া কুকুর ধর্ম গ্রহণ করে। চৌকিদার নেপালীদের আরও বহু হীন ব্যবহারের কথা আমার মনে জাগিল। আমি তাঁহাকে আর কোন কথাই বলিলাম না। পূজারী মনের সুখে মহারাজাকে নিন্দা করিলেন, গালি ও শাপ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ‘‘মন্দিরের পূজার জন্য আমি মাসে ৫০্ টাকা বেতন পাই; তিন মাস হইয়া গিয়াছে, আমার বেতন আসে নাই। ঐ দেখুন, আমার পুত্র ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে। আমি

তাহার বেতন দিতে পারি না। আমি ঐ রাজার সর্বনাশ কামনা করি।'' আমি বলিলাম, ''আপনি পুরোহিত হইয়া যজমানের উপর শাপ দিবেন? ইহা শুনিতে আমার ভল লাগিল না। আপনি এই কাজ ছাড়িয়া দিন।'' তিনি কাজ ছাড়িবেন না, শাপ দিতেও ছাড়িবেন না বলিলেন।

(৫) কোতোয়ালের রামভক্তি। চুনারের গঙ্গার ধারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। কয়েকজন পরিচিত ভদ্রলোক, সকলেই রিফর্মটারী কয়েদখানার কর্মচারী; কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রলোকও তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন। পরিচিতেরা জেদ ধরিলেন; কাজেই আমাকে বসিতেই হইল। অপরিচিত ভদ্রলোক (পরে জানিলাম ইনি চুনারের কোতোয়াল O.C.) আমাকে বলিলেন, ''গঙ্গায় ময়লাই ফেল, আর চন্দনই দেও, গঙ্গা মায়ের নিকট সবই সমান; আপনি কি বলেন?'' আমি বলিলাম, ''গঙ্গা মায়ের যদি চেতনাশক্তি আছে, মানা যায়, তবে তিনি দুইটা কার্যকে এক দেখিবেন না। তবে মায়ের অসীম স্নেহ, কাজেই হয় তো তিনি সেটা সহ্য করিবেন। যে ইচ্ছা করিয়া মায়ের গায়ে ময়লা ফেলে এবং যে ভক্তি করিয়া চন্দন দেয়, উভয়ের কার্যফল কিছুতেই এক হইতে পারে না।'' কোতোয়াল নানা ফন্দিতে তর্ক করিলেন, সব স্থানেই তিনি যুক্তিতে পরাস্ত হইলেন। শেষ কালে, তিনি আত্মপরিচয় দিলেন (O.C.) এবং তাঁহার কথা আমাকে মানিয়া লইতে বলিলেন। তিনি রামভক্ত, রামায়ণপাঠী, এম. এ. পাশ, হিন্দীভাষায় পণ্ডিত ইত্যাদি, অনেক আত্মপ্রশংসা করিলেন। উপস্থিত পরিচিতগণও ইহার সমর্থন করিলেন। আমি বলিলাম, দুইজনে কথা হইয়াছে, ইহাতে মানিয়া লওয়া বা মানিয়া না লওয়ার কি কথা আছে? আপনি যেমন ইচ্ছা মনে করুন না? কোতোয়াল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ''তোমাকে মানিতেই হইবে।'' আমি একটু বিস্মিত হইলাম এবং বলিলাম, ''ক্রুদ্ধ হইবার কি আছে?'' তিনি বলিলেন, একজন পদস্থ বিদ্বান লোকের একটা কথা তুমি মানিতে পার না? আমি বলিলাম, আপনি পদস্থ লোক ইহা মানি। কিন্তু কিরূপ বিদ্বান সেটা বুঝিলাম না। আমার সঙ্গে আপনি এতক্ষণ ''আপ'' শব্দ ব্যবহার করিয়া কথা বলিয়াছেন, এর মধ্যেই আপনি ''তুম্'' বলিতেছেন। ইহাতে মনে হয় না আপনি হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত। ''আপ'' এবং ''তুম্'' একই ব্যক্তির উপর ব্যবহার চলে না। তিনি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি ''তোকে'' ''তু'' বলিতেছি। আমি বলিলাম, এতেও প্রমাণিত হয় যে আপনি ''হিন্দী'' তো জানেনই না ভদ্রতাও জানেন না। সাধারণতঃ গোঁয়াররাই এইরূপ ভাবে কথা বলে। কোতোয়াল সাহেব ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইব, তুমি আমাকে অপদস্থ করিয়াছ। আমি বলিলাম, আমি মোটেই অপদস্থ করি নাই, আপনি অকারণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। প্রতিশোধের কথা বলিতেছেন, সেটাও দেখা যাইবে। এ কথা বলিয়া আমি ভ্রমণে বাহির হইলাম।

সন্ধ্যাবেলা আমি কুটিয়াতে ফিরিয়াছি, একজন চৌকিদার আমার সামনে আসিয়া কতগুলি অপমানকর প্রস্তাব করিল। আমি চৌকিদারকে বলিলাম, কোতোয়াল সাহেবকে যাইয়া বল, এ সব ভাল না, ইহার ফল ভাল হইবে না।

পর দিন জানিলাম, সকাল বেলা কোতোয়াল সাহেব গঙ্গা পার হইবার সময় (খুব বড়) নৌকা হইতে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন। দুইদিন অজ্ঞান থাকিবার পর, আমারই এক কবিরাজ শিষ্য কোতোয়ালের স্ত্রীর অনুরোধে কোতোয়ালকে চিকিৎসা করেন এবং সজ্ঞান করেন। সজ্ঞান হইবার পর চুনারে বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহাকে নির্দোষ মহাত্মার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখিতে নিষেধ করেন। কিন্তু আশ্চর্য, কোতোয়াল সাহেব কয়েক দিন বাদই আবার অপমানকর কিছু প্রস্তাব সহ চৌকিদারকে পাঠান। আমি চৌকিদারকে বলিলাম, "তোমার কোতায়ালের ভাগ্যে আরও দণ্ড আছে", ওকে এ কথাই যাইয়া বল। ১৫ দিনের মধ্যে কোতোয়ালকে O.C. হইতে নামাইয়া একটা ফাঁড়ির কর্তা হইতে হইল ঘুষের দায়ে। বেতনও কম হইবে। ফাঁড়িতে যাইবার পরও তাঁহার উপর আবার ঘুষের দায়ে তদন্ত হইল এবং তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইল। এ ঘটনার দুই বৎসর বাদ তিনি একবার চুনারে আসেন, তাঁহার রামায়ণ পার্টির বন্ধু ও জনতা তাঁহাকে সম্মান দিবার জন্য মহাবীরের মন্দিরে জমায়েত হইলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কোতোয়াল সাহেব বলিলেন, নারায়ণ কিরূপে কাহাকে কখন দর্শন দেন, ইহা কেহই জানে না। কোতোয়াল শ্রীচক্রবর্তী এগারটি কন্যার পিতা। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামায়ণ পাঠী বলিয়া সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন। চুনারের বক্তৃতার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি যুদ্ধের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং আপন ভাগ্য পুনর্গঠনের পথ করেন।

(৬) পাহাড়ের মঠে (চুনার) এক চামার চাকর ছিল। সে আশ্রমের রান্নার বটুলী ও কাঠের পাল্লা চুরি করিয়া ইমিলিয়া নামক গ্রামে এক কুনবীর নিকট বিক্রয় করে। এ ঘটনার কিছুদিন বাদ আমি পাহাড়ের মঠ ছাড়িয়া ভৈরব গুহায় চলিয়া আসি। ইতিমধ্যে সে চামার অসুস্থ হইল; তাহার পেটে এক ভয়ঙ্কর যাতনা দায়ক ব্যথা হইল। দিন রাতে ১০, ২০ বার ব্যথা উঠিত। সে ভয়ঙ্কর ছটফট করিত, এবং চিৎকার করিত। ব্যথা কালে সে নিজেই বলিত ওই ছোট্‌কা বাবা ত্রিশূল দ্বারা আমাকে খোঁচাইতেছেন, আমি মঠের বটুলী ও পাল্লা চুরি করিয়াছি, ইমিলিয়া গ্রামে বিক্রয় করিয়াছি, আমি এ জন্য এই যাতনা ভোগ করিতেছি। তোমরা আমাকে বাঁচাও। সে এই ভাবেই যাতনায় চিৎকার করিয়া ৩, ৪ মাসে প্রাণত্যাগ করে। তাহার গ্রামবাসীরা আমাকে অনেক খোঁজ করিয়াছিল, দেখা পায় নাই। এইরূপ অনেক ঘটনা আরও আছে। পাঠক জানিয়া রাখুন, সবখানে ফাঁকি ও চুরির ফল ভাল হয় না।

(৭) মঘা। চুনার স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে, আমিও স্টেশনে পৌঁছিয়াছি। টিকেট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিনা টিকেটেই আমি গাড়ির সামনে দাঁড়াইয়াছি। স্টেশন মাষ্টার ও গার্ডকে বলিলাম, আপনারা T.T.I. কে বলুন, যেন আমাকে টিকিট প্রস্তুত করিয়া দেন। T.T.I. নিকটেই ছিলেন। গাড়ি ছাড়িল, আমি টি.টি-কে বলিলাম, আমার টিকেটটা প্রস্তুত করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আপনাকে এলাহাবাদ হইতে ২৷৹ গুণ ভাড়া দিতে হইবে। আমি তো নিজেই দেখিলাম, আপনি স্টেশন মাষ্টার এবং গার্ডকে বলিলেন। কিন্তু এঁরা কেহই কাজের বেলায় সাক্ষী দিবেন না। আমি সত্য কথার ভিত্তিতে টিকিট প্রস্তুত করিলে, আমাকেই ইহার জবাব দিতে হইবে, তখন ওঁরা সকলেই অস্বীকার করিবেন। আমার মতে, আপনার হাতে যখন অতিরিক্ত পয়সা নাই, তখন আপনি চুনারের পরের

স্টেশনে নামিয়া হাঁটিয়া কাশী চলিয়া যান। আমি অগত্যা তাহাই করিলাম। কাশীতে যাইয়া আমি পঞ্জিকা দেখিলাম এবং বুঝিলাম ‘‘মঘা নক্ষত্রের যাত্রা’’। মঘার ফলে আমি আমার জীবনে অনেকবার অপ্রস্তুত হইয়াছি। মানুষের সত্য ও সততা হইতেও কি দৈবজগৎ বলবান?

(৮) একদিন অতুলবাবু (তাঁহার কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে) আমাকে বলিলেন, আপনার গুরুদেবের সঙ্গে আমার অনেকবার আলোচনা হইয়াছে। তিনি চান, ‘‘আপনি উন্নত স্টাইলের জীবনযাত্রার অভ্যাস করুন।’’ আমি বলিলাম, এ জীবনে আর ঐরূপ হইবার সুযোগ আসিবে না। ইহার কারণ শুনুন – বাল্যকালে রজনী বক্সী নামক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে আসিতেন এবং দুই-চার দিন অবস্থান করিয়া চলিয়া যাইতেন। তিনি ঢাকা কলতা বাজারের বসাক জমিদারদের কর্মচারী ছিলেন। কলতা বাজারের সঙ্গে আমাদের অনেক জায়গা-জমি এবং তালুকদারীর সম্বন্ধ ছিল। বক্সী মহাশয়কে আমরা নিজেদের পরিবারের সম্মানীয় ব্যক্তি মনে করিতাম। তিনি আমাদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতেন। তাঁহার কথিত একটি গল্প আমার জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এক কুম্ভকারের কন্যা, বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বর-ভক্ত। সে নিত্য শেষরাত্রে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার জন্য আসনে বসিত। দৈববলে কন্যাটির বিবাহ রাজপুত্রের সঙ্গে হইল। রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্র এখন রাজা হইয়াছেন। কন্যা নিত্য শেষরাত্রে সেই কুম্ভকারের বেশ ধারণ করিয়া পূজাগৃহে গমন করিতেন এবং ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন। রাজা একদিন শেষরাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর, জানিলেন, রাণী বিছানায় নাই। তিনি খোঁজ করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে তন্ময় ও অত্যন্ত মলিন বস্ত্রধারিণী রাণীকে দেখিতে পাইলেন। ধ্যানভঙ্গে, স্বামীর প্রশ্নে কুম্ভকার-কন্যা বলিলেন, ‘‘আমি গরীব কুম্ভকার-কন্যা, ঈশ্বরের আশীর্বাদে রাজগৃহে আসিয়াছি। আপনি এবং আপনার পিতা দয়া করিয়া আমাকে রাণীর স্থানে বসাইয়াছেন; আমার রাণী হইবার যোগ্যতা নাই; কাজেই আমি আমার স্বাভাবিক বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ভালবাসি।’’ এই গল্পটি আমার জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। গুরুদেবও আমাকে কখনও সাজসজ্জায় মানুষ করেন নাই, বা এ সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নাই। আমার জীবন এইভাবেই কাটিবে, ইহা আপনারা জানিয়াই রাখুন। আমি অতি সাধারণ ও ছিন্ন বস্ত্রেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। গুরুদেব আশীর্বাদ করুন যেন এইভাবেই জীবন কাটিয়া যায়। বাল্যকালে বাড়ি ত্যাগ করিয়া দুর্গাপূজার বাড়িতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম। অনেকেরই ধারণা ছিল ‘‘বালক নিশ্চয়ই রাত্রিতে ধ্যান-পূজা কিছু করে।’’ আমি কি করি, ইহা জানিবার জন্য বক্সী মহাশয়কে আমার বিছানায় শুইতে দেওয়া হয়। আমি কিছুই বলিলাম না। পাঠান্তে রাত্রি এগারোটায় আমি চেয়ারে বসিয়া মাকে স্মরণ করিয়া রাত কাটাইলাম। শেষরাত্রে বক্সি মহাশয় ইহা বুঝিতে পারেন, এবং সকলকে বলিয়া দিলেন, ওকে যেন আপনারা কেহ বাধা দিবেন না। জানেন অতুলবাবু ধর্ম এবং সাধারণ বেশভূষা, আমার সমস্ত জীবনের মূলনীতি, জীবন এভাবেই চলিবে। গুরুদেব প্রচুর আশীর্বাদ করুন।

(৯) মূর্তিতে শক্তি আছে কি? আমার জন্মস্থান মুরমাবাসী এক যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে আত্মপরিচয় দিল এবং পিতামহ কালাচান্দ সরকারের শ্মশানের উপর রচিত মন্দিরটির কথা বলিল। মন্দিরে মহালক্ষ্মীর একটি মনোহর কষ্টিপাথর নির্মিত মূর্তি ছিল। আমার বাল্যকালের বহু ঘটনা জড়িত মূর্তিটির কথা আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিলাম। মায়ের এই মূর্তিটি এতই সুন্দর ছিল যে ইহার কথা আমি ভুলিতে পারিতাম না। বাল্যকালে দিনেরাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ শ্মশানের মন্দিরে প্রবেশ করিতাম। মায়ের নিকট নানারকম আবদার করিতাম। আমার মনে হইত, মূর্তিটি জীবন্ত। গ্রামবাসীরা মূর্তিটির নাম দিয়াছিল 'যোগমায়া'। কিন্তু এই মূর্তিটি ছিল মহালক্ষ্মীর মূর্তি। মহালক্ষ্মী আমাদের জন্ম বংশের কুলদেবতা ছিলেন। মূর্তিটি আশ্চর্যভাবে মুরমার বাড়িতে আসিয়া যান। যুবক বলিল, মন্দিরের ইটগুলি মুসলমানদের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। এবং খালি জমির উপর সুন্দর মূর্তিটি দাঁড়াইয়া আছে। মূর্তিটি এখানেই আনিয়া রাখা যায় কিনা, এ সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলাম। যে মূর্তিটিকে দশজন মানুষও তুলিতে সক্ষম নহে, উহা এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া আসা সহজ নহে! আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়িয়া দেই নাই। ঢাকা মিউজিয়মের কর্তা নলিনী ভট্টাশালী এই মূর্তি দর্শন ও মিউজিয়মে রক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বহুবার মুরমা গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার ফটো গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ধরণের মূর্তি ভারতে মাত্র তিনখানা আছে। উহার একখানা ভাঙিয়া গিয়াছে। একখানা বোম্বাইয়ের দিকে আছে, আর একখানা এখানে আছে।" আমার পিতা একদিন মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি রক্ষণে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বংশের লোকই দেবমন্দিরের ইট বিক্রয় করেন। নলিনীবাবু মুরমার বাড়ি হইতে হস্তলিখিত অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া মিউজিয়মের জন্য লইয়া যান। মুরমানিবাসী যুবক আমাকে বলিল, "আপনাদের পুকুরের ঘাটের ইটগুলিও বিক্রয় করা হইতেছিল। আমরা বাধা দিয়া বলিলাম, ঘাটটা বিক্রয় করিবেন না, এই ঘাট বহুশত বৎসর "সরকার বাড়ীর ঘাট" নামে পরিচিত থাকিবে।" আমি বলিলাম, "আর দুঃখ করিয়া কি হইবে, রাষ্ট্রবিপ্লবেরই ইহা পরিণতি। আমি চেষ্টা করিব, মায়ের মূর্তিটি যাহাতে এখানে আনিতে পারি। ঐ মূর্তিটি আমার অত্যন্ত প্রিয় মাতৃমূর্তি।" ইহা একটি প্রাচীন দীঘিতে পাওয়া যায়। সেই দীঘিতে পরে চাষ হইত। প্রতি বৎসরই ইহাতে চাষ হইতেছিল, কিন্তু এক বৎসর চাষকালে ঐ মূর্তিতে লাঙ্গল আটকাইয়া যায়। মাটি সরাইয়া এই মূর্তি পাওয়া যায়। দশজন লোকের সাহায্যে ইহাকে আমাদের দুর্গামন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। মূর্তিটির নিম্নে ছোট একটু সূঁচালু অংশ ছিল। ঐ অংশ মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ছয় মাস পরেই দেখা গেল মূর্তিটি সমতল মণ্ডপভূমি হইতে উঁচু হইয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ সূঁচালু অংশের সূঁচ অংশ ভূমির সমতায় আসিয়া গিয়াছে। প্রস্তর নির্মিত এত বড় মূর্তি কি করিয়া চাষের সমভূমিতে আসিল এবং সূঁচালু অংশটুকুর উপর এত বড় বিশাল ও ভারি মূর্তি কিভাবে উপরের দিকে আসিতে পারে, ইহা লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রস্তর বিশেষে, বিশেষ কোন গ্রহের আকর্ষণ আছে কিনা, কে জানে। মন্দিরে রক্ষিত মাতৃমূর্তি এবার আবার আকাশের তলায়

আসিয়াছেন। যবনের দেশে এই মূর্তির শেষ পরিণতি কি হইতে পারে কে জানে? সত্যানন্দের বাল্যলীলার সাথী মা মহাশক্তি জাগো মা, - দুষ্টের পরিকল্পিত পাকিস্তান মিটিয়া যাউক! দুর্বল ও মূর্খ নেতা পরিচালিত ভারত শক্তিবাদের মর্ম বুঝুক।

(১০) মোগল সরাইয়ের পথে ট্রেনে বসিয়াছি। গাড়িতে তিন উকিল এবং দুই তিনজন অন্য লোক আছেন। উকিল তিনটি কংগ্রেস পন্থী, সুখেই আছেন, জওহরলালের মত জামা পরিধান করিয়াছেন। আমাকে গাড়িতে দেখিয়াই তাঁহাদের মনে ধর্ম ও সাধু বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়াছে। এঁরা মনের সুখে সাধুনিন্দা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা ইঙ্গিতে আমাকেও আক্রমণ করিতেছেন, আমি চুপচাপ উদাসীনভাবেই শুনিতেছি। যখন দেখিলেন, কোন কথাই বলিতেছি না, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কোথায় থাকি, কোথায় আশ্রম। আমি বলিলাম, কলিকাতায় এবং চুনারে কুটিয়া আছে। আবার প্রশ্ন, "কলিকাতায় বড় সাধু কে?" আমি বলিলাম, "জানি না।" "আপনি যে এত সব দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন কলিকাতার কোন বড় সাধুর কাছে যান না?" আমি বলিলাম, "না"। "আপনি কোন সাধুর দর্শন করেন নাই - নাম শোনেন নাই?" আমি বলিলাম, "সাধুর অভাব কি? আপনারা কি কম সাধু?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা কি সাধু, আমরা তো সংসারী লোক।" আমি বলিলাম, "সংসারীরা কি কম সাধু? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাম তো আমার গুরু।" উকিল বলিলেন, "তবে আপনি গেরুয়া পরিধান কেন করিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "গেরুয়া পরিধান, আমার বাল্যকালের সৌখিনী।" এবার উকিলগণ সাধু-নিন্দার আরও একটি অধ্যায় আরম্ভ করিলেন; "সাধুরা ভগবানকে দেখেন কিনা?" এই অধ্যায়েও তাঁহারা মনের সুখে সাধু ও ধর্মবিদ্বেষ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। আমি চুপচাপই আছি। যখন দেখিলেন, আমি কিছুই বলি না, তখন তাঁহারা আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান দেখিয়াছেন কিনা?" আমি বলিলাম, "না, ভগবান দেখিবার আমার কোনই সাধ নাই, আমি শান্তিতেই আছি।" হতভাগারা এবার আবার সাধুনিন্দা আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা শান্তিতে থাকেন তাঁহারা গাড়িতে যান কিনা। অন্ন খান কিনা। কথাবার্তা বলেন কিনা। এ সব কথা লইয়া তাঁহারা মনের সুখে ধর্ম ও সাধুনিন্দা আরম্ভ করিলেন। আমি উত্তর দিতেছি না দেখিয়া তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাত্মা। কোন কথা বলেন না যে?" আমি বলিলাম, "শান্তি সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, (বৃদ্ধা ও তর্জনীর নখ মিলাইয়া) উহাতে একটুও মিথ্যা কথা নাই, একটুকুও মিথ্যাও নাই জানিবেন।" গাড়িতে এক যুবক ছিলেন, তিনি বলিলেন, উকীল সাহেব! আপনারা মনের সুখে সাধুর নিন্দা করিয়াছেন, শেষকালে সাধু আপনাদের সঙ্গে, অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত একটা দুইটা কথা বলিয়াছেন এবং আপনাদের মাথা কাটিয়া দিয়াছেন। উকীলরা এবার কথার মোড় ফিরাইলেন। আমি বুঝিলাম, হতভাগারা এবার নূতন চাল ধরিয়াছেন। তাঁহারা সাধু মহাত্মাদের খুব প্রশংসা আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন "আপনার কর্তব্য আমাদের উপদেশ দেওয়া।" আমি চুপচাপই আছি। আমি কোনই উপদেশ দিতেছি না, ইহাতে তাঁহারা বার বার দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "উপদেশ দিবার এবং নিবার মুড্ আছে। গীতায় বলিয়াছেন, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন

সেবয়া।'' আপনাদের সেই মুড্‌ কোথায়?'' এবার তাঁহারা নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ বাদই তাঁহারা গাড়ি হইতে নামিবার জন্য দাঁড়াইলেন এবং প্রণাম করিয়া নামিয়া গেলেন। আমি ইঙ্গিতে আশীর্বাদ জানাইলাম। কংগ্রেসীদের মুখে কোথাও ভারত ভাগকারী মুসলমান এবং যবন তোষক মূর্খ নেতাদের নিন্দার কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দুর সমাজ ধর্ম ও মহাত্মাদের নিন্দা করিতে এঁরা ইতস্ততঃ করেন না। ভারত ভাগকারী দুর্জন ও পাষণ্ডগণকে ভারতীয় জাতীয়তার অধিকার দেওয়া হইল; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার মূল যে বৈদিক সংস্কৃতি, ইহাকে স্থান দিবার জন্য কেন আইন করা হইল না। ইহার উত্তর কে দিবে? ১৫ বৎসর পূর্বেও আমি ট্রেনে দেশেবিদেশে ভ্রমণ করিয়াছি। প্রত্যেকটি লোকের ব্যবহারের মধ্যে সভ্যতা এবং সম্ভ্রম ছিল। আজ পথেঘাটে সাধুর গায়ে পা তুলিয়া বসিবার মত ছোটলোক ও নীচ স্তরের যাত্রীর বেশ প্রাচুর্য্য দেখা দিয়াছে। যেখানে মহাপুরুষে শ্রদ্ধা নাই, ধর্মের নিষ্ঠা নাই, সেখানে শান্তি হইবে? ভারতে যে ভয়ঙ্কর অধঃপতনের যুগ দেখা দিয়াছে, ইহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। একজন মহাত্মা সাধু সমাজের যে সেবা করেন উহার তুলনায় কংগ্রেসীদের কার্য যে পনেরো বৎসর নরক তুল্য হইয়াছে, ভারত আজও উহা বুঝে নাই কী?

(১১) বান্দর ও গাভী কি করিয়া God হইলেন। ব্রহ্মদেশে হিন্দুদের গোশালা এবং হনুমান মন্দির আছে। আমি উহা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে এক ইংরেজ বৃদ্ধাও ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, হিন্দুধর্ম বুঝিতে হইলে আপনাকে প্রথম শক্তিবাদ, দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদ বুঝিতে হইবে। আমি সংক্ষেপে ইহাদের মর্মকথা বলিলাম। দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদকে হিন্দুধর্মে শ্রেষ্ঠতা দেয় নাই। শক্তিবাদকেই শ্রেষ্ঠতা এবং দেবত্ব দান করিয়াছে। এবার শুনুন, বান্দরের দেবত্বের কথা। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র বনবাসে গিয়াছিলেন। সেখানে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন। রাবণ একজন তপস্বী এবং বিদ্বান রাজা। একজন বিদ্বান রাজা একজন সতী নারীকে অপহরণ করেন, ইহা আপনি ভাল কাজ মনে করেন? মিস রীবণ বলিলেন, নিশ্চয়ই ইহার মত হীন এবং জঘন্য কাজ হইতে পারে না। মহাবীর হনুমান নামক এক বান্দর সীতা উদ্ধারের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। বিদ্বান রাজার অসুরবাদিতা এবং বনের বানরের শক্তিবাদিতাকে সমাজজীবনে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্থান দিবার জন্য আমরা হনুমানের পূজা করি। হনুমান নিশ্চয়ই God নহেন বা ঈশ্বর নহেন। তিনি বনের পশু হইলেও শ্রেষ্ঠ শক্তিবাদী, এইভাবে শক্তিবাদকে শ্রদ্ধা করা এবং অসুরবাদকে তিরস্কার করিবার আদর্শকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। আপনি কি ইহাকে বান্দর উপাসনা বলিতে চান? তিনি বলিলেন, আমি রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়াছি। সীতার সব কথা আমি জানি। তাঁহার উদ্ধার-কর্তা বনের বান্দরকে সম্মান এবং পূজাদানের ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করি। এবার বলুন গরু কিভাবে God হইলেন। আমি বলিলাম আপনি রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়াছেন। রামদের গুরু বশিষ্ঠ্যদেবের কথা জানেন। তাঁহার আশ্রমে একটি সুন্দর গাভী ছিল। রামদের পূর্বপুরুষ মহারাজা বিশ্বামিত্র গাভীটিকে অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। গাভীটিকে যখন তিনি বলপূর্বক টানিয়া লইতে যাইতেছিলেন, তখন যাইতে অনিচ্ছুক গাভীটি করুণ দৃষ্টিতে বশিষ্ঠ্যদেবের দিকে তাকাইতে ছিলেন। বশিষ্ঠ্যদেব ইহাতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। যাইতে অনিচ্ছুক

গাভীর সহিত বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ হইল। বিশ্বামিত্র পরাজিত হইলেন। এই ঘটনায়ও দেখুন, রাজাতে সাধুর গাভী বলপূর্বক গ্রহণের আসুরিক নীতি এবং গাভীর শক্তিবাদ চরিত্র। যাহার ফলে গাভীর পূজা হিন্দুধর্মের অঙ্গে স্থান পাইয়াছে। মিস্ রীবন বলিলেন, এই দুইটি প্রশ্ন আমি অনেককে করিয়াছি, কেহই আমাকে সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আমি বলিলাম, হিন্দুধর্মের মূল হইতেছে শক্তিবাদ এবং তপস্যা। হিন্দুধর্মকে শক্তিবাদের দৃষ্টিতে বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি যদি থাকিত তবে এই মহান জাতি হাজার বৎসর পরাধীন থাকিত না এবং কতগুলি ধাপ্পাবাজ ও মূর্খ নেতার ভাঁওতায় পড়িয়া আজ নারী নির্যাতন, হিন্দুর সর্বনাশ এবং ভারত-ভাগরূপ দুষ্কার্য হইতে পারিত না।

গড্ কি ঈশ্বর? এবার আমি মিস্ রীবনকে গড্ সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা, উহার উত্তর দিতে বলিলাম। আমি বলিলাম, গডের মতন ব্যক্তিকে চাব্‌কাইয়া দেওয়া কর্তব্য। গড্ নরক সৃষ্টি করেন এবং শয়তান প্রস্তুত করেন এবং মহাত্মা লোককে বিপথে পরিচালনা করেন, ইহা কি রকম কথা? এই পল্লীর মধ্যে কেহ যদি এই পথটাকে নরক করে, আপনি কি তাহাকে পূজ্য ও সৎ ব্যক্তি বলিবেন? আমি কুরান ও বাইবেল পড়িয়াছি। আপনাদের গড এবং আল্লাহ্ একটি দুষ্কার্য এবং নরক সৃষ্টির মহারাজা। এরূপ দুষ্ট ব্যক্তির উপাসকগণ কখনও সৎলোক হইতে পারে না। এজন্য পৃথিবীর কোথাও মুসলমানগণকে কেহই সম্মান করে না, বিশ্বাস করে না। খ্রীষ্টানগণের মধ্যে হিন্দুধর্মের দার্শনিকতার প্রভাব পড়িবার দরুণ উহাদের মনুষ্যত্ব কিছুটা উন্নত হইয়াছে। গডের বিরুদ্ধে বলিবার দরুণ, মিস রীবন দুঃখিত হইলেন এবং অনেক তর্ক করিলেন এবং সবটাতে হারিয়া গেলেন এবং ক্ষোভে ও দুঃখে বলিলেন, আপনি হচ্ছেন বনের বাঘ, বনে ফিরিয়া যান। আপনি সমাজে আসিয়াছেন শুধু খ্রীষ্টবাদ ও ইসলামকে মিটাইবার জন্য। আমি বলিলাম, খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণকে মিটাইয়া দিবার শক্তি আমি রাখি না, কিন্তু গড্ এবং আল্লাহ্ মানুষকে মানুষ হইতে হীন করিয়া দিবার শক্তি পূর্ণভাবেই রাখেন। মিস্ রীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বর্গ নরকের কথা হিন্দুধর্মে আছে কিনা। আমি বলিলাম, হ্যাঁ আছে। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে ঐ সব স্বর্গ নরক এবং পাপ পুণ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহা যমরাজার বা প্রেতরাজার কাহিনী মাত্র। ঈশ্বর তো আর যমরাজ নহেন। কৃতকর্মের ফলও মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে ভোগ করে। এনি বেশান্ত লিখিত গীতার ইংরেজী অনুবাদখানা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া, ৫ম অধ্যায়ের ১৪, ১৫ শ্লোক পাঠ করিতে বলিলাম। বাইবেলে এবং কুরাণে ঈশ্বরের যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে উহাতে হীন স্তরের উপদেবতার যাহা লক্ষণ ইহার চেয়ে বেশী কিছু নাই। বলুন তো, ছোট বাচ্চাদের ধরিয়া ছুন্নৎ করিয়া দেওয়া কোন্ পুণ্য কর্ম? গড ও আল্লার বইতে এই দুষ্কার্যের কথা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিরূপে স্থান পাইয়াছে। গীতার শ্লোক কয়টি পাঠ করিয়া মিস্ রীবন বলিলেন, এ তো অত্যন্ত যুক্তিবাদসম্মত ধর্মকথা। আপনি ঈশ্বর উপাসনার উপদেশ আমাকে বলুন, আমি সেই প্রেয়ার-পাঠ করিব। আমার নিকট গায়ত্রী, ব্রহ্মস্তোত্রম্ এবং মহামন্ত্র সমন্বিত ইংরেজী ব্যাখ্যাসহ উপাসনার কাগজখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি এখন হইতে ঐ প্রেয়ারই নিত্য করিতে লাগিলেন।

(১২) দুর্দশা। পাটনার পথে গাড়ি কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। পাটনা কলেজের কয়েকজন বিদ্যার্থী এবং কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক গাড়িতে আছেন। এক বিদ্যার্থী

বি.এ. পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনি সকলের মৌন ভঙ্গ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারত জুড়িয়া দুর্দশা ও দুর্নীতি চলিয়াছে, আপনি ইহা স্বীকার করেন কিনা এবং ইহার প্রতিকার কি? আমি বলিলাম, আপনারা যদি দুর্নীতিকেই নীতি বলিয়া প্রচার করেন এবং ঐ দুর্নীতিকেই আইন মনে করেন, তবে ইহার প্রতিকার কিরূপে সম্ভব? পাটনা স্টেশনে একটি বৃহৎ চিত্র সরকার টাঙাইয়াছেন। এক গৃহস্থ যুবক, তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্র এবং কন্যার চিত্র উহাতে রহিয়াছে। উপরে লেখা আছে "সুনিয়ন্ত্রিত পরিবার", নিম্নে লেখা আছে "সুখের সংসার"। যাহারা পশু-হত্যা করে, তাহাদিগকে আমরা বলি কসাই, ব্যাধ বা "চণ্ডাল"। যে ব্যক্তি গর্ভস্থ সন্তান হত্যা করে সে কসাই হইতেও হীন কিনা। যে ব্যক্তি নিজের জনন শক্তিকে হনন করে, নিজেকে বলদা বা বলদী প্রস্তুত করে এবং যে সরকার এ সব দুষ্কার্য করায় তাহাকে আপনি কি বলিবেন? আপনারা কি মনে করেন, সংযম দ্বারা ভোগ হয় না? যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণই ভারত সরকারের নীতি হইত তবে তাহারা মুসলমানদের চারটি বিবাহকে আইনসম্মত রাখিতেন না। জানিয়া রাখুন, ভারতের মঙ্গল নাই। কারণ, এঁরা চাইছেন, যবনের রাজ্য এবং দুর্নীতির প্রসার।

অন্য এক ভদ্রলোক সমাজতন্ত্রবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মতে উহা ভারতের কল্যাণ আনিবে। আমি বলিলাম, একজন লোক বি. এ. পাস করিলেই সে ধার্ম্মিক ও নীতিবান হইবে কি? বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সরকারী বিভাগ আছে, সর্বত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব কমিয়া গিয়া চৌর্য ঘুষ কর্মহীনতা এবং ফাঁকি প্রসার লাভ করে নাই কি? সরকারের উৎপাদন আয় কর্ম বণ্টন এবং সমস্তপ্রকার বিভাগই দুর্নীতিপরায়ণ দুষ্টলোক সৃষ্টির কেন্দ্র হইবে না কি? সরকারী শিল্প, বাস, রেশনের দোকান ও কন্ট্রোলগুলি সমাজতন্ত্রবাদ নয় কি? এগুলো নরক নয় কি? মুসলমানেরা পাকিস্থান করিয়া আবার ভারতে থাকে কেন? যাহারা ৭০০ বৎসরেও ভারতের জাতীয়তা গ্রহণ করে নাই, তাহাদের মর্যাদা জাতীয়তার সমকক্ষ হইতেই পারে না। ভারতীয় কনষ্টিটিউসন যদি এই দুর্নীতিকারীকে জাতীয়তার মর্যাদা দান করে তবে ভারতের কি ভাবে মঙ্গল হইতে পারে? চারবর্ণ ও চার আশ্রমই ঠিক ঠিক সমাজতন্ত্রবাদ। সকলে সমাজের মঙ্গল লক্ষ্যে কর্ম করিবে, অন্ন এবং দুধ সকলের জন্য প্রচুর হইবে, সমাজই বিষ্ণু, সমাজই নারায়ণ। আজ সরকারী কোন বিভাগে নরের সেবা হয়, বলুন? গাড়িগুলিতে প্রবেশ করিবার স্থান নাই; বসিবার স্থান দূরের কথা! কলিকাতার বাসগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার পর, উহাতে যে ভাবে মানুষ যাতায়াত করে, উহাকে এক একখানা গাড়ি মনে না করিয়া এক একখানা ধানের বস্তা বোঝাই করা ট্রাক মনে করিতে পারেন। আমি কাশী হইতে মোগলসরাই পর্যন্ত গতিশীল বাসে বহুবার গমনাগমন করিয়াছি। এই পথে রাস্তার মধ্যস্থান হইতে যাহারা বাসে উঠিতে চায় তাহাদের জন্য কোনই ব্যবস্থা নাই। আমি বহুদিন গোদৌলিয়া বাস স্টেশনে চারটায় আসিয়া রাত্রি আটটায়ও বাস ধরিতে পারি নাই। ইহার কারণ, কোন বাসের পর কোন বাস যাইবে উহা বাস ছাড়িবার এক সেকেণ্ড পূর্বেও জানা যায় না। কনডাক্টার ও ড্রাইভার হঠাৎ কোন একটা খালি বাসে চড়িয়া এক সেকেণ্ড সময় না দিয়াই বাসখানা ছাড়িয়া দেয়। বাস অফিসের নির্দেশ লইয়াই বাসে বসা গেল, কিন্তু দেখা গেল সে বাসখানা ছাড়িবার পূর্বে পাঁচখানা বাস চলিয়া গেল। এসব

নরখাদক দুর্জনগণকে লইয়াই আপনাদের সমাজতন্ত্রবাদ তো? যেসব দুর্জনেরা ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্তান করে, তাহারই আপনাদের সমাজবাদের বাহক তো? যাহারা রুশ এবং চীন বা পাকিস্তানের মন্ত্রে দীক্ষিত তাহারাই আপনাদের সমাজতন্ত্র তো? আপনারা ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সমাজবাদ এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করুন এবং সব বিষয়ে যাহারা অভারতীয়, তাহাদিগকে বাদ দিন, এ বিজ্ঞানে নূতন ভারত গঠনে মন দিন। ইহা যদি অসম্ভব মনে করেন, তবে দুর্দশা কমিবে না। মুসলমানেরা যে দুষ্কার্য করিয়াছে, তাহাদিগকে উহার প্রতিশোধ ভোগ করিতে না দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। আর সব ঘটনা উহারই প্রতিক্রিয়া। গাড়িতে একজন দূরযাত্রী হিন্দীভাষী ছিলেন। গাড়িতে যাত্রীদের দুর্দশার কথা উঠিতেই তিনি টাটা স্টেশনের কথা বলিলেন। একটা গাড়ির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সেখানে মাত্র দুইখানা বগী থাকে। উহার মধ্যে একখানা রিজার্ভ গাড়ি, অন্যখানায় মানুষের হাঁস মুরগীর মত প্রবেশ করিবারও স্থান থাকে না। সরকার কি ইহা জানেন না? মন্ত্রীরা কিজন্য আছেন, আপনারাই ভাবুন।

(১৩) মাস্টার মহাশয়। গৃহত্যাগের তেরো বৎসর বাদে আমি আবার জন্মভূমিতে আসিলাম। আমার ইচ্ছা হইল, বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষকগণকে দেখিব। দেবেনবাবু ইংরেজী মাস্টার ছিলেন। তিনি এখন হেড্‌মাস্টার। তিনি আমাকে দেখিয়াই বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, ‘‘তোমাদের পর আর জীবনে ভাল ছাত্র পাই নাই।’’ এম্ কে আম্বলীকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম। আমাদের ভূগোল পড়াইতেন। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় ইংলণ্ডের মানচিত্র আঁকিতে দিয়াছিলেন। আমার মানচিত্র খুবই ভাল হইত, ...তিনি ইহা জানিতেন। মানচিত্রে তিনি আমাকে নম্বর দেন নাই বরং পাঁচ নম্বর কাটিয়া দিয়াছেন, নকল করিয়াছি, সন্দেহ করিয়াছেন। আমি বলিলাম, মাস্টার মহাশয়! আপনি আমার উপর দুইটা অবিচার করিলেন (১) মানচিত্রে নম্বর দেন নাই। (২) ইহা ছাড়াও আরও পাঁচ নম্বর কম করিয়াছেন। আমি চক্ লইয়া বোর্ডে যাইতেছি। বোর্ডে সকলের সামনে ইংলণ্ডের মানচিত্র আঁকিয়া দিতেছি। যদি এই খাতার মতন না হয় তবে আমাকে দোষী বলুন। আম্বলীবাবু কিছুতেই রাজী হইলেন না। স্কুলে আম্বলীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল, নমস্কারও জানাইলাম। কিন্তু আমার মন সেই অবিচারের কথা ভুলে নাই। নম্বর না দেওয়া, নম্বর কাটিয়া দেওয়া এবং আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে সকলের সামনে কলঙ্কিত করার অপরাধ হইতে আমি তাঁহাকে মুক্তি দিতেই চাহিয়াছিলাম। স্কুলের এই ঘটনার পর আমি আর বেশীদিন দেশেই ছিলাম না, গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম; তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ও শিক্ষক; তাঁহার এই সুযোগ দেওয়া কর্তব্য ছিল। শুধু সন্দেহ করিয়া যোগ্যতাকে এ ভাবে অমর্যাদা করা কি ভাল কথা?

(১৪) শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধ। মঠের এক শিষ্যা (ইতি-) নিজের পিতৃশ্রাদ্ধ যাহাতে শক্তিবাদীয় নীতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধে ৬ দান, ১৬ দান আদির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বৃষোৎসর্গ বিধিতে বৈদিক মন্ত্রে ‘রুদ্রযজ্ঞ’ অবশ্যই করিতে হইবে। রুদ্রযজ্ঞের সঙ্গে বৃষোৎসর্গের বিধান আছে। আমি বলিলাম, এ যুগে বৃষোৎসর্গ অসম্ভব। কারণ গোষ্ঠের ভূমি নাই, শ্রাদ্ধের ষাঁড়গুলিকে যবনেরা হত্যা করিয়া আহার করে, ইহা আমি বহু ঘটনায় জানি। কাজেই বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান বাদ দিয়া

রুদ্রযজ্ঞকে শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাহার গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভাবে ১৬ দান বা ষোড়শ দানের অনুষ্ঠানহীন রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠানময় শ্রাদ্ধ করাইতে প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহারা বেশ দলবদ্ধ হইয়া আমার নিকট আসিলেন এবং তর্ক করিলেন। আমি ষোড়শ দান দ্বারা মৃতের স্বর্গপ্রাপ্তির অনুষ্ঠানকে সমর্থন করিলাম না। আমি বলিলাম, বরং সামর্থ্যপক্ষে অন্নদান (আহারাদি) সমর্থন করা যায়, কিন্তু ষোড়শ দান নিরর্থক। ব্রাহ্মণকে ষোল প্রকার দ্রব্য দান করিলাম, আর পরদিনই সেই দানের দ্রব্যগুলি ব্রাহ্মণদেবতা যবন ও চামারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিলেন; আর আমি জীবিত কালেই দেখিলাম, আমার পিতৃকার্যের দানদ্রব্য ওই ভাবে হীন স্তরের লোক ব্যবহার করিতেছে, এবং আমার পিতা সেই সুখে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। ইহা কদর্য কথা। বৃষোৎসর্গকে বাদ দিয়া রুদ্রযজ্ঞ বিষয়েও তাঁহারা তর্ক তুলিলেন। আমি বলিলাম, পূর্বে জীববলি ভিন্ন শক্তিপূজা হইত না, এখন জীব বলিদান না করিয়াই শক্তিপূজা হইতেছে। এইরূপ বৃষকে উৎসর্গ করিবার অনুষ্ঠান না করিয়াও রুদ্রযজ্ঞ করা যায়। রুদ্র মানে ঈশ্বর। ঈশ্বর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ পূজাই শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গ। কারণ ঈশ্বরের কৃপা দ্বারাই পরলোকগামী আত্মার ঊর্ধ্বগতি সম্ভব। ইহার তুল্য মহান কর্তব্য শ্রাদ্ধে হইতেই পারে না। আলোচনায় ব্রাহ্মণগণ সব রকমের সন্তুষ্ট হইয়া ইতিকে শ্রাদ্ধের সম্মতি দান করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি ইতিকে ডাকিয়া বলিলাম, ‘‘এসব ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাসের অযোগ্য। ইঁহারা শ্রাদ্ধের পূর্বদিনও বলিবেন, শ্রাদ্ধ তাঁহারাই করাইবেন কিন্তু এঁরা নিশ্চয়ই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ধাপ্পা দিবেন।’’ কাজেই রুদ্রযজ্ঞে পারদর্শী এবং শ্রাদ্ধকার্যে অভিজ্ঞ অন্য পুরোহিত গোপনে ঠিক করা হইল। তাঁহাদিগকে সব কথাই বলিয়া রাখা হইল। তাঁহারা বলিলেন, যখনই ডাকা হইবে তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা একত্রিত হইবেন এবং বিধিপূর্বক শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধকার্য করাইয়া দিবেন। ইতিদের গ্রামের ব্রাহ্মণগণ সত্যই ধাপ্পা দিলেন এবং শেষ মুহূর্তে বলিলেন, ‘‘যেভাবে চিরদিন শ্রাদ্ধ হইয়াছে, ওই ভাবে না হইলে তাঁহারা কার্য করিবেন না।’’ খুব সুন্দরভাবে শক্তিবাদীয় রীতিতে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বৈদিক বিধানে রুদ্রযজ্ঞ হইল। সমস্ত আত্মীয়গণ এবং অনেক শক্তিবাদীরা যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। সমবেত আহুতি এবং সমবেত উপাসনার পর রুদ্রযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল। শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধ সকলের মনেই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল। পিতৃকার্যোপলক্ষে ইতিরাণী, তাহার ভগ্নী, মা ও আত্মীয়গণ উপনিষদ পাঠ ও ভূরীভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। সময়মত প্রস্তুত থাকিবার দরুণ তাহাদের শ্রাদ্ধকার্যে অসুবিধা হয় নাই। অভ্যাস করিয়া লইলে নিজেরাও শ্রাদ্ধকার্য করিয়া লইতে পারে। শক্তিবাদীয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ইহাই প্রথম অধ্যায়।

(১৫) সাধুর জীবনে নারীর কথা। চুনারের ভৈরব গুহায় বসিয়া আছি, বেলা তিনটা। একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ইনি গোরক্ষপুরের লোক, বণিক সম্প্রদায়। চুনারের দুর্গাবাড়িতে পুরশ্চরণ করিতে আসিয়াছেন। পুরশ্চরণ শেষ হইয়াছে, কালই চলিয়া যাইবেন। প্রণামান্তে বলিলেন, আমার নাকি অনেক প্রশংসা শুনিয়াছেন। অন্য এক সাধুর কথা তুলিলেন। তাঁহার প্রশ্নে বলিলাম, ‘‘তাঁহাকে জানি।’’ তিনি বলিলেন, ‘‘তাঁহার নিকট এক মহিলা আছেন, আপনি সাধুকে বলুন, মহিলাকে যেন চলিয়া যাইতে বলেন।’’ এ

সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাও বলিলেন। আমি বলিলাম, ‘‘নারীর অবস্থান সম্বন্ধে অনেক ভাবিবার কথা আছে। এক, ভোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান, কাহার কি লক্ষ্য ইহা কে নির্ণয় করিতে পারে, বলুন? ইহা ভিন্নও অন্য জন্মের প্রারব্ধ এবং লেনদেন সম্বন্ধও থাকিতে পারে। এ বিষয়ে যাঁহারটা তিনি বুঝিবেন।’’ তিনি বলিলেন, ‘‘নারীরা পুরুষকে শেষ পর্যন্ত বশীভূতই করেন, ইহা তাঁহাদের স্বভাব, যতক্ষণ পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিবে না, ততক্ষণ নারীরা নানা প্রকারে অসন্তুষ্টি দেখাইতে থাকিবে। আপনি বালব্রহ্মচারী, আপনি ইহা বুঝিবেন না।’’ এ বিষয়ে ভদ্রলোক অনেক যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, ‘‘সাধু যদি জ্ঞানী ও শক্তিমান হন তবে প্রারব্ধ অতিক্রম করিবেন এবং বশ্যতাও অতিক্রম করিবেন। আর যদি প্রারব্ধ বুঝিবার মত জ্ঞান না থাকে তবে জড়াইয়া যাইবেন, আমি তাহাতেও দোষ দেখি না। কারণ নারীতে জড়াইয়া যাওয়াই সংসার। যে সংসার চায়, সংসারই তাহাকে শিক্ষা দেয়।’’

(১৬) ভারত ভাগের পূর্বকথা। কলিকাতা অবস্থানকালে এক মুসলমান ভদ্রলোক আমার নিকট আসিতেন। তিনি ডেকোরেটারের কারবার করেন। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, ‘‘আবদুল কালাম আজাদ কলিকাতায় আসিলে প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজী সাধু মানুষ। আমরা গান্ধীজীকে ধরিয়া ভারত ভাগ করিয়া দিব। আপনারা কংগ্রেসকে সমর্থন করুন, ইহার ফলে ভারতেও আপনাদের সুখ সুবিধার সব ব্যবস্থা করা সহজ হইবে।’’ ভারত ভাগের পর সেই মুসলমান ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পাকিস্তানে চলিয়া যাইবেন কি না? আমি বলিলাম, ‘‘আপনি যাইবার জন্য ব্যস্ত কেন হইয়াছেন, হিন্দুদের দুর্দশাটা ভাল করিয়াই দেখিতে থাকুন না! শতকরা কুড়িজন মুসলমান গুণ্ডামীর প্রয়োগে এত বড় একটা দেশকে ভাগ করে, আর কংগ্রেসী নেতারা এখনও বাহবা পায়; ইহা দেখিয়াও আপনি কি বোঝেন না, ভারতের নেতারা ভারতকে কোন নরকে নামাইয়াছেন? আপনারা ভোট না দিলে এবং আপনাদের তোষণ না করিলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ধ্বসিয়া যাইবে।’’

(১৭) দুধে জল। পাহাড়ের গোয়ালা আমাকে নিত্য দুধ দেয়। পাহাড়ে থাকিতে আমি ওদের ঔষধ পথ্য দ্বারা অনেক সেবা করিয়াছি। তাহারা এখনও আমাকে শ্রদ্ধা করে। কয়েকদিন ধরিয়া গোয়ালার পুত্রবধূ দুধ দিতেছে। দুধ ভাল নয়, জল থাকে। আমি রোজই পুত্রবধূকে ওরূপ করিতে নিষেধ করিতেছি। একদিন পরিচিত বৃদ্ধ গোয়ালা আসিল। আমি তাহাকে দুধে জল দিবার জন্য নিন্দা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে আক্রমণ করিয়া রুষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিল। আমি বিরক্তির সহিত বলিলাম, ‘‘দেখ গোয়ালা, এত চোট ভাল নয়, হজম করিতে পারিবে না।’’ সে দুধ বিক্রয় করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে, আঙিনায় তাহার মহিষ বাঁধা ছিল। মহিষটি ওকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটাইয়া পড়িল এবং তখনই মারা গেল। পরদিন গোয়ালা আসিয়া অনেক দুঃখ জানাইল। আমিও বুঝিলাম কড়া মন্তব্য করা ঠিক হয় নাই; এরূপ আর করিব না স্থির করিলাম। সেই অবধি আমি কখনও দুধে জলদানকারীদিগকে কড়া কথা বলি না।

(১৮) ভারত কল্যাণের কথা। আশুতোষ কলেজে তিন তলায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে একটি গৃহে একান্তে কলেজের কথা হইতেছে। তিনি বলিলেন, ‘‘জনসঙ্ঘ করিয়াছি, অখণ্ড

ভারত লক্ষ্য থাকিবে। মুসলমানদেরও সঙ্গে লওয়া হইবে।” আমার মত জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, আমার কথা আমি তারকেশ্বর কনফারেন্সেই বলিয়াছি। মুসলমানেরা পুরা ভারতকেই মক্কাবাদী ও পাকিস্থান করিতে চায়। হিন্দু নেতাদের একটুও দূরদৃষ্টি নাই। কংগ্রেস, ইংরেজ এবং মুসলমানের কর্মধারা একই লক্ষ্যের অনুকূল। আমি শক্তিবাদীয় চিন্তাধারা প্রবর্তন করিয়াছি। এই পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকেদের সুখ সুবিধা দেখিতে চাই। ভারতের জন্য আমার নীতি স্পষ্ট। আমি ভারতকে অখণ্ড দেখিতে চাই এবং ভারতকে সম্পূর্ণরূপে বেদবাদীয় সংস্কারে সংস্কৃত করিতে চাই। আমার লক্ষ্যে ভারত এক পাও অগ্রসর হয় নাই। দিন দিন ভারত মক্কাবাদীদের হীন লক্ষ্যের অনুকূলে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমি ভারতের বহু নেতা এবং বহু কর্মীর সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, কেহই কিছু বুঝেন না। এ যেন শাপান্ত ভারত। আপনি যোগ্য এবং চিন্তাশীল নেতা। আপনি যাহাই করিতে চান, আমি আপনার অনুকূলে থাকিব। ভারত যুগযুগান্তর এক ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে। ভারতে যুগযুগান্তর বৈদিক সভ্যতার অনুকূল ধর্ম ছিল, ভারতে উহাই থাকিবে। যদি ঐ লক্ষ্যে নেতারা অগ্রসর না হয় তবে ভারতের সভ্যতা ও শান্তি থাকিবে না। কংগ্রেস, কম্যুনিজম, সোসিয়ালিজম ও মক্কাবাদীদের চিন্তাধারা ভারতের সর্বনাশ এবং পাকিস্থানের অনুকূলে। আপনার সামনে পর্বত পরিমাণ বাধা। আপনি সত্যই ভারত মাতার বীর সন্তান। যে বর্বরতা ও পশুবল প্রয়োগ করিয়া ভারতে পাকিস্থান হইয়াছে এবং পাকিস্থান হিন্দুশূন্য হইতে চলিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণ পশুবল প্রয়োগে ভারতকে এক করিতে হইবে এবং বেদবাদ প্লাবন করিতে হইবে। আমার নিকট ভারতের জন্য অন্য কোনই পন্থা নাই। আপনি অগ্রসর হউন, আমি পূর্ব যুগের মহাত্মাদের মতন পূজা পাঠ ও ব্রত যজ্ঞের মধ্য দিয়া পরমাত্মার আশীর্বাদ আনিতে চেষ্টা করিব এবং যতটা পারি দেশের জনতার মধ্যে শক্তিবাদ নীতিরই প্রচার করিব।

শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ইংরেজ অখণ্ড ভারতকে খণ্ড করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে উহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মুসলমানেরা ভারতে প্রবেশ করিয়া এক অংশ ভারতীয়কে বলপ্রয়োগে মক্কাবাদী করিয়াছে, আমরা উহাদিগকে বেদবাদী করিব। আমি ইংরেজ, কংগ্রেস, পাকিস্তান ও মক্কাবাদীদের ভয় পাই না, কম্যুনিষ্ট সোসিয়ালিষ্টকেও ভয় পাই না; শক্তিবাদের প্রচার বৃদ্ধি হউক, এ সব মুখোসপরা কল্যাণকারীদের স্বরূপ আপনিই প্রকাশ পাইবে। গান্ধীজির হাতে গড়া সব কয়টা মানুষই অপদার্থ অদূরদর্শী এবং যবনতোষক। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াই কাশ্মীর পাকিস্তানে কেন যাইবে? মুসলমানগণকে কি হিন্দু করা যায় না? আমরা যদি না মানি তবে পাকিস্তান কদিন থাকিবে? প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধ ভারতখণ্ডে বেদবাদ ভিন্ন অন্য মতবাদী রাষ্ট্র থাকিতে দেওয়া হইবে না। বেদবাদীর মতবাদের আধারে ভারতে একশত রাষ্ট্র থাকুক, তাহাতে শক্তিবাদের দৃষ্টিতে দোষের হইবে না। বৈদিকযুগে ভারতের দশদিকে বৈদিক সভ্যতার ভিত্তিতে দশ দিকপালের দশখানা রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তা বলিয়া মক্কাবাদী রাষ্ট্র থাকিবে এবং প্রতিপদে শত্রুতা করিবে নাকি?

(১৯) ছোট ভাই বড় ভাই। গুরুদেবের গৃহস্থাশ্রমের পুত্র কয়েকবার আসিয়াছেন। তিনি "শক্তিবাদ ভাষ্য গীতা" পাঠ করিয়াছেন। বলিলেন, আপনি আমার বড় ভাই, আমি আপনার ছোট ভাই। আমি যখন পাঁচ মাসের তখন পিতা সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। আপনি তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, স্নেহ, আদর সব পাইয়াছেন এবং সবরকমে বড় হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লক্ষ্মীপূজার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া যাইতে বলিলাম। তিনি উহা স্বীকার করিলেন। পূজার পর তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবস্থা করিয়া প্রসাদ দিবার জন্য আমি আদেশ করিলাম। তিনি ওইভাবে প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া সকলের সঙ্গে পাতা বিছাইয়া বসিয়া গেলেন। বলিলেন, আজ লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানটি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, আজ আমি সব রকমেই শক্তিবাদী।

(২০) নেহরুর মৃত্যুর পর শাস্ত্রীজী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন, এই পরিস্থিতিতে আপনার মতে ভারতের অবস্থা কি হইল? আমি বলিলাম, গান্ধী, নেহরু ও শাস্ত্রীর নীতি ভারতের ভীষণ অকল্যাণকর। গান্ধী মুসলমানদের হাতে ভারত দিবার যে নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, নেহরু হিন্দুগণকে ধমকাইয়া ধমকাইয়া উহাই করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রিজীর যুগে মুসলমান নেতারাই ভারত শাসন করিবেক। হিন্দুর ভোটে এবার ভারতে মুসলমানের রাজ্য হইল। এই ভাবে চলিলে, আর কিছুকাল পরে হিন্দুর ভোটেরও আর প্রয়োজন হইবে না। যে জাতি নিজের সংস্কৃতি ধ্বংস করে সেই জাতি তো মৃত জাতি। আমার মতে আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিশর, আপগানিস্তান এবং পাকিস্তান নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়াছে। আমার মতে এরা সব মৃত জাতি। ভারতের বুকেও নানা পথেই দুঃখ দুর্দশা ও মৃত্যুর রূপ স্পষ্ট হইয়াছে। ভারতের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার জন্যই ভারতের সভ্যতাকে ধ্বংসকারী যবনবাদীদের হাতে ভারতের শিক্ষাবিভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। পঞ্চশীলের ভণ্ডামীর আড়ালে ভারতকে চীনের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ভারতের জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রের মত শক্তিমান নেতা, দিব্যাস্ত্র (এটমিক অস্ত্র), অখণ্ড ভারত, যবনবাদের বহিষ্কার, মার্কিন জোটে প্রবেশ, সংস্কৃত ভাষা, কনষ্টিটিউশন সংশোধন এবং শক্তিবাদ যুগের পরিকল্পনা। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মক্কায় একদল বর্বর ও গুণ্ডাপ্রকৃতির মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলিরও সভ্যতা ঐ নিয়মে উৎপাটন করে। ১৫শত বৎসরের ইতিহাসই কোন সভ্যতা কি? মক্কার বর্বরতা এখনও কোন টক্করের সম্মুখীন হয় নাই। শক্তিবাদকে আসিতে দাও। ইহা বৌদ্ধবাদের মতই ভাঙ্গিয়া যাইবে। গান্ধী, নেহরু এবং শাস্ত্রী ইতিহাসের পাতা কালো করিয়াই বিলুপ্ত হইবেন।

(২১) নবীন মুসলমান ও মক্কাবাদী সমাজ (খুদার উপাসনা)। আমার নিকট কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান প্রায়ই আসিতেন। একজন বলিলেন, আপনার লিখিত শক্তিশালী সমাজের তৃতীয় ভাগ আমি পাঠ করিয়াছি। আপনার সব কথাই যুক্তিপূর্ণ এবং সত্য। এই পুস্তক সম্বন্ধে পাকিস্তানের পত্রিকায় লম্বা লম্বা সমালোচনা বাহির হইয়াছে, যাহার ফলে ঐ পুস্তকের পাকিস্থান-প্রবেশ অসম্ভব। ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক সরকারও ঐ পুস্তক "নিষিদ্ধ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, ইহাও আমি জানি। এই সম্বন্ধে আমি অনেক শিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা পূর্বেই আপনার বই পাঠ

করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ধারণা, কুরানের ‘‘নেমাজটি’’কে কেন্দ্র করিয়া এবং অনেক অংশকে উদাসীন দৃষ্টিতে দেখিয়া নবীন মুসলমান সমাজ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়া যায়। আমি বলিলাম, যে নেমাজের কথা বলিতেছেন উহার বিষয়বস্তু অত্যন্ত অদার্শনিক এবং যুক্তিহীন। উহা যে চিন্তাহীন মূর্খের জন্য পরিকল্পিত ইহাতে আমি একটুও সন্দেহ করি না। একটা নেমাজে যে সামান্য সময় অতিবাহিত হয়, উহাতে মানুষকে ছয়বার উঠা বসা ও শরীর চালনা করিতে হয়। মানুষ এই সামান্য উপাসনায় চিন্তা ও ধ্যান করিবার সময় কোথায় পাইবে যে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আপনারা চিন্তাশীল মুসলমান সমাজ গড়িবেন? যে নেমাজে ধ্যানের কথা নাই, চিন্তা করিবার মত উপাদান নাই, উহা তো মানুষকে চিন্তাহীন, চঞ্চল ও বর্বর করিবার জন্যই প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ভদ্রলোক আমাকে নবীন দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকখানা বইও পড়িতে দিয়াছিলেন। আমি বইগুলি পাঠ করিয়া ফেরত দিলাম এবং বলিলাম - ‘‘অনেক তাপ্তিই দেখিলাম কিন্তু জানিয়া রাখিবেন ১৫০০ বৎসরের ‘‘বর্বরতা ও নেমাজ’’ কোন মানব বা সমাজ সভ্যতার ভিত্তি হইতে পারে না। আপনারা নেমাজ ও বর্বরতা চালাইতে থাকুন। ইহার ফলে ধন ও নারী অনেক পাইবেন কারণ হিন্দু নেতারা সকলেই মূর্খ। বর্বরতাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্যই খুদার ভক্তি এবং নেমাজ। ভারতকে ভাগ করিয়া এবং পাকিস্তানবাসী কোটি কোটি হিন্দুকে নিষ্ঠুর আচরণে বহিষ্কার করিয়া মক্কাবাদীরা যে দুষ্কার্য করিয়াছে সেই দুষ্কার্যের প্রতিশোধবাদীদের দৃষ্টির সামনে ধূম্র সৃষ্টির চেষ্টা ভিন্ন আপনার প্রদত্ত বইগুলিতে অন্য কথা নাই। ভারতে বেদবাদ থাকিবে কি মক্কাবাদ থাকিবে ইহা আমি জানি না। আপনারা নানা রকম তাপ্তি দিয়া আবার প্রস্তুত হউন। ভাল ভাবেই জানিবেন, দুর্বলবাদী ভারত মক্কাবাদের পদতলে যাইবে এবং শক্তিবাদী ভারতের চাপে মক্কাবাদ বিলুপ্ত হইবে।’’

(২২) ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করিতেছে। এ বিষয়ে আমার মত কি, বহু লোক জিজ্ঞাসা করেন। ভারতের সমস্তগুলি দর্শন শাস্ত্রই ধর্মমূলক। ভারতের উপনিষদ বেদ ও গীতা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদ এবং দর্শনমূলক। ভারত কি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে দর্শন শাস্ত্র পাঠ বন্ধ করিয়া দিবেন? ভারত-রাষ্ট্র দর্শন শাস্ত্র পাঠে খরচ করিলে সেটা ধর্মনিরপেক্ষ কি করিয়া হইল? আমার মনে হয় শ্রীজাকির হোসেনই বেশী বেশী ধর্ম নিরপেক্ষতার ওকালতী করেন। আমি বলিতে পারি, ভারত ভাগকারী মক্কাবাদীরা পাকিস্থানে চলিয়া গেলে ভারত রাষ্ট্রে ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন হানি হইবে না। কারণ, ভারতের শত্রু ও ভারত ভাগকারী মক্কাবাদীরা চলিয়া গেলেও ভারতে অনেক ধর্ম থাকিয়া যাইবে। ধানের দেশ পূর্ববঙ্গ এবং গমের দেশ পশ্চিম পাঞ্জাবকে পাকিস্তানে দান করিয়া এবং ঐ দুই দেশের কোটি কোটি হিন্দু মুসলমানকে ভারতে পোষণ করিয়া ভারত কিছুতেই স্থায়ী দুর্ভিক্ষ অতিক্রম করিতে পারিবে না। শ্রীজাকির তো বিদ্বান মানুষ, তিনি ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে ‘‘খুদার নেমাজ মানো এবং কাফেরদের ধ্বংস কর এবং যত পার ভারত রাষ্ট্র ভাগ করিয়া যবন রাজ্য করিয়া পুণ্য অর্জন করো,’’ ফিলোসফীর পাঠ প্রবর্তন করুন না?

(২৩) শক্তিবাদের প্রভাব। প্রশ্ন : আপনি শক্তিবাদ ধরিয়া থাকিয়া নানা প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, আমাদের মতে আপনি ইহা ত্যাগ করুন।

উত্তর : শক্তিবাদ ত্যাগ করিয়া আমি কি লইয়া থাকিব, বলুন? শক্তিবাদ ত্যাগ করিয়া ক্ষতি লাভ কাহাকে বলে উহা আমার জানা নাই। শক্তিবাদ, দুর্বলবাদ ও অস্থরবাদ, এই তিনের একটা আমাকে ধরিয়াই থাকিতে হইবে। আমার কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানধারায় শক্তিবাদই থাকিবে; কারণ ইহাই আমার জীবন, ইহাই আমার নীতি এবং ইহাই আমার সব। আমি এক সময় নানা মতবাদীদের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি, দেশ-বিদেশের অনেক কর্মী ও নেতার সংস্পর্শে গিয়াছি। বহু অর্থব্যয় করিয়াছি। কি ফল হইয়াছে, উহা আমার হিসাব করিবার সময় নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের হত্যা যে ভারতের প্রকাশ্য শত্রু মক্কাবাদী এবং ভারতের প্রচ্ছন্ন শত্রু দুর্বলবাদী নেতাদের ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি এবং স্পষ্ট বুঝিয়াছি এখন মঠ, মন্দির, পূজা, যজ্ঞ এবং তপস্যার মাধ্যমে আমাকে ঐ শক্তিবাদই ধরিয়া রাখিতে হইবে। শক্তিবাদ আমার জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ইহার প্রভাবে আসিয়াই জীবন দান করিয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পর অন্য কোন নেতাকে প্রভাবিত করার কথা অনেক লোক আমাকে বলিয়াছিল। আমি বলিলাম, বর্বর ও মূর্খেরা তাঁহাকেও হত্যা করিবে, কোন লাভই হইবে না। এখন আমি ধরুন ছিন্নমস্তারই সাধক হইয়াছি। নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছি, যদি আমার সঙ্গে সাক্ষী কোন শক্তিবাদী সাধক থাকে তাঁহাদিগকেও ঐ রুধিরে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আমি ঐ ভাবেই শক্তিবাদ মঠের ভিত্তি দান করিয়াছি। আমি ভিক্ষা করি না, চাঁদা করি না, আমার স্বীয় কর্মফল (রক্ত) পান করিয়া চলিয়াছি, এই বিজ্ঞানে মঠও চলিবে।

(২৪) ভারতের প্রধান মন্ত্রী। প্রশ্ন : জওহরলালের পর শাস্ত্রীজী প্রধান মন্ত্রী, এঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : জওহরলাল চীনকে ভারতের এক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন, শাস্ত্রীজী উহা উদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। কাশ্মীরের এক অংশ পাকিস্তানকে দান করিয়া অন্য অংশও দিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রীজী উহারও প্রতিকার করেন নাই। মক্কাবাদীরা ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্তান করিয়াছে, কিন্তু পাকিস্তানে যায় নাই। শাস্ত্রীজী উহারও কোন যোগ্য ব্যবস্থা করেন নাই। পাকিস্তানের হিন্দুরা বহিষ্কৃত হইয়াছেন, শাস্ত্রীজী উহারও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, শাস্ত্রীজী উহার কোনই প্রতিকার করেন নাই। চীন এটম বোম ফাটাইয়া সমগ্র পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে, উহার উত্তরে তিনি ভারতে করতাল লইয়া নৃত্য করিবার উপদেশ দিতেছেন। নাগারা বিদ্রোহ নীতি গ্রহণ করিয়াছে, শাস্ত্রীজী তাহাদের নেতাদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন এবং সেনাবিভাগকে সতর্ক থাকিতে বলিতেছেন। রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের সঙ্গে সন্ধির কথার মানে কি? এ তো রাষ্ট্র ভাঙিবার নীতি মাত্র। ইহাতে কি মনে হয় যে ইনি ভারত রক্ষার কোন চিন্তা করেন? জওহরলাল হিন্দুর দেশ তিব্বতকে চীনের হাতে দান করিয়া তিব্বতের স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব চীন দ্বারা পদদলিত করাইয়াছেন। শাস্ত্রীজী উহার কোনই প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। সমস্ত ভারত আজ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্র হইয়াছে, উহার জন্য দায়ী যে ভারত ভাগ, এক তরফা রিফিউজী এবং পাকিস্তানের মুসলমানদের ভারতে অনুপ্রবেশ - এ কথা তিনি

কোন বক্তৃতায় স্বীকার করেন নাই। এ সব দেখিয়াও কি বলিতে হইবে, শাস্ত্রীজী ভারতের যোগ্য নেতা? ভারত অখণ্ড হইবে, ভারতে বেদ-বাদীর ধর্মমাত্র থাকিবে। ভারত নিজের বলে বিশ্বজয়ের ক্ষমতা অর্জন করিবে এবং অধ্যাত্মবাদে বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া বিশ্বকে শান্তি দিতে সক্ষম হইবে। অহিংসাবাদ ভারতের ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করিয়াছে ইহাতে প্রকাশ্যে পদাঘাত করিতে হইবে। এই ভাবে ভারত গঠনে যিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন তিনিই ভারতের যোগ্য নেতা।

(২৫) রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট মত কি, ইহা অনেকে জানিতে চাহেন। সংস্কৃত এবং ইংরেজীই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা। হিন্দীকে আমি প্রান্তীয় ভাষা বলি। ভারত যদি নিজের মঙ্গল চায় তবে ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতকে শক্তিশালী করিবে এবং ইংরেজী ভাষাকে অটুট রাখিবে। হায়ারসেকেণ্ডারী পর্যন্ত পাঠ্য বিষয়ে সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য রাখিতে হইবে। সমগ্র ভারতে সরল সংস্কৃতকে প্রচলন করিতে হইবে। সংস্কৃতকে সরল ভাষা করা সহজ। দেব শব্দের রূপ এবং ভূ-ধাতুর রূপের সাজে সমগ্র শব্দরূপ এবং ধাতুরূপকে সাজাইতে হইবে। পিতৃ শব্দের ষষ্ঠীতে ‘পিতুঃ’ হয়। আমরা উহাকে ‘পিতৃস্য’ বলিব। প্রাচীন সংস্কৃতের ক্ষতি না করিয়া সরল সংস্কৃতকেও চালাইতে হইবে। অর্থাৎ ইংরেজী ও সব প্রান্তীয় ভাষার শব্দ গ্রহণ করিয়া সরল সংস্কৃতের ভিত্তিতে নবীন কথ্য সংস্কৃত গড়িতে হইবে। এ জন্য নেতাদের একটা কমিটি করা প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষাকে আমি বিদেশী ভাষা বলি না। যে ভাষা অখণ্ড ভারতে দুই শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে উহাকে আর বিদেশী ভাষা বলা যায় না। উর্দুভাষাকে দেবনাগরী বর্ণে লিখিলে উহার নাম হয় হিন্দী, ইহাও কোন দেশী ভাষা নয়। যে কোন প্রাদেশিক ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করিলে সেই ভাষাভাষীদের রাজ্য এই বিশাল ভারতে হইতে বাধ্য। হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার জেদ ধরিলে বাংলা, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার জেদ করা যায়। যাঁহারা এই সরল সত্য বুঝেন না তাঁহারা ভারতের অযোগ্য নেতা।

(২৬) ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত-রাষ্ট্রে মুসলমানগণকে বড় বড় নেতৃস্থানে রাখা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আমার মত কি? উত্তর - আমি মুসলমানগণকে বিশ্বাস করি না। যে বর্বরতা সাত আট শত বৎসর ধরিয়া ভারতের সর্বনাশ করিয়াছে, যাহারা অনেক বর্বরতার মাধ্যমে ভারত ভাগ করিয়াছে, তাহাদের মুখে বা কার্যে ভারত কল্যাণের কথা শুনিলে আমার মনে হয়, মাতৃমস্তক ছিন্নকারী কষাইয়ের রক্ত মাখা হাতে নারায়ণ পূজার প্রসাদ বিতরণের কার্য করানো হইতেছে। আমার মনে হয় এখন এদের বেদ-বাদীয় ধর্ম অনুসরণ করা বা পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়া কর্তব্য। চারিদিকেই ভারতের সর্বনাশ করা নীতির প্রবর্তন এবং প্রসার লাভ করিয়াছে। এ জন্য প্রধান দায়ী কংগ্রেস এবং সহকারী জড়বাদী কম্যুনিষ্ট কর্মী সম্প্রদায়। এখন দল বড় কি ভারত বড়, কোন নেতার কথায় ইহা আর বুঝা যায় না।

(২৭) সুভাষ জীবিত আছেন কিনা? উত্তর - সুভাষ বাঁচিয়া আছেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। দেশের দুর্দশার জন্য চিন্তিত একদল কর্মী সুভাষকে বাঁচাইয়া রাখিয়া বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। আমার স্পষ্ট কথা, ইঁহারা যদি অখণ্ড ভারত এবং হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করিতেন এবং শক্তিবাদের মত কোন শক্তিশালী মতকে কেন্দ্র করিতেন তবে তাঁহাদিগকে এ ভাবে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইত না।

শক্তিবাদ মঠ

কলিকাতার নিকটবর্তী গড়িয়া নামক স্থানে শক্তিবাদ মঠের জন্য জমি খরিদ করা হইল। প্রথম শস্যসহ একখণ্ড জমি তাং ... রেজিষ্টারী করা হইল। জমি খরিদের পরই দেখা গেল স্থানীয় কৃষকদের এক ষড়যন্ত্রমূলক অভিযান আরম্ভ হইয়াছে যে আমাকে জমিতে বসিতে দিবে না। আমিও বুঝিলাম, শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন আর কোন উপায়েই ইহাতে আশ্রয় করা চলিবে না। আমি সমস্ত দলিলপত্রসহ থানায় গিয়া ডায়রী করিলাম এবং জমির সমস্ত শস্য রাত্রিবেলা নষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। হরিচরণ চক্রবর্তী এবং সৌরীন দাস অগ্রবর্তী হইয়া এ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া দিল। কৃষকরা নয়জন গিয়া থানায় ডায়রীর ব্যবস্থা করিল। O.C. বলিলেন, এই জমি যে তোমাদের উহার প্রমাণ লইয়া এস। তোমাদের নামধাম ঠিকানা পিতার নাম ও বয়স সবই লিখিয়া লইতেছি। নয়জন আসিয়াছ সাতজন থাক এবং দুইজন বাড়ি গিয়া সব প্রমাণ ও কাগজপত্র লইয়া এস। এই জমির মালিক একজন সাধু। তিনি ইহার বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রমাণ সহ কাল ডায়রী করিয়া গিয়াছেন। তোমরা যদি প্রমাণ না দিয়া এই জমিতে প্রবেশ কর এবং কোনও প্রকার দাঙ্গা হয় তবে তোমাদের নয়জনকে বে-আইনী কার্য করিবার জন্য দায়ী করা হইবে। যাহা হউক, কৃষকরা ক্ষমা চাহিয়া থানা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং আমিও বিনা বাধায় উহাতে প্রবেশ করিয়া চালা প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। পাকা ঘর করিবার সঙ্গে সঙ্গে জমির জমিদার কোর্টে এক নালিশ করিলেন যে তাঁহার জমি এক সন্ন্যাসী বলপূর্বক দখল করিয়া গৃহাদি নির্মাণ করিতেছেন, ইহার কার্য রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। পাকা গৃহের চালা হইয়াই গিয়াছিল, যখন পেয়াদা আসিয়াছিল তখন সে দেখিয়াই গিয়াছে আমি উহাতে বসবাস করিতেছি। জমিদারের মিথ্যা মামলাও দুই বৎসর চলিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার আইনতঃ অধিকার মানিয়া লইয়া স্থলেহ্‌নামা কোর্টে দাখিল করিলেন। জমিকে কেন্দ্র করিয়া কৃষক ও জমিদার দুইখানা পাপরূপ দর্শাইলেন। একজন সাধু নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া শক্তিবাদ ধর্মের কেন্দ্র স্থাপনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাতে সাহায্য করা বা সহায়ক হওয়ার কোন নাম নিশানা নাই; বরং মিথ্যা দাঙ্গা ও মিথ্যা মামলা করিয়া একজন সমাজহিতৈষী মহাত্মাকে হয়রান করিবার দুষ্কার্য চলিয়াছে। জমি আরও কিছু খরিদ করিয়া শক্তিমন্দির নির্মিত হইল। শক্তিবাদ প্রচারের স্থবিধার জন্য বিদ্যার্থী ভবন নির্মিত হইল। কিছুদিন বিদ্যার্থী ভবন চলিবার পরই বিদ্যার্থী ভবনে নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। তাহাদের দাবী অনেক। প্রধান দাবী তাহারা উপাসনা করিবে না এবং শক্তিবাদ দুর্বলবাদ এবং অস্থরবাদ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনায় যোগদান করিবে না। ছাত্ররা প্রায় সকলেই বি. এ. এবং এম. এ.-র ছাত্র। জাতি গঠনের জন্য যে মহান কার্য আরম্ভ করিয়াছি, নিজের সমস্ত ধন ঢালিয়াছি, নিজের শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত ব্যয় করিয়া যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছি, জাতীয় মেরুদণ্ডস্বরূপ শিক্ষিত যুবকরা সংঘবদ্ধ ভাবে উহার মূল উৎপাটনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে সমস্ত ছাত্রফেডারেশন তাহাদের সমর্থক, কম্যুনিস্ট পার্টি তাহাদের বাহক। সকালে বৈকালে শত শত যুবক দল বাঁধিয়া আসে, ঝগড়া করে। আমি অবসরপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার, থানার O.C., পুলিশ কমিশনার

সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া আমার পজিসনটা বুঝিয়া লইলাম। ছাত্রগণকে বার বার বুঝাইলাম যে এ ভাবে সর্বদা এবং নিত্য গোলমাল করিলে তোমাদেরই লেখাপড়ার ক্ষতি হইবে এবং পিতামাতার অর্থ ব্যর্থ ব্যয় হইবে। এ সব ত্যাগ করিয়া তোমরা পাঠে মন দাও। তাহারা কোন সৎকথায়ই কর্ণপাত করিত না। পুলিশ কমিশনার আমাকে স্পষ্ট বলিলেন, উচ্ছৃঙ্খলদের দমন করিবার মত শক্তি আমাদের হাতে মোটেই নাই। আমি বলিলাম, বদমাইসদের দমন করিবার মত শক্তি আমার প্রচুর আছে, আপনাদেরও আছে। তবে আপনারা উহা করিবেন না, ইহার কারণ আপনাদের উপর যাঁহারা কর্তৃত্ব করেন তাঁহারা সকলেই ''বদমাইসদের পক্ষে'' এবং বদমাইস। তিনি বলিলেন, আপনারা একটা গোলমাল বাধাইয়া দিন, আমরা গিয়া পাহারা দিব। আমি বলিলাম, আপনাদিগকে পাহারা দিবার সুযোগ আমরা দিব না, আর টাকা নষ্ট করিয়া ছাত্ররা শক্তিবাদ মঠে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবে এবং আমাদের পূজা ও সাধনায় বিঘ্ন করিবে আমরা তাহাও হইতে দিব না। যাহা হউক, আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া গোলমালের নেতাকে নাম কাটা নোটিশ দিলাম। বদমাইস যাইবে না এবং তাহার সাথী বদমাইসরাও তাহাকে যাইতে দিবে না। আমরা ভালভাবেই জানিতাম, এ ভাবে বে-আইনী গোলমাল করিয়া বদমাইসের দলে বেশীদিন সকলে থাকিবে না। কারণ, বাপমায়ের অর্থ সকলের বাড়িতে সমান ভাবে সচ্ছল নয়। আর নাম কাটার পর ''ট্রেস পাশ'' হইয়া এখানে থাকারও বেশ বিপদ আছে। যাহা হউক, বড় বদমাইস চলিয়া গেল এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আসিল।

কিছুদিন বিদ্যার্থীভবন ভালই চলিল। আবার উহাতে বদমাইসের আবির্ভাব হইল। এবার দল একটু শান্ত হইল। এরা শক্তিবাদ মঠ ভাঙিয়া দিবে, আমাকে গুপ্তহত্যা করিবে এবং স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠানে মঠকে পরিণত করিয়া বিনা খরচে এখানে থাকিয়া এরা এবং ইহাদের বংশধররা বিদ্যা অর্জন করিবে। ইহাই ইহাদের পরিকল্পনা। ইহারা গোপনে প্রচার পত্র ছাপিয়াছে।

এ ঘটনায় ভাল ভাবেই বুঝিলাম দেশের যুবকরা চরম উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। ইহারা রাত্রিকালে মঠের চালে ঢিল ছোঁড়ে। সমস্ত দিন ঘরে ঘরে আমার নামে মিথ্যা নিন্দা করে এবং লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া বিদ্যার্থী ভবনের টেবিল চাপড়াইয়া বক্তৃতা করে। আবার স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন এবং কম্যুনিস্ট যুবকদিগকে ডাকিয়া আনে, ঝগড়া করিবার জন্য এবং আমার সঙ্গে মিটমাট করিবার জন্য। ওরা আমাকে প্রায়ই বলে, আমরা জানি আপনার সঙ্গে বিদ্যার্থীভবনের ছাত্রগণের মতভেদ আছে, আমরা একটা মিটমাট করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছি। আমি এ সব বদমাইসদের কোন কথাই আমল দিই না। শেষ পর্যন্ত আমি দুই চারিজন বাদে সকলের নামে নাম কাটা নোটিশ দিবার পরিকল্পনা করিলাম। স্টুডেন্টস ফেডারেশনের এক ছাত্রনেতা আমার নিকট আসিলেন এবং কোন মধ্যপন্থা বাছিয়া লইয়া মিটমাট করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে শক্তিবাদ একটা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্মত প্রতিষ্ঠান। শক্তিবাদ মঠ উহারই প্রচারের একটা প্রতিষ্ঠান। এই মঠের সমস্ত সম্পত্তি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ইহা বিনা চাঁদায় এবং বিনা ভিক্ষায় নিজের পরিশ্রমে প্রস্তুত

হইয়াছে। আমার প্রতিষ্ঠানে এ সব বদমাইসদিগকে থাকিতে দিব না। এরা কেহই সীট রেন্টও দেয় না। যুবকটি সব কথা বুঝিলেন। আবশ্যক কাগজপত্র এবং রেজিস্টারও দেখিলেন এবং বলিলেন ওরা আমাদিগকে এই প্রতিষ্ঠান এবং আপনার বিষয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং তিন চার মাস ধরিয়া এ সব দুষ্কার্য করিতেছে। তবুও বলিতেছি, যদি পারেন ওদের থাকিতে দিন। আমি বলিলাম, আর সম্ভব হইবে না। জনসাধারণ ভয়ঙ্কর ভাবে এদের প্রতিশোধ লইবে এবং আমি এখন ইহার প্রতিকার না করিলে আমাকেও পুলিস আইনে জবাবদিহি করিতে হইবে। কারণ গ্রামবাসীরাও এদের অত্যাচারে জর্জরিত। এরা ক্ষেতের তরকারী, ফাৎনার মাছ, বৃক্ষের ফল চুরি করে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটা অঘটন ঘটিলে পুলিশ আমাকেও অ্যারেস্ট করিবে এবং ডিসিপ্লিনারী অ্যাকসন লই নাই বলিয়া আমাকেও দোষী করিবে। যাহা হউক, নাম কাটার নোটিশ দিবার পর সব ছাত্রেরাই রাত্রিকালে ঠেলায় মাল ভর্তি করিয়া চলিয়া গেল। এবার আরও একটু শক্ত হাতে বিদ্যার্থীভবন চালাইবার ব্যবস্থা করিলাম এবং ইহার নাম দিলাম 'গীতাভবন'। ইহার পর আর কোন ব্যাপক গোলমাল হয় নাই। একটু শক্ত হাতে পরিচালনা করিবার দরুণ বেশ ভদ্র এবং ভাল ছাত্র ইহাতে প্রবেশ করিতে লাগিল।

মঠে দুইটি মন্দির আছে : উহার একটিতে কালী, তারা, ত্রিপুরা, মহিষমর্দিণী দুর্গা এবং ষট্চক্র শিব; অন্যটিতে তন্ত্রবক্তা আদি গুরু শিব এবং ১৪০, ১৪১ ও ১৪২ সংখ্যক আনন্দামঠাধীশের মর্মর মূর্তি স্থাপনা করা হইয়াছে। ষট্চক্র শিব এই মন্দিরেও আছেন। মন্দিরের বাহিরে পঞ্চমুণ্ড আসনে মহাকাল শিব স্থাপনা করা হইয়াছে। ঐ আসনে জনসাধারণ সব সময় জল ফুল দান করিয়া আরোগ্য শান্তি ও জ্ঞান কামনা করেন। মঠে কোন চাঁদা বা ভিক্ষার ব্যবস্থা নাই বা চাঁদা বা ভিক্ষা করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাও করা হয় নাই। মঠের শক্তিবাদী বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শিষ্যগণও এই মঠ পরিচালনা করিয়া ইহা রক্ষা করিবেন। এই মর্মে মঠের সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করা হইয়াছে। ১৯৬৩ সনের ২ সেপ্টেম্বর ইহা রেজিস্টারী করা হইয়াছে। মকরসংক্রান্তি, শারদীয় দুর্গোৎসব, কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, নীল সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, নীলের সন্ন্যাস পূজা এবং রাজরাজেশ্বরী মহাবিদ্যার পূজা প্রভৃতি শক্তিশালী দিবসে এখানে পূজা উৎসব ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আশা করা যায়, শক্তিবাদী শিষ্য শিষ্যাগণ ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশে শক্তিবাদ ধর্মের প্লাবন আনয়ন করিয়া মানবের সমাজজীবন এবং ধর্মজীবন সুন্দর মহান্ ও শক্তিশালী করিতে উৎসাহিত হইবেন এবং আনন্দমঠের সাধনার ধারা মাধ্যমে গৃহী এবং সন্ন্যাসী সাধক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবেন।

ষোড়শ অধ্যায়

আমার শক্তি-সাধনা

ওঁ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ মুণ্ডমালা তন্ত্রম্॥

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশজন মহাবিদ্যা বলিয়া খ্যাতা।

কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তিকা।
বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেবাঃ কর্নৌপূর্ণ ফলপ্রদাঃ। মালিনী বিজয় তন্ত্রম্॥

কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী প্রভৃতি দেবতা কলিকালে পূর্ণফল প্রদান করেন।

শক্তি-সাধনা বুঝিতে বা বুঝাইতে যে প্রতিভার প্রয়োজন উহার সন্ধান মানবের এক জীবনে বা এক জন্মের সাধনায় কুলাইবে না। বহু জন্মের সাধনা এবং বহু জন্মের তপস্যালব্ধ প্রতিভা পুঞ্জীভূত হইয়া সাধককে শক্তিসাধনা এবং শক্তিতত্ত্বে প্রবেশের প্রেরণা দিয়া থাকে। আমাদের দেশের পিতামাতারা বাল্যকালেই সন্তানগণকে শক্তিদীক্ষা দান করিয়া থাকেন। এই দীক্ষাকেই গায়ত্রী দীক্ষা বা উপনয়ন সংস্কার বলে। উপনয়নের পরই বালক গুরুগৃহে চলিয়া যায় এবং বেদ পাঠ, ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করে। ত্রিসন্ধ্যোপাসনাই গায়ত্রী দীক্ষা বা উপনয়ন দীক্ষার প্রথম সাধনা। উপনয়ন সাধনার প্রধান অবলম্বন ব্রহ্মনাড়ী এবং গৌণ অবলম্বন সূর্যজ্যোতি।

সূর্য কিরণে বিশ্বমূলক মহাশক্তির সব শক্তির পরিবেশন বিশ্বজগতে হইয়া থাকে, এজন্য উহার মধ্যেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। এ কারণ উপনয়ন দীক্ষার সাধনায় ব্রহ্মনাড়ী এবং সূর্যদেবতা দুইটি অবলম্বনের দিকেই জোর দেওয়া হইয়াছে। পূজাবিধিতে ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিশালী পীঠ স্থাপনার ব্যবস্থা আছে। ইহারই ফলে মন্দির ও তীর্থস্থান প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রহ্মনাড়ী ও সূর্য্যদেবতাই শক্তিপীঠ নহে। ভূমিকে কেন্দ্র করিয়াও অনেক প্রভাবশালী শক্তিপীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। মূর্খ ও বর্বরদের পবিত্র গ্রন্থে যদি সূর্যকে খুদার লালটেম্ (লণ্ঠন) বলা হইয়া থাকে, তাহাতে

আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই; কারণ ধর্মকে যাহারা লুঠ, গুণ্ডামী ও সংঘবদ্ধ পশুত্বের স্তরে আনিতে পারে, তাহাদের নিকট ইহার চেয়ে বেশী কিছু আশা করা যায় না।

সূর্য কিরণের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগে চার প্রকার শক্তিকণার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন এবং মধ্যরাত্রি, পৃথিবীতে এই চার প্রকার কাল বিভাগ সূর্যরশ্মি ও পৃথিবী সংযোগের ফল। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন এবং মধ্যরাত্রি সব সময়ই বিদ্যমান। ঠিক একই সময় গোলাকার পৃথিবীর চার জায়গায় প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন এবং মধ্যরাত্রি বিদ্যমান। মধ্যরাত্রির জ্যোতি অমাজ্যোতির ঘনতম অবস্থা। একই সূর্যজ্যোতি এবং একই পৃথিবী কিন্তু এই চার কালের জ্যোতিগুলির উপাদান এক নহে। প্রাতঃ সূর্যজ্যোতি জন্ম বা সৃষ্টিকারক ও বৃদ্ধিকারক, মধ্যাহ্নজ্যোতিঃ কার্যশক্তি এবং তেজবর্ধক, সায়াহ্ন জ্যোতিঃ লয় ও ধ্বংসকারক। উপনয়ন সাধনায় প্রাতঃ-জ্যোতিকে ব্রহ্মাণী বা সৃষ্টিকারিণী বলা হইয়াছে। মধ্যাহ্ন-জ্যোতিকে পালিনী এবং কর্মশক্তি বর্ধক বলা হইয়াছে। সায়াহ্ন জ্যোতিকে ধ্বংসাত্মক বলা হইয়াছে। ত্রিসন্ধ্যোপাসনায় তিনপ্রকারের জ্যোতির মধ্যে মহাশক্তির ত্রিমূর্তি স্পষ্ট হয়। উপনয়ন দীক্ষার পর বালক সাধক এই ত্রিশক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনকালের সূর্যজ্যোতির উপাদানকে গ্রহণ করিয়া কি ভাবে বিশ্বজগতের জীবগণ পরিপুষ্ট ও ধ্বংসাত্মক শক্তি আহরণ করে এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের বহু গ্রন্থে বহু আলোচনা করিয়াছি। যাহারা সূর্যদেবতাকে খুদার লালটেম্ (লণ্ঠন) বলিতে চাও তাহারাও বর্বরতা ও মূর্খতার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সূর্যজ্যোতির উপাসনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে পার। একটা বৃক্ষকে প্রাতঃ সূর্যকিরণ স্পর্শ হইতে বঞ্চিত কর, দেখিতে পাইবে সে ভাল ফলিবে না। তাহাকে মধ্যাহ্ন কিরণ হইতে বঞ্চিত কর দেখিতে পাইবে পূর্ণতেজ স্পর্শ না পাইবার দরুণ সে নিস্তেজ হইতেছে। তাহাকে প্রাতঃ এবং মধ্যাহ্ন রশ্মিস্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবলমাত্র সায়াহ্ন রবিকিরণে প্রতিপালন কর, দেখিবে সে ধীরে ফল দানে অক্ষম হইয়া চলিয়াছে। একটি শস্য গাছকে কেন্দ্র করিয়া তোমার অভিজ্ঞতার ফল দ্বারা তুমি যে কোন জীবকে বিচার করিতে পার। জানিয়া রাখিও, সূর্যদেব কোন লালটেম্ নহেন। সূর্য হইতেছেন বিশ্বসৃষ্টিমূলক কেন্দ্রীয় শক্তির পরিবেশন কেন্দ্র।

ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশের জন্য প্রাণায়ামকে অবলম্বন করা হইয়াছে। ব্রহ্মনাড়ীস্থিত মণিপুর কেন্দ্রে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণীর ধ্যান (ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করং হংস বাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্); অনাহত কেন্দ্রে বিষ্ণু বা বৈষ্ণবীর ধ্যান (ওঁ নীলোৎপল দলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্) এবং মস্তিষ্কস্থিত আজ্ঞাচক্রে শম্ভু বা রুদ্রাণীর ধ্যান (ওঁ শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল-ডমরুকরং অর্ধচন্দ্র বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্) করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়। ইহাই আত্মস্থ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় শক্তির উপাসনার অঙ্গ। সন্ধ্যোপাসনায় সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বাহ্য ত্রিশক্তির উপাসনাও নিত্য সন্ধ্যাবিধিতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বাহ্য ত্রিশক্তিকে সূর্যকেন্দ্রে ধ্যান করিবার জন্য প্রথম সূর্যোপাস্থান করিতে হয়। বিস্তারিত সন্ধ্যাবিধিতে দেখুন। যাঁহারা বহুদিন সন্ধ্যোপাসনা করেন নাই এবং যাঁহারা যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শক্তিপূজা করেন নাই, তাঁহাদের নিকট এই "শক্তি সাধনা" অধ্যায় বেশ জটিল

মনে হইবে। যাহা হউক, প্রাতঃ সন্ধ্যায় সূর্যমণ্ডলে ব্রহ্মাণীর ধ্যান (ওঁ কুমারীং ঋগ্‌বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ। হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডল সংস্থিতাং); মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবীশক্তির ধ্যান (ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসনম্ যুবতীঞ্চ যজুর্বেদাং সূর্যমণ্ডল সংস্থিতাং) এবং সায়ংকালে সূর্যমণ্ডলে শিবানীর ধ্যান (ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং। সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাং) করিতে হয়। সূর্য সাক্ষাৎ আত্মশক্তির প্রতীক; ইঁহার তত্ত্ব আত্মকেন্দ্রে বিদ্যমান এবং আত্মশক্তির সমস্ত উপাদান সূর্যমণ্ডলে রহিয়াছে। জানিয়া রাখিও, ব্রহ্মনাড়ীই অন্তরাত্মা এবং সূর্যদেব বাহ্য বিশ্বআত্মা। উপাসনা কাণ্ডে কেবল ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং শিবানীর উপাসনা অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় তত্ত্বের উপাসনাকেই সূর্যকেন্দ্রে যে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে তাহা নয়, তুরীয়া শক্তির বাহ্য উপাসনাতেও সূর্যদেবকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিধিতে ইষ্টদেবতার অর্ঘ্যমন্ত্রে উহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পর ভারতের শক্তিবাদ ধর্মের বেশ পতন দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে অসুরবাদকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সুদূর কর্মশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তির হ্রাস হইয়াছে।

“সর্বে দ্বিজাঃ শাক্তাঃ প্রোক্তাঃ ন শৈবাঃ ন চ বৈষ্ণবাঃ।”

“সমস্ত দ্বিজগণকেই শাক্ত বলিবে, তাঁহাদিগকে শৈব বা বৈষ্ণব বলা যায় না।” দ্বিজ মানেই উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত; এ জন্য ইঁহারা সকলেই শাক্ত। ইঁহারা সকলেই গায়ত্রী বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। মনে এবং শরীরে প্রচুর তেজস্বিতা থাকিবে, ইহাই শক্তিসাধকের প্রধান লক্ষণ। অসুররা ক্রোধী, কিন্তু শক্তিসাধকগণ তেজস্বী। বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য এবং সৌরগণ কি শাক্ত নহেন? হ্যাঁ, তাঁহারাও শাক্ত। কারণ বিষ্ণু, শিব, গণপতি, সূর্য উপাসনা শক্তি বা তেজবৃদ্ধির লক্ষ্যে তত্ত্বসাম্যের উপাসনা। শরীরে ও মনে তেজ কম থাকিলে জানিতে হইবে শরীরে ও মনে ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ এবং ব্যোম তত্ত্বের আধিক্য বা অভাব আছে। এই আধিক্য বা অভাব সাম্য হইলেই মানবের মন ও শরীর তেজস্বী হইবে এবং তখনই সে শক্তিসাধনার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইবে। যে মানব যুক্তিবাদী ও তেজস্বী, সে শক্তি সাধনা না করিলেও সে শাক্ত। যে মানব শক্তিদীক্ষা লইয়াও দুর্বলবাদ গ্রহণ করিয়া অসুরের পদে তৈলমর্দন করিবার জন্য অহিংসা ও বিশ্বপ্রেমের ভণ্ডামী করে, সে যে মহাপাপী - ইহাতে সন্দেহ নাই।

গায়ত্রী দীক্ষার পরে তুরীয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষার ইহাই সনাতন ক্রম। আবার যাহাদের বংশজ নিয়মে গায়ত্রী দীক্ষার নিয়ম নাই, তাহারা নিজ নিজ বংশে উপনয়ন দীক্ষা প্রবর্তন করিতে পারেন বা সোজা তুরীয়া শক্তির দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। গায়ত্রী উপাসনা বা তুরীয়া শক্তির উপাসনা গ্রহণ করিবার পর যদি কেহ প্রয়োজন মনে করে, তবে তাহাকেও সাময়িক ভাবে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু ও শিবাদি তত্ত্বদীক্ষা দিবার বিধান আছে।

গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি, মনোবিকাশেরও এই পাঁচটি স্তর। এই পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়াই পূর্ণজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের পথ বিদ্যমান। এজন্য ভারতব্যাপী পূজা বা উপাসনা বিধিতে পঞ্চদেবতার পূজা সকলের জন্য অলঙ্ঘনীয় বিধান। অধুনা অপুষ্টবাদী

ধর্ম ব্যবসায়ীরা ভ্রান্ত প্রচারদ্বারা সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রশ্রয় দিয়াছে। মূর্খদের ধর্মপ্রচারের ফলে মূল বৈজ্ঞানিক ধর্মের ক্ষতি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। কি ভাবে গায়ত্রী উপাসনা এবং তুরীয়া শক্তির উপাসনা ভারতে প্রসার লাভ করিতে পারে এ বিষয়ে বহু চিন্তাশীল সাধকের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুরীয়া দীক্ষাই ঠিক ঠিক শক্তিদীক্ষা এবং তুরীয়া শক্তির উপাসনাই পূর্ণরূপে শক্তিসাধনা। গায়ত্রী দীক্ষা এই তুরীয়া শক্তির প্রাথমিক ও প্রবেশ দীক্ষা। গণেশ সূর্য বিষ্ণু ও শিবদীক্ষা অর্থাৎ তত্ত্বদীক্ষাও তুরীয়া দীক্ষার প্রবেশ দীক্ষা। এইসব দীক্ষা এবং সাধনার মধ্যেই শক্তিবাদ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীর উপাসনাই তুরীয়া শক্তি বা শক্তি উপাসনার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক অবলম্বন। দিনের বেলায় শিবপূজা এবং রাত্রিতে কালীর সাধনা, সাধক জীবনকে অত্যন্ত দ্রুত শক্তিশালী করিতে সক্ষম।

কালীর একাক্ষরী বীজমন্ত্র :- ওঁ ক্রীঁ।

কালী মন্ত্রের গায়ত্রী :- ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশান বাসিন্যৈ ধীমহি তন্নোঽঘোরে প্রচোদয়াৎ।

মালা মন্ত্র :- ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণ কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা॥

মহাকাল ভৈরব হইতেছেন এ সব মন্ত্রের ঋষি, উষ্ণিগ ছন্দঃ চতুর্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

সাধকের নিত্যসাধনা বেশ সংক্ষেপ সহজ এবং তত্ত্বপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। নয়তো সাধনার দিব্যাচার লক্ষ্য এবং শক্তিবাদ লক্ষ্য ব্যাহত হইবে। যথেষ্ট ত্যাগ ও তপস্যা না থাকিলে শক্তিমন্ত্রের প্রভাব কম হইবেই। অনেকে অলৌকিক কিছু দেখাইয়া তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, আমরা ঐরূপ করিবার মোটেই প্রয়োজন দেখি না। তেজস্বিতা, ত্যাগ ও জ্ঞান জীবনকে বিকশিত করে ইহা ভিন্ন অন্য সব ভড়ং ক্ষতিকর। যথাবিধি সাধনা করিবেন, উপার্জন করিয়া অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন। সর্বপ্রকারের ভড়ং হইতে মুক্ত থাকিয়া শক্তিবাদ ধর্মকে প্রসার করিবেন।

প্রথমে দীক্ষার পর কায়াকাশ ধ্যান সহ জপ করিতে হয়। এই জপে মন শূন্যবোধ ও শ্বাসপ্রশ্বাস মধ্যে স্বতঃই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। কয়েক মাস এইভাবে সাধনা করিবার পর সাধনার মধ্যে আরও কিছু ক্রিয়ারও অভ্যাস করিতে হইবে। নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যোপাসনার অভ্যাস করা আবশ্যক। মহাশক্তি কালীর উপাসকগণের জন্য মহা সন্ধ্যার উপাসনা অধিক দিন না করিলেও চলে কারণ কালীর উপাসনা এবং মহাসন্ধ্যোপাসনা একই তত্ত্বের সাধনা। সাধক যতই উন্নতির দিকে যাইবে নিত্যসাধনায় বাহ্য অনুষ্ঠান সে অনুপাতে কম করিতে হইবে। দিব্যাচার শক্তিসাধনার ইহাই নীতি।

সাধক আসনে উপবেশন করিয়াই মূলাধার চিন্তা করিবেন। মূলাধার পদ্মই যে আসন ইহা বোঝাই আসনশুদ্ধি।

আসনে বসিয়াই মূলাধার ও সহস্রার ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ী স্মরণ করিয়া ইষ্ট ও গুরুকে প্রণাম করিবেন এবং প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি করিবেন। ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। ভূতশুদ্ধির পথে সাধক সোমচক্রের নিকটস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর মন বুদ্ধি চিত্ত অহং ও প্রাণ সবই অমৃতরসে প্লাবিত হইতে থাকিবে। সোমরসই মহত্তত্ত্ব

পীঠ। ইহার পর অব্যক্ত পীঠ। এই অব্যক্ত পীঠেই শক্তিস্তর আরম্ভ এবং ইহাই তুরীয়া শক্তির আসন পীঠ। ইহাতে মহাশক্তির স্তর বা পুরুষোত্তম স্তর আরম্ভ। মহাশক্তিকে স্মরণ করিয়াই সাধক মহত্তত্ত্ব পীঠে আসিবেন ও ন্যাস করিবেন। অন্তর মাতৃকা ন্যাস মানে ষট্‌চক্রের মধ্যে মহত্তত্ত্বের অমৃত ও জ্ঞানধারার প্রবাহকে স্বচ্ছন্দভাবে টানিয়া আনা। ভূতশুদ্ধির পথে সাধক মহত্তত্ত্ব পীঠে আসিলেই এই জ্ঞানধারা ষট্‌চক্রপথে আপনি নামিয়া আসিতে থাকে। এবার সাধক সেই ধারা যেভাবে আসিতে থাকে উহা একবার প্রত্যক্ষ করিয়া লইবেন। অন্তর মাতৃকান্যাসের পর মহত্তত্ত্বস্থিত জ্ঞানের সেই অমৃতধারা বাহ্য শরীরেও প্রবাহিত হইতে থাকে। বাহ্য মাতৃকান্যাস অনুষ্ঠানে সেই ধারা কিভাবে বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে উহাও দর্শন করিতে হইবে।

ভূতশুদ্ধির পরেই মাতৃকান্যাসের ধ্যান করিতে হইবে। এই ন্যাসের কেন্দ্র হইতেছে মহত্তত্ত্ব বা মস্তিষ্কস্থিত সোমচক্র বা গুরুপাদুকাস্থিত ''দ্বন্দ্বমিন্দু'' এবং উহারও অগ্রবর্তী কেন্দ্র। ক্রমবিকাশ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এবং চিত্র দেখিয়া কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে কোথায়, উহার মোটামুটি আভাস ঠিক কষিয়া লইবেন।

মাতৃকাধ্যানের উপদ্‌ঘাত মন্ত্র :- ওঁ অস্য মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানী স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং কীলকং মাতৃকা ন্যাসে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ওঁ ব্রাহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দয়ে নমঃ। (হৃদয়ে) ওঁ মাতৃকা সরস্বতৈ নমঃ। (পাদয়োঃ) ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। (সর্বাঙ্গে) ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।

উপদ্‌ঘাত মন্ত্রের লক্ষ্যও বুঝা প্রয়োজন। ঋষি মানে মন্ত্রদ্রষ্টা। ব্রহ্মঋষি মানে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সাধকই এই মাতৃকাশক্তির মর্মকে বুঝিবার শক্তি রাখেন। ছন্দ মানে স্পন্দনের তালসংযুক্ত প্রবাহ। এই প্রবাহের আকর্ষণে মজিতে হইবে। গায়ত্রী ছন্দ মুক্তিদাতা ছন্দ। হলো বীজ মানে ব্যাঞ্জন বর্ণগুলি এই সরস্বতী দেবীর জপমন্ত্র। স্বরবর্ণগুলি হইতেছে শক্তি। অব্যক্ত তত্ত্ব হইতেছে এই সরস্বতী তত্ত্বের কীলক। কীলক মানে খিল বা অর্গল। অর্থাৎ অব্যক্ত তত্ত্ব ভেদ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর লাভ হয় না এবং এই সরস্বতী দেবী বা জ্ঞানধারাকে জানা যায় না। এতটা জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে মাতৃকা ন্যাস-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

করন্যাস॥

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা।
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্।
এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ।
ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস॥

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসি স্বাহা।

উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্।

এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ।

ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।

অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।

এই ভাবে করে ও অঙ্গে জ্ঞানশক্তি সরস্বতীর প্রবাহ মস্তিষ্কস্থিত মহত্তত্ত্ব পীঠ হইতে প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া, ষট্চক্রপথে এই জ্ঞানধারা কি ভাবে প্রবাহিত হইয়া কেন্দ্রগুলি জ্ঞানময় হইয়াছে উহা দেখিয়া মনে মনে প্রণাম করিবে। যথা -

বিশুদ্ধ চক্রে॥ অং নমঃ আং নমঃ ইং নমঃ ঈং নমঃ উং নমঃ ঊং নমঃ ঋং নমঃ ৠং নমঃ ঌং নমঃ ৡং নমঃ এং নমঃ ঐং নমঃ ওং নমঃ ঔং নমঃ অং নমঃ অঃ নমঃ॥

অনাহত চক্রে॥ কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ॥

মণিপুর চক্রে॥ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ পং নমঃ ফং নমঃ॥

স্বাধিষ্ঠান চক্রে॥ বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লং নমঃ॥

মূলাধার চক্রে॥ বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ॥

মস্তিষ্কস্থিত আজ্ঞাচক্রে॥ হং নমঃ ক্ষং নমঃ॥

এই ভাবে জ্ঞানধারা সমস্ত চক্রগুলিতে প্রবাহিত হইতেছে দর্শন করিয়া, সাধক গুরু পাদুকার দ্বাদশ বর্ণাঙ্কিত দ্বাদশ দল, গুরু পাদুকাস্থিত অ ক থ রেখাত্রয় শক্তিপীঠ বা অবলালয় এ গুরুপাদুকাস্থিত শক্তিপীঠের ত্রিকোণ হইতে উত্থিত ত্রিশিখা বা শিখাত্রয় এবং শক্তিপীঠ মধ্যস্থিত 'নাদবিন্দু' এবং ত্রিশিখার লয় ভূমি দ্বন্দ্ববিন্দু কেন্দ্র দর্শন করিবেন। এই দ্বন্দ্ববিন্দু স্থানই শান্তিময় শিব, এখান হইতে নাড়ী দ্বারা মহত্তত্ত্ব পীঠ সংযুক্ত আছে। দ্বন্দ্ববিন্দুর মধ্য দিয়াই মহত্তত্ত্ব পীঠে প্রবেশ করিতে হয়। অর্থাৎ দ্বন্দ্ববিন্দু স্থানে সাধকের অহংকার বিলীন হইলেই মহত্তত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তি সরস্বতীর নিকটস্থ হইবেন। এই ভাবে অন্তর মাতৃকান্যাস স্মরণ করিয়া বাহ্য মাতৃকা ন্যাস করিবেন। যথা -

ধ্যান॥ ওঁ পঞ্চাশ লিপিভিঃ বিভক্তঃ মুখদোঃ পন্মধ্য বক্ষস্থলাং ভাস্বন্মৌলি নিবন্ধ চন্দ্রশ কলামাপীন তুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষ গুণং স্বধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদ প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥

অন্তরমাতৃকা ন্যাসে, সাধকের সমস্ত অন্তর প্রদেশ, ষড়ঙ্গ এবং করপীঠ স্থানগুলি জ্ঞান বা অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে। এবার বাহ্যমাতৃকা ন্যাসে সেই স্বধাময়ী বাগ্দেবী সরস্বতী কি ভাবে জ্ঞানধারায় সাধকের সমস্ত বাহ্য শরীরটা প্লাবিত করিয়াছেন উহাও দর্শন করুন। ন্যাস-বিধিতে একটি পুষ্প হাতে লইয়া বা নানা প্রকার মুদ্রায় স্থানগুলি স্পর্শের আদেশ আছে। যাঁহারা যথাযথ মুদ্রায় স্থানগুলি স্পর্শ করিতে চাহেন তাঁহারা পূজাবিধি গ্রন্থ দেখিয়া উহার অভ্যাস করিবেন। সাধকগণ স্থানগুলিতে মস্তিষ্কস্থিত জ্ঞানপীঠ হইতে জ্ঞানের ধারাগুলি বিভিন্ন স্থানকে প্লাবিত করিতেছে, দর্শন করিয়া মন্ত্রগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে পারেন। তবে মুদ্রাসহ স্থান স্পর্শই ভাল বিধান।

ললাটে অং নমঃ। মুখবৃত্তের চারিদিকে আং নমঃ। দঃ নেত্রে ইং নমঃ। বাম নেত্রে ঈং নমঃ। দঃ কর্ণে উং নমঃ। বাম কর্ণে ঊং নমঃ। দঃ নাসায় ঋং নমঃ। বাম নাসায় ৠং নমঃ। দঃ গণ্ডে ৯ং নমঃ। বাম গণ্ডে ৯ং নমঃ। ওষ্ঠে এং নমঃ। অধরে ঐং নমঃ। ঊর্ধ্বদন্ত পংক্তিতে ওং নমঃ। অধো দন্ত পংক্তিতে ঔং নমঃ। মস্তকে অং নমঃ। মুখবিবরে অঃ নমঃ॥

দঃ বাহুমূলে কং নমঃ। কর্পূরে খং নমঃ। মণিবন্ধে গং নমঃ। অঙ্গুলীমুখে ঘং নমঃ। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ঙং নমঃ॥

বাম বাহুমূলে চং নমঃ। কর্পূরে ছং নমঃ। মণিবন্ধে জং নমঃ। অঙ্গুলীমূলে ঝং নমঃ। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ঞং নমঃ॥

দঃ উরুমূলে টং নমঃ। জানুতে ঠং নমঃ। গুল্‌ফে ডং নমঃ। অঙ্গুলীমূলে ঢং নমঃ। অঙ্গুলী অগ্রে ণং নমঃ॥

বাম উরুমূলে তং নমঃ। জানুতে থং নমঃ। গুল্‌ফে দং নমঃ। অঙ্গুলীমূলে ধং নমঃ। অঙ্গুলী অগ্রে নং নমঃ॥

দঃ পার্শ্বে পং নমঃ। বাম পার্শ্বে ফং নমঃ। পৃষ্ঠে বং নমঃ। নাভিতে ভং নমঃ। উদরে মং নমঃ॥

হৃদয়ে যং নমঃ। দঃ স্কন্ধে রং নমঃ॥

কাকুদি (ঘাড়ে) লং নমঃ। বাম স্কন্ধে বং নমঃ॥

হৃদয়াদি দঃ করে শং নমঃ। হৃদয়াদি বাম করে ষং নমঃ॥

হৃদয়াদি দঃ পদে সং নমঃ। হৃদয়াদি বাম পদে হং নমঃ॥

হৃদয়াদি জঠরে লং নমঃ। হৃদয়াদি মুখে ক্ষং নমঃ॥

ভূতশুদ্ধির পর মহত্তত্ত্ব বা মস্তিষ্কস্থিত জ্ঞানকেন্দ্র হইতে সুধাধারা যে সাধকের সমস্ত অন্তর প্রদেশ ও বাহ্য শরীরে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত শরীর মন ও প্রাণকে অমৃতময় করিতেছে সাধক এক মিনিটকাল উহা ভাবুন। এবং সরস্বতী মায়ের অমৃতময় আশীর্বাদ অনুভব করুন।

দিব্যাচার তন্ত্রসাধনায় বাহ্য পঞ্চমকারের প্রয়োগ নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম পঞ্চমকারের সাধনা দিব্যাচার বিধানেও আছে। এবার সে সব বুঝুন। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এই সব নদীতে শ্বাসপ্রশ্বাস নামক মৎস্য বিচরণ করে। সাধক এই মৎস্যদ্বয়কে ভক্ষণ করিবেন। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসকে আয়ত্তে আনিয়া কুণ্ডলিনী জাগরণের জন্য কুম্ভক (বা মৎস্য ভক্ষণ) করিবেন। ইহাই মৎস্যাহার বা মহাশক্তির পূজায় মৎস্য নিবেদন।

সাধকের জিহ্বাই মাংসখণ্ড। ইহাকে ভক্ষণ করিয়া কেহ কেহ খিচুড়ী মুদ্রার অভ্যাস করেন। আমাদের মতে বাক্য সংযমই জিহ্বা ভক্ষণ। মন যখন শূন্যগত হয় তখন ঠিক ঠিক বাক্য সংযম হয়। মুখে কথা বলিলাম না কিন্তু মনে মনে আকাশপাতাল সৃষ্টি করিলাম, ইহা কোন বাক্য সংযম নহে। শূন্যবোধই বাক্য সংযম এবং ইহাই খেচরী মুদ্রা। খে মানে আকাশ, মনের আকাশে বিচরণই খেচর ক্রিয়া।

মুদ্রা। মানে নানাপ্রকার ভাজা খাদ্য। সাধনার পথে সাধককে নানাপ্রকার কল্পনা এবং ধারণা করিতে হয়। শরীর খণ্ডের মধ্যে ষট্‌চক্র, গুরু পাদুকা, ন্যাস আদি ক্রিয়াগুলি

সবই ধারণা ও কতকটা কল্পনাময়। সাধক সাধনার পথে নানাস্থানে ও নানাকেন্দ্রে নানাপ্রকার ধারণা করিবেন। এই ধারণার মধ্যে সুখ ও শান্তিরস পাইতে হইবে। ধারণার মধ্যে যথাযথ সুখরস গ্রহণ করাই মুদ্রা ভক্ষণ। কোন ধারণা হইতে সুখ ও শান্তিরস আহরণ করিবার পরে এ সব ধারণাগুলি আপনিই বিলয় হয়। এইভাবে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া যাইবার মত, ধারণার বিষয়বস্তুগুলি সাধককে প্রচুর রসদান করিয়া সাধকের স্বভাবের মধ্যে আপনিই বিলয় হয় বা হজম হইয়া যায়। ইহাই মুদ্রা ভক্ষণ।

মদিরা (মদ্য)। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত সোমকেন্দ্র হইতে সদাই সোমরস প্রবাহিত হইতেছে। সাধক যত নিশ্চিন্ত মনে সোমরস অনুভব করিতে পারিবেন সাধক ততই জ্ঞানী এবং সুখময় ও আনন্দময় থাকিবেন। ইহাই মদ্যপান।

মৈথুন। পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সুখই মৈথুন। সাধকের শরীরকে আশ্রয় করিয়া পুরুষতত্ত্ব এবং প্রকৃতিতত্ত্ব বিদ্যমান। অব্যক্ত পীঠের একপ্রান্তে প্রকৃতিতত্ত্ব এবং অন্যপ্রান্তে পুরুষতত্ত্ব বিদ্যমান। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় সবই পুরুষপ্রকৃতির মিলন লীলার আনন্দ বিহার। সাধকের ‘‘অহং’’ গ্রন্থি ভেদ হইলে এই চরাচর বিশ্বে পুরুষ প্রকৃতির অবাধ লীলাই থাকিয়া যায়। ইহারই অনুভবের নাম মৈথুন। সাধকের ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র হইয়াছে। রুদ্রগ্রন্থিই অহংগ্রন্থি। নরনারীর মিলনের মধ্যেও এই মৈথুন রসের ছায়া বিদ্যমান আছে। এইজন্যই জীবমাত্রেরই মৈথুনে এত আকর্ষণ। সিদ্ধ স্তরের যোগীশ্বর মহাপুরুষগণের প্রারব্ধবশে কর্মক্ষয়ের জন্য সাময়িক ভাবে ঐরূপ মৈথুন গ্রহণের প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা সাধক দশার সাধনার কোন সাহায্য হয় বা সাধনার জন্য উহার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দিব্যাচারের পথেই সাধক জ্ঞানসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন, এইজন্য আমরা দিব্যাচারের কথাই বলিলাম। নিত্য জ্ঞানের ধারায় সাধক অভিষিক্ত হইবেন, নিজের স্বভাব অত্যন্ত নির্মল ও অত্যন্ত তেজঃপূর্ণ হইবে। ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থির দুর্বলতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে হইবে। জ্ঞান মানুষকে যে কত সুখে ও আনন্দে রাখে এবং জ্ঞান মানুষকে যে কত শক্তিমান করিতে সক্ষম একনিষ্ঠ সাধক যথাসময় উহা বুঝিতে পারিবেন। দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ - সাধককে প্রভাব করিতে পারে না।

পূজা বিধিতে আরও অনেক ন্যাসের কথা আছে। সে সব ক্রিয়াগুলি শক্তিপূজা অনুষ্ঠানকালে বিশদভাবেই করিতে পারিবেন। এবার কালীর ধ্যান বলা যাইতেছে।

দক্ষিণা কালীর ধ্যান

ওঁ করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং॥ ইত্যাদি ধ্যান ও মানস পূজার পর নিজের বুকে লেলিহা মুদ্রায় আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা মানে নিজের প্রাণই মহাশক্তি কালীর প্রাণ ইহা বুঝা। অহং গ্রন্থি না থাকাই ‘‘অনাদি পুরুষ প্রকৃতির ক্ষেত্র’’ হওয়া জানিতে হইবে। সাধনার কোন মন্ত্রের কি লক্ষ্য এবং কোন ক্রিয়ার লক্ষ্যে

কিরূপ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান, সেটা নিজের স্বভাবে ও জীবনে প্রতিফলিত করিতে হয়।

আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা। ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদ্ দক্ষিণা কালিকায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমদ্ দক্ষিণা কালিকায়াঃ জীব ইহস্থিত॥ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হোঁ হং সঃ শ্রীমদ্ দক্ষিণা কালিকায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি, ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হং সঃ শ্রীমদ্ দক্ষিণা কালিকায়াঃ বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃ স্তোত্র ঘ্রাণপ্রাণাঃ ইহা গত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥

সাধকের রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইয়া গেলে, সাধককে কেন্দ্র করিয়া পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির তত্ত্ব প্রতিফলিত হইবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার ইহাই লক্ষ্য। সাধক আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা ঈশ্বর হইয়া যেন নকল ঈশ্বর বনিয়া যাইবেন না। আসল কথা, ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার ইহা একটা সাধনা মাত্র। সাধককে নানাপ্রকার সাধনার মধ্য দিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থির প্রান্তদেশে আসিতে হইবে।

মানসপূজা সম্বন্ধে কুণ্ডলিনী-পূজা অংশে বলা হইয়াছে, এখানে পুনঃ বলা যাইতেছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধা, আজ্ঞা প্রভৃতি মর্মকেন্দ্রগুলি যে এখন আর সাধকের নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং উহা যে মহাশক্তির মহান ভাণ্ডারের অংশে পরিণত হইয়া গিয়াছে, ইহা বুঝিবার অনুষ্ঠানের নামই মানসপূজা। এখানে অনেক সব অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল। সাধক কোন অনুষ্ঠানের প্রকল্পনার জাল মনে সাজাইবেন না। কেবল করিয়া যাইবেন এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার শেষেই মনকে ফাঁকা করিয়া নিশ্চিন্ত ও কল্পনাশূন্য হইবেন। ক্রিয়াগুলি সবই ব্রহ্মবিদ্যামূলক জ্ঞানের সাধনা। এক একটি অনুষ্ঠান করিবেন এবং একটু অপেক্ষা করিয়া মন হইতে উহার কল্পনা ছাড়িয়া দিবেন।

মূলাধারে, ওঁ লং পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে, ওঁ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ। মণিপুরে, ওঁ রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং; অনাহতে ওঁ যং বায়্বাত্মকং ধূপং; বিশুদ্ধায় ওঁ হং আকাশাত্মকং পুষ্পং; সমস্ত ব্রহ্মনাড়ীতে ওঁ ঐং সর্বাত্মকং তাম্বুলং ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥

কালীধ্যান সম্বন্ধে পরে বলিব। ধ্যানের পরে গুরুস্থান বা মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ড, মন্ত্রস্থান বা বিশুদ্ধাখ্য কেন্দ্র এবং দেবতার স্থান অনাহত; কেন্দ্র তিনটি একটি স্নিগ্ধ জ্যোতিরেখা দ্বারা এক হইয়াছে দেখিয়া নিবিষ্ট মনে জপ করিবেন। অমৃত প্রবাহে স্নাত স্নিগ্ধ এবং ব্যাপক হালকা শ্বেতবৎ রং বিশিষ্ট আকাশের মধ্যে ঐ স্নিগ্ধ জ্যোতি রেখাটি রহিয়াছে ইহা দেখিবেন এবং নিজের ধীর শ্বাস-প্রশ্বাসটি ঐ রেখাকে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে ও নামিতেছে, ইহা ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিবেন। জপে যত বেশী আরাম পাইবেন, মন ততই নিবিষ্ট হইতে থাকিবে। মনকে নিবিষ্ট করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে মাঝে মাঝে কায়াকাশ ধ্যানের সহায়তা লইতে পারেন। সাধনার আরম্ভে যাহা "কায়াকাশ", সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় উহাই অমৃত ধারায় প্লাবিত স্নিগ্ধ ব্যাপক আকাশ জানিবেন। এ সব লইয়া বেশী বলার কোনই প্রয়োজন দেখি না। স্নিগ্ধজ্যোতি রেখাটি শিবপিণ্ডসংযুক্ত বিষ্ণু, শিব, মহৎ বা অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে বা

হংসপীঠ হইতেও নামিয়া আসিতে পারে। নিবিষ্টতার গভীরতায় ইহা সাময়িক বিলুপ্তও হইতে পারে। সবই ভাল এবং উন্নতির লক্ষণ জানিবেন। নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ শেষ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। যথা - ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য ইত্যাদি...।

জপের পর, সময় থাকিলে স্তব কবচ আদি পাঠ করিতে হয়। কেহ কেহ পূজার শেষে স্তব কবচ আদি পাঠ করেন এবং সর্বশেষ শক্তিবাদীয় উপাসনা পাঠ করিয়া আসন ত্যাগ করেন। বেদ ও তন্ত্রনির্দিষ্ট এবং শিব বা বিষ্ণু কথিত বা যুগান্তরকারী শক্তিমান মহাতপস্বী নির্দিষ্ট স্তোত্রম্ অধিক শক্তিশালী। তপঃপ্রভাহীন পণ্ডিতের স্তোত্রে শক্তি কমই থাকে। বেদের গায়ত্রী, তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রম্, বেদ ও উপনিষদের মহামন্ত্রম্, বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র নির্দিষ্ট ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যানসহ শক্তিবাদ প্রবর্তিত উপাসনা স্তোত্র অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ও শক্তিসম্পন্ন স্তোত্র জানিবেন। বেদ তন্ত্র ও যোগবিদ্যার লক্ষ্য যে একই ব্রহ্মবিদ্যা অখণ্ড ব্রহ্মশক্তি এবং সমস্ত শাস্ত্রের লক্ষ্যই যে এক, শক্তিবাদীয় স্তোত্রে উহাই প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অত্যন্ত উচ্চ দার্শনিক স্তরের চারিটি স্তোত্র আছে। উহাদের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের ব্রহ্মা কর্তৃক মহাকালীর স্তোত্রটি সবচেয়ে গম্ভীর এবং শক্তিশালী। আচার্য শঙ্করকৃত বৃহৎ মাতৃস্তোত্রের সামান্য অংশ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। যাঁহারা পূর্ণভাবে উহা পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারা স্তোত্রগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি যুগান্তরকারী মহাপুরুষগণ যে শক্তিসাধক ছিলেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তাঁহার প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ শক্তিসাধনারই ফল। উহা কোন পণ্ডিত কল্পিত তত্ত্ব নহে।

যাঁহারা শ্মশানে জপাদি করিতে চাহেন, তাঁহারা মধ্যরাত্রিকালে চিতাস্থানে জপাদি করিতে পারেন। শব সাধনা করিতে হইলে শবদেহ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং অসংস্কৃত চিতাস্থানে আসন করিতে হইবে। যাঁহারা মহাবলবান, মহাবুদ্ধি, মহাসাহসী, পবিত্র, সরলমনা, দাতা, সর্বপ্রাণীর হিতসাধনে অনুরক্ত, তাঁহারাই বীর সাধনের উপযুক্ত।

> "মহাবলো মহাবুদ্ধির্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
> মহাস্বচ্ছা দয়াবাংশ্চ সর্বভূতহিতে রতঃ॥" তন্ত্রসার, বীরসাধনম্॥

এ সব লক্ষণ যে দিব্যাচারী শক্তিবাদ ধর্মের মূল কথা, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা দুর্বল চিত্ত এবং শ্মশানেমশানে ঘোরাফেরা করেন না তাঁহারা হঠাৎ এ কার্য করিবেন না। শ্মশান সাধনাকালে প্রথমটায় বন্ধুভাবাপন্ন সৎলোক সঙ্গে রাখিতে পারেন। ইহাতে দোষের হইবে না। আসনশুদ্ধি, ভূতাপসরণ, দিক বন্ধন, চিতাস্থানকে নমস্কার, শ্মশানাধীপ কালভৈরবকে স্মরণ করিয়া আসনে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পূর্বোক্ত বিধানে নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করিবেন। শ্মশান সাধনাকালে অলৌকিক কিছু দর্শন করা এবং উহাতে ভীত না হওয়া এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ না করিয়া আসন ত্যাগ না করাই বোধ হয় শ্মশান সিদ্ধি। আমি শ্মশানে একাই রহিয়াছি, ধ্যান জপাদিও অনেক করিয়াছি, কিন্তু অলৌকিক কিছুই কখনও দেখি নাই। শবদগ্ধ-গন্ধ আমার ভাল লাগিত না। এজন্য আমি অধিক দিন শ্মশানে অবস্থান করি নাই। শ্মশান জপের সঙ্গে অন্য স্থানের জপের কোন বিশেষ ভেদ আছে বলিয়া আমার মনেই হইত না। অন্য যে কোন স্থানের জপের মতই শ্মশান জপ আমার ভালই লাগিত। অনেকদিন সন্ধ্যা পূজা জপ যজ্ঞ স্তোত্র কবচ আদির

অনুশীলন করিবার পর, যথাবিধি পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করিয়া তারা মন্ত্রের দীক্ষা লইবার চেষ্টা করিবেন। আমার মনে হয়, যাঁহারা গৃহস্থজীবনের বাহিরে আসিতে চাহেন না, তাঁহাদের জন্য কালী মন্ত্রের সাধনাই যথেষ্ট। এ সম্বন্ধে গুরুদেবের সঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "শিব একটা ধারা সাজাইয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল প্রাথমিক সাধককে উৎসাহিত করিয়া বহুদিন সাধনার পথ ধরিয়া রাখিবার জন্য। বাস্তবিক সাধনা ত্যাগী ও তপস্বীরাই করিতে পারে। এই ভাবে সাধনার পথে বহুদিন অবস্থানের পর যদি কাহারও সত্য সত্যই ত্যাগ ও তপস্যার জীবন দেখা দেয়, সে ধন্য হইবে।"

শ্মশান সাধনা সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ। যথাশক্তি উপচারাদি সংগ্রহ॥ অসংস্কৃত চিতা নির্বাচন। ওঁ মদ্যে ইত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুকঃ, অমুক মন্ত্র সিদ্ধিকাম শ্মশান সাধনমহং করিষ্যে॥ অস্ত্রান্ত মূল মন্ত্রেণ প্রোক্ষণং যোগভূমিম্। মূল মন্ত্রেণ ফট্কারা স্ত্রেনেত্যর্থঃ॥ গুরুপাদুকাং ধ্যাত্বা গণেশাদিং বটুকং তথা॥ যোগিনীং মাতৃকাঞ্চৈব বাম পাদপুরঃ সরম্॥ অস্ত্র মন্ত্রেণাত্মনং সংরক্ষ্যা পুষ্পাঞ্জলী এয়ং চিতায়াং ক্ষিপেৎ। যথা - ওঁ যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ॥ পিশাচাঃ সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্বাক্ষরসাং গণাঃ॥ যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্বাশ্চ খেচরা স্ত্রিয়ঃ। সিদ্ধিদাস্তা ভবন্ত্যত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥ আর সব অনুষ্ঠান ও কালীপূজা ও শ্মশানধীপ কালভৈরবের পূজা ও বলিদান, কালীপূজা বিধিমতে করিবে এবং পরে জপ করিবে। শ্মশান সাধনা সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রকথাও জানা প্রয়োজন। যথা - অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েদ্বীর সাধনম্॥ তৎসার্ধপ্রহরে যামে গতে চ সুরসুন্দরী। শবং বাপি চিতাং বাপি নীত্বা গত্বা যথা সুখম্। সাধয়েৎ স্বহিতং মন্ত্রী মন্ত্রধ্যান পরায়ণঃ॥ চিতায় পুষ্পাঞ্জলী দানকার্য্য ভূতপূজার সঙ্গে করিলেই সুবিধা হইবে। পুরশ্চরণ, শ্মশানেই করুন বা অন্যত্র করুন, ব্রহ্মচর্য এবং হবিষ্যাশী হইয়াই পুরশ্চরণ করিতে হইবে। এবং "কৃত্বা হবিষ্যাশী জপেল্লক্ষমনন্যধী॥"

আমার জীবনে শিবমূর্তি সম্বন্ধে যেমন অনেক অবান্তর কথা ও বিরুদ্ধ প্রচার শুনিয়াছি, কালীমূর্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক অবান্তর ও মূর্খতাপূর্ণ সমালোচনা শুনিয়াছি। কালীধ্যানের শক্তিবাদ ভাষ্য মূর্খগণের অপপ্রচারের পথ রুদ্ধ করিবে এবং শক্তিসাধকগণেরও মনে বল সঞ্চার করিবে। শাক্তদীক্ষা ও শক্তিসাধনা এবং শক্তিবাদীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবাদের প্রচার ও প্রসার ঘরে ঘরে বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। ইহা না করিলে হিন্দুজাতি নিজের সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবিদ্যার ভিত্তি রক্ষা করিতে পারিবে না এবং ইহারা মৃতজাতিতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর অকল্যাণের কারণ হইবে। আমরা কালী ধ্যানের প্রত্যেকটি শব্দের ভাষ্য লিখিতেছি। যাহার ফলে, সাধকগণের সাধনার সুবিধা হইবে। কালী বঙ্গদেশীয় শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্র। আমরা বাঙালীকে পৃথিবীর সর্বত্র কালী বা শক্তি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে বলি এবং কালী ধ্যান রহস্যের প্রবল প্রচার করিতে বলি। বাঙালীরা পৃথিবীর সর্বত্র দুর্গাপূজার উৎসব করিতেছে। আমরা বাঙালীকে ঐ সঙ্গে শক্তিমন্দির এবং শক্তিসাধনারও প্রসার করিতে বলি। বাংলার ঘরে ঘরে কালীপূজা ও দুর্গাপূজার উৎসব, ইহা বাঙালীর গৌরব ও ভারতের গৌরব। পৃথিবীর সর্বত্র বাঙালীরা যত পার শক্তিমন্দির কর। সান্ধ্য-উপাসনার কেন্দ্র স্থাপন কর। নিত্য

সায়ংকালে সেখানে শক্তিবাদীয় উপাসনায় যে কয়জন পার সমবেত হও। শিবমূর্তি সম্বন্ধে আমি নানাভাবে আলোচনা করিয়াছি, কালীধ্যান সম্বন্ধে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি সম্বন্ধেও অনেক বলিয়াছি এবং লিখিয়াছি।

বেদ বলেন, ‘‘নেদং যদিদং উপাসতে’’ অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাসনার মত তত্ত্ব নহে। যেখানে দুইটি বস্তু থাকে না অর্থাৎ উপাস্য এবং উপাসক নাই, যেখানে একই ব্রহ্ম তত্ত্ব রহিয়াছেন, সেখানে উপাসনার কোন কথাই আসিতে পারে না। এইজন্য শক্তি উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। অব্যক্ত শক্তিই শক্তি উপাসনার চরম উপাসনা এবং এই মহাশক্তির উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। আমরা ভালভাবেই দেখাইয়া দিব, কালীর উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা এবং কালীর মূর্তিই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার সংকেত মূর্তি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহাশক্তির তিন রূপের কথা আছে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। বঙ্গদেশে শক্তির এই তিন রূপের পূজা ও উপাসনা জাতীয় উপাসনা; ফলতঃ ইহা সমস্ত ভারতেরই উপাসনা। কালীমূর্তি বুঝিলে এই তিন প্রকার উপাসনারই মর্ম বুঝা যায়। দুর্গাপূজা মন্ত্রে দেখা যায় ‘‘ওঁ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ’’॥ এখানে দেখুন, দুর্গাকে মহাঘোরা (মহা অন্ধকাররূপা) ভদ্রকালী বলা হইয়াছে। দুর্গাই মহিষাসুরমর্দিনী মহালক্ষ্মী। আবার সরস্বতী পূজা মন্ত্রে দেখুন : ‘‘ওঁ সরস্বতৈঃ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।’’ এখানেও দেখিতেছেন ‘‘সরস্বতীকে’’ ‘‘ভদ্রকালী’’ করা হইয়াছে। ব্রহ্মবাদ প্রবর্তক আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গিরী মঠে আজও ভদ্রকালী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। কাশীর শঙ্কর পন্থী ‘‘পাদুকা মঠে’’ও ভদ্রকালীর পূজা উপাসনা আজও প্রবর্তিত আছে। এই মঠটি কাশীর বাঙালীটোলা, গণেশ মহল্লায় অবস্থিত। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কালীর উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। কালীই ব্রহ্মবাদী শঙ্করের উপাস্যা মহাদেবী ভবানী। কেহ কেহ বলেন, আচার্য শঙ্কর শিবের উপাসক ছিলেন। আমরা বলি, মহাকাল শিবের উপাসনা ও মহাকালী মহাশক্তির উপাসনা অনুপূরক ও পরিপূরক সম্বন্ধ জড়িত। ইহার একটি বাদ দিয়া অন্য উপাসনা অসম্ভব। বাংলার কালীপূজা ও তিব্বতের মহাকালের উপাসনাও এই ভাবেই একক সম্বন্ধযুক্ত।

ব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রকেই আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের ভিত্তি মানিয়া ভাষ্য রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হইতেছে ‘‘ওঁ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।’’ অর্থাৎ ‘‘এখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে’’। দ্বিতীয় সূত্রে ইহার উত্তর ‘‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’’ ‘‘জন্মাদি যাহা হইতে হইয়া থাকে, তিনি ব্রহ্ম।’’ অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি যাহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম। কালীমূর্তিতে পা হইতে নাভি পর্যন্ত সৃষ্টি তত্ত্ব দেখানো হইয়াছে। কোমর হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত পালন ও অসুর নাশন নীতি স্পষ্ট করা হইয়াছে, কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্যন্ত ‘লয়ের নীতি’ দেখানো হইয়াছে। ‘‘জন্মাদি’’ বলিতে শুধু সৃষ্টি স্থিতি লয়ই বুঝায় না। সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রিয়ার সাম্যাবস্থাও বুঝায়। এই সাম্যাবস্থাই তুরীয়া ব্রহ্ম এবং ইহাই ঘোররূপা মহাকাল। এই কালো রঙই কালীর কালা রঙ।

প্রশ্ন। যদি ব্রহ্মতত্ত্বের স্তরগুলিই কালী মূর্তির মর্মকথা, তবে অনেক সাধক মায়ের মূর্তি দেখেন, ইহা কি? ইহার উত্তর আমরা আমাদের শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীর বহু স্থানেই দিয়াছি। মৃত্যুকালে যে সব সাধক বা সাধিকা কালীমূর্তি ধ্যানসহ দেহত্যাগ করেন,

তাঁহারা অনেক বৎসর পর্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরে মায়ের সৃষ্টি লয় বা তুরীয় স্তরে অবস্থান করেন এবং সাধকের দেয় ভক্তি নৈবেদ্য ও বলিদ্বারা তৃপ্ত হন এবং সাধককে আশীর্বাদ করেন ও প্রয়োজন বোধে মায়ের মূর্তি ধারণ করিয়া দর্শনও দেন। এইরূপ দর্শনাদির কথা যদি সত্য হয়, তবে সেটাও মঙ্গলসূচক জানিতে হইবে। শক্তি উপাসনা অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। এজন্য মাতৃশক্তির উপাসক সূক্ষ্ম আত্মাদের সংখ্যাও অনন্ত। ইহারা অসুরনাশন ও তপঃ কার্যে সাধকের চিরসহায়ক। পূজা বিধিতে, বিশেষ করিয়া ইহাদের তৃপ্তির জন্যই বলি ও নৈবেদ্য আদি দিবার বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। জানিয়া রাখিও মা কালী চিরজাগ্রতা মহাশক্তি। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং নানারূপ রূপধারিণী মঙ্গলময়ী মহাশক্তি। তিনি অসুর রক্তে পৃথিবী প্লাবনকারিণী আদ্যা বীর; এবং সাধক ভিন্ন মাকে কে জানিতে সক্ষম?

ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় সূত্র, ‘‘শাস্ত্র যোনিত্ত্বাৎ’’। অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের যাহা জননী, উহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত শাস্ত্র সমুদ্ভূত হইয়াছে। লৌকিক জ্ঞান, অলৌকিক জ্ঞান, ক্ষণস্থায়ী দুর্বলবাদ, ক্ষণস্থায়ী অসুরবাদ, শক্তিবাদ, বৌদ্ধবাদ সমস্ত শাস্ত্রই আত্মার বিভিন্ন স্তর হইতে নির্গত হইয়াছে। এজন্যই মা আমার মুণ্ডমালা অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতীক মস্তক মালা পরিহিতা।

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মতত্ত্বের নাম দিয়াছেন ‘‘নেতি’’। নেতি মানে - ন ইতি। অর্থাৎ তুমি যাহা কিছু দেখ, যাহা কিছু বোধ কর, যাহা কিছু দর্শন কর, সেটা ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। অর্থাৎ তুমি আরও সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি জগতে প্রবেশ কর; কিন্তু উহাও ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে শক্তিস্তরে আসিবে এবং একদিন সময় আসিবে, যখন তুমি জানিতে পারিবে গতিসম্পন্না বা দৃশ্য শক্তিকণাই দ্রষ্টার স্বরূপ এবং তিনিই ক্রিয়াহীন স্পন্দনহীন ব্রহ্মতত্ত্ব (দ্রঃ ক্রমবিকাশ)।

কালীর গায়ত্রীমন্ত্রে ‘‘শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি’’ অর্থাৎ ‘‘তিনি শ্মশানবাসিনী, তাঁহাকে ধ্যান করি।’’ এই বিশ্ব তুমি দর্শন করিতেছ। শূন্যবোধ ফুটিলে ইহা শ্মশান হইয়া যাইবে অর্থাৎ তোমার দর্শনে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে না। ইহার পর তুমি তৈজস্ বা মানস জগতে প্রবেশ করিবে; উহাও বিলীন হইবে। ইহার পর বোধ জগতের আবির্ভাব হইলে, তোমার দার্শনিক জগতে তৈজস্ ব্রহ্ম ফুটিবে না। বোধজগৎও উন্নত দার্শনিক স্তরের বিকাশে বিলুপ্ত হইবে এবং শক্তির ক্রিয়া মাত্র থাকিবে। এই অনাদি শক্তিরূপা ক্রিয়াও একস্তরে থাকিবে না এবং ইহাও তুমি ভাল ভাবেই জানিতে পারিবে। অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শক্তিই নির্গুণদ্রষ্টা ব্রহ্মা এবং তিনিই শক্তিহীন অনাদি চেতনা। শক্তিতত্ত্ব জানিবার ইহাই সাধনা, ইহারই নাম শ্মশান সাধনা এবং ইহাই ‘‘শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি’’ এবং ইহাই আচার্য শঙ্করের ভাষায় ‘‘নেতি’’। এবার আপনারা ভাবিয়া দেখুন, আচার্য শঙ্করের ‘‘নেতি’’ বাক্য কালী সাধনার ‘‘শ্মশানবাসিনী’’র ধ্যান কিনা। ‘‘নেতি’’ কোন দীক্ষা বা সাধনার মন্ত্র নহে, কিন্তু ‘‘শ্মশানবাসিনী’’ জপমন্ত্রের এক অংশ। আচার্য শঙ্কর ‘‘শ্মশানবাসিনী’’ মন্ত্রের অনুভূতিকে ‘নেতি’ বলিয়াছেন।

হে আমার পরমগুরু আচার্য শঙ্কর! একদিন তোমার শক্তিবাদীয় ব্রহ্মবাদের প্রভাবে দুর্বল এবং বেদবাদের শত্রু বৌদ্ধবাদকে ভারত হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। আজ

দেখ, সেই ভারতে বেদবাদের প্রধান শত্রু যবনবাদীরা এবং উহাদের পদে তৈলমর্দনকারী দুর্বলবাদী ভণ্ড ও মূর্খরা ভারতের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া ভারতের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। ভারতকে ভাগ করিয়া এবং বিভক্ত ভারতে যবন পুষিয়া ভারতের সর্বনাশ করিয়াছে; এস গুরুদেব! এস, শক্তিবাদ আবার তোমার স্মরণ করে। অখণ্ড ভারত তোমাকে চায়। এস নাথ। অসি এবং মসি হস্তে বেদবাদীয় সভ্যতায় ভারতকে আবার প্লাবিত কর। যবনবাদ ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করুক, অখণ্ড ভারতে বেদবাদ আবার উচ্চ শিরে এবং গর্বিত শিরে প্রতিষ্ঠিত হউক।

কালী ধ্যানের শক্তিবাদ ভাষ্য

শক্তিবাদীয় কালীপূজার সমবেত ধ্যানের পূর্বে শক্তিবাদ ভাষ্য শ্রবণ করিবেন এবং পরে ধ্যান করিবেন।

করাল বদনাং - করাল কাল বা মহাকাল। কালের মুখে সমস্তই বিলয়প্রাপ্ত হয়। আজ যাহা দেখিতেছ কাল উহা থাকিবে না। মানব সৃষ্টির আরম্ভ হইতে তুমি বা তোমার পিতা পর্যন্ত বিচার কর। দেখিবে কেহই নাই, সবই মহামায়ার করাল বদনে প্রবেশ করিয়া কোথায় যেন অস্তিত্বহীন হইয়া গিয়াছে। অদ্যকার পৃথিবী, জীব এবং চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রও কোন না কোন দিন মায়ের করাল বদনে প্রবেশ করিবে। কোন একটা লেনদেন বিষয়ে আমরা ‘‘করাল’’ করি, অমুক দিন দিব বা নিব। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট দিনের নড়চড় হইবে না। তিনি নিশ্চয়ই গ্রাস করিবেন, এজন্য মহাকাল বা মহাকালী করাল বদনা। এখানে সমস্ত শব্দই ব্যাকরণ মতে দ্বিতীয়ান্ত শব্দ আছে। অর্থাৎ করাল বদনা বা সর্বগ্রাসী কাল বা কালীকে ধ্যান করি।

ঘোরাং - অন্ধকার বর্ণা, ইহারও তাৎপর্য আছে। যখন অন্ধকার অত্যন্ত ঘন হয় তখন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোর অন্ধকারেও বস্তু অস্তিত্বহীন হয় না। বস্তুরা থাকিয়া যায়; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ব যখন কাল সত্তায় প্রবেশ করে তখন বিশ্বের সূক্ষ্মসত্তা থাকে, অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়। বিশ্ব তাহার স্থূলসত্তা হারায় এবং অতিসূক্ষ্মরূপে তাহার মূল উপাদান থাকিয়া যায়। রাত্রির ঘোর অন্ধকারে ঘন বর্ষা ও বাদলে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, কিন্তু বিড়াল দেখিতে পায়। অব্যক্ত আধারে প্রবেশ করিলে বিড়ালও দেখিতে পাইবে না, কারণ বস্তু রূপান্তরিত হইয়া শক্তিরূপে পরিণত হইবে। মহাকাল সাধক উহা অনুভব করিতে পারেন। কাল সত্তা অনাদি এবং অনন্ত। নিত্য এই সত্তায় বিশ্ব ও জীবগণ প্রবেশ করিতেছে, নিত্য কাল সত্তা হইতে সৃষ্টি হইতেছে। ধ্যানে সব কথারই আলোচনা আছে।

মুক্তকেশীং - কৃষ্ণ কেশদাম আর বন্ধনে নাই, ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ অব্যক্ত আকারে যেসব বস্তুসত্তার মূল উপাদান রহিয়াছে, উহাও মায়ের কেশদামে ঢাকিয়া গিয়াছে। মস্তকই মানবের বোধশক্তির কেন্দ্র। এই বোধকেন্দ্র হইতে কৃষ্ণবর্ণের বোধপ্রবাহ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয় বিশ্বস্থিত সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান ভূত সব সত্তাই ঢাকিয়া দিয়াছেন। এ যেন ঘোর অন্ধকার রজনীতে ঘন বাদলের আবির্ভাব। মা তো এমনই অন্ধকাররূপা, তাহার উপর আবার কৃষ্ণ কেশদামের বিস্তার।

চতুর্ভুজাং - চারিটি হস্ত। হস্ত মানে কর্মশক্তি। অব্যক্তে সব ডুবিয়া গিয়াছে। ঘোর রজনীর অন্ধকারে সব বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখানেও কর্মশক্তি? হ্যাঁ, এখানেও কর্মশক্তি। এ যেন রাত্রি বারোটার সময় ঘোর অন্ধকারকে ভেদ করিয়া "কালিকা মেল" চলিয়াছে। সৃষ্টি স্থিতি লয়ে তুরীয়া স্তরেও মা কর্মহীনা নহেন। তুরীয়া স্তরে মা আরও বেশী কর্মবেগ সম্পন্না। জানিয়া রাখিও শক্তিসাধকমাত্রই অসাধারণ কর্মকুশল এবং অনলস। অনেকের চরিত্রে অসাধারণ কর্মকুশলতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাঁহাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের শক্তিসাধনারই কর্মফল। শ্রীকৃষ্ণ, রাম, রাবণ, অর্জুন প্রভৃতি গৃহী শক্তিসাধকদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিশ্বামিত্র, ভৃগু, পরাশর, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, শঙ্কর প্রভৃতি ত্যাগী শক্তিসাধকদের চরিত্রও কম কর্মশক্তিসম্পন্ন নহে। ইঁহারা কেহই কম তেজস্বীও নহেন। আচার্য শঙ্কর যেভাবে অতি সামান্য দিনে আসমুদ্র হিমাচল বেদবাদ ধ্বংসকারী বৌদ্ধবাদকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই কর্মশক্তির কথা ভাবিতেও বিস্ময় হয়।

কালিকাং - কালিকা মানে কালকে কলনকারী মহাশক্তি। কালের ক্রিয়া সেখানে থাকে না, উহারই নাম নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব। কিন্তু কালের ক্রিয়াকে কলন কে করে? নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব কালের ক্রিয়াকে কলন করেন না। তুরীয়া শক্তির মধ্যেই এমন অন্তর্নিহিত ক্রিয়া বিদ্যমান, যাহা তুরীয়া কালের ক্রিয়াকেও কলন করিয়া লন এবং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যদি তুরীয়া শক্তির ক্রিয়াকে স্তব্ধ করেন, তবে তিনি নির্গুণ তত্ত্বে থাকেন না। এজন্য সৃষ্টি স্থিতি লয় কালের ক্রিয়াকে কলনকারী তুরীয়া মহাশক্তি তুরীয়া কালের ক্রিয়াকেও স্তব্ধ করেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রকাশ করেন। তুরীয়া কাল সত্তায় এই শক্তি আছে বলিয়াই কালী কালিকা নামে পরিচিতা।

দক্ষিণাং দিব্যাং - দক্ষিণ মানে অনুকূল, অর্থাৎ সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি প্রকাশকারিণী দিব্যসত্তা। অর্থাৎ ইনিই কালিকা বা নির্গুণ ব্রহ্মসত্তা প্রকাশকারিণী, আবার ইনিই সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারিণী মহাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি বা আদ্যাশক্তি। অর্থাৎ মা-ই বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া "দক্ষিণাং দিব্যাং", আবার মা-ই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশকারিণী "কালিকা"।

মুণ্ডমালা বিভূষিতাং - মহাশক্তি মা মুণ্ডমালায় বিভূষিতা আছেন। জীবের মস্তকই জ্ঞানাধার। মানবের মস্তিষ্কই সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারকারী। আত্মজ্ঞানানুকূল সমস্ত প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের মালা ইনি পরিধান করিয়াছেন। অসুররা কম শক্তিমান নহে। কিন্তু তাহারা প্রভুত্ব ও ভোগলোভে সমস্ত শক্তি বর্বরের মত প্রয়োগ করে। দুর্বলরা শক্তির উপাসনা পছন্দ করেন না। তাঁহাদের যাহা কিছু শক্তি আছে সবই তাঁহারা অসুরের পায়ে তৈল মর্দনের জন্য প্রয়োগ করেন এবং অহিংসা ও বিশ্বপ্রেমের ভণ্ডামী করিয়া রাষ্ট্রের সর্বনাশ করেন।

মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ীই মহাশক্তি কালী। এই ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয়ে জ্ঞানশক্তির একান্নটি পীঠ আছে। ষট্‌চক্রে ইঁহারাই বর্ণমালা এবং ইঁহারাই জ্ঞানমালা। মা কালীর গলায় ইহারই মালা বিদ্যমান। এই মুণ্ডমালায় একান্নটি মুণ্ড

বিদ্যমান। জানিয়া রাখিও শক্তিসাধক কখনও অনাত্ম বুদ্ধিতে পরিচালিত হন না, অনাত্ম বুদ্ধিতে পরিচালিত হইবার দরুণই শক্তিসাধক রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সদ্যচ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ্ব করাম্বুজাং - তাঁহার বাম দিকের ঊর্দ্ধ্বদিকের করে খড়্গ এবং অধঃ দিকের করে সদ্য ছিন্নমুণ্ড রহিয়াছে। বাম অর্থে প্রতিকূল এবং দক্ষিণ অর্থে অনুকূল। বিশ্বসৃষ্টি ও রক্ষায় যাহারা প্রতিকূল তাহাদের নাশের জন্য তাঁহার কর্মবিধানে খড়্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই খড়্গ এইমাত্র শিরকর্তন করিয়াছেন এমন খড়্গ। অর্থাৎ অসুরের মস্তক তুলিবামাত্র তাহাকে কাটিয়া দিতে হইবে। শক্তিস্তরের কর্মবিজ্ঞানের ইহাই নীতি।

চীন নেফা ও লাডাক আক্রমণ করিল ও দখল করিল। মক্কাবাদী বর্বরতা ভারত ভাগ করিবার জন্য কলিকাতা ও নোয়াখালীর বর্বরলীলা সমস্ত ভারতে আরম্ভ করিল। তাহাদের নাশ না করিয়া নেফা ও লাডাক ছাড়িয়া দিলাম এবং পাকিস্তান করিয়া দিলাম এবং ভারত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার বীজ স্বরূপ মক্কাবাদীদিগকে ভারতে পরিপুষ্ট করিবার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, ইহা কিন্তু শক্তিবাদ নীতি নহে। শক্তিবাদ নীতি উহার সম্পূর্ণরূপে বিরোধী।

অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধ্বাধ পাণিকাং - তাঁহার দক্ষিণ উপরের করে অভয় এবং নিম্ন করে বরদান রহিয়াছে। অভয় এবং বরদান গুরুর কর্ম। অর্থাৎ যাহারা সৃষ্টি এবং পালন কর্মের অনুকূল তাহাদিগকে আত্মজ্ঞানমূলক শিক্ষা, দীক্ষা ও অভয় দান করিবে, ইহাই শক্তিবাদীয় কর্মনীতির আদর্শ।

মক্কাবাদীরা যাহাতে ভারতের অনুকূল হয় এবং ভারতব্যাপী গুণ্ডামী ত্যাগ করে, এজন্য গান্ধীজী এবং ভারতের নেতারা পঞ্চাশ বৎসর প্রচার চালাইয়াছেন, যাহার প্রভাবে গুণ্ডামী ও বর্বরতার প্রতিশোধ দেশ লয় নাই। ইহার ফলে ভারত ভাগ, এক তরফা রিফিউজী আগমন এবং খণ্ডিত ভারতকে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করা হইয়াছে। চীন সম্বন্ধেও ভারতের নীতি সর্বনাশের কারণ হইয়া চলিয়াছে। চীন ভারতের দুই দিকের দুই অংশ এবং হিন্দুর দেশ তিব্বত গ্রাস করিয়া লইয়া এটম্ বোমের হুমকী দেখাইতেছে। ভারত চীনকে সুশিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ব আন্দোলন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু শক্তিমত্তার কোন নীতি গ্রহণ করে নাই। একটা দারোয়ান এবং চাকরেরও ইহার বেশী বুদ্ধি আছে।

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং - ব্যাপক এবং ঘন মেঘের প্রভাবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণা, ইহা তুরীয়া শক্তির রঙের বর্ণনা। পূর্বেই সব বলা হইয়াছে।

তথা চৈব দিগম্বরীং - এবং তিনি দিকবসনা। দশদিক তাঁহারই বসন। অর্থাৎ তিনি সীমাহীন অত্যন্ত ব্যাপক তত্ত্ব। যে তত্ত্বের প্রকাশে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র নাই, সেখানে আবার দিক্ নির্ণয় কোথায়? দিক্‌জ্ঞান যদি সাধক ব্যবহারিক জগতে হারাইয়া ফেলেন তবে তাঁহার বিচার শক্তি বিলুপ্ত হইবে। কাজেই মায়ের রূপের সঙ্গে দিক্‌জ্ঞান যাহা আছে, সেটা মায়ের বসনের মত। অর্থাৎ মায়ের কোন বসন নাই, তাই বলিয়া সাধক যেন দিক্‌জ্ঞান না হারান।

কণ্ঠবসাক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চিতাম্ - তাঁহার গলে যে মুণ্ডমালা রহিয়াছে, উহা হইতে রক্তধারা বিগলিত হইয়া সমস্ত অঙ্গ অনুলিপ্ত হইতেছে।

মুণ্ডমালা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। মুণ্ডমালা মানে আত্মজ্ঞানের মালা। মুণ্ডমালা হইতে শোণিত ধারা মানে জ্ঞানের কেন্দ্র হইতে রজঃ বা কর্মপ্রবাহ। জ্ঞানহীন কর্মই অসুরকর্ম। জ্ঞানকৈন্দ্রিক কর্মই শক্তিবাদীয় কর্ম। শক্তিস্তরের সাধক ও সিদ্ধযোগীরা কখনও কর্মহীন নহেন এবং অসুরকর্মী বা অসুরতোষক ভণ্ড কর্মীও নহেন।

কর্ণাবতঃ সতানীত শব যুগ্ম ভয়ানকাম্ - তাঁহার কর্ণে দুইটি শবপিণ্ড রহিয়াছে, ইহাতে দেবী অত্যন্ত ভীষণরূপা হইয়াছেন।

ধ্যানের ভাষ্যে মহাদেবীর অঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। (১) মস্তক, (২) কণ্ঠ হইতে নাভি, (৩) নাভি হইতে সমস্ত নিম্ন অঙ্গ। মস্তকের বর্ণনায় ‘‘লয় প্রধান’’; মধ্যঅঙ্গ বর্ণনায় কর্ম পালন ও অসুরনাশের কথা স্থান পাইয়াছে। নিম্ন অঙ্গ বর্ণনায় সৃষ্টির কথা। মহাপ্রকৃতির লয় কাণ্ডে জীবমাত্রই শব। প্রলয় কাণ্ডে শবই শোভার সাজ। লয়কাণ্ড নিশ্চয় ভয়ঙ্কর, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে যখন মৃত্যু অনিবার্য তখন ইহাকে প্রকৃতির শোভা বলিয়াই মানিতে হইবে। অন্ততঃ প্রলয়কারিণী মহাশক্তির ইহাই শোভা।

বাঙালীর ইষ্টদেবতা কালী। এক যুগে কালী সমস্ত ভারতের রাজা ঋষি এবং জনগণের ইষ্টদেবতা ছিলেন। আজও সমস্ত ভারতে উহার কঙ্কাল দেওয়ালী উৎসবে প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা বাঙালীকে এবং ভারতকে ব্যাপক ভাবে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বলি। ভয়ঙ্করীর পূজায়, সমস্ত ভারতে দেওয়ালীর দীপমালার উল্লাস আমরা দেওয়ালীর সন্ধ্যায় দেখিতে পাই, তখন কি মনে হয়, ভয়ঙ্করী মায়ের পূজায় ভারত পশ্চাৎপদ ?

আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, কোন দেবদেবীই মা কালীর মত সুন্দরী ও আকর্ষণশক্তিসম্পন্না নহেন। বাল্যকাল হইতেই মা আমাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছেন। বাল্যকালে মায়ের মূর্তি কত গড়িয়াছি এবং খেলা করিয়াছি। যখন একটু বয়স হইয়াছে তখন মাকে মা বলিয়া কত জড়াইয়া ধরিয়াছি। মাতৃস্নেহ লুটিয়া লইবার ছেলেমী করিয়াছি। গৃহত্যাগের সময় পর্যন্ত আমার এই সন্তান লীলা এক ভাবেই ছিল। আমি একদিনও ভয় পাই নাই। এক রাত্রিতেও মনে হয় নাই, মা আমার ভয়ঙ্করী। চিতাস্থানে এবং মহা নিশাকালেও মাকে ভয়ঙ্কর মনে হয় নাই। আমার এখন মনে হয়, বাঘিনীর সন্তান বাঘিনী মাকে নিশ্চয়ই ভয় পাইতে পারে না। আমি শক্তিশালী সমাজ গ্রন্থে বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, বাঙ্গালীরা দেবতাদের বংশের কঙ্কাল। দেব, শর্মা, বর্মা, বসু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, বর্ধন, আদিত্য সবই দেবতার বংশোদ্ভব মানব বংশ। শক্তি উপাসনার প্রধান পূজারীরা সকলেই বৈদিক যুগের দেবতা ছিলেন। চৈতন্যবাদীরা শক্তি উপাসনা ত্যাগ করিয়া বাংলাকে রসের উপাসনার কথা প্রচার করেন। যে উপাসনার সঙ্গে বৈদিক যুগের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি ও ইতিহাস জড়িত উহাকে তাঁহারা ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালীকে ভাঙিয়াছেন এবং সমস্ত ভারতের শক্তিবাদিতার মূল ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন।

ঘোর দংষ্ট্রাং করালাস্যাং - তাঁহার দশনন্তপংক্তি অতি করাল। দাঁত মস্তক অংশের অঙ্গ, কাজেই ইহা লয়েরই সাজ। লয়ের সাজ অতি ভীষণ হইবারই কথা।

পীনোন্নত পয়োধরাং - তাঁহার স্তনদ্বয় দুগ্ধপূর্ণ এবং উন্নত। স্তন মধ্য অঙ্গের অংশ। সন্তান পালনের জন্য মাতৃস্তন্যের প্রয়োজন। মা কালী ধন ঐশ্বর্য অন্ন ও সম্পদদাতা

শক্তি। তুরীয়া শক্তির উপাসনা দরিদ্রের উপাসনা নহে। মা, সাধক এবং ভক্তকে কম দেন না। এ জন্য বঙ্গদেশ অনন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার ছিল। বঙ্গদেশ শক্তিবাদ ত্যাগ করিবার দরুণই বঙ্গভঙ্গ হইয়াছে এবং বঙ্গ দীন দেশে পরিণত হইয়াছে। বাংলায় যদি শক্তিবাদ থাকিত তবে বঙ্গভঙ্গ হইত না, মক্কাবাদও নির্মূল হইত। মক্কাবাদ হইতে শক্তিবাদ অনেক শক্তিশালী। প্রচার এবং শক্তিপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করিলে মক্কাবাদ বহিষ্কার মোটেই কঠিন নহে। মক্কাবাদকে আমি একটা মৃত মতবাদ মনে করি। যে মতবাদ বর্বরতা করিয়া নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি নষ্ট করিয়াছে, উহাতে উক্ত সংস্কৃতি কিছুই নাই যাহা ধরিয়া উহা বাঁচিয়া আছে, বলা যায়।

শবানাং কর সংঘাতৈঃ কৃত কাঞ্চীং হসন্মুখীং - শবগণের কর সমূহে তাঁহার কটিবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখা দিয়াছে। আত্মা অমর, শরীর মৃত হইবেই। আত্মশক্তির ভিত্তি ধরিয়া যাঁহারা মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধরত, তাঁহাদেরই হাত সমূহে মায়ের কোমরবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছে। নাভি স্থানের উপর পর্য্যন্ত মহাশক্তির কর্ম্ম ও পালন লীলা এবং অসুর নাশন কার্যেরও শেষ সীমা। এই সীমা স্থানে মহাশক্তি অসুর নিধনের জন্য মৃত্যুপণকারী বীরদের হস্ত সমূহে গ্রথিত কোমরবন্ধ ধারণ করিয়াছেন। কেবল স্তন্য পান করানোই মাতৃত্ব নহে; সন্তান ও সৃষ্টি রক্ষার জন্য সমাজ নাশক অসুর নাশও মাতৃত্ব। বন্যপশুদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং তাহাদের শাবক দিগকে হরণ করিবার চেষ্টা কর। যদি তাহারা বুঝিতে পারে তবে তোমাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিশ্চয়ই হত্যা করিবে বা নিজে হত হইবে। মহাশক্তি আজ নিশ্চিন্ত, ইহার কারণ, বীরগণ মৃত্যুপণ করিয়া অসুরকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মায়ের মহাশক্তির কোমরবন্ধে পরিণত হইয়াছে। যেদিন বুঝিয়াছিলাম, গান্ধী বাবার দল ভারতকে বর্বরদের হাতে দিবার রাজনীতি গ্রহণ করিয়াছে সেই দিন আমি যেন মনের হাসি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সাধনা ও তপস্যা জীবনের শেষের দিকে কত দল কত রাজনীতির নেতা কত সব কর্ম্মীর দ্বারে ঘুরিয়াছি। সকলেই সব বুঝিয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও সর্বনাশের বিরুদ্ধে শক্তিদান করিতে পারি নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও পরিস্থিতিটা বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে হত হইলেন। তুরীয়া শক্তির প্রকাশে শক্তিমান সাধক যদি দেখিতে পান, মহাশক্তির অসুর-নাশন-কার্যে শক্তিমান যোদ্ধারা আমরণ পণে হাত মিলাইয়াছে তবে তাঁহাদেরও মুখে তৃপ্তি ও নিশ্চিন্তের হাসি ফুটিবে। ''হসন্মুখী'' মস্তকের অঙ্গ। যুদ্ধ এবং রণসজ্জা যদি ঠিক ঠিক গড়িয়া উঠে, সংঘবদ্ধতা যদি সত্যই অসুর ধ্বংসের নীতির ধারক হয় তবে শক্তিমানের মুখে স্বস্তির আনন্দ ফুটিবেই। যুদ্ধে কোন পক্ষই কম ধ্বংস হয় না, কিন্তু যুদ্ধেপ প্রস্তুতি ঠিক ঠিক হইলে, উহার তৃপ্তি মনে ও মুখে দেখা দিবেই। তুমি ভাবিতে পার অস্ত্রহীন যবনরা ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্থান করিতে পারে? তুমি কি ভাবিতে পার, বিনা বাধায় ভারতের দুইটা বৃহৎ অংশ আবার এক হইবে? তুমি কি ভাবিতে পার, কোন মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ এই দুর্দিনেও সফলতার হাসি হাসিতে পারে? মহাশক্তি মা জাগো, ভারত এ সব দুষ্কৃতকারী ভণ্ডগণকে চিনুক।

সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত ধারা বিস্ফুরিতা ননাম্ - কালিকা দেবী হাস্য বদনা, তাঁহার ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় হইতে বিচলিত শোণিত ধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

কথিত আছে, রক্তবীজ বধকালে মা মুখ বিস্তার করিয়াছিলেন। যাহার ফলে রক্তবীজের সমস্ত রক্তই মায়ের মুখে পতিত হইয়াছিল। ইহার ফলে নূতন রক্তবীজ সৃষ্টি বন্ধ হইয়া রক্তবীজ ধ্বংস হয়। মায়ের মুখে প্রলয়ের ইঙ্গিত। প্রলয় শক্তির প্রসার করিয়া মা রক্তবীজ অসুরের অসুর-সৃজন-শক্তি হরণ করেন। অসুররা নিজেদের নীতিজালে নিজের পক্ষে অনেককে গড়িয়া লয়। অসুররা যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন তাহারা বিশ্বকে সংগঠন ও প্রচার কৌশলে নিজের দলে করে। শক্তিবাদও যদি নিজের মুখ বিস্তার না করে অর্থাৎ প্রচার ও সংগঠনের প্রসারতা না করে তবে অসুরবাদ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবে না। অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা যে গান্ধীবাদীরা এই মূল শক্তিবাদ নীতির বিরুদ্ধ কার্য করিয়া ভারতের ধ্বংস আনিতেছেন।

ঘোর রাবাং মহারৌদ্রীং - দেবীর ধ্বনি অত্যন্ত গম্ভীর। শক্তিবাদীয় প্রচার অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সংক্ষেপ কথায় হইয়া থাকে। অসুরবাদীরা উহার ভয়ে কম্পিত হইতে বাধ্য। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, চীন, পাকিস্থান ও মুসলমানদের প্রত্যেকটি আসুরিক দুষ্কার্যকে মূর্খ নেতারা তারে নারে করিয়া করিয়া প্রশ্রয় দিয়াছে। শক্তিবাদ ধর্ম কোন ভণ্ডামীর বিশ্বাসবাদ নহে, ইহার উপাসনা অত্যন্ত শক্তিশালী, ইহার জ্ঞানবাদ অত্যন্ত যুক্তিবাদপূর্ণ ও শক্তিশালী অনুভূতির ভিত্তিসম্পন্ন। ইহার কর্মবিজ্ঞান সত্যই শক্তিশালী। কালী ধ্যানের প্রত্যেকটি কথা উচ্চ অনুভূতি, উচ্চ কর্মবিজ্ঞান এবং দৃঢ়চিত্ত সাধনার ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

শ্মশানালয় বাসিনীং - শক্তির আলয় শ্মশান। সমস্ত জড় পদার্থ এবং সমস্ত জীবের আত্মা শক্তিদ্বারা গঠিত। বিশ্ব ও সৃষ্টি যেখানে শেষ বা শ্মশানরূপ লাভ করে, সেইখানেই শক্তির আত্মপ্রকাশ। সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপিয়া মহাশক্তিই বিদ্যমান।

শক্তিসাধক চরমভাবে ত্যাগনিষ্ঠ। ভোগবিলাসিতা শক্তিসাধকের থাকে না বা থাকিতেই পারে না। শক্তিসাধকের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্বয়ং শিব।

বালার্ক মণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ - ইঁহার তিনটি নয়ন নবোদিত সূর্যের মত মণ্ডলাকার ও উজ্জ্বল।

শক্তিবাদের দৃষ্টিশক্তি নিস্তেজ হয় না। শক্তিরূপা কালের চক্ষু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উত্থান পতন সবই দেখিতে পায়। অর্থাৎ শক্তিস্তরের দর্শনশক্তি বা দার্শনিকতা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। মণ্ডলাকার দৃষ্টি মানে পক্ষপাতহীন দৃষ্টি। দুর্বলবাদীদের দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হইতেছে অসুরের অনুকূল, শক্তিবাদের বিরোধী। অসুরবাদীদের দৃষ্টি হইতেছে শক্তিবাদের মূলোচ্ছেদের অনুকূলে।

ত্রিলোচন মানে তিন চক্ষু। শক্তিস্তরের ত্রিলোচন সম্বন্ধে ক্রমবিকাশে বলা হইয়াছে। ভোগ কর্ম এবং জ্ঞান জগতের উপর মায়ের পূর্ণ স্নেহদৃষ্টি বিদ্যমান। অসুরবাদীর উপর মা কঠোর হৃদয়া। ইহার কারণ, অসুরবাদ নিজের জন্য এবং সমাজের জন্য আত্মবিকাশের নীতি মানে না।

দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপী মুক্তালম্বি কচোচ্চয়াম্ - তাঁহার দশন পংক্তি উন্নত ও বহির্গত, কেশপাশ দক্ষিণব্যাপী এবং আলুলায়িত।

দাঁত বাহিরের দিকে, ভিতরের দিকে এবং নিম্নে ও উচ্চে সমান। এইরূপ তিন রকমের হইয়া থাকে। যাঁহারা সরল ও প্রফুল্ল তাঁহাদের দাঁত একটু বাহিরের দিকে

থাকে। সাধকদের জিহ্বা সাধারণতঃ একটু বড় থাকে, এজন্য যাঁহারা অন্য জন্মে সামান্য সাধনাও করিয়াছেন, তাঁহাদের দাঁত একটু বাহিরের দিকে থাকে।

কেশদাম দেবীর দক্ষিণ ভাগে মানে দেবীর বা অব্যক্ত শক্তির জ্ঞানধারা সমাজ রক্ষার অনুকূল এবং অসুরবিরোধীগণের দিকে ব্যাপ্ত থাকে। অসুর বা অসুরবাদীদের পদে তৈলমর্দনকারী দুর্বলবাদীদের দিকে অব্যক্তের জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয় না। অসুরবাদের আশ্রয়ে কোন ধর্মই শক্তিস্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না।

শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং - শবরূপ মহাদেবের হৃদয়ের উপর দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। শবরূপ শিব মানে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপর সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও তুরীয়া শক্তির লীলা। সৃষ্টি স্থিতি লয় তুরীয় ব্রহ্মের পরপারে নির্গুণ চেতনা বা ব্রহ্ম অবস্থিত।

কালীর মূর্তিই ব্রহ্মমূর্তি। ব্রহ্মের নির্গুণ ভাগ শবরূপ শিবরূপে পরিকল্পিত। সগুণ অংশে সৃষ্টি, মায়ের পা হইতে নাভির নিম্নস্থানে রহিয়াছে। স্থিতি মানে সন্তান পালন, রক্ষণ এবং অসুরনাশলীলা দেবীর মধ্য অঙ্গে অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে নাভি পর্যন্ত অংশে বিদ্যমান। লয় ক্রিয়া মায়ের মস্তক অংশে বিদ্যমান। শক্তির তুরীয়াতত্ত্ব মায়ের কালো রঙে রহিয়াছে।

বেদান্ত সূত্রের প্রথম সূত্র ‘‘অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা’’ ২য় সূত্র ‘‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’’ এবং তৃতীয় সূত্র ‘‘শাস্ত্রযোনিত্বাৎ’’ সব কথারই ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে।

শিবাভি র্ঘোররাবাভি চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্ - শিবাগণ তাঁহার চারিদিকে ঘোর রব (ডাকিতেছে) করিতেছে।

সহস্র সহস্র শিবা রণক্ষেত্রকে এবং শ্মশানকে ঘেরিয়া অবস্থান করে এবং উল্লাসে গম্ভীরভাবে ডাকিতে থাকে। ইহা যুদ্ধক্ষেত্র এবং শ্মশানের প্রাকৃতিক চিত্র। যেখানে যুদ্ধ বাধে সেখানে শত শত মাইলের মধ্যে শৃগালগণ সমবেত হয়। কালী শ্মশান ও রণক্ষেত্রের দেবতা।

দ্বিতীয় মহাসমরকালে আসাম (কোহিমা) ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময় আমি রংপুরে ছিলাম। রংপুরকে একটি বিরাট শৃগালের দেশ বলা যায়। যুদ্ধকালে দেখা গেল হঠাৎ শৃগালের সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে। সন্ধানে জানিলাম, শৃগালগণ রণক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। মহাভারতের যুদ্ধকালেও শৃগালের সংঘবদ্ধতার কথা উল্লেখ আছে।

মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং - মহাকালের সমত্বে মহাশক্তি বিপরীত রতাতুরা আছেন।

মহাকাল এবং মহাকালী একই কথা। বিদ্যুৎশক্তি যখন কাজ করে তখন উহাতে পজেটিভ ও নিগেটিভ স্রোত দুই-ই থাকে। সৃষ্টি মহাকালীরই কার্য; কিন্তু সৃষ্টিতে মহাকাল সত্তাকেও মানিতে হয়। মহাকাল সত্তা না থাকিলে মহাকালীর সৃষ্টি হয় না। শক্তির কার্যের ইহাই নিয়ম।

কাল সত্ত্বাই যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং তুরীয় ক্রিয়ায় সক্রিয় হয় তখনই তিনি কালী নামে খ্যাতা। সৃষ্টি স্থিতি লয় সবই কালেরই নীতি। যখন কালের এই নীতি প্রস্ফুটিত হয় তখনই তিনি কালী নাম ধারণ করেন। নয়তো তিনি অনাদি কালসত্তা।

এখানে বিপরীত রতির কথা বলা হইয়াছে। ইহার মানে ব্রহ্মচর্য এবং ভোগ যে স্তরে একই কথা। সেই স্তরের ভোগের নাম বিপরীত ভোগ। ব্রহ্মচর্য ভোগহীনও হইতে পারে আবার ভোগময়ও হইতে পারে। বিপরীত ভোগ মানেই ঊর্ধ্বরেত ভোগ।

সুখপ্রসন্ন বদনাং স্মেরানন সরোরুহাম্ - দেবীর মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন এবং হাস্যবিকশিত। সৃষ্টি স্থিতি লয় তুরীয় ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই যাঁহার স্বরূপ তাঁহার মুখে সুখ এবং প্রসন্নতা থাকিবে না তো কাহার মুখে থাকিবে? অসুরবাদ ও দুর্বলবাদে বিশ্ব যখন প্রপীড়িত থাকে তখন কাহার মুখে আনন্দ থাকিতে পারে? কিন্তু সৃষ্টিব্রহ্ম, স্থিতিব্রহ্ম, লয়ব্রহ্ম, তুরীয়ব্রহ্ম এবং নির্গুণব্রহ্মকে যে সাধক দর্শন করেন তাঁহার সুখ ও প্রসন্নতা যায় না। সাধকের দার্শনিকতা সাধককে সুখী* ও সুপ্রসন্ন রাখিতে সক্ষম। ইহা ভিন্ন যখন শক্তিবাদী সাধক দেখিতে পায় কর্মীদের সমস্ত কর্মশক্তি শক্তিবাদের অনুকূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে সেই সময়ও সাধকের প্রসন্নতা দেখা দেয়। আবার প্রসন্নতা সাধকের তখনই দেখা দেয়, যখন রক্তবীজের ঝাড় মহাশক্তির ভীষণ দন্তে চূর্ণীকৃত হইতেছে। ধ্যানে সব কথারই উল্লেখ যথাযথ স্থানে রহিয়াছে।

এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকাম সমৃদ্ধিদাম্ - এই ভাবে সমস্ত কামনা ও সর্ব সমৃদ্ধদাত্রী কালীকে সংচিন্তন (ধ্যান) করিবে।

মা কালীকে এই ভাবে ধ্যান করিলে সাধকের সমস্তপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ হয় এবং কামনা পূর্ণ হয়। ধ্যানের এই অংশটুকু আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি, ভারতের সর্বনাশকারী দুর্বলবাদী মহাপাপীদের শাসন অবসান হইবে এবং ভারতের কল্যাণের পথ কণ্টকহীন হইবে। ভারত সমৃদ্ধশালী দেশ হইবে। ভারতে আবার বেদবাদ গীতাবাদ শক্তিবাদের প্লাবন আসিবে।

তুরীয়াশক্তির উপাসনার প্রধান কথা হইতেছে কালী সাধনা। শাক্তাভিষেক গ্রহণ না করিলে তুরীয়া শক্তির কোন উপাসনাই করা চলে না। দশমহাবিদ্যার অগ্রবর্তী সাধনায় প্রবেশ করিতে হইলে পূর্ণাভিষেকও গ্রহণ করা প্রয়োজন। বঙ্গ দেশে শক্তিপূজার প্রচলন অত্যন্ত প্রবল। অভিষিক্ত না হইয়া কোন পুরোহিতই দুর্গা জগদ্ধাত্রী বা মহাবিদ্যার পূজায় বসিত না। এখন অনেক স্থানেই অর্থলোভে এবং যজমানগণের অভিজ্ঞতার অভাবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিতেছে। আমাদের মতে অভিষেক গ্রহণ করিয়াই শক্তিপূজা করা কর্তব্য। এ বিষয়ে সমাজকে অবহিত করা† প্রয়োজন।

গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদ মঠে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দীপাবলী অমাবস্যাতে মায়ের বিস্তারিত পূজোৎসব হইয়া থাকে। সমবেত ধ্যান করিবার পূর্বে সাধকগণ কালী ধ্যানের শক্তিবাদ ভাষ্য শ্রবণ করিবেন। ইহা শক্তিবাদীয় কালীপূজার বিশেষ নিয়ম।

কালীসাধকগণের চণ্ডীপাঠের অভ্যাস, চণ্ডীর ব্রহ্মা কর্তৃক কালী স্তোত্রম্, কর্পূর স্তোত্রম্, কালী কবচম্ ও অর্জুন কর্তৃক দুর্গা স্তোত্রম্ ইত্যাদি পাঠের আলোচনা রাখিবেন। কালী সাধনা অত্যন্ত প্রাচীন। এ জন্য কালী স্তোত্রাদির অভাব নাই। সমস্ত ভারতে কালী, দুর্গা, চণ্ডী ও ভবানী একার্থবাচক। বিখ্যাত সাধকগণের অনেকেই কালীস্তোত্র রচনা

---

* প্রকাশকের নিবেদন - ‘‘সুখ’’ স্থানে ‘‘সুখী’’ আমাদের সংযোজন।

† প্রকাশকের নিবেদন - ‘‘হওয়া’’ স্থানে ‘‘করা’’ আমাদের সংযোজন।

করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর কর্তৃক কালীস্তোত্রম্ প্রায় সমস্ত সংস্কৃত টোলের ছাত্রগণ পাঠ করিয়া থাকেন॥ (শঙ্কর কর্তৃক কালী স্তোত্রম্-এর কিয়দংশ :

ওঁ ন মন্ত্রং নো যন্ত্রম্ তদপি ন জানে স্তুতিমহো,
ন চাহ্বাহনং ধ্যানং তদপি ন জানে স্তুতিকথা।
ন জানে মুদ্রান্তে তদপি চ ন জানে বিলেপনম্,
পরং জানে মাত স্তদনু স্মরণং ক্লেশ দহনম্॥)

তারা সাধনা

কালী সাধনা হইতেও তারা সাধনা কঠিন। কালীর মত তারাও অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। দশ মহাবিদ্যার সব সাধনাই কালীর সাধনা এবং দশ মহাবিদ্যার সব মূর্তিই কালীমূর্তির বিভিন্ন রূপ। কালীর সাধনা খুব ভাল ভাবে না করিলে দশ মহাবিদ্যার কোন সাধনাই স্নুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইবে না। তুরীয়া শক্তিতে সমস্ত সৃষ্টির উপাদান অব্যক্ত ভাবে রক্ষিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে সেই সব উপাদান নবীন সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়। প্রতি সৃষ্টিতেই পূর্বসৃষ্টির অনেক উপাদান প্রকাশিত হয় এবং মহত্তত্ত্ব এবং পুরুষোত্তমের সংস্পর্শে নবীন সৃষ্টিরও আবির্ভাব হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দেখুন।

দশ মহাবিদ্যা অব্যক্ত মহামায়ারই দশটি কার্য রূপ। তন্ত্রশাস্ত্রে কালীকে ‘‘ইচ্ছাশক্তি’’ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তি মানে সৃষ্টির বেগ। তন্ত্রমতে ‘‘তারা’’ হইতেছেন ‘‘ক্রিয়াশক্তি’’। ক্রিয়াশক্তি মানে জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানমুখী গতি। অব্যক্ত শক্তি কালী সত্তার ধ্যান হইতেই ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ বুঝা যাইবে। এখানে সৃষ্টির বেগ নাই কিন্তু জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যমূলক মনোবেগের প্রাবল্য স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। তারা উপাসনা কালে সাধকের যতটা অন্তর্মুখিতা স্পষ্ট হয় কালী সাধনায় ততটা হয় না। এ স্তরে সাধক যেন সমাজের রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যই করিতে চাহেন না। মহাযানী বৌদ্ধদের মধ্যে ‘‘তারা সাধনা’’ প্রবল ভাবেই বিদ্যমান। কালী সাধনাকালে সাধকের যতটা ব্রহ্মচর্য নিষ্ঠা থাকে তারা সাধনা কালে উহা শতগুণ বৃদ্ধি হয়। এ সাধনায় সৃষ্টির রস যেন কোন রসই নহে; সৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া রুক্ষ ব্রহ্মচর্য রসই যেন প্রকৃত রস। এই সাধনায় ত্যাগই রস এবং ব্রহ্মচর্যই রস। কালী সাধনা কালে সাধক অব্যক্ত মহাশক্তির সাধনা সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া অভ্যাস করিতেছিলেন। তারা সাধনায় একটু অগ্রসর হইলেই দেখা যাইবে সাধক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন এবং সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছেন।

তারা মন্ত্র। ‘‘ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্’’॥

তারা গায়ত্রী। ‘‘ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো তারে প্রচোদয়াৎ।’’

কালী মন্ত্রের সাধনার মতই আসনে উপবেশন, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর মাতৃকান্যাস ও বাহ্য মাতৃকান্যাস করিবেন। এ সব ন্যাসের পর রুদ্রন্যাস, গ্রহন্যাস,

লোকপালন্যাস, শিবশক্তিন্যাস, তারাদিন্যাস ও পীঠন্যাস করিয়া কালী সাধনার মতই আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা, ধ্যান ও মানসপূজা করিবেন এবং মন্ত্রচৈতন্য করিয়া নিবিষ্ট মনে জপ করিবেন। যাঁহারা ভাল ভাবে কালী মন্ত্রের সাধনা করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে তারা মন্ত্রের সাধনা কঠিন মনে হইবে না। কালী সাধনার প্রথম ধাপ কালী উপাসনা, কালী সাধনারই দ্বিতীয় ধাপ তারা উপাসনা।

তারা সাধনায় রুদ্রন্যাস॥ কালীমন্ত্র সাধনায় যাহা বাহ্য মাতৃকান্যাস বলিয়া উক্ত আছে, সেই সব ন্যাসই রুদ্রন্যাসের মূলকথা। সেই সব ন্যাসই হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ বীজমন্ত্র সহ এক একটি রুদ্রদেবতার নামসহ যথাযথ স্থানে স্পর্শ করিতে হইবে। যাঁহারা উহা করিতে চাহেন তাঁহারা তন্ত্রসার হইতে সংগ্রহ করিবেন।

তারা দেবতার গ্রহন্যাস॥ হৃদি রক্তবর্ণং সূর্যং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীং হূঁ অং ১৬ সূর্যায় নমঃ॥ ভ্রূমধ্যে শুক্লবর্ণং সোমং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ যং রং লং বং সোমায় নমঃ॥ নেত্রত্রয়ে লোহিতং মঙ্গলং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ কং খং গং ঘং ঙং মঙ্গলায় নমঃ॥ হৃদয়মণ্ডলে শ্যামং বুধং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ চং ছং জং ঝং ঞং বুধায় নমঃ॥ কণ্ঠকূপে পীতবর্ণং বৃহস্পতিং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ টং ঠং ডং ঢং ণং বৃহস্পতয়ে নমঃ॥ গলদেশে পাণ্ডববর্ণং শুক্রং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ তং থং দং ধং নং শুক্রায় নমঃ॥ নাভিদেশে নীলবর্ণং শনৈশ্চরং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ পং ফং বং ভং মং শনৈশ্চরায় নমঃ॥ মুখে ধূম্রবর্ণং রাহুং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ যং রং লং বং শং ষং সং রাহবে নমঃ॥ গুদে ধূম্রবর্ণং কেতুং ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ লং ক্ষং কেতবে নমঃ॥

তারা সাধনায় লোকপালন্যাসঃ। মস্তকের আট দিকে এবং মস্তকের ঊর্দ্ধে এবং অধঃ দিকে দশজন দিকপালের ন্যাস করিতে হয়।

যথা - পূর্বে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং আং কং খং গং ঘং ঙং ইন্দ্রায় নমঃ॥

অগ্নিকোণে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ইং ঈং চং ছং জং ঝং ঞং অগ্নয়ে নমঃ॥

দক্ষিণে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ উং ঊং টং ঠং ডং ঢং ণং যমায় নমঃ॥

নৈর্ঋতে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ঋং ৠং তং থং দং ধং নং নৈর্ঋতায় নমঃ॥

পশ্চিমে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ঌং ৡং পং ফং বং ভং মং বরুণায় নমঃ॥

বায়ুকোণে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ এং ঐং যং রং লং বং বায়বে নমঃ॥

উত্তরে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ওঁ ঔং শং ষং সং হং কুবেরায় নমঃ॥

ঈশানকোণে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং অঃ লং ক্ষং ঈশানায় নমঃ॥

অধঃ - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অনন্তায় নমঃ॥ ঊর্দ্ধে ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥

তারা সাধনায় শিবশক্তিন্যাস॥

মূলাধারে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ বং শং ষং সং ডাকিনী সহিত ব্রহ্মণে নমঃ॥

স্বাধিষ্ঠানে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ বং ভং মং যং রং লং রাকিনী সহিত বিষ্ণবে নমঃ॥

মণিপুরে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং লাকিনী সহিত রুদ্রায় নমঃ॥

অনাহতে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং কাকিনী সহিত ঈশ্বরায় নমঃ॥

বিশুদ্ধাখ্যে - ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ হং ক্ষং হাকিনী সহিত পরশিবায় নমঃ॥

তারা সাধনায় তারান্যাস॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং ১৬ তারায়ৈ নমঃ॥ ললাটে ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ কং ৫ উগ্রায়ৈ নমঃ॥ ভ্রূমধ্যে ওঁ হ্রীঁ ৩ চং ৫ মহোগ্রায়ৈ নমঃ॥ কন্ঠগহ্বরে ওঁ হ্রীঁ ৩ টং ৫ বজ্রায়ৈ নমঃ॥ হৃদয়ে ওঁ হ্রীঁ ৩ তং ৫ কাল্যৈ নমঃ॥ নাভিদেশে ওঁ হ্রীঁ ৩ পং ৫ সরস্বত্যৈ নমঃ॥ লিঙ্গে ওঁ হ্রীঁ ৩ যং রং সং বং কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥ মূলাধারে ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ শং ষং সং হং লং ক্ষং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥

তারা সাধনায় পীঠন্যাস॥

মূলাধারে ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ অং আং কং ৫ কামরূপ পীঠায় নমঃ॥ হৃদি ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ চং ৫ জালন্ধর পীঠায় নমঃ॥ ললাটে ওঁ হ্রীঁ ৩ উং ঊং টং ৫ পূর্ণংগিরি পীঠায় নমঃ॥ ললাটোর্ধ্বে ওঁ হ্রীঁ ৩ ঋং ৠং তং ৫ উড্ডীয়ান পীঠায় নমঃ॥ ভ্রূবোর্মধ্যে ওঁ হ্রীঁ ৩ ঌং ৡং পং ৫ বারাণসি পীঠায় নমঃ॥ লোচনত্রয়ে ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ এং ঐং যং রং লং বং মধুপুরী পীঠায় নমঃ॥ নাভিদেশে ওঁ হ্রীঁ ৩ অযোধ্যা পীঠায় নমঃ॥ কট্যাং ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ কাঞ্চী পীঠায় নমঃ॥

তারা সাধনায় করাঙ্গন্যাস॥

ওঁ হ্রাং অখিলবাগ্‌রূপিণ্যৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥
ওঁ হ্রীঁ অখণ্ডবাগ্‌ রূপিণ্যৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা॥
ওঁ হ্রূঁ ব্রহ্মবাগ্‌রূপিণ্যৈ মধ্যমাভ্যাম্‌ বষট্‌॥
ওঁ হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্‌রূপিণ্যৈ অনামিকাভ্যাম্‌ হূং॥
ওঁ হ্রৌং রুদ্রবাগ্‌ রূপিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাম্‌ বৌষট্‌॥
ওঁ হ্রঃ সর্ববাগ্‌ রূপিণ্যৈ অস্ত্রায় ফট্‌॥

তারা সাধনায় ষড়ঙ্গন্যাসঃ॥

ওঁ হ্রাং অখিলবাগ্‌ রূপিণ্যৈ হৃদয়ায় নমঃ॥
ওঁ হ্রীঁ অখণ্ডবাগ্‌রূপিণ্যৈ শিরসি স্বাহা॥
ওঁ হ্রূং ব্রহ্মবাগ্‌ রূপিণ্যৈ শিখায়ৈ বষট্‌॥
ওঁ হ্রৈং বিষ্ণুবাগ্‌ রূপিণ্যৈ কবচায় হূঁ॥
ওঁ হ্রৌং রুদ্রবাগ্‌ রূপিণ্যৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌॥
ওঁ হ্রঃ সর্ববাগ্‌ রূপিণ্যৈ অস্ত্রায় ফট্‌॥

তারা সাধনায় ঋষ্যাদিন্যাসঃ॥

শিরসি অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ॥ মুখে বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ॥ হৃদি শ্রীমদেক জটায়ৈ নমঃ॥ মূলাধারে হূঁ বীজায় নমঃ॥ পাদয়ো ফট্‌ শক্তয়ে নমঃ॥ সর্বাঙ্গে হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্‌ কীলকায় নমঃ॥

তারা সাধনায় ব্যাপকন্যাসঃ॥

ওঁ পুটিত করিয়া বীজমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। মস্তক হইতে পা পর্যন্ত, পা হইতে মস্তক পর্যন্ত; এবং হৃদয় হইতে মুখ পর্যন্ত। এভাবে ৫ বার ন্যাস করিতে হয়। ইহার পর

ধ্যান। ধ্যানের পর আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা, পরে মন্ত্র চৈতন্য করিয়া জপ। সমস্ত মহাবিদ্যার উপাসনায়ই ন্যাসক্রিয়া বেশ নিষ্ঠা ও নিবিষ্ট মনে করিতে হইবে। প্রচুর সাধনা না করিলে সিদ্ধি অসম্ভব। বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্‌শক্তি, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা সবই এ জন্মে বা অন্য জন্মের শক্তি সাধনার ফলে আসিয়া থাকে।

ন্যাস কার্য শেষ করিয়া ধ্যান আরম্ভ করিবেন। তারাধ্যান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা - সাধক নিজের আত্মাকে সমস্তপ্রকারে ব্যথাহীন তারিণীরূপে চিন্তা করিবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ীই মহাশক্তি তারারূপে আছেন, জানিবেন। ব্যথাশূন্য অন্তরে তারিণীধ্যান কর্তব্য।

"এই বিশ্ব অমৃত জলে প্লাবিত আছে। সেই জলের মধ্যে 'আঃ' কার কৈন্দ্রিক রক্তকমল রহিয়াছে। সেই রক্তকমলের উপর 'টাং'কার কৈন্দ্রিক শ্বেতপদ্ম বিদ্যমান। সেই শ্বেতপদ্মের উপরে হূঁ কৈন্দ্রিক এক প্রকার নীল কমল রহিয়াছে। সেই নীল কমলের উপরে একটি 'হূঁ' কার চিহ্নিত কর্তৃকা বিদ্যমান। সেই কর্তৃকার উপরি ভাগে একটি শ্বেত কমলের মধ্যে শবরূপী শিব চিৎ হইয়া শায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। কমলের মধ্যে শিবের চারিদিকে চিতার অগ্নি জ্বলিতেছে। শিবের হৃদয়ের উপর এবং চিতাগ্নির মধ্যস্থানে মা তারা দাঁড়াইয়া আছেন। তারা ধ্যানে শ্মশানাগ্নি স্নিগ্ধ। ইহাতে গরম বা জ্বালা নাই। যদি স্নিগ্ধ চিতাগ্নি ধ্যান করিতে অসুবিধা হয় তবে তীব্রস্পর্শ অগ্নিই সামান্য স্মরণ করিয়া অমৃত জলের মধ্যে শ্বেত কমলের উপর মাকে ধ্যান করিবেন। মোট কথা স্নিগ্ধতার মধ্যে ধ্যান হওয়া চাই।"

নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধমাত্মানং দেবতাময়ং।
অন্তরিক্ষে ততো ধ্যানেৎ আঃ কারাদ্রক্তপঙ্কজম্॥
ভূয়স্তস্যোপরি ধ্যায়েৎ টাংকারাৎ শ্বেতপঙ্কজম্।
তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ হূঁ কারাং নীল সন্নিভাম্॥
ততো হূঁ কারজাং পশ্যেৎ কর্তৃকাং বীজভূষিতাম্।
কর্তৃকোপরিগতাং ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্॥

ধ্যানের পূর্ব্বে এই অংশ এবং ধ্যানের শক্তিবাদ ভাষ্য শ্রবণ করিয়া, সাধকগণ সমবেত-ধ্যান-মন্ত্রসহ তারাধ্যান করিবেন।

ওঁ প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবন সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোল জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
খড়্গকর্তৃসমাযুক্ত-সব্যেতর ভূজদ্বয়াম্।
কপালোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্॥
পিঙ্গোগ্রৈক জটাং ধ্যায়েৎ মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্ক মণ্ডলাকার-লোচনত্রয় ভূষিতাম্॥
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
স্বাবেশ স্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার বিভূষিতাম্॥
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্।

তারাধ্যানের শক্তিবাদ ভাষ্য

প্রত্যালীঢ়পদাং - তিনি বামপদ অগ্রবর্তী রাখিয়াছেন। পা মানে গমনশক্তি। বামপদ মানে সৃষ্টির দিকে গতিবেগ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানমুখী গতি। কালীর মূর্তিতে গমনশক্তি সৃষ্টিমুখী, তারা-সাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান।

ঘোরাং - অন্ধকাররূপা। অর্থাৎ তুরীয়া শক্তি। তুরীয়া শক্তির গতি সৃষ্টিমুখী হইলে তিনিই কালী নামে পরিচিতা হন। তুরীয়া শক্তিরও গতি অনুধাবন করা হইয়াছে, ভাবিতে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়। এ বিশ্বে স্বয়ং শিব ভিন্ন কে এতবড় জ্ঞানী যে তুরীয়া শক্তির মধ্যেও নানা প্রকার গতির দিক নির্ণয় করিতে সক্ষম? দশমহাবিদ্যার সাধনার মূল হইতেছেন কালী সাধনা। এই সাধনার কেন্দ্র হইতেই ব্রহ্মজ্ঞানমুখী গতির বিকাশ হয়। দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকটি শক্তিই কালীমায়ের বিভিন্ন রূপ। মা কালী এবার ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে চলিলেন। এজন্য কালীই মহাশক্তি তারা।

মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্ - বিস্তারিত কালীধ্যানে বলা হইয়াছে।

খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং - তিনি খর্বাকৃতি, ঝোলাপেট এবং ভীষণরূপা। ক্রমবিকাশ গ্রন্থে গণেশধ্যানে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অব্যক্ত মহাশক্তির মধ্যে আটটি শক্তিরই গতি বিদ্যমান। এ সব শক্তি সাধককে নানা দিকে শক্তিমান করে। গণেশ ধ্যান ব্যাখ্যায় আমরা যে কেন্দ্রশক্তিকে বুদ্ধিশক্তি বলিয়াছি, অতিসূক্ষ্ম অব্যক্ত স্তরে সেই শক্তিই তারা শক্তিরূপে বিদ্যমান। আমরা সেই শক্তির নাম দিয়াছি বুদ্ধিশক্তি "ই"। আজ যে বালক ব্রহ্মজ্ঞানের পথে গৃহত্যাগ করিয়া তপস্বী হইতে চলিয়াছেন, তাঁহাকে কে প্রেরণা দেয়, কে রক্ষা করে, কে ফুটাইয়া তোলে, জানো কী? তাঁহার এই প্রেরণা আসে অব্যক্ত মহাশক্তির ভাণ্ডার হইতে। সেই শক্তির গতিবেগই তাঁহাকে গতি দেয়, তাঁহাকে শক্তিমান তপস্বী করে। কেহই সেই গতি রুদ্ধ করিবার শক্তি রাখে না। এজন্য এই গতিবেগকে মহাবলবান বলা হইয়াছে।

জীবে যে সৃষ্টির বেগ কত বলবান, বা ভীমাশক্তি ইহা কে না জানে? দুর্বার কাম ও প্রেমবেগকে কে রুদ্ধ করিতে পারে? এই সৃষ্টির বেগের কেন্দ্রস্থান হইতেছে অব্যক্ত স্তরে, মা কালীরই রূপের মধ্যে। অব্যক্তরূপা মা ইচ্ছাশক্তিই জীবের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন। আবার অব্যক্ত স্তরে থাকিয়াই মহাশক্তি মা কোন কোন ক্ষণজন্মা বালককে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণা দান করেন।

ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ - তাঁহার কটিস্থান ব্যাঘ্রচর্মাবৃত। ইহা ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। বাল্যকাল হইতে যিনি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত নহেন, তিনি জ্ঞানী হইতেই পারেন না। দশমহাবিদ্যার কোন সাধনাই সাধককে কিছু না কিছু অলৌকিক শক্তি দিতে সক্ষম, কিন্তু ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠাহীন কোন সাধকই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে সক্ষম নহেন।

নবযৌবনসম্পন্নাং - তিনি নবযৌবনসম্পন্না। ভোগপথে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন যৌবনের প্রয়োজন, ব্রহ্মচর্য পথে অগ্রসর হইতে হইলেও পূর্ণযৌবন চাই। ভোগপথে

যেমন জীবের আকর্ষণ আছে, সংযম এবং ব্রহ্মচর্যের মধ্যেও উহা হইতে অনেক বেশী আকর্ষণ বিদ্যমান। এখানে নব যৌবন মানে ব্রহ্মচর্যের যৌবন বা প্রবল বেগ।

পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাং - তারা মায়ের কপাল পঞ্চমুদ্রা বা পাঁচটা নরশিরকঙ্কালে শোভিত আছে। তারাসাধক আচার্য শঙ্কর বলেন, ‘‘এই পাঁচটি নরশিরকঙ্কাল একটি বিচিত্র কঙ্কাল মালায় গ্রথিত আছে।’’ ‘‘বিচিত্রাস্থি মালাং ললাটে করালাং কপালাঞ্চ পঞ্চান্বিতং ধারয়ন্তী-মিতি’’। পাঁচটি নরকপাল মানে পঞ্চ তন্মাত্রাবোধের কেন্দ্রকে বুঝাইতেছে। শিবের পঞ্চ মুখই পঞ্চ তন্মাত্রাবোধের ইঙ্গিত একথা আমরা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। পঞ্চ তন্মাত্রাবোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সাধকের আর বাহ্য ভোগ স্পৃহা থাকে না। অর্থাৎ তারা-মা আমার পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিতা এবং ব্রহ্মচর্য-শোভায় শোভিতা।

চতুর্ভুজাং - দেবীর চার হাত। হাত মানে কর্মশক্তি। শক্তিসাধক কর্মহীন নহেন। ব্রহ্মজ্ঞান আছে, ব্রহ্মচর্যও আছে, কিন্তু কর্মহীনতা নাই।

লোলজিহ্বাম্ - ‘‘লোল জিহ্বা’’ সম্বন্ধে কালীধ্যানে বলা হইয়াছে। বাক্ সংযম এবং নির্লোভ প্রকৃতি। অনেক নরনারীতেই অকারণ বক্‌বক্ করিবার স্বভাব আছে। তারা-সাধনার পরও যদি দেখা যায় বক্‌বক্ যায় নাই তবে জানিতে হইবে এ সাধনা কার্যকরী হয় নাই। আমাদের পরম্পরাতে তারা-দীক্ষায় আমরা সাধককে বেশীদিন রাখি না। অনেক অভিজ্ঞতায় এখন মনে হইতেছে, তারাদীক্ষা অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা দীক্ষা দিলেও অপুষ্টতা হেতু কুফল সমান ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কালী দীক্ষাই ভাল ভাবে অনুশীলন করা শ্রেয়ঃ। তুরীয়াশক্তির যে কোন সাধনার ভিত্তি ‘কালী সাধনা’। যাহার ভিত্তি দৃঢ় নয় সে কি করিতে সক্ষম?

মহাভীমাং - অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপা। ব্রহ্মচর্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত সাধক বা যোগিনীকে ভোগপথে টানিতে বা ভোগদৃষ্টিতে দেখিতে কে না ভয় পায়?

কালী ধ্যানে ভোগে ব্রহ্মচর্যের কথা বলা হইয়াছে, প্রারব্ধ কারণে, শিবতুল্য শক্তিমান যোগীর ঐরূপ ক্ষয়হীন ব্রহ্মচর্য জীবন আসিতে পারে। আবার শ্রীরাধার মত ঈর্ষাহীন একনিষ্ঠ প্রারব্ধ জীবনও কোন কোন নারীর হইতে পারে। এঁরাও ভয়ঙ্কর এবং শক্তিসম্পন্না।

বরপ্রদাং - বরপ্রদানকারী। ভোগদৃষ্টির ফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইলেও মাতৃদৃষ্টিতে দেখিলে স্নেহ বা আশীর্বাদের অভাব নাই।

খড়্গকর্তৃসমাযুক্ত-সব্যেতর ভুজদ্বয়াম্। কপালোৎপল-সংযুক্ত সব্যপাণি যুগান্বিতাম্ - দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ইনি খড়্গ এবং কর্তরিকা ধারণ করিয়াছেন। বাম হস্তদ্বয়ে নরকপাল এবং পদ্ম ধারণ করিয়াছেন।

খড়্গ অসুরকে বধ করিবার জন্য বলবান অস্ত্র। কর্তরিকা হালকা অস্ত্র। ইহা দুর্বলবাদীদের বধের অস্ত্র। কালী ধ্যানে খড়্গ দেবীর বাম করে ছিল। এখানে দক্ষিণ করে থাকিবার ইহাই কারণ যে সমাজপথে চলিতে চলিতে কে কখন অসুর হইবে কেহই তাহা জানে না। অসুরবাদ সমাজপথের একটি নিয়ম। এই নিয়মে চলিলে আত্মজ্ঞান অসম্ভব, এইরূপ দুর্বলবাদ গ্রহণ করিলেও সমাজকে আসুরিক অত্যাচারের সম্মুখীন

হইতেই হইবে। দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদ দুই-ই কর্তন করিতে করিতে আত্মজ্ঞানের পথে চলিতে হইবে। শক্তিবাদের ইহা মূলনীতি। মায়ের বাম হস্তে নরকপাল এবং কমল রহিয়াছে। মস্তকের মধ্যেই জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার। সাধক ইহার অনুশীলন করিতে করিতে এবং সাধকগণকে করাইতে করাইতে চলিবেন। শান্তিকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করিতে হয়। যে কোন জ্ঞান, যে কোন বোধ, যে কোন অনুভূতি যদি সাধককে শান্তির অবলম্বন হইতে দূরে লইয়া যায়, উহা করণীয় হইতেই পারে না। সাধকের ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; অসুর কাটো, দুর্বলবাদীদিগকে ছিন্ন কর, জ্ঞানের অনুশীলন কর এবং শান্তিকে আঁকড়াইয়া রাখ। ব্রহ্মকর্মের ইহাই নীতি। অসুরবাদকে প্রশ্রয় দিয়া লাভ নাই। উহারা একটি বর্বরতা ও অন্যায় করে এবং অন্যটি করিবার জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রস্তুত হইতে থাকে।

পিঙ্গোগ্রৈক জটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্ - ইনি শিরোদেশে একটি পিঙ্গল বর্ণ জটা ধারণ করিয়াছেন। মুকুটে নানারূপধারী অক্ষোভ্য ঋষি রহিয়াছেন।

জটা ধারণ ব্রহ্মচর্য জীবনেরই চিহ্ন। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ীই যে নাগরূপ আত্মা, ইহা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে শিবমূর্তি ব্যাখ্যায় দেখুন। সাধক যতই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন সাধকের আত্মা ততই ক্ষোভহীন হইতে থাকে। ব্রহ্মনাড়ীই শক্তিনাড়ী, এজন্য এই অক্ষোভ্যকে শাস্ত্রে 'নাগিনী' বলা হইয়াছে।

বালার্ক মণ্ডলাকার-লোচনত্রয় ভূষিতাম্ - উদয়কালীন সূর্যের মত মণ্ডলাকার তিনটি চক্ষু দ্বারা তিনি ভূষিতা। শক্তির তিন চক্ষের কথা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। মণ্ডলাকার চক্র মানে দৃষ্টিশক্তিতে কোন প্রকার দুর্বলতার লক্ষণ নাই। নিখুঁত দৃষ্টি, সূর্যের মত সতেজ দৃষ্টি। শক্তিস্তরের দৃষ্টি এমনই নিখুঁত যে তিনকালেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইহা অসুরের সঙ্গে মিতালী করিয়া নিজের ঘরের সব সম্পদ দুষ্টের হাতে তুলিয়া দিয়া পরে অনুতাপ করিবার মত দৃষ্টিশক্তি নহে। এ স্তরের সাধক ত্রিকালজ্ঞ হন।

জ্বলচ্চিতা মধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্ - তিনি জ্বলন্ত চিতা-মধ্যে স্থিতা আছেন। তাঁহার দন্তপংক্তি অতি ভয়ঙ্কর।

তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকালকে ভক্ষণ করিতে শক্তিধারিণী। তিনি চিতামধ্যে আছেন - মানে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ আদি সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার আবির্ভাবে জ্বলিয়া যাইতেছে। সৃষ্টির সব উপাদান শেষ হইলে কেবল শক্তিই অবশিষ্ট থাকেন।

স্বাবেশ স্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার ভূষিতাম্ - তিনি নিজের আবেশে নিজে আনন্দপূর্ণ বদনেই আছেন এবং নারী অলঙ্কারে ভূষিতা আছেন।

সব সৃষ্টির উপাদানই শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার আনন্দের অভাব নাই। শক্তিস্তরটাই এইরূপ যে সদা আনন্দময়ী, সদা উৎসাহী, সদা ক্রিয়াময়ী। তিনি স্ত্রী অলঙ্কারে ভূষিতা মানে তিনি ইহা দেখাইতেছেন যে তিনি এখনও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপা হন নাই।

বিশ্ব ব্যাপক তোয়ান্ত শ্বেত পদ্মোপরিস্থিতাম্ - বিশ্ব ব্যাপক জলের মধ্যে তিনি শ্বেতপদ্মের উপর স্থিতা আছেন।

অব্যক্ত আধারই সূক্ষ্ম অমৃত রসের সাগর। এই অমৃতের স্পর্শ পায় বলিয়াই সৃষ্টির কোন উপাদানই ধ্বংস হয় না এবং নবীন সৃষ্টিকালে উহারা সৃষ্টিতে নবরূপে আবির্ভূত হয়। শ্বেত কমল দিব্যভাবের প্রতীক।

ধ্যানের পর আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা, মানসপূজা, মন্ত্র চৈতন্য এবং জপ। এইভাবেই তারা সাধনা করা প্রয়োজন।

গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদ মঠে তারা মূর্তি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর বসন্ত পঞ্চমীতে মায়ের পূজা উৎসবের দিন ধার্য আছে। সেইদিন মহাশক্তি, নীল সরস্বতীর পূজা যজ্ঞ এবং চণ্ডী পাঠ উৎসব হইয়া থাকে। নীল সরস্বতী পূজায় যে সব অন্য অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে এখানে কিছু নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। মঠের প্রত্যেক শক্তিপূজায়ই যন্ত্র অঙ্কন করিয়া সেই যন্ত্রের উপর ঘট স্থাপনা করা হইয়া থাকে। তারা পূজার অনুষ্ঠানেও ইহা কর্তব্য। প্রতি অমাবস্যায় এবং বসন্ত পঞ্চমীতে ক্রমাভিষিক্ত সাধকের তারা পূজা করা কর্তব্য। মানসপূজার পর সমস্ত অনুষ্ঠান কালীপূজার মতন হইবে। অর্থাৎ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন। ঘটে বা যন্ত্রে পীঠপূজা (কালীপূজার মত) করিয়া যন্ত্রের মধ্যস্থিত কমলের কেশর চিন্তাসহ - লক্ষ্মীঃ সরস্বতী রতি প্রীতিঃ কীর্তিঃ শান্তিঃ তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ এই অষ্ট শক্তির পূজা করিয়া মধ্যে ওঁ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ॥ এইভাবে পীঠপূজা শেষ করিয়া পুনর্ধ্যান কর্তব্য।

পুনর্ধ্যান॥ আবাহন॥ প্রাণপ্রতিষ্ঠা॥ ষোড়শোপচারে পূজা॥ তারাদেবীর পূজামন্ত্র :- ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্ শ্রীমদেকজটে বজ্র পুষ্পং প্রতীচ্ছ হূঁ ফট্ স্বাহা, (ইদং আসনং ইত্যাদি) শ্রীমদেক জটায়ৈ তারায়ৈ নমঃ॥ আবরণ পূজা॥ পঞ্চদশ যোগিনীর পূজা॥ চতুষষ্ঠী যোগিনীর পূজা॥ ব্রহ্মাদি অষ্ট শক্তির পূজা॥ ভৈরবগণের পূজা॥ বটুকগণের পূজা॥ দেবীর অস্ত্রগণের পূজা॥ ক্ষেত্রপালগণের পূজা॥ মহাকালের পূজা॥ মহাকালের বলিদান॥ মহাকালের তর্পণ॥ অক্ষোভ্য ঋষির পূজা॥ দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ, মানবৌঘ গুরুগণের পূজা॥ গুরু, পরম গুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্টি গুরুগণের পূজা॥ মন্দিরস্থিত সমস্ত দেব ও দেবীগণের পূজা॥ বসন্ত পঞ্চমী সরস্বতীর পূজা ও পুষ্পাঞ্জলী প্রণাম॥ দশ দিকপালগণের পূজা। সমস্ত দেবতার তর্পণ॥ তারা দেবীর পুনঃধ্যান করিয়া বলিদান॥ ১০৮ প্রদীপ দান॥ পুষ্পাঞ্জলী দান॥ শক্তিবাদীয় উপাসনা॥ আরতি॥ যজ্ঞ॥ এই সব অনুষ্ঠানই কালীপূজা বিধানে করিতে হইবে॥ দক্ষিণা॥ উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর পূজা॥ জপাদি॥

তারা সাধকগণের তারা স্তোত্রম্ এবং "ত্রৈলোক্য মোহনম্" নামক তারা কবচ পাঠ করা কর্তব্য। তন্ত্রসার বা অন্য কোন স্তোত্র গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিলেই চলিবে।

ত্রিপুরা সাধনা

ত্রিপুরা সাধনার প্রথম দীক্ষা।

১। বাগ্ভব কুটমন্ত্র :- "ক এ ঈ ল হ্রীঁ"

দীপনী :- "ওঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ"

ত্রিপুরা সাধনার দ্বিতীয় দীক্ষা।
২। কামরাজ কুটমন্ত্র :- “হ স ক ল হ্রীঁ”
দীপনী :- “ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ”
ত্রিপুরা সাধনার তৃতীয় দীক্ষা।
৩। শক্তিকুট মন্ত্র :- “স ক ল হ্রীঁ”
দীপনী :- “হং সঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ সোঽহম্”
ত্রিপুরা সাধনার চতুর্থ দীক্ষা।
৪। স্বপ্নাবতী কুটমন্ত্র :- “হ ক ল স হ্রীঁ
হ ক ল স হ্রীঁ
হ ক হ ল হ্রীঁ
হ স ক ল হ্রীঁ”
ত্রিপুরা সাধনার পঞ্চম দীক্ষা।
৫। মধুমতী কুটমন্ত্র :- “ক হ ল স হ্রীঁ
ক হ য ল হ্রীঁ
ক স স ল হ্রীঁ”
দীপনী : - “ওঁ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ”
ইচ্ছাশক্তি - কালী - ওঁ ভূঃ, মূলাধার।
ক্রিয়াশক্তি - তারা - ওঁ ভুবঃ, মণিপুর।
জ্ঞানশক্তি - ত্রিপুরা - ওঁ স্বঃ, সহস্রার।

ত্রিপুরা সাধনা হইতেছে জ্ঞানশক্তির সাধনা। ইচ্ছাশক্তি কালী, ক্রিয়াশক্তি তারা এবং জ্ঞানশক্তি ত্রিপুরা; ইহা আমাদের গুরু পরম্পরার নির্দেশ। অব্যক্ত শক্তিস্তরেই সৃষ্টির বেগ বিদ্যমান। অব্যক্ত স্তরেই ক্রিয়াশক্তি নিহিত আছে। অব্যক্ত শক্তিস্তরেই জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান। ইচ্ছা (সৃষ্টিবেগ) ও ক্রিয়া (ব্রহ্মজ্ঞানমুখী ক্রিয়া) শক্তির মতন জ্ঞানশক্তির বেগও অব্যক্ত স্তরে একটি মৌলিক বেগ। ইঁহারা কেহই অন্য হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ সাধক বহুদিন অব্যক্ত স্তরে স্থিত হইলে জ্ঞানশক্তিরও সন্ধান পাইবেন। ইহা সাধককে গম্ভীর করে, আত্মপ্রত্যয়শীল করে এবং প্রভুত্বের সামর্থ্য দান করে। যত উচ্চ স্তরের মহাপুরুষের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই ত্রিপুরার উপাসক। কালী সাধনার সাধককে সাধনার শক্তিই তারা সাধনার উন্নতির ক্রমে চালিত করে। জ্ঞানশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাধকের তীব্র তপঃচর্যা সাম্য হয় না। ত্রিপুরার অন্য নাম ‘ষোড়শী’। অর্থাৎ ষোল কলায় পরিপুষ্ট মহাশক্তি। কিছুদিন ত্রিপুরা সাধনার পরই দেখা যায়, সাধক নিজের সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। উগ্রতম ত্যাগ ও তপস্যার পূর্বে এইরূপ লক্ষণকে ভাল লক্ষণ বলা চলে না। কারণ এ সব সাধকগণ সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে কোন দূরদর্শী কর্মবিজ্ঞানের ভিত্তি দিতে সক্ষম হন না। ত্রিপুরা সাধকদের মধ্যে ব্যাস, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্যের মত ব্রহ্মর্ষি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের মত রাজর্ষিগণের মত গম্ভীর চিন্তাধারা ও জ্ঞানধারা খুব কম সাধকের মধ্যেই

দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ সাধারণ গৃহীদের স্তরে অবস্থিত থাকিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার দিকে ঝুকিয়া যান। ইহার ফলেই ভাববাদ ও পৌরোহিত্যবাদ আধুনিক ভারতে প্রবেশ হইয়া চলিয়াছে। হাজার চেষ্টা কর, এইরূপ বিকৃত কর্ম ও জ্ঞানধারার মূল উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। শক্তিবাদ ধারার সাধকগণ সব সময়ই শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীর আলোচনা ও প্রচার সহ শক্তিবাদী ধর্ম প্রচারে মন দিবেন।

কালী ও তারা সাধনার সাধকগণের মতই ত্রিপুরা সাধকগণ আসনে উপবেশন, (যাঁহারা ত্রিপুরা পূজা করিবেন তাঁহারা কালীপূজার বিধিতে পঞ্চদেবতার পূজা পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণায়াম করিবেন) প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর মাতৃকান্যাস ও বাহ্য মাতৃকান্যাস করিবেন। ত্রিপুরান্যাস সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

তারা সাধনার গ্রহন্যাস, লোকপালন্যাস, শিবশক্তিন্যাস, তারান্যাস, তারাপীঠন্যাস, করাঙ্গন্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস ও ঋষ্যাদিন্যাসের কথা আমরা বলিয়াছি।

শাক্ত ও পূর্ণ দীক্ষায় কালী সাধনা করিতে হয়। এ সময় সাধক মাত্র সাধনায় প্রবেশ করিয়াছেন। এই কারণ, সাধক এদিকে ওদিকে দৃষ্টি না দিয়া জ্ঞানবিকাশের দিকে যেন ছুটিয়া অগ্রসর হইতে ব্যস্ত। নিজের স্থূল শরীরকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানানুশীলনই যেন প্রধানতা লাভ করিয়াছে। তারা সাধনাকালে ন্যাসের প্রকৃতিগুলির লক্ষ্য যেন ক্রমে বিশ্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কালীর সাধনায় সাধক জ্ঞানের ধারা নিজের স্থূল শরীরের বিভিন্ন মর্ম ও সন্ধিস্থানে প্রবাহিত করিতে চাহেন। তারা সাধনাকালে জ্ঞানের ধারাকে কেবল স্থূল শরীরেই প্রবাহিত করিতেছেন না জ্ঞানের উন্নত ধারাকে বিশ্বরূপের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রবাহিত করিয়া পরে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিজের জীবনকথার একটা অংশের কথা আলোচনা করা কর্তব্য মনে করি। উন্নত স্তরের সাধক কেবল নিজেকে লইয়া থাকিতে পারেন না। সাধকের সাধনালব্ধ জ্ঞানধারা অন্যকে দিবারও প্রয়োজন হয়। সাধনা ও জ্ঞানের ধারা অন্যকে দান না করিলে সাধককে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের লোককে লইয়া জীবন কাটাইতে হইবে।

গুরুদেবের আনন্দাশ্রম ছাড়িয়া ভৈরব গুহায় আশ্রয় লইবার পর কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল অত্যন্ত নিম্ন স্তরের ভক্তের দল আমাকে ঘেরিয়া থাকিতে চায়। নিজেরা অত্যন্ত নিম্ন স্তরের চিন্তাধারা লইয়া দিন কাটাইয়া এবং আমার নিকট আসিয়া মতলবের কথা এবং ভক্তির ভাণ, ইহা দেখিয়া আমি চিন্তিত হইলাম। জীবন যদি এ সব ছলনার খেলা লইয়াই কাটাইতে হয় তবে এ তো ভয়ঙ্কর জীবন হইয়া দাঁড়াইল, বলিতে হয়। অন্ন, বস্ত্র ও সেবা আমি যাহা পাই তাহাতেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এজন্য আমাকে কোনও প্রকার চেষ্টা করিতে হয় না বা হইবে না; কারণ আমি আকাশ-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু মানুষের ভক্তিকে সুপথে চালনা করিবার চেষ্টা না করিয়া আমি অন্য কি লইয়া কাটাইতে পারি? অধ্যাত্ম চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত এবং ধর্মগত সব রকমের সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া এবং কিছু না বলিয়া বা না করিয়া কেবল কপট ভক্তির অবলম্বনে জীবন কাটানো সম্ভব কি? কয়েক মাস বিবেচনার পর আমি স্থির করিলাম, যদি কেহ সাধনার ধারা গ্রহণ করিতে চায় আমাকেও নিশ্চয়ই কিছু কিছু সন্ধান দিতে হইবে। নয়তো বাহ্য জীবন অত্যন্ত নীরস ও সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে।

কালী সাধনার ন্যাসবিধানে সাধকের নিজের শরীরে জ্ঞানের ধারাকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তারা সাধনা কালে গ্রহদের প্রভাবকেও নিজের শরীরে শুদ্ধ জ্ঞানালোকে উৎভাসিত করিয়া টানিবার বা প্রতিষ্ঠা দিবার আগ্রহ দেখা যায়। তারা সাধনায় গ্রহন্যাসের ইহাই মর্মকথা। সাধক ক্রমেই স্থূল শরীরের সীমা ছাড়াইয়া বিশ্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

বৈদিক যুগে ভারতের দশ প্রান্তে দশ দিকপালের রাজ্য ছিল। ইঁহারা কেহই দুর্বলবাদী বা অস্থরবাদী রাজা ছিলেন না। সাধক ইঁহাদের মত তেজস্বী, অস্থর বিরোধী, অধ্যাত্মবাদী এবং সমাজহিতৈষী হইবার আদর্শ গ্রহণ করিবেন, এ জন্য দিকপাল ন্যাস। দিকপাল ন্যাসে, সাধক গ্রহন্যাস হইতেও বেশী বাস্তববাদী হইতে চলিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতই অধ্যাত্মবাদী ও শক্তিবাদী মহান দেশ। এখানে যাঁহারা গুরু হইবেন বা শাসক বা কর্মী হইবেন তাঁহাদের জন্য আদর্শ কর্মী ঐ দশদিকপাল। ইঁহারা সকলেই অস্থরবিরোধী শক্তিবাদী ছিলেন।

তারা সাধনায় শিবশক্তি ন্যাসের লক্ষ্য॥ কর্মশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির কেন্দ্র হইতেছে ব্রহ্মনাড়ী আশ্রিত ষট্‌চক্র। শিব মানে জ্ঞানশক্তি, শক্তি মানে কর্মশক্তি। দুইয়ের সামঞ্জস্যময় জীবন হওয়া চাই। জ্ঞানের আলোহীন কর্ম কোন উচ্চ কর্ম নহে। আবার কর্মের অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন জ্ঞান বা অনুভূতিই অনুভূতি নহে। তারা সাধনায় দেখা যায়, সাধককে ক্রমেই কর্মজগতের জন্য শক্তিমান করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। জ্ঞান থাকিবে এবং অনন্ত কর্মশক্তি থাকিবে, তবেই তো সাধক এবং যোগী এবং অধ্যাত্মবাদী গুরু; নয় তো দুর্বলবাদ এবং অস্থরবাদ যে অধ্যাত্মবাদী সমাজের সর্বনাশ করিবে।

তারান্যাসের মর্মকথা। তারা সাধনা যে সাধককে কতরকমে শক্ত করিয়া দেয়, তারান্যাসে উহার মর্ম পাওয়া যায়। তারা অধ্যায়ে সাধক তারার নামগুলি দেখুন।

তারা সাধনায় পীঠন্যাস মর্ম॥ ভারতের অনেক স্থানেই তারা সাধনার কেন্দ্র ছিল। পীঠন্যাস অনুষ্ঠানে সেই সব স্থানের উপর সাধকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধক স্থূল জগতের তারা সাধনার কেন্দ্রগুলি হইতেও শক্তি আহরণ করিবেন। তারা সাধনার মূলকথা এবং লক্ষ্য বুঝিয়া এবার ত্রিপুরা সাধনার কথা বলা যাইতেছে। ত্রিপুরা সাধনায় জ্ঞানের দিক অত্যন্ত গম্ভীর এবং কর্মদিক আরও বাস্তববাদিতায় পরিপূর্ণ। সাধক ক্রমেই জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্রে ডুবিতেছেন এবং কর্মজগতে বাস্তবতার সম্মুখীন হইতেছেন, মনে রাখিবেন। গুরুরা তোমাকে এমনিই সিদ্ধ করিয়া এবং মহাপুরুষ করিয়া দিতেছেন না, তোমার হাতে ভারতের অধ্যাত্মবাদ রক্ষার চাবি তুলিয়া দিবেন, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন। ভাবিও না, ঈশ্বর এক জায়গায় বসিয়া, গল্পগুজব করিয়া দিন কাটান। তিনি অনন্ত কর্মশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির আধার। যে মানবে কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তির যত বেশী স্ফুরণ তিনি ততবড় মানুষ। কর্মহীনতা বা দুর্বলবাদিতা ও অস্থরবাদিতা কোন উচ্চস্তরের মনুষ্যত্ব নহে; কর্মবাদিতা এবং শক্তিবাদিতাই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব।

এই অধ্যায়ের আরম্ভেই আমরা বাগ্‌ভব, কামরাজ, শক্তি, স্বপ্নাবতী ও মধুমতী কুট সম্বন্ধে বলিয়াছি। এইসব মন্ত্রই আমি গুরুপরম্পরাগত ভাবে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি।

গুরুদেব এই সব দীক্ষা পর পর দান করিয়াছেন। এখানে বলা প্রয়োজন। গুরুর আশীর্বাদ এবং স্নেহই শ্রীবিদ্যা সাধনার মূলসম্পদ। শ্রীবিদ্যা সাধনা অত্যন্ত দুর্লভ এবং অত্যন্ত গোপনীয়। মহাদেব পার্বতীকে এ সব দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা সাধনা অত্যন্ত বৃহৎ। ইহার যে কত মন্ত্র ও কত রকম সাধনা আছে উহার হিসাব করা কঠিন।

ত্রিপুরান্যাস। প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, বাহ্য মাতৃকান্যাস, অন্তর মাতৃকান্যাস, সবই কালী সাধনার মত সম্পন্ন করিয়া পরে ত্রিপুরান্যাস করিতে হইবে।

ত্রিপুরা সাধনায় ঋষ্যাদি ন্যাস। ওঁ অস্য ত্রিপুরা স্নন্দরী মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তি ঋষিঃ, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ, ত্রিপুর স্নন্দরী দেবতা, বাগ্‌ভব বীজং কামরাজ কীলকং, তার্তীয়ং শক্তিঃ, পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ত্রিপুর স্নন্দর্যে দেবতায়ৈ নমঃ।

ত্রিপুরা সাধনায় বশিন্যাদিন্যাস। (তত্ত্বমুদ্রায়) অং ১৬ র ব লুং বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে। কং ৫ কলহ্রীং কামেশ্বরী বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ ললাটে। চং ৫ নবলীং মোদিনী বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ মস্তকে। টং ৫ যবলুং বিমলা বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ কণ্ঠে। তং ৫ জমলীং অরুণা বাগ্‌দেবতায়ৈ নমো হৃদি। পং ৫ হ স ল ব যুং জয়িনী বাগ্‌দেবতায়ৈ নমো নাভৌ। যং রং লং বং ঝং মরয়ুং সর্বেশ্বরী বাগ্‌দেবতায়ৈ নমো মূলাধারে। শং ষং সং হং ক্ষং ক্ষমরীং কৌলিনী বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ সর্বাঙ্গে॥

ত্রিপুরা সাধনায় নিবৃত্তিন্যাস। ক্রাঃ নিবৃত্তৈ নমঃ গুহ্যে। ক্রীঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ হৃদয়ে। ঐঃ বিদ্যায়ৈ নমঃ কণ্ঠে। হৌঃ শান্ত্যৈ নমঃ ভ্রূমধ্যে। হ্রৌঃ অমৃতায়ৈ নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে।

ত্রিপুরা সাধনায় পীঠতত্ত্বন্যাস। মূলাধারে ক এ ঈ ল হ্রীঁ অগ্নিচক্রে কামগির্যালয়ে মিত্রীশ নাথাত্মকে রুদ্রশক্তি কামেশ্বরী দেবী শ্রীপাদুকায়ৈঃ নমঃ। হৃদয়ে স হ ক হ ল হ্রীঁ সূর্যচক্রে জালন্ধর পীঠে ষষ্ঠীশ নাথাত্মকে বিষ্ণবাত্মশক্তি শ্রী বজ্রেশ্বরী দেবী শ্রী পাদুকায়ৈ নমঃ। ললাটে স ক ল হ্রীঁ সোমচক্রে পূর্ণগিরি পীঠে উড্ডীশ নাথাত্মকে ব্রহ্মাত্মশক্তি শ্রীভগমালিনী দেবী শ্রীপাদুকায়ৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ পরংব্রহ্মচক্রে উড্ডীয়ান পীঠে শ্রীচর্যানাথাত্মকে ব্রহ্মাত্ম শক্তি শ্রীমহা-ত্রিপুর স্নন্দরী দেবী পাদুকায়ৈ নমঃ।

ত্রিপুরা সাধনায় তত্ত্বন্যাস। মূলাধারে ক এ ঈ ল হ্রীঁ আত্মতত্ত্বব্যাপিকা ত্রিপুরস্নন্দর্যৈ নমঃ। হৃদয়ে স হ ক হ ল হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্ব ব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুর স্নন্দর্যৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে স ক ল হ্রীঁ শিবতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রী মহাত্রিপুরস্নন্দর্যৈ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ক এ ঈ ল হ্রীঁ স ক হ ল হ্রীঁ সর্বতত্ত্বব্যাপিকায়ৈ শ্রীমহাত্রিপুরস্নন্দর্যৈ নমঃ॥

পঞ্চদশীন্যাস। মূলাধারে কং নমঃ। হৃদয়ে এং নমঃ। দক্ষিণ নেত্রে ঈং নমঃ। বাম নেত্রে লং নমঃ। দক্ষিণ কর্ণে হ্রীঁ নমঃ। বাম কর্ণে সং নমঃ। দক্ষিণ নাসাতে হং নমঃ। বাম নাসাতে কং নমঃ। মুখে হং নমঃ। দক্ষিণ ভুজে লং নমঃ। বাম ভুজে হ্রীঁ নমঃ। পৃষ্ঠে সং নমঃ। দক্ষিণ জানুতে কং নমঃ। বাম জানুতে লং নমঃ। নাভিতে হ্রীঁ নমঃ॥

সংহারন্যাস॥ পাদদ্বয়ে কং নমঃ। জঙ্ঘাদ্বয়ে এং নমঃ। জানুদ্বয়ে ঈং নমঃ। কটিতে লং নমঃ। অঙ্গুলী পৃষ্ঠে হ্রীঁ নমঃ। নাভিতে সং নমঃ। পার্শ্বদ্বয়ে হং নমঃ। স্তনদ্বয়ে কং

নমঃ। অংসদ্বয়ে হং নমঃ। হস্তদ্বয়ে লং নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্রীঁ নমঃ। মুখে সং নমঃ। ভ্রূযুগলে কং নমঃ। কর্ণে লং নমঃ। করবেষ্টনস্থানে হ্রীঁ নমঃ॥

স্থিতিন্যাস॥ হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠে কং নমঃ। তর্জনীতে এং নমঃ। মধ্যমাতে ঈং নমঃ। অনামিকায় লং নমঃ। কনিষ্ঠায় হ্রীঁ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে সং নমঃ। মুখে হং নমঃ। হৃদয়ে কং নমঃ। নাভি হইতে পা পর্যন্ত হং নমঃ। কণ্ঠ হইতে নাভি পর্যন্ত লং নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত হ্রীঁ নমঃ। পাদলীর অঙ্গুষ্ঠে সং নমঃ। তর্জনীতে কং নমঃ। মধ্যমাতে লং নমঃ। অনামিকায় হ্রীঁ নমঃ। কনিষ্ঠায় সৌঃ নমঃ॥

ত্রিপুরা সাধনার স্থিতিন্যাস॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে কং নমঃ। ললাটে এং নমঃ। নেত্রে ঈং নমঃ। শ্রবণে লং নমঃ। ঘ্রাণে হ্রীঁ নমঃ। মস্তকে সং নমঃ। ওষ্ঠে হং নমঃ। দন্তাধঊর্ধ্বে কং নমঃ। জিহ্বায় হং নমঃ। চিবুকে লং নমঃ। পৃষ্ঠে হ্রীঁ নমঃ। সর্বাঙ্গে সং নমঃ। হৃদি কং নমঃ। স্তনয়ো লং নমঃ। কুক্ষৌ হ্রীঁ নমঃ। লিঙ্গে সৌঃ নমঃ॥

ত্রিপুরা সাধনায় ষোড়ান্যাস॥ ষোড়ান্যাসে গণেশন্যাস, গ্রহন্যাস, নক্ষত্রন্যাস, যোগিনীন্যাস ও রাশিন্যাস বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে গণেশন্যাসটি বাহ্য মাতৃকান্যাসের মত। কেবল ভেদ এই যে ন্যাসস্থানগুলি গণেশের ভিন্ন ভিন্ন নামের সঙ্গে মাতৃকা বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিয়া স্পর্শ করিতে হয়। আমরা গণেশন্যাস বাদ দিলাম। যাঁহারা ইহা করিতে চাহেন, তাঁহারা তন্ত্রসার হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। গণেশ বুদ্ধি এবং বিবেক দেবতা। জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিকে শক্তিশালী করিতে হইবে এবং বিবেকের ধারায় জীবন যাপন করিবার জন্য শক্তিশালী অঙ্গপ্রত্যঙ্গও গড়িতে হইবে।

ত্রিপুরা সাধনায় গ্রহন্যাস॥ ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ অং ১৬ আং আদিত্য রুচিভ্যাং নমো হৃদয়ে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ যং রং লং বং সোং সোমরমাভ্যাং নমো ভ্রূমধ্যে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ কং ৫ অং অঙ্গারক রক্তাভ্যাং নমো নেত্রে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ চং ৫ বুং বুধজ্ঞানরূপাভ্যাং নমো হৃদয়োপরি। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ টং ৫ বৃং বৃহস্পতি যশস্বিনীভ্যাং নমঃ কণ্ঠে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ তং ৫ শুং শুক্রাহ্লাদিনীভ্যাং নমো গলে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ পং ৫ শং শনৈশ্চরশক্তিভ্যাং নমো নাভৌ। ওঁ শং ষং সং হং রাং রাহুকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ বক্তে্র। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ লং ক্ষং কেং কেতুবায়বীভ্যাং নমো গুহ্যে॥

ত্রিপুরা সাধনায় নক্ষত্রন্যাস॥ ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ অং আং অশ্বিন্যৈ নমো ললাটে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ইং ঈং ভরণ্যৈ নমঃ দক্ষনেত্রে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ উং ঊং কৃত্তিকায়ৈ নমঃ বামনেত্রে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ঋং ৠং রোহিন্যৈ নমঃ দক্ষকর্ণে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ঌং ৡং মৃগশিরায়ৈ নমঃ বাম কর্ণে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ এং ঐং আদ্রায়ৈ নমঃ দক্ষ নাসায়াম্। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ওং ঔং পূর্ণবসবে নমঃ বাম নাসায়াম্। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ কং পূষ্যায়ৈ নমঃ কণ্ঠে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ খং গং আশ্লেষায়ৈ নমঃ দক্ষ স্কন্ধে। ওঁ হ্রীঁ ৩ ঘং ঙং মঘায়ৈ নমো বাম স্কন্ধে। ওঁ ৩ চং পূর্বফাল্গুন্যৈ নমো দক্ষ ভুজমধ্যে। ওঁ ৩ ছং জং উত্তর ফাল্গুন্যৈ নমঃ বাম ভুজমধ্যে। ওঁ ৩ ঝং ঞং হস্তায়ৈ নমো দক্ষ মণিবন্ধে। ওঁ ৩ টং ঠং চিত্রায়ৈ নমো বামমণিবন্ধে। ওঁ ৩ ডং স্বাত্যৈ নমো দক্ষ হস্ততলে। ওঁ ৩ ঢং ণং বিশাখায়ৈ নমো বামহস্ত তলে। ওঁ ৩ তং থং দং অনুরাধায়ৈ নমো নাভৌ। ওঁ ৩ ধং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমো দক্ষকটিদেশে। ওঁ ৩ নং পং ফং মূলায়ৈ নমো বামকটিদেশে। ওঁ ৩ বং পূর্বাষাঢ়ায়ৈ

নমো দক্ষোরৌ। ওঁ ৩ ভং উত্তরাষাঢ়ে নমো বামারৌ। ওঁ ৩ মং শ্রবণায়ৈ নমো দক্ষজানুনি। ওঁ ৩ যং রং কনিষ্ঠায়ৈ নমো বাম জানুনি। ওঁ ৩ লং শতাভিষায়ৈ নমো দক্ষজঙ্ঘায়াম্। ওঁ ৩ বং শং পূর্বভাদ্র পদায়ৈ নমো বাম জঙ্ঘায়াম্। ওঁ ৩ ষং সং হং উত্তরভাদ্রপদায়ৈ নমো দক্ষপাদে। ওঁ ৩ লং ক্ষং অং অঃ রেবত্যৈ নমো বামপদে।

ত্রিপুরা সাধনায় যোগিনীন্যাস॥ ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং ডাং ডীং ডূং ড ম ল য র যূং ডাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ ত্বগাত্মনে নমঃ কণ্ঠে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং রাং রীং রূং র ম ল ব র যূং রাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ অসৃগাত্মনে নমো হৃদয়ে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং নাং নীং নূং ন ল ম ল ব র যূং লাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ মাংসাত্মনে নমো নাভৌ। ওঁ ৩ বং ভং মং যং রং লং কাং কীং কূং ক ম ল ব র যূং কাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ মেদাত্মনে নমঃ স্বাধিষ্ঠানে। ওঁ ৩ বং শং ষং সং সাং সীং সূং স ম ল ব র যূঁ শাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ অস্থ্যাত্মনে নমো মূলাধারে। ওঁ ৩ হং লং ক্ষং হাং হীং হূং হ ম ল ব র যূঁ হাকিন্যৈ মাং রক্ষ রক্ষ মজ্জাত্মনে নমো ভ্রূমধ্যে।

ত্রিপুরা সাধনায় রাশিন্যাস॥ ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ অং আং ইং ঈং মেষ রাশয়ে নমো দক্ষগুলফে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ উং ঊং ঋং বৃষ রাশয়ে নমো দক্ষজানুনি। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ৠং ঌং ৡং মিথুন রাশয়ে নমো দক্ষ বৃষণে। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ এং ঐং কর্কট রাশয়ে নমো দক্ষকুক্ষৌ। ওঁ ৩ ওঁ ঔঁ সিংহ রাশয়ে নমো দক্ষ স্কন্ধে। ওঁ ৩ অং অঃ শং ষং সং হং লং ক্ষং কন্যারাশয়ে নমো দক্ষ মস্তকে। ওঁ ৩ কং খং গং ঘং ঙং তুলা রাশয়ে নমো বাম মস্তকে। ওঁ ৩ চং ছং জং ঝং ঞং বৃশ্চিক রাশয়ে নমো বাম বাহুমূলে। ওঁ ৩ টং ঠং ডং ঢং ণং ধনুরাশয়ে নমো বামকুক্ষৌ। ওঁ ৩ তং থং দং ধং নং মকর রাশয়ে নমো বাম বৃষণে। ওঁ ৩ পং ফং বং ভং মং কুম্ভরাশয়ে নমো বাম জানুনি। ওঁ ৩ যং রং লং বং মীন রাশয়ে নমো বাম গুলফে।

ত্রিপুরা সাধনায় পীঠন্যাস॥ অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণমালা শক্তিপীঠের নামের সঙ্গে যুক্ত করিয়া মাতৃকান্যাসের স্থানানুযায়ী ন্যাস করিতে হয়। এই ন্যাসে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় ভারতের কোন কোন স্থানে ত্রিপুরা সাধনার কেন্দ্র ছিল। এখনও সেই সব স্থানে ত্রিপুরা সাধনার প্রভাব বিদ্যমান। তারা সাধনার পীঠস্থানের ব্যাপকত্ব হইতে ত্রিপুরা সাধনার পীঠস্থানের ব্যাপকত্ব অনেক বেশী। যাঁহারা এই ন্যাস করিতে চাহেন তাঁহারা ‘‘তন্ত্রসার’’ হইতে সংগ্রহ করিবেন।

ত্রিপুরা সাধনায় ত্রিপুরান্যাস॥ এই ন্যাসও মাতৃকা ন্যাসের মতনই পঞ্চাশটি বর্ণসহ শরীরের পঞ্চাশটি স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তারা সাধনায় তারান্যাস যেমন দৃঢ়তা ও উগ্রতার ভাবমণ্ডিত, ত্রিপুরান্যাসের মর্মকে ঠিক উহার বিপরীত বলিতে হইবে। মনের কোমলতাকে কেন্দ্র করিয়া মানবে যে সব ভাবপ্রবণতা দেখা যায় ত্রিপুরা ন্যাসে সেই সব ভাবপ্রবণতাকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে। বিশ্বকে বশীভূত করিতে হইলে নিজেকেও নানাপ্রকারে কোমল হইতে হয়। নিজে হাস, অন্যকে হাসাও; নিজে কান্না কর, অন্যকে কাঁদাও। নিজে পাগল হও, অন্যকে পাগল কর।

আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া নিজেকে এইভাবেই গড়িয়া লইতে হয়; তবেই লোকের শ্রদ্ধা, অর্থের প্রাচুর্য, জ্ঞানী ও শক্তিমান লোকের সমাগমে তুমি ষোল কলায় ষোড়শী হইবে। সাবধান, সাধক যেন শখ করিয়া ভাবপ্রবণ ও পাগল সাজিও না। কোমলকলার মধ্যে জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত করিয়া নিজেকে শক্তিমান ও জ্ঞানী হইতে হইবে।

ত্রিপুরা সাধনায় কামরতিন্যাস॥ এই ন্যাসেও কোমলকলার পরিবেশের কথাই বিদ্যমান। ইহাও পঞ্চাশটি বর্ণমালায় মাতৃকান্যাসের স্থান স্পর্শ নির্দিষ্ট আছে। ব্যাস ও আচার্য শঙ্করের মত বহুমুখী জ্ঞানীরা যে জ্ঞানশক্তি ত্রিপুরা সাধনার মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ে ভারতের মনপ্রাণ জয় করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য শঙ্কর কর্তৃক আনন্দ লহরী স্তোত্র এবং দক্ষিণামূর্তি গুরুস্তোত্রে ত্রিপুরা সাধনার কথা বিশদভাবেই রহিয়াছে। আচার্য শঙ্কর বেদান্তের বিশাল জ্ঞানের সাগরে অল্পজ্ঞানী বৌদ্ধবাদকে কয়েকদিনের চেষ্টায়ই নিমজ্জন করিয়াছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্তমান যুগের রাজনৈতিক নেতারা যে জনতাকে খেপাইয়া কর্তৃত্ব করেন এবং সিনেমার তারকাগণ যে মানুষকে সম্মোহিত করিয়া নাম ও অর্থ উপার্জন করেন; ইঁহারাও কি ত্রিপুরা সাধক? আমার মনে হয়, কোন জন্মের সাধনায় ইহাদেরও হয়তো ত্রিপুরা সাধনা কিছুটা ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা - জ্ঞানশক্তির অভাবে এদের মনে কোনই সুখ বা শান্তি থাকে না। আজ যাঁহারা কর্তৃত্ব করেন, কালই তাঁহাদের নামে জনতা জুতা ছোঁড়ে। আজ যে তারকা জনতার কাম বিলাসিনী, কালই তাঁহাকে কেহ দেখিতে অগ্রসর হয় না। আমরা বলি, জ্ঞানশক্তিই সকল প্রকার কোমলকলার আধার; এজন্যই ত্রিপুরা ষোড়ান্যাসে কঠোর গণেশন্যাসের সঙ্গে অনেক কোমলকলার ন্যাস সন্নিবিষ্ট আছে। কোমলন্যাসের মধ্য দিয়া জ্ঞানের বিকাশ করাই এসব ন্যাসের লক্ষ্য।

ত্রিপুরা সাধনায় আরও অনেক প্রকারের ন্যাসের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে প্রকটযোগিনী ন্যাসের আলোচনা করিয়া এই ন্যাস অধ্যায় শেষ করিব। শেষ পর্যন্ত পাঠক জানিয়া রাখুন, সমস্ত প্রকার ললিতকলাগুলি জ্ঞানশক্তিরই অংশ; যদি সাধকের সংযমের অবলম্বন থাকে।

ত্রিপুরা সাধনায় প্রকটযোগিনী ন্যাস॥ মূলাধারে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকটযোগিনীভ্যো নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুপ্তযোগিনীভ্যো নমঃ। নাভৌ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুপ্ততর যোগিনীভ্যো নমঃ। হৃদয়ে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সম্প্রদায় যোগিনীভ্যো নমঃ। কণ্ঠে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রহস্য যোগিনীভ্যো নমঃ। নাদান্তে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অতিরহস্য যোগিনীভ্যো নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমাতি রহস্য যোগিনীভ্যো নমঃ॥

ত্রিপুরা সাধনার ন্যাস অংশ অত্যন্ত লম্বা। একদিনে সব না করিয়া শাস্ত্রে এসব সাধনা ভাগে ভাগে করিতে বলিয়াছে। আসল কথা, ত্রিপুরা সাধনা জ্ঞানেরই সাধনা, এখানে বাহ্য পূজা অপেক্ষা ন্যাসমধ্যে সূক্ষ্মপূজাকে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা সাধনা ও তারা সাধনা অত্যন্ত গুপ্ত সাধনার অঙ্গ। ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষ্যেই ইঁহাদের সাধনা দিব্যাচারী সাধকগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের মতে এই সব উচ্চ স্তরের দিব্যাচারী সাধকগণ সর্বদা আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিবেন। পূর্বসাধকগণ তারা ত্রিপুরা অর্ধনারীশ্বর এবং যোগেশ্বর শিবমন্দির ও মূর্তিকে গুপ্তমন্দিরে স্থাপনার কথাই ভাবিয়াছিলেন। আমি সমস্ত

জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহাই বুঝিলাম, এ সব শক্তিবাদীয় সাধনের কথা হাজার প্রকাশ কর অজ্ঞানীর নিকট ইহা চিরদিন গুপ্তই থাকিবে। যুগের ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের দিনে, উচ্চ স্তরের ব্রহ্মবিদ্যার মর্মগ্রাহী সাধক খুবই কমিয়া যাইতেছে। সাধকগণ বিশেষ বিশেষ নৈমিত্তিক ত্রিপুরা পূজাকালে বিস্তারিতভাবেই সব ন্যাস করিতে পারিবেন।

ত্রিপুরা সাধনার করাঙ্গ ন্যাস॥ অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। আং অনামিকাভ্যাং নমঃ। সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। আং তর্জনীভ্যাং নমঃ। সৌঃ করতলঃ পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হূং। ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ অস্ত্রায় ফট্॥ ইহার পর মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস এবং নয় মুদ্রা প্রদর্শন॥ ওঁ দ্রাং সর্ব সংক্ষোভিনী॥ ওঁ দ্রীঁ সর্বদ্রাবিণী॥ ওঁ ক্লীঁ আকর্ষণী॥ ওঁ ব্লুং সর্ববেশিনী॥ ওঁ সঃ সর্বোন্মাদিনী॥ ওঁ ক্রোং মহাঙ্কুশ॥ ওঁ হ স খ ফ্রেং খেচরী॥ বীজমুদ্রা হেসৌঃ। যোনীমুদ্রা ঐং॥

সব মুদ্রা জানা না থাকিলে তত্তৎ মন্ত্রে জল দিবে এবং সর্বশেষ যোনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ধ্যান করিবে।

ত্রিপুরা ধ্যান

ওঁ ততঃ পদ্মনিভাং দেবীং বালার্ককিরণোজ্জ্বলাম্।
জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্।
পদ্মরাগপ্রতীকাশাং কুঙ্কুমারুণসন্নিভাম্।
স্ফুরন্মুকুটমাণিক্যকিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্।
কালালিকুলসঙ্কাশকুটিলালকপল্লবাম্।
প্রত্যগ্রারুণসঙ্কাশবদনাম্ভোজমণ্ডলাম্।
কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দুকুটিলললাটমৃদুপট্টিকাম্।
পিনাকিধনুরাকারভ্রূলতাং পরমেশ্বরীম্।
আনন্দমুদিতোল্লাসলীলান্দোলিতলোচনাম্।
স্ফুরন্ময়ূখসঙ্কাশবিলসদ্ধেমকুণ্ডলাম্।
সুগণ্ডমণ্ডলাভোগ-জিতেন্দ্বমৃতমণ্ডলাম্।
বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মাণসূত্রসুস্পষ্টনাসিকাম্।
তাম্রবিদ্রুমবিম্বাভরক্তোষ্ঠীমমৃতোপমাম্।
স্মিতমাধুর্য্যবিজিতমাধুর্য্যরসসাগরাম্।
অনৌপম্যগুণোপেত-চিবুকোদ্দেশশোভিতাম্।
কম্বুগ্রীবাং মহাদেবীং মৃণালললিতৈর্ভুজৈঃ।
রক্তোৎপলদলাকারসুকুমারকরাম্বুজাম্।
রক্তাম্বুজনখজ্যোতির্ব্বিতানিতনভস্তলাম্।
মুক্তাহারলতোপেতসমুন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিবলীবলয়াযুক্তমধ্যদেশসুশোভিতাম্॥
লাবণ্যসরিদাবর্ত্তাকারনাভিবিভূষিতাম্।

অনর্ঘরত্নঘটিতকাঞ্চীযুতনিতম্বিনীম্।
নিতম্ববিম্বদ্বিরদরোমরাজিবরাঙ্কুশাম্।
কদলীললিতস্তম্ভসুকুমারোরুমীশ্বরীম্।
লাবণ্যকুসুমাকারজানুমণ্ডলবন্ধুরাম্।
লাবণ্যকদলীতুল্যজঙ্ঘাযুগলমণ্ডিতাম্।
গূঢ়গুল্‌ফপদদ্বন্দ্বপ্রপদাজিতকচ্ছপাম্।
তনুদীর্ঘাঙ্গুলিস্বচ্ছনখরাজিবিরাজিতাম্।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণাম্বুজাম্।
শীতাংশুশতসঙ্কাশকান্তিসন্তানহাসিনীম্।
লৌহিত্যজিতসিন্দূরজবাদাড়িমরূপিনীম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং পাশাঙ্কুশকরোদ্যতাম্।
রক্তপদ্মনিবিষ্টান্ত রক্তাভরণভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রান্ত পঞ্চবাণধনুর্ধরাম্।
কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাম্।
মহামৃগমদোদ্দামকুঙ্কুমারুণবিগ্রহাম্।
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীম্।
জগদাকর্ষণকরীং জগৎকারণরূপিণীম্।
সর্ব্বমন্ত্রময়ীং দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং নিত্যাং সর্ব্বশক্তিময়ীং শিবাম্।
এবং রূপমাত্মানং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজয়েৎ॥

অর্থ - ষোড়শী দেবী পদ্মনিভা, প্রাতঃকালীন সূর্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্টা, জবাপুষ্প, দাড়িম্বকুসুম, পদ্মরাগমণি ও কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণা এবং উজ্জ্বলমুকুটস্থিতমাণিক্যকিঙ্কিণীজালে বিভূষিতা। ইঁহার মস্তকে ভ্রমরপংক্তির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কুটিল অলকা শোভা পাইতেছে। ইঁহার নবোদিত সূর্যমণ্ডলতুল্য বদনমণ্ডল, জটিল ললাটফলকে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, হরধনুর ন্যায় কুটিল ভ্রুলতা, নেত্রত্রয় আনন্দভরে নিমীলিত ও উন্মীলিত হইয়া আন্দোলন হইতেছে। ইঁহার স্ফুরৎকিরণজালের ন্যায় উজ্জ্বল-প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণমণ্ডল, সম্পূর্ণ সুগণ্ডস্থল চন্দ্রের অমৃতমণ্ডল জয় করিয়াছে, সুস্পষ্ট নাসিকা যেন বিশ্বকর্মা কর্তৃক বিনির্মিত; তাম্র, বিদ্রুম ও বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, হাস্যের মাধুর্য রসসাগরের মাধুর্যকে জয় করিয়াছে, অনুপমগুণবিশিষ্ট শোভমান চিবুকদেশ, এই মহাদেবী কম্বুগ্রীবা। ইঁহার সুকুমার হস্ত; কোমলমৃণালসদৃশ ভুজ রক্তোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, রক্তাম্বুজতুল্য নখপ্রভায় আকাশমণ্ডল যেন বিতানবিশিষ্ট হইয়াছে এবং সমুন্নত পয়োধরোপরি মুক্তাহার শোভিত হইয়াছে, ত্রিবলীবলয়াযুক্ত মধ্যদেশ অতি সুশোভিত॥

ইঁহার নাভিমণ্ডল লাবণ্য-সরিতের আবর্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহামূল্য রত্নগঠিত কাঞ্চীহার নিতম্বোপরি বিদ্যমান রহিয়াছে, ললিত কদলীস্তম্ভের ন্যায় সুকুমার ঊরুদ্বয়, লাবণ্যপূর্ণ সুকুমার জঙ্ঘাযুগল অতি মনোহর, গুল্‌ফদ্বয় অতি গুপ্ত এবং পদাগ্র

বিস্তৃত, দীর্ঘ অঙ্গুলীতে স্বচ্ছ নখশ্রেণী সুশোভিত হইতেছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্নে চরণকমল শোভমান, শত শত চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল দেহকান্তি। স্বীয় ললিত প্রভায় জবাপুষ্প ও দাড়িম্বকুসুম পরাজিত হইয়াছে। ইঁহার রক্তবস্ত্র পরিধান এবং হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ আছে। ইনি রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা এবং রক্তবর্ণ আভরণে বিভূষিতা। এই দেবতা চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা এবং ইনি অন্য দুই হস্তে পঞ্চবাণ ও ধনু ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার বদনমণ্ডল কর্পূর-কণামিশ্রিত তাম্বুলরসে পরিপূর্ণ, সর্বাঙ্গ গোরোচনা ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত, অঙ্গ সর্বপ্রকার শৃঙ্গারোপযুক্ত বেশ ও সর্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত। ইনি জগতের আহ্লাদজননী, জগজ্জনরঞ্জনকারিণী, জগদাকর্ষণকারিণী এবং জগতের কারণস্বরূপা, সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী এবং সর্বলক্ষ্মী ও সর্বশক্তিস্বরূপা। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসপূজা করিবে॥

মানসপূজা॥ সাধকগণ মানস-পূজান্তে জপে বসিবেন॥ যাঁহারা ত্রিপুরা পূজা করিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিতভাবে পূজা আরম্ভ করিবেন॥

সামান্যার্ঘ্য স্থাপনম্॥ সামান্যার্ঘ্য পাত্রের বামদিকে মণ্ডল অঙ্কন ও পূজা॥ ত্রিকোণের এক কোণে ওঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ॥ ২য় কোণে ওঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ॥ ঊর্ধ্ব কোণে ওঁ স ক ল হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ॥ কোণমধ্যে ষড়ঙ্গের পূজা॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরা দেবতায়াঃ হৃদয়ায় নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরা দেবতায়াঃ শিরসি স্বাহা॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরা দেবতায়াঃ শিখায়ৈ বষট্॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরা দেবতায়াঃ কবচায় হূঁ॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরা দেবতায়াঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীমদ্ ত্রিপুরা দেবতায়াঃ অস্ত্রায় ফট্॥

বিশেষার্ঘ্য স্থাপনম্॥ ত্রিকোণের মধ্যস্থলে ত্রিপদী স্থাপন করিয়া বহ্নিমণ্ডলের পূজা॥ যথা - ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘপাত্রাধারায় নমঃ। পরে বৃত্তাকারে দশ কলায় পূজা॥ যথা - ওঁ ঐঁ হ্রী শ্রীঁ যং ধূম্রায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রং নীলায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লং কপিলায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং বিস্ফূলিঙ্গৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শং জ্বালিন্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষং হৈমবত্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সং হব্যবাহন্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হং কব্যবাহন্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লং রাত্রৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষং সঙ্কর্ষিন্যৈ নমঃ॥ এবার এই ত্রিপদীর উপরে ধৌত শঙ্খপাত্র স্থাপনা করিবে। পূজা - ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ॥ দ্বাদশ কলার পূজা॥ যথা - ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং ভং তাপিন্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ খং বং তাপিন্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঘং পং বিবুধায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঙং নং বোধিন্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ধং কালিন্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ছং দং শোষিণ্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জং থং বরেণ্যায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঝং তং আকর্ষিণ্যৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঞং ণং মায়ায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঢং বিবস্বতৈ নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঠং ডং হেমপ্রভায়ৈ নমঃ॥

দ্বাদশ কলার পূজা করিবার পর শঙ্খপাত্রে জল ও অন্যান্য অর্ঘ্যদ্রব্যাদি দিবে। অর্ঘ্যজলের মধ্যে গুরুপাদুকা মধ্যস্থিত অ ক থ আদি রেখা এবং কোণত্রয়ে হ ল ক্ষ চিন্তা করিবে এবং পূজা করিবে। যথা - ওঁ সৌঃ ঐং হ্রীং শ্রীং উং সোম মণ্ডলায়

ষোড়শ কলাত্মনে অর্ঘ্য পাত্রামৃতায় নমঃ॥ বৃত্তাকারে ষোড়শ কলার পূজা। যথা - ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং অমৃতায়ৈ নমঃ। ওঁ ৩ আং মানদায়ৈ নমঃ। ওঁ ৩ ইং তুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ ৩ ঈং পুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ ৩ উং প্রীত্যৈ নমঃ। ওঁ ৩ ঊং রত্যৈ। ওঁ ৩ ঋং শ্রিয়ৈ। ওঁ ৩ ৠং ক্রিয়ায়ৈ। ওঁ ৩ ঌং সুধায়ৈ। ওঁ ৩ ৡং রাত্রৈ। ওঁ ৩ এং জ্যোৎস্নায়ৈ। ওঁ ৩ ঐঁ হৈমবত্যৈ। ওঁ ৩ ওং ছায়ায়ৈ। ওঁ ৩ ঔং পূর্ণিমায়ৈ। ওঁ ৩ অং বিদ্যায়ৈ। ওঁ ৩ অঃ অমাবস্যায়ৈ॥ তীর্থ আবাহন॥ ওঁ হংসাত্মনে নমঃ॥ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ আনন্দ ভৈরবায় বষট্॥ হ স ক্ষ ম ল ব র যীং সুধাদেবৈ বষট্॥ মৎস্য মুদ্রা॥ অষ্টধা ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জপ॥ অর্ঘ্যপূজা॥ নবমুদ্রা প্রদর্শন॥ অর্ঘ্যে ষড়ঙ্গ পূজা॥ ব্রহ্মময় সেই জলের সামান্য অংশ সামান্যার্ঘ্য পাত্রে গ্রহণ। নিজের মস্তকে ও সমস্ত পূজা দ্রব্যে সেই জলের ছিটা দিবে এবং সবই ব্রহ্মময় ভাবিবে॥ পূজা শেষ পর্যন্ত এই অর্ঘ্য একই স্থানে স্থির রাখিবে।

শ্রীবিদ্যাযন্ত্র অঙ্কন ও পীঠপূজা॥ যথা - বিন্দুমত্রাস্রমষ্টকোণং এতত্রিত্রয় সংহারক্রম দ্বিদশারং চতুর্দশারম্। স্থিতিচক্রমেতত্রয়ম্। দ্বিদশারম্ চতুর্দশারম্ স্থিতিচক্রমেতত্রয়ম্। অষ্টদল পদ্মম্ ষোড়শদলং বৃত্ত্রয়ম্ চতুর্দ্বার সমাযুক্তমেতৎ সৃষ্টাত্মকম্॥

একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে বিন্দু এবং তদ্বাহ্যে অষ্টকোণ অঙ্কিত করিবে। এতদ্ত্রয়ের নাম সংহার চক্র (· + Δ + অষ্টকোণ)। তদ্বাহ্যে দশকোণদ্বয়, তদ্বাহ্যে চতুর্দশকোণ অঙ্কিত করিবে। এতদ্ত্রয়ের নাম স্থিতিচক্র। তদ্বাহ্যে অষ্টদলপদ্ম এবং তদ্বাহ্যে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহ্যে বৃত্তত্রয় অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে তিনটি ভূপুর চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। ইহার নাম সৃষ্টিচক্র। গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদ মঠে শ্রীবিদ্যা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। খড়দহে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ পূজিত শ্রীযন্ত্র বিদ্যমান। পুরী গোবর্ধন মঠে শঙ্কর পূজিত শ্রীযন্ত্র রহিয়াছে। শ্রীবিদ্যা যন্ত্রকে চলিত কথায় শ্রীযন্ত্র বলা হয়। সাম্রাজ্য দীক্ষাকালে সাধকদের শ্রীযন্ত্র অঙ্কন করিতে হয়। এই যন্ত্রের অঙ্কনও শক্তিশালী সাধনার অঙ্গ। শ্রীযন্ত্রে পীঠপূজা করিবে।

ধ্যান রহস্য॥ মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত গুরুপাদুকা যন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশের চতুর্থ খণ্ডে করা হইয়াছে। সাধক সেই অংশ ভালভাবে আলোচনা করিবেন। গুরুপাদুকান্তর্গত শক্তিপীঠ আছে গুরুপাদুকামন্ত্রে ঐ শক্তিপীঠের নাম ''অবলালয়''। অর্থাৎ শক্তিস্থান। অ ক থ রেখা দ্বারা এই ত্রিকোণ গঠিত হইয়াছে। এই ত্রিকোণই মায়ের আসনবদ্ধ ত্রিকোণ পাদপীঠ। স্বস্তিকাসনে বা পদ্মাসনে বসিলে আমাদের পা দুইখানি দ্বারা সকলেরই এইরূপ ত্রিকোণ আসন প্রস্তুত হয়। মস্তিষ্ক মধ্যস্থলে ত্রিপুরা মা এইভাবে বসিয়া আছেন। অ হইতে অঃ পর্যন্ত ১৬টি বর্ণে এক রেখা, ক হইতে ত পর্যন্ত ১৬টি বর্ণে ২য় রেখা এবং থ হইতে স পর্যন্ত তৃতীয় ১৬টি বর্ণে ত্রিকোণ আসনের তৃতীয় রেখা। এই রেখা তিনটির তিন কোণে হ ল ক্ষ ত্রিবিন্দু। এইভাবে ত্রিকোণ এবং ঊর্দ্ধ ত্রিকোণ রেখা গঠিত এক শক্তিমূর্তিই মায়ের মূর্তি। এই আসন ত্রিকোণ এবং এই ঊর্দ্ধ ত্রিকোণের মধ্যস্থলে ''নাদবিন্দু'' ধ্যান করিতে হয়। একটি অর্ধচন্দ্র এবং অর্ধচন্দ্রের উপরে একটি ''বিন্দু'' অবস্থিত আছে। অর্ধচন্দ্রের ডান ও বাম সীমাকে দুইটি বিন্দু কল্পনা কর। এই বিন্দু দুইটিকে মায়ের দুইটি স্তন কেন্দ্র জানিবে। দ্বিবিন্দু যে মায়ের দুইটি স্তন বিন্দু ইহা বলাই হইল; ঊর্দ্ধ বিন্দু হইতেছে মায়ের কণ্ঠচক্র অর্থাৎ মায়ের বিশুদ্ধাখ্য চক্র। এই

তিনটি কেন্দ্র হইতেছে মায়ের স্নেহজগৎ। এই জগতের স্নেহ পান করিয়া কার্তিক ও গণেশ আজও অসুরনাশকারী ব্রহ্মচারী বলিয়া পূজিত। সিদ্ধ ব্রহ্মচারী সাধকের ব্রহ্মচর্য দায়ক মাতৃস্থান সদাই মস্তিষ্ককেন্দ্রে এই নাদবিন্দু স্থানে বিদ্যমান। এই সাধনার কিছু অংশ উচ্চস্তরের বৌদ্ধ সাধকদের মধ্যেও চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি "সাধনমালা" (বৌদ্ধসাধকদের সাধন কথা) গ্রন্থের কোন অংশই এখন আর পাওয়া যায় না। "গুরুপাদুকা" সাধনা সম্বন্ধে যাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নাই তাঁহারা ঐ গ্রন্থের অনেক কথারই রহস্য বুঝিতে পারিবেন না। উচ্চস্তরের তন্ত্রোক্ত গুরুপাদুকা সাধনা হইতেই "সাধনমালার" ঐ সব গুপ্ত অংশ সংগৃহীত হইয়াছে। অ ক থ রেখা দ্বারা গঠিত ত্রিকোণ আসনমণ্ডল, হ ল ক্ষ বিন্দু হইতে ত্রিজ্যোতি শিখা, যাহা গুরুপাদুকার শেষ ঊর্ধ্ব প্রান্তে মিলিত হইয়াছে, উহাই মায়ের মস্তক জানিবে। গুরুপাদুকা কেন্দ্রে গুরুধ্যান, শিবধ্যান অথবা ত্রিপুরান্যাস যাহাই কর না তাঁহাদের মূর্তটির আসনমণ্ডল, স্তনমণ্ডলের প্রতীক দ্বিবিন্দু বা "নাদ", বিশুদ্ধ চক্র স্থানের প্রতীক "বিন্দু" স্থান এবং মস্তিষ্ক স্থানের কেন্দ্রে ত্রিশিখা লয় স্থানের (বা মস্তক স্থান) ধ্যানই মূল কথা। এখানে মানবাকার মূর্তি ধ্যানকে বড় প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু মস্তিষ্ক স্থানের শক্তিমান কেন্দ্র নিরূপণ কার্যে সহায়তা পাইবার জন্য গুরুপাদুকাকেন্দ্রে শক্তিমান ও শক্তিবাদী গুরুধ্যানের প্রয়োজন আছে। মহাদেব শিবই আমাদের আদর্শ শক্তিমান ও শক্তিবাদী গুরু এবং তাঁহার ধর্মপত্নী পার্বতীই আমাদের আদর্শ সতী মহিলা। ত্রিপুরা ধ্যান বা কামকলা ধ্যানে অনেক স্থানে পার্বতী-সতীর আদর্শকে স্মরণ করা হইয়াছে। আচার্য শঙ্করও এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিপুরা সাধনায় "কামকলা" নামক তত্ত্বধ্যান ও তত্ত্বজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলেই সাম্রাজ্য দীক্ষার পরবর্তী মহাসাম্রাজ্য দীক্ষার অর্ধনারীশ্বর ধ্যানের রহস্য বুঝা যাইবে। ত্রিপুরা ধ্যান, কামকলা ধ্যান এবং অর্ধনারীশ্বর ধ্যান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কোনই লাভ নাই। কারণ, সাধকজগতে যোগেশ্বর শিবের মতন শক্তিধর মহাত্মা দুর্লভ। আবার পার্বতীর মত একনিষ্ঠ সতী সাধিকাও দুষ্প্রাপ্য। আমরা ইহারা সামান্য আলোচনা করিলাম। আবাল্য ব্রহ্মচারী মহাশক্তিধর শঙ্করের অবতার আচার্য শঙ্করও ইহার অতি সামান্য আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর মহাশক্তিধর বা ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদের দুর্বলবাদীয় সমাজ কল্পনা নিজেই ভাঙিয়া দিয়াছিলেন এবং শিষ্যদের হাতে দিয়া গিয়াছিলেন ব্রহ্মবাদমূলক গ্রন্থাবলী (বেদান্তভাষ্য, গীতাভাষ্য এবং উপনিষদ ভাষ্য)। মা আমাকে দিয়া অনেক খাটাইয়াছেন। সমাজ গঠনের জন্য গায়ত্রীব্রহ্ম উপাসনা দাঁড় করাইয়াছেন। মানুষের মনোবিকাশের স্তর ও শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করাইয়াছেন, মানুষকে জ্ঞান ও শক্তির পথ ধরাইবার জন্য।

কামকলা জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত অনুভূতিরই অনন্তভাণ্ডার। কামকলা ধ্যান সম্বন্ধে তন্ত্রসার যাহা বলিয়াছেন সে সব কথা বলা যাইতেছে। "নিজের শরীর মধ্যে কামকলা চিন্তা করিতে হইবে।" তন্ত্রের ইহাই আদেশ "বিন্দুং সঙ্কল্প্য বক্ত্রস্তু তদধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্। তদধঃ সপরার্ধঞ্চ চিন্তয়েত্তদধোমুখম্॥ ততস্তিথি নিত্যাং পূজয়েৎ। মহাত্র্যস্রে বামাবর্তেন শুক্লপক্ষে কামেশ্বর্যাদিবিচিত্রান্তং, কৃষ্ণপক্ষে বিচিত্রাদি কামেশ্বর্যন্তং পূজয়েৎ॥" অর্থাৎ প্রথমে বিন্দু কল্পনা করিবে (এই বিন্দু মানে গুরুপাদুকাস্থিত ত্রিশক্তির লয়স্থান

যেখানে বিলীন হইয়াছে, সেই বিন্দুই মায়ের মুখ। এই বিন্দুকে নাদ বিন্দু ধ্যানের বিন্দু বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন)। তাহার পর স্তন যুগলকে দুইটি বিন্দুরূপে কল্পনা করিবে। (এই বিন্দুদ্বয়কে ‘‘নাদ’’ বা চন্দ্রাকার নাদপীঠের দুইপ্রান্ত স্থিত দুই বিন্দু আমরা বলিয়াছি।) এই স্তন্যবিন্দুর নিম্নে অর্ধ ‘হ’কার (ঃ) নিম্নমুখে চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে। ইহার নিম্নে তিনভাগে, বামাবর্তে ১৫টি স্বরবর্ণ চিন্তা করিবে অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ॥ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ॥ এ ঐ ও ঔ অং॥ এবং ইহাদের মধ্যস্থলে ঃ বিসর্গ ভাবনা করিবে। (এই বিসর্গই অধোমুখে স্থিত অর্ধ হ কার।) ইহারাই শুক্লপক্ষে বামাবর্তে কামেশ্বরী আদি বিচিত্রান্ত এবং কৃষ্ণপক্ষে বিচিত্রাদি কামেশ্বর দেবতার স্বরূপ; সাধক ইহাদের পূজা করিবেন। এখানে সাধক জানিয়া রাখুন ‘‘নাদ’’টিই ১৫ কলার বা পঞ্চদশ স্বরাত্মক জ্ঞানমণ্ডল। এই জ্ঞানমণ্ডলের মধ্যস্থানস্থিত কেন্দ্রস্থানটিই ঃ বিসর্গরূপী শিব। আমরা যে কথা বলি, উহার মূল স্থান হইতেছে, গুরুপাদুকাস্থিত ‘‘নাদ’’ পীঠে। ইহাই ষোলকলা জ্ঞানভূমি। বহুদিন নাদ বিন্দু ধ্যান করিয়া ইহা আয়ত্ত করিতে হয়। সাধক সব কথা গুরুমুখেই জানিবেন।

আমাদের গুরুধারার ইহাই উপদেশ যে গুরুপাদুকাস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলই মায়ের ত্রিকোণ পাদপীঠ। ইহার উপরে ষোল জ্ঞানকলার সমষ্টিজ্ঞান বা নাদপীঠ। এই নাদ পীঠের দুই প্রান্তই (দক্ষিণ ও বাম প্রান্ত) মায়ের স্তনদ্বয় কেন্দ্র। এই স্তনদ্বয় কেন্দ্রের উপরিভাগে ‘নাদ বিন্দু’র বিন্দুটি হইতেছে মায়ের কণ্ঠচক্র। এই নাদ বিন্দুর বেষ্টনী ঊর্ধ্বমুখী শিখাত্রয় রচিত ত্রিশিখা যেখানে শেষ হইয়াছে উহাই মায়ের মুখ। এইভাবে অন্তর যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া ত্রিপুরা ধ্যান করিতে হয়। ইহাই গুরুধ্যান এবং ইহাই যোগেশ্বর শিবের ধ্যান।

এইভাবে সব মিলাইয়া ‘‘কামকলা’’ ধ্যান হয়। কামকলার এক একটি অংশকে বহুদিন ধরিয়া অনুশীলন করা প্রয়োজন। কামকলা ধ্যানই অর্ধনারীশ্বর ধ্যান। এ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আবার বলিব। নাদ বিন্দুধ্যান এবং কামকলা ধ্যানের পার্থক্য বুঝা প্রয়োজন। সবই গুরু মুখ গম্য।

এইভাবে কামকলা ধ্যান করিয়া সাধক মূলাধারে মন দিবেন। এখানে নৃত্যপরা কলা যোগেশ্বরী ও শিবাত্মা ব্রহ্মাকে মায়ের রূপ জানিয়া প্রণাম করিবেন।

স্বাধিষ্ঠান চক্রে মেঘাভ বিষ্ণুমূর্তি এবং তিমিরনাশিনী স্ফুরণশক্তিকে (বৈষ্ণবীশক্তিকে) সাধক প্রণাম করিবে। এই বৈষ্ণবীশক্তি শ্যামবর্ণ মেঘের প্রান্তে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি দীপ্তিযুক্ত নানারূপ রত্নাভরণে ভূষিতা হইয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিকশিতা আছেন। ইনি মেঘাভ বিষ্ণুমূর্তি; রুদ্ররূপ-সূর্যতপ্ত ত্রিভুবনে শান্তিবারি বর্ষণ করেন। মণিপুর চক্রে নিয়ত হুতাশন অধিষ্ঠিত। সাধক এই সম্বর্ত বা রুদ্রমূর্তি (অগ্নি) মহতী শক্তিকলাকে বন্দনা করিবেন। মহাপ্রলয়কালে রুদ্র ক্রোধরক্ত নেত্রে সমস্ত লোককে দগ্ধ করিতে থাকিলে মায়ের দয়ার্দ্র দৃষ্টির প্রভাবে জগৎ শীতল হয়। প্রত্যেক চক্রেই দেখা যায়, শিব এবং শক্তির স্বভাবে নানাপ্রকার মাধুর্য বিদ্যমান। একজন উগ্র তো অন্যজন নরম। এইভাবেই এই বিশ্ব পালিত হইয়া চলিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, সাধনার জগতে

বাস্তবতার সামঞ্জস্য নাই তাঁহারা কোন দিনই শক্তিসাধনার কোন মর্ম্মই অবগত হইতে পারিবেন না।

অনাহত চক্রে বিকশিত জ্ঞান কমলের মধুপান রসিক এবং মহাত্মাগণের মানসচর মায়ের হংস ও হংসীমূর্তি (ঈশ্বর ও ঈশ্বরীশক্তি) বিরাজমান। সাধক মাকে ঐভাবে স্মরণ ও প্রণাম করিবেন। যে হংসমিথুনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিলে অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হয় এবং যে হংসমিথুন, হংসের জল হইতে দুগ্ধ পৃথক করিবার ন্যায় দোষ হইতে গুণ সমুদয় পৃথক করিয়া লইতে সক্ষম, অর্থাৎ দোষগুণ মিশ্রিত এই বিশ্বে যেভাবে বিচরণ করিয়া সাধক নিজের জ্ঞান ও শক্তিরক্ষা করিয়া চলেন, মা সেই বিদ্যা অনাহত চক্রকেন্দ্র হইতে প্রদান করেন। এবার সাধক বিশুদ্ধ চক্রে মায়ের প্রভাব বিষয়ে ধ্যান কর। বিশুদ্ধ চক্রে মায়ের শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশ নির্মলরূপ এবং আকাশতুল্য শিবমূর্তি বিদ্যমান। শিবের সঙ্গে শিবের সমান সুখদুঃখভাগিনী শিবাশক্তির অবস্থান ও ধ্যান করিবে। ইঁহাদের কান্তিধ্যান করিয়া সাধক জগৎ অন্তরের অন্ধকার নাশ করতঃ কৌমুদী পংক্তিতে চকোরীর ন্যায় বিলাস করিয়া থাকেন। সাধক মাকে ঐভাবে দেখিয়া প্রণাম কর। আজ্ঞাচক্রে মায়ের কোটি সূর্য-চন্দ্রসমপ্রভ পরম শিব ও তৎপার্শ্বে মিলিত পরা চিৎশক্তিকে প্রণাম কর। ইঁহাকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া সাধক চন্দ্র সূর্য ও অগ্নির অগোচর তেজঃপূর্ণ ভবনে অবস্থান করেন। আজ্ঞাচক্রের উপরে গুরুপাদুকাস্থান। সেখানে দ্বাদশ দল গুরুপাদুকা কমলে হ স খ ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ শোভিত আছেন। এই কমলের মধ্যস্থলে অ ক থ রেখায় ত্রিকোণ যন্ত্র বিদ্যমান। এই ত্রিকোণ যন্ত্রই মায়ের কোমর হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নে পদ পর্যন্ত পাদপীঠ। মা পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট। এজন্য ইহা ত্রিকোণাকার ধারণ করিয়াছে। এই পাদপীঠের ত্রিকোণ হইতে তিনটি জ্যোতিরেখা ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে এবং সোমচক্রস্থানে যাইয়া মিলিয়াছে। এই ঊর্ধ্ব বিন্দুই মায়ের মুখমণ্ডল এবং মস্তক স্থান। এই ঊর্ধ্ব ত্রিকোণ এবং পাদপীঠের ত্রিকোণের মধ্যস্থলে 'নাদ বিন্দু' বিদ্যমান। এই অর্ধ চন্দ্রাকার নাদের দুই প্রান্তই মায়ের স্নেহপূর্ণ স্তন্যকেন্দ্র। 'নাদ বিন্দু'র বিন্দুস্থান হইতেছে মায়ের বিশুদ্ধ চক্রকেন্দ্র। এই তিনটি কেন্দ্র হইতেই মায়ের স্নেহরস কোন কোন সাধক সন্তানের দিকে ধাবিত হয়। এই স্তন্য রসে প্লাবিত ব্রহ্মচারী সাধকই কার্তিক ও গণেশের মত অসুরনাশক এবং ব্রহ্মজ্ঞান পথের পথিক হন। গুরুপাদুকা কমল হইতে আরম্ভ করিয়া সোমচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল জ্ঞানময় ব্রহ্মাণ্ডে অনেক স্তরের জ্ঞান এবং অনেক প্রকার সুখময় এবং শান্তিময় অনুভূতির বহু কেন্দ্র বিদ্যমান। এ সব সুখময়, শান্তিময় ও অনন্ত সৌন্দর্যময় অনুভূতি দ্বারা গঠিত আমার মায়ের মূর্তি ধ্যান কর। সোমচক্রের পরপারেও অনেক অনুভূতি এবং জ্ঞানভূমি এবং তত্ত্বভূমি বিদ্যমান। সে সব কথা আমরা পরে বলিব। ক্রমবিকাশ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাধক এ সব তত্ত্বের মর্ম বুঝিতে চেষ্টা করুন। মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত কামকলাপীঠের ধ্যান বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। এখানে মায়ের মুখ বা সম্মুখ ভাগটি আমাদের মস্তকের পেছনের দিকে থাকিবে। মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সমস্ত চক্রপীঠেই ধ্যানের ইহাই নিয়ম যে মায়ের বা শিবের মুখের সম্মুখ দিকটা আমাদের পেছনের দিকে থাকিবে।

অ ক থ রেখা এবং হ ল ক্ষ বিন্দু সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। অ হইতে অঃ - ব্রহ্মরেখা - বামাশক্তি। ইহা আমাদের মস্তিষ্কের ডান দিকে অবস্থিত। ইহা মায়ের বাম ঊরু রেখা। ক হইতে ত - বিষ্ণু রেখা - জ্যেষ্ঠা রেখা। ইহা আমাদের মস্তিষ্কের বাম দিকে অবস্থিত। থ হইতে স - শিব রেখা - রৌদ্রী রেখা - ইহা মায়ের দুই পদের হাঁটু হইতে পা পর্যন্ত অঙ্গে গঠিত। হ কোণ - বিষ্ণু + শিবরেখা কোণ। ক্ষ কোণ - শিব + ব্রহ্মরেখা। ল কোণ - ব্রহ্মরেখা + বিষ্ণুরেখা। হ - চন্দ্রবিন্দু। ল - অগ্নিবিন্দু। ক্ষ - সূর্যবিন্দু। দুই দশ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরা সাধনার কথা লেখা যায় না। ত্রিপুরা সাধক বহুদিন আচার্য শঙ্কর লিখিত দক্ষিণা মূর্তি গুরু স্তোত্রম্ এবং আনন্দলহরী স্তোত্রম্ ও স্তোত্রের অর্থ পাঠ করিবেন। যে সাধনা আচার্য শঙ্করকে দিগ্‌বিজয়ী করিয়াছিল। ত্রিপুরা মাই আচার্য শঙ্করকে অদ্ভুত ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। কালী সাধনাকালে সাধকমাত্রেরই কর্পূরাদি স্তোত্রম্ পাঠ করা কর্তব্য। এক একটি মহাবিদ্যার সাধনা এক এক প্রকার শক্তির কেন্দ্র। বিবেকানন্দের গুরু মাকালী, বুদ্ধের গুরু মাতারা, শঙ্করাচার্যের গুরু মা ত্রিপুরা। এঁদের বিশ্বজয় করিতে টাকা পয়সা, সংগঠন বা হাতীঘোড়া বা মোটর গাড়ির প্রয়োজন হয় নাই। ধন্য আমার আদি গুরু মহাদেব শিবকে, ধন্য তাঁহার সহধর্মিণী পার্বতী, গৌরী, সতীকে; যিনি অধ্যাত্ম ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য দশমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তোমরা শ্রীবুদ্ধদেবকে দুর্বলবাদী বা অহিংসবাদী মনে করিও না। অসুর নাশের জন্য তিনিও অস্ত্র ধারণের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধবাদী সন্ন্যাসীরা অহিংসার নামে অসুরের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন এবং সব বিষয়ে মধ্যপন্থার অনুসরণের পাপ পথ গ্রহণ করিয়া নিজেদের পতনের রাস্তা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ষড়দর্শনে পাঠ কর এবং সেই সঙ্গে আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদ অধ্যায় অবলোকন কর। দেখিবে, অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রভায় ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ম্লান হইয়া গিয়াছে। এইভাবেই বৌদ্ধবাদ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। শক্তিবাদ আলোচনা কর। দেখিবে, দুর্বল ও অসুরবাদ মূলক ধর্ম কর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রবাদের কথা তোমার আর ভালই লাগিতেছে না। দেখিতে পাইবে, তোমার মন ব্রহ্মগায়ত্রী উপাসনা এবং উন্নত শক্তিবাদ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, ভারতের শক্তিসম্পন্ন সব মতবাদের মূলেই মহামায়ার আশীর্বাদ থাকে এবং ধীরে ধীরে উহা বিশ্ব গ্রহণ করিতে থাকে। প্রয়োজনের অভাব হইলে, সব মতবাদই আবার মহাশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়।

ত্রিপুরা সাধনায় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, গাণপত্য, সৌর সব দর্শনের কথাই আছে। ভারতের বুকে যে সব যুগান্তকারী মতবাদ স্থাপিত হইয়াছে, উহাদের সকলের মূল হইতেছে মহাবিদ্যার সাধনা। ইহাদের মধ্যে কালী, তারা ও ত্রিপুরার সাধনা সবচেয়ে অদ্ভুত এবং আশ্চর্য শক্তিধারা বহনকারী।

পীঠপূজা। শ্রীচক্রের চারিদিকে সূর্য গণেশ শিব ও নারায়ণের পূজা করিয়া শ্রীচক্রে পূজা। যথা - ওঁ মহাচক্রে ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অমৃতাম্ভোনিধয়ে নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রত্নদীপায় নমঃ॥ ওঁ ৩ নানা বৃক্ষ মহোদ্যানায়॥ ওঁ ৩ সন্তান বাটিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ কল্প বৃক্ষ বাটিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ হরি চন্দন বাটিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ মন্দার বাটিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ পারিজাত বাটিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ কদম্ব বন বাটিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ পুষ্পরাগ রত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ পদ্মরাস প্রাকারায়॥ ওঁ ৩

গোমেদ রত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ ইন্দ্রনীল রত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ বজ্র রত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ বৈদুর্য্য রত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ মুক্তারত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ বিদ্রুম রত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ মাণিক্য রত্ন প্রাকারায়॥ ওঁ ৩ মাণিক্য মণ্ডপায়॥ ওঁ ৩ সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপায়॥ ওঁ ৩ অমৃত বাপিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ আনন্দ বাপিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ বিমর্ষ বাপিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ বালা তপোদ্ধাবায়॥ ওঁ ৩ চন্দ্রিকোদরায়॥ ওঁ ৩ মহাশৃঙ্গার পরিখায়ৈ॥ ওঁ ৩ মহাপদ্মাটব্যৈ॥ ওঁ ৩ চিন্তামণি গৃহরাজায়॥ ওঁ ৩ পূর্ব্বাম্নায় পূর্ব্ব দ্বারায়॥ ওঁ ৩ দক্ষিণাম্নায় দক্ষিণ দ্বারায়॥ ওঁ ৩ পশ্চিম্নায় পশ্চিম দ্বারায়॥ ওঁ ৩ উত্তরাম্নায় উত্তর দ্বারায়॥ ওঁ ৩ রত্নদ্বীপ বলয়ায়॥ ওঁ ৩ মহাসিংহাসনায়॥ ওঁ ৩ ব্রহ্ম ময়ৈক মঞ্চপাদায়॥ ওঁ ৩ বিষ্ণু ময়ৈক মঞ্চপাদায়॥ ওঁ ৩ রুদ্র ময়ৈক মঞ্চপাদায়॥ ওঁ ৩ ঈশ্বর ময়ৈক মঞ্চপাদায়॥ ওঁ ৩ সদাশিব ময়ৈক মঞ্চফলকায়॥ ওঁ ৩ হংস তুলত নিনায়॥ ওঁ ৩ হংস তুল মহোপাধানায়॥ ওঁ ৩ কৌস্তুম্ভাস্তরণায়॥ ওঁ ৩ মহাবিতানিকায়ৈ॥ ওঁ ৩ মহাযমনিকায়ৈ॥ তদোপরি ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ॥

পুনর্ধ্যান॥ পূর্বে কথিত ধ্যান পাঠ করিবে এবং কামকলাস্থানে মাকে চিন্তা করিবে॥ আবাহন॥ প্রাণপ্রতিষ্ঠা॥ যথাশক্তি উপাচারে পূজা॥ এ সব কালী পূজার বিধিমত করিবে॥ তর্পণ॥ (বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাতে অর্ঘ্য পাত্রের জল লইবে এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাতে পুষ্প তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া দেবী মুখে তর্পণ করিতে হয়।) মস্তিষ্কস্থিত কামকলা ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ। ইহার পর আবরণ পূজা॥

আবরণ পূজা।

ওঁ ঐং মহাশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ হৃদয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ ক্লীং নিত্যতৃপ্তশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী শিরসি স্বাহা।
ওঁ ক্লীং শিরসাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ সৌঃ অনাদি বোধশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ সৌঃ শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ ঐঁ স্বতন্ত্রশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী কবচায় হূঁ।
ওঁ ঐঁ কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ ক্লীঁ অলুপ্তশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ওঁ ক্লীঁ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ সৌঃ অনন্তশক্তি শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী অস্ত্রায় ফট্।
ওঁ সৌঃ অস্ত্রাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

মস্তিষ্কস্থিত নাদপীঠ ধ্যান করিয়া শ্রীচক্র পূজা। নাদপীঠে কামেশ্বর্য্যাদি ষোড়শকলা পূজনম্॥ অর্ধচন্দ্রাকার ন্যাসধ্যানের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই নাদপীঠের উপরের অংশ কৃষ্ণবর্ণ এবং নিম্নের অংশ শুক্লবর্ণ। কৃষ্ণ এবং শুক্ল স্থানের সংযোগস্থলে শুক্লের ১৫ কলা এবং বিপরীত ভাবে কৃষ্ণ অংশে ১৫ কলা বিদ্যমান। শুক্লের ১৫ কলা এবং কৃষ্ণের ১৫ কলার পূজনের পর উভয় অংশের মধ্যস্থলে ঃ (বিসর্গ) আছেন ভাবিয়া ধ্যানসহ ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজা করিবেন। ইহাই পীঠশক্তি সহিত

ষোড়শীর পূজা। কামকলা ধ্যানে নাদপীঠের দক্ষিণ ও বামদিকে শেষপ্রান্তে যে মায়ের স্তন্যকেন্দ্র, ইহাই বলা হইয়াছে। এই ১৬ কলা জ্ঞানামৃত স্তন্য পান করিয়াই গণেশ পূর্ণজ্ঞানী হইয়াছিলেন এবং জ্ঞানামৃত পান করিয়াই কার্তিক শ্রেষ্ঠ অসুরনাশক বীর ও চিরকুমার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। কোন কোন পুরাণে ষষ্ঠী দেবীকে কার্তিকের স্ত্রী বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক নহে। এঁরা চিরকুমার। এঁরা আসিয়াছিলেন অসুরনাশের জন্য। সৃষ্টির জন্য নহে।

(বামাবর্তে) শুক্লপক্ষে প্রতিপদে - ওঁ অং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামেশ্বরী নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ দ্বিতীয়ায়াম্ ওঁ আং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভগমালিনী নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ তৃতীয়ায়াম্ ওঁ ইং ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ নিত্যক্লীন্নাম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ চতুর্থ্যাম্ ওঁ ঈং ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ভেরুণ্ডাম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ পঞ্চম্যাম্ ওঁ উং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বহ্নিবাসিনীম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ষষ্ঠ্যাম্ ওঁ ঊং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাবিদ্যেশ্বরী নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ সপ্তম্যাম্ ওঁ ঋং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শিবদূতীম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ অষ্টম্যাম্ ওঁ ৠং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ত্বরিতাম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ নবম্যাম্ ওঁ ঌং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কুলসুন্দরীম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ দশম্যাম্ ওঁ ৡং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নিত্যাম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ একাদশ্যাম্ ওঁ এং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নীল পতাকাং নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ দ্বাদশ্যাং ওঁ ঐঁ ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বিজয়াম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ত্রয়োদশ্যাম্ ওঁ ওং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বমঙ্গলাম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ চতুর্দশ্যাম্ ওঁ ঔং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জ্বালামালিনীম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ পৌর্ণমাস্যাং ওঁ অং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিচিত্রাম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ বিসর্গে ওঁ অঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ত্রিপুর সুন্দরীম্ নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ কৃষ্ণপক্ষের বিচিত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া কামেশ্বরীর পূজা করিয়া মধ্যে ত্রিপুরার ধ্যান করিয়া ত্রিপুর সুন্দরীর পূজা করিতে হইবে।

গুরু পংক্তির পূজা॥ কামকলা ধ্যান করিয়া শ্রীযন্ত্রের মধ্য, প্রাক্, ত্র্যস্র ও মধ্যস্থলে গুরু (ইহাই অষ্ট কোণসমন্বিত সংহার চক্র) পংক্তির পূজা। দিব্য গুরু, সিদ্ধ গুরু, মানব গুরু, স্বগুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠি গুরু॥ লোপা মুদ্রা ঘটিত দিব্য গুরু দিব্য সিদ্ধ ও মানব গুরুদের স্মরণ করা গুরু পংক্তি পূজার লক্ষ্য। পূর্ব পূর্ব কোন কোন গুরুগণের আত্মা এবং সমস্ত গুরুগণের জ্ঞান ও চিন্তাধারা মহৎ এবং অব্যক্ত জগতে অবস্থান করে। সব জ্ঞানের ধারা তাঁহাদেরই আশীর্বাদে সিদ্ধ স্তরের সাধকগণে প্রতিফলিত হয়। তাঁহাদের দ্বারা অর্জিত মহাশক্তির জ্ঞান ও কর্মশক্তির মহাভাণ্ডারে রক্ষিত জ্ঞানধারা বিশ্বে আবার প্লাবিত হয় এবং অধ্যাত্মবিদ্যার ধারা রক্ষিত হয়। গুরুপাদুকা স্তোত্রে প্রকাশিত 'নাদ বিন্দু' কেন্দ্রের তাত্ত্বিক রূপ বুঝিতে হইলে পাঠকগণকে ক্রমবিকাশ আলোচনা করিতে হইবে। ক্রমবিকাশের ৪র্থ খণ্ডে মস্তিষ্ক চিত্রে ৫নং এবং ৬নং কেন্দ্র হইতেছে মহৎ এবং অব্যক্ত কেন্দ্র। এই সব কেন্দ্র হইতে বহু নাড়ী এবং অন্যান্য বহু কেন্দ্রের অনেক নাড়ী মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত নাদবিন্দু স্থান এবং কামকলা পীঠকে ভেদ করিয়া অন্যান্য মস্তিষ্ক কেন্দ্রে গমন করিয়াছে। আমরা এখানে

উপাসনা কাণ্ড লইয়া আলোচনা করিতেছি। কামকলা ধ্যানের উপরে আর কোন প্রকার ধ্যানস্থান উপাসনার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় না। উপাসনা কাণ্ডে সাধক মস্তিষ্কের মধ্যে কামকলা স্থান বুঝুন এবং ধ্যান করুন; ইহার অধিক করণীয় এখানে হইবার উপায় নাই। যাঁহারা গুরুগণের নাম ও মন্ত্র সহ এই গুরুধারা স্মরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা ''তন্ত্রসার'' হইতে সংগ্রহ করিবেন। সংক্ষেপে পূজা এখানে বলা হইল। যথা - ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরম গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরাপর গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমেষ্ঠি গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দিব্য গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সিদ্ধ গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মানব গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লোপামুদ্রা গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ॥ (লোপামুদ্রা মন্ত্রে যাঁহারা ত্রিপুরাসুন্দরীর সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে লোপামুদ্রা গুরু বলা হয়।) সিদ্ধি বিষয়ে জ্ঞানসিদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। আদি গুরু শিব, ঋষিগণের আশীর্বাদ এবং অন্যান্য সিদ্ধ গুরুগণের স্নেহই জ্ঞানসিদ্ধির মূল। কিন্তু সাধক জানিয়া রাখুন, উহার মূল হইতেছে কামকলা পীঠে।

সৃষ্টিচক্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পূর্বাম্নায় উন্মনী দেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ স্থিতিচক্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দক্ষিণাম্নায় ভোগিনী দেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ সর্বসৌভাগ্যাদি সংহারাত্মক ত্রিচক্রে পশ্চিমাম্নায় ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কুব্জিকা দেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ সর্বচক্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উত্তরাম্নায় মহাচণ্ড যোগেশ্বরী কালিকা দেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ বৈন্দবচক্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঊর্ধ্বাম্নায় সকল সিদ্ধিদাদেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ এবার অগ্নি, ঈশান ও বায়ু আদি কোণ মধ্যে ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ষড়ঙ্গ দেবতা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ইহার পর বাহ্য চতুরস্রে পশ্চিমাদি দ্বার চতুষ্টয়েষু অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির পূজা॥

(১) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
(২) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লঘিমাদি সিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
(৩) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহিমাদি সিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
(৪) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈশিত্ব সিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

বায়বাদি কোণ চতুষ্টয়েষু ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বশিত্ব সিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রাকাম্যসিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইচ্ছাসিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভক্তিসিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
অধঃ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রাপ্তিসিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥
ঊর্ধ্বে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞাসিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

শাস্ত্রে অষ্টসিদ্ধির কথা আছে। উহাদেরও মূলস্থান মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকা কেন্দ্রে বিদ্যমান। তবে সাধক জানিয়া রাখুন, জ্ঞানসিদ্ধিই সমস্ত সিদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

মধ্যচতুরস্রস্য পশ্চিমাদি দ্বার চতুষ্টয়েষু ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আং ব্রহ্মাণী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং মাহেশ্বরী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঊং কুমারী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং বৈষ্ণবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

বায়বাদি চতুষ্কোণেষু ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ৎং বারাহী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ইন্দ্রাণী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ চামুণ্ডা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ মহালক্ষ্মী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

অভ্যন্তর চতুরস্রস্য পশ্চিমাদি দ্বার চতুষ্টয়েষু ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং সর্ব্বসংক্ষোভিনী মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রীং সর্ব্ববিদ্রাবিণী মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং সর্ব্বাকর্ষণী মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্লুং সর্বশঙ্করীমুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

এই সব নামে নানাপ্রকার মুদ্রার প্রয়োগ আছে। আমরা সেই সম্বন্ধে পরে বলিব। সাধক জানিয়া রাখুন, এখানে 'মুদ্রা' মানে মানস শক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশ। সাধনার পথে যাঁহার যেমন আয়ত্ত হইয়া যায়।

বায়বাদি কোণ চতুষ্টয়েষু ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সঃ সর্বোন্মাদিনী মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোং মহাঙ্কুশা মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেং খেচরী মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হেসৌঃ সবীজমুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ অধঃ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ যোনিমুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ঊর্দ্ধে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ ত্রিখণ্ডা মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

চক্রাগ্রে সম্পূর্ণ চক্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ত্রৈলোক্যমোহন চতুরস্র চক্রায় নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রিপুর শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ মায়ের দক্ষিণে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রী দ্রাং সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ দেব্যা বামে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ অণিমাদি সিদ্ধি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥

অত্র ত্রৈলোক্যমোহন চতুরস্রচক্রে ত্রিপুরাচক্র নায়িকাধিষ্ঠিতে এতা অণিমাদ্যাঃ প্রকটযোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্ব্বোপচারৈঃ পূজিতাঃ সন্তু, ইত্যর্ঘ্যজলেন মূলদেব্যৈ সমর্পয়েৎ॥

ইহার পর দ্রামিতি সর্ব্ব বিদ্রাবিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ অর্ঘ্যজলে তর্পণ॥

এ পর্যন্ত যে সব পূজার কথা বলা হইল ইহাতেও ত্রিপুরা যন্ত্রের সব অংশের পূজা হয় নাই। যন্ত্রের অন্যান্য অংশের পূজার কথা বলা যাইতেছে। শ্রীযন্ত্রের কামকলার ধ্যান যে ত্রিকোণে নির্দিষ্ট আছে, মস্তিষ্কের মধ্যে ধারণার জন্য ঐ অংশই যথেষ্ট। সবটা শ্রীযন্ত্রকে মস্তিষ্কে কল্পনা করিবেন না। মস্তিষ্কে ''কামকলা পীঠ'' ও ''নাদ বিন্দু পীঠ'' এবং ''দ্বাদশ দল গুরুপাদুকা ধ্যানই'' যথেষ্ট। শ্রীযন্ত্রস্থিত বৈন্দব চক্রই মস্তিষ্ক স্থিত কামকলা পীঠ। এই কামকলা পীঠেই ''নাদ বিন্দু'' পীঠ বিদ্যমান। মস্তিষ্ক স্থিত ''কামকলা পীঠকে''ই শ্রীযন্ত্রে বিস্তার পূর্বক অঙ্কন করা হইয়াছে। সাধকের সাধনা সিদ্ধি বাহির হইতে আসে না। উহা আসে কামকলা পীঠ হইতে। ঐ পীঠকেই সংহার চক্র, স্থিতি চক্র এবং সৃষ্টি চক্ররূপে ক্রমে ক্রমে বাহিরের দিকে দেখানো হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সিদ্ধিগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। অন্যান্য সিদ্ধিগুলি জ্ঞানসিদ্ধির তুলনায় অনেক কম সুখ ও তৃপ্তিদায়ক। সব রকম সিদ্ধির কথাই শ্রীযন্ত্র পূজনে স্থান পাইয়াছে। সাধক কেন্দ্রীয় জ্ঞানসিদ্ধি হইতে যত দূরে, সাধক ততটা কম সিদ্ধ জানিবেন। শ্রীযন্ত্র দেখিয়া মিলাইয়া লইবেন।

শ্রীযন্ত্রের ষোড়শ দলে পশ্চিম দল হইতে বামাবর্ত্তে পূজা করিবেন। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ‘‘অং’’ কামাকর্ষিণী নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ৩ ‘‘আং’’ বুদ্ধ্যাকর্ষিণী নিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ইং অহঙ্কারাকর্ষিণী॥ ঈং শব্দাকর্ষিণী॥ উং স্পর্শাকর্ষিণী॥ ঊং রূপাকর্ষিণী॥ ঋং রসাকর্ষিণী॥ ৠং গন্ধাকর্ষিণী॥ ঌং চিত্তাকর্ষিণী॥ ৡং ধৈর্যাকর্ষিণী॥ এং স্মৃত্যাকর্ষিণী॥ ঐং নামাকর্ষিণী॥ ওং বীজাকর্ষিণী॥ ঔং আত্মাকর্ষিণী॥ অং অমৃতাকর্ষিণী॥ অঃ শরীরাকর্ষিণী॥

অনেকেরই ধারণা, রূপের আকর্ষণই সবচেয়ে বড় সম্পদ। কিন্তু ওইরূপ মনে করা ঠিক নহে। আকর্ষণীয় অনেক গুণসম্পদই আছে। সেগুলিই প্রধান আকর্ষণীয় সম্পদ। সেইগুলি আয়ত্ত করিলে আকর্ষণের অভাব থাকে না।

চক্রাগ্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাশা পরিপূরক ষোড়শদল চক্রায় নমঃ॥ ওঁ ঐঁ ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরেশ্বরী চক্রনায়িকা শ্রী পা পূ॥ এতস্যা দক্ষিণে ওঁ ৩ দ্রীং সর্ববিদ্রারিণী মুদ্রা শ্রী পা পূ॥ বামে ওঁ ৩ লঘিমাসিদ্ধি শ্রী পা পূ॥ ওঁ বৌদ্ধ দর্শনায় নমঃ॥ অত্র সর্বাশা পরিপূরক ষোড়শ দল চক্রে ওঁ শ্রী ত্রিপুরেশ্বরী চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামাকর্ষণ্যাদ্যাঃ গুপ্ত যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ পূজিতাঃ স্তর্পিতাঃ সন্তু ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ত্রিপুরা দেব্যৈ সমর্পয়ামি নমঃ॥ অর্ঘ্যজলে তর্পণ॥ ওঁ ঐঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা॥ ওঁ ঐঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা॥ ওঁ ঐঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা॥ বৌদ্ধ দর্শন (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ), মূল জ্ঞানশক্তির কোন স্তরে (সৃষ্টিচক্রে) বিদ্যমান, ইহা বুঝা যায়।

অষ্টদল চক্রে (ইহাও সৃষ্টিচক্রে অন্তর্গত) পূর্ব দিকে বামাবর্তে পূজা॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং অনঙ্গ কুসুমাদেবী শ্রী পা পূ॥ ...চং ৫ অনঙ্গ মেখলাদেবী শ্রী পা পূ॥ ...টং ৫ অনঙ্গ মদনাদেবী শ্রী পা পূ॥ ...তং ৫ অনঙ্গ মদনাতুরা দেবী শ্রী পা পূ॥ অগ্ন্যাদি কোণে, ...পং ৫ অনঙ্গ রেখাদেবী শ্রী পা পূ॥ ...যং ৪ অনঙ্গবেশিনী দেবী শ্রী পা পূ॥ ...শং ষং সং হং অনঙ্গাঙ্কুশা দেবী শ্রী পা পূ॥ ...লং ক্ষং অনঙ্গ মালিনী দেবী শ্রী পা পূ॥ চক্রাগ্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বংসংক্ষোভনাষ্টদল চক্রায় নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরী চক্রনায়িকা শ্রীপাদুকাং পূ॥ এতস্যা দক্ষিণে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্বাকর্ষণী মুদ্রা শ্রী পা পূ॥ বামে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহিমাসিদ্ধি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জিনেন্দ্র দর্শনায় নমঃ॥ (শ্বেতম্বরী ও দিগম্বরী সম্প্রদায়কে জিনেন্দ্র দর্শন সম্প্রদায় বলে।)

চক্রাগ্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভনাষ্টদলচক্রে শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ অনঙ্গকুসুমাদ্যা গুপ্ততরাযোগিন্যাঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ পূজিতাঃ স্তর্পিতাঃ সন্তু॥ অর্ঘ্যজলে তর্পণ॥ ওঁ ক্লীঁ ইতি সর্বাকর্ষণী মুদ্রা প্রদর্শয়েৎ॥ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ইত্যাদি তর্পণ॥

চতুর্দশার চক্রাগ্রাৎ সমারভ্য বামাবর্তেন পশ্চিমাদি দক্ষিণান্তং যাবৎ (এই চতুর্দশ চক্র স্থিতি চক্র) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিনী শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ...সর্বাকর্ষিণী শক্তি শ্রী পা পূ॥ ...ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব সম্মোহিনী শক্তি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব সম্ভিনী শক্তি॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জৃম্ভনী শক্তি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বতত্ত্ববশঙ্করীশক্তি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ৩ সর্বরঞ্জনীশক্তি॥ সর্বোন্মাদিনীশক্তি॥ সর্বার্থসাধিনী শক্তি॥ সর্ব সম্পত্তিপূরণী শক্তি॥ সর্ব্বমন্ত্রময়ী শক্তি॥ সর্বদুঃখভয়ঙ্করী শক্তি॥

(চক্রাগ্রে) ওঁ ৩ সর্বসৌভাগ্যদায়ক চতুর্দশার চক্রায় নমঃ॥
ওঁ হৈং হ ক্লীঁ হেসৌঃ ত্রিপুরাবাসিনী চক্রনায়িকা শ্রী পা পূ॥
(এতস্যা দক্ষিণে) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ সর্ববশঙ্করী মুদ্রা শ্রী পা পূ॥
(বামে) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈশিত্বাদি সিদ্ধি শ্রী পা পূ॥
ওঁ সাংখ্য মীমাংসা ন্যায় দর্শনেভ্যো নমঃ॥

অত্র সর্ব সৌভাগ্যদায়ক চতুর্দশারচক্রে ত্রিপুরবাসিনী চক্রনায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বসংক্ষোভিণ্যাদ্যাঃ শক্তয়ঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ পূজিতা স্তর্পিতাঃ সন্তু (অর্ঘ্যজলে তর্পণ)॥ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি তর্পণ॥

বহির্দশার চক্রাগ্রাৎ সমারভ্য বামাবর্তেন পশ্চিমাদক্ষিণান্তং ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদাদেবী শ্রী পা পূ॥ সর্ব সম্পদপ্রদাদেবী শ্রী পা পূ॥ সর্বপ্রিয়ঙ্করী॥ সর্বমঙ্গলকারী॥ সর্বকামপ্রদা॥ সর্বদুঃখবিমুচিনী॥ সর্বমৃত্যু প্রশমিনী॥ সর্ববিঘ্ননিবারিণী॥ সর্বাঙ্গসুন্দরী॥ সর্বসৌভাগ্যদায়িনী॥ চক্রাগ্রে ওঁ সর্বার্থসাধক বহির্দশারচক্রায় নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হে সং হ স ক্লীঁ হেসৌঃ ত্রিপুরাচক্রনায়িকা শ্রী পা পূ॥ এতস্য দক্ষিণে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সঃ সর্বোন্মাদিনী মুদ্রা শ্রী পা পূ॥ বামে ওঁ ৩ বশিত্বাদি সিদ্ধি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ব্রাহ্মবৈদ্যক দর্শনায় নমঃ॥

অত্র সর্বার্থ সাধক বহির্দশার চক্রে ত্রিপুরা শ্রীচক্র নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদাঃ দেবাঃ কুলকৌলিনী যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ পূজিতা স্তর্পিতাঃ সন্তু॥ তর্পণ॥ ততো ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি তর্পণ॥

অন্তর্দশার চক্রাচ্চ সমারভ্য পশ্চিমাদ্দক্ষিণান্তং যাবৎ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞাদেবী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ॥ ওঁ ৩ সর্বশক্তিময়ী দেবী শ্রী পা পূ॥ সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী॥ সর্বজ্ঞানময়ী॥ সর্বব্যাধি বিনাশিনী॥ সর্বাধার স্বরূপিণী॥ সর্বপাপহরা॥ সর্বানন্দময়ী॥ সর্বরক্ষা স্বরূপিণী॥ সর্বেপ্সিত ফলপ্রদা॥ (চক্রাগ্রে) সর্বরক্ষাকরান্তর্দ্দশার চক্রায় নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লুং ত্রিপুর মালিনী চক্র নায়িকা শ্রী পা পূ॥ (এতস্যা দক্ষিণে) ওঁ ৩ ক্রোং মহাঙ্কুশ মুদ্রা শ্রী পা পূ॥ (বামে) ওঁ ৩ প্রাকাম্য সিদ্ধি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ৩ সৌর দর্শনায় নমঃ॥

অত্র ওঁ সর্বরক্ষান্তর্দশারচক্রে ত্রিপুরামালিনী চক্র নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ সর্বজ্ঞাদ্যাঃ দেব্যো নিগর্ভ যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্ব্বোপচারৈঃ পূজিতা স্তর্পিতাঃ সন্তু॥ তর্পণ॥ ওঁ আত্মতত্ত্বায় ইত্যাদি তর্পণ॥

ততোঽষ্টার চক্রাগ্রাচ্চ সমারভ্য পশ্চিমাদ্দক্ষিণান্তং যাবৎ॥ ওঁ ৩ অং ১৬ বরলুং বশিনী বাগ্‌দেবতা শ্রী পা পূ॥ ওঁ ৩ কং ৫ ক ল হ্রীঁ কামেশ্বরী বাগ্‌দেবতা॥ ওঁ ৩ চং ৫ ন ব লীং মোদিনী বাগ্‌দেবতা॥ ওঁ ৩ টং ৫ যুং বিমলা বাগ্‌দেবতা॥ ওঁ ৩ তং ৫ জ ম রীং অরুণা বাগ্‌দেবতা॥ ওঁ ৩ পং ৫ হ স ল ব যূঁ জয়িনী বাগ্‌দেবতা॥ ওঁ ৩ যং ৪ ঝ ম র যূঁ সর্ব্বেশ্বরী বাগ্‌দেবতা॥ ওঁ ৩ শং ষং সং হং লং ক্ষ ম রীং কৌলিনী বাগ্‌দেবতা॥ (চক্রাগ্রে) ওঁ ৩ সর্বরোগহরাষ্টার চক্রায় নমঃ॥ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ ত্রিপুরাসিদ্ধানিত্যা শ্রী পা পূ॥ (এতস্যা দক্ষিণে) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেং খেচরী মুদ্রা শ্রী পা পূ॥ (বামে) ভুক্তিসিদ্ধি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৈষ্ণব দর্শনায় নমঃ॥ অত্র সর্বরোগহরে অষ্টারচক্রে ত্রিপুরা সিদ্ধচক্র নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ বশিন্যাদ্যাঃ যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ

সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ পূজিতাঃ সমর্পণম্ সন্তু॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেং খেচরী মুদ্রাং প্রদর্শ্য ওঁ ঐঁ আত্মতত্ত্বায় ইত্যাদি তর্পণ॥

ত্রিকোণ বাহ্যে অগ্রতঃ বামাবর্তেন পশ্চিমাদি দক্ষিণান্তং যাবেৎ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রী দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ যাং রাং লাং বাং শাং কামেশ্বর কামেশ্বরী জৃম্ভণ বাণেভ্যো নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ যাং রাং লাং বাং শাং ধং খং সর্বসন্মোহনায় কামেশ্বর কামেশ্বরী ধনুষে নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লুং সঃ যাং রাং লাং বাং শাং আং হ্রীঁ বশীকরণায় কামেশ্বর কামেশ্বরী পাশায় নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ যাং রাং লাং বাং শাং ক্রোং সর্বস্তম্ভনায় কামেশ্বর কামেশ্বরী অঙ্কুশায় নমঃ॥ ততঃ ত্রিকোণগ্র দক্ষিণ বামেষু ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ অগ্নিচক্রে (ঊর্দ্ধমুখী ত্রিকোণে) কামগীর্যালয়ে মিত্রীশ নাথাত্মকে রুদ্রাত্মশক্তি কামেশ্বরী দেবী শ্রী পা পূ॥ হ স ক হ ল হ্রীঁ সূর্যচক্রে জালন্ধরপীঠে ষষ্ঠীশ নাথাত্মকে বিষ্ণাত্মকশক্তি বজ্রেশ্বরী দেবী শ্রী পা পূ॥ স ক ল হ্রীঁ সোমচক্রে পূর্ণগিরিপীঠে উড্ডীশ নাথাত্মকে ব্রহ্মাত্মশক্তি ভগমালিনী দেবী শ্রী পা পূ॥ চক্রাগ্রে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধি প্রদায় চক্রায় নমঃ॥ ওঁ হ স রৈ হ স ক ল রীং হ সরৌঃ ত্রিপুরাস্বানিত্যা শ্রী পা পূ॥ এতস্যা দক্ষিণে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হেসৌঃ বীজ মুদ্রা শ্রী পা পূ॥ বামে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইচ্ছাশক্তি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শাক্তদর্শনায় নমঃ। অত্র সর্বসিদ্ধি প্রদাদ্য চক্রে বাণচাপ পাশাঙ্কুশ ভূষিতান্তরালে ত্রিপুরাম্বা চক্র নায়িকাধিষ্ঠিতে এতাঃ কামেশ্বর্যাদ্যা অতিরহস্য যোগিন্যঃ সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ মূলদেবীসহ পূজিতা স্তর্পিতাঃ সন্তু॥ হেসৌঃ বীজমুদ্রাং প্রদর্শ্য তর্পণ॥ ওঁ আত্মতত্ত্বায় ইত্যাদি॥

ততো বৈন্দবচক্রে মূলমুচ্চার্য (ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ) শ্রীমহাত্রিপুর সুন্দরী নিত্যা শ্রী পা পূ॥ ইতি ত্রিঃ সংপূজ্য॥ চক্রাগ্রে ওঁ সর্বানন্দময় বৈন্দব চক্রায় নমঃ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীমহাত্রিপুর সুন্দরী চক্রনায়িকা শ্রী পা পূ॥ এতস্যা দক্ষিণে ওঁ ঐঁ যোনিমুদ্রা বামে প্রাপ্তিসিদ্ধি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মোক্ষসিদ্ধি শ্রী পা পূ॥ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শৈবদর্শনায় নমঃ॥

শ্রীত্রিপুরেশ্বরী শ্রীযন্ত্রপূজা কথিত হইল। ত্রিপুরা পূজায় ইহাই পীঠপূজা। এই পীঠপূজার পর দেবীর পুনঃ ধ্যান করিয়া দেবীর বাহ্য পূজানুষ্ঠান করিতে হইবে। ৫, ১০, বা ১৬শ উপচার, যাঁহার যেমন সুবিধা ও ব্যবস্থা তিনি তেমন করিবেন। উপচার পূজা কালী পূজার বিধিতেই করিতে হইবে। এই অধ্যায়ের অনেক স্থানেই এমন ভাবে লিখিত হইল যে কালী পূজার বিধির সাহায্য ভিন্ন ত্রিপুরা পূজা সুসম্পন্ন করা যাইবে না। জ্ঞানলক্ষ্যযুক্ত শক্তিসাধক কমিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরা দেবীর মন্দিরগুলি প্রায় সব স্থানেই কামনা পূরণের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয়। মামলা জয় ও বশীকরণ বিদ্যার অনুশীলন যেন ত্রিপুরার পূজারীদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ইহার ফলাফল লইয়া আলোচনা করিতে চাই না। কাহার কি বিশ্বাস বা কাহার কি লাভ বা অলাভ এ সব বিচারে আমাদের কোনই লাভ নাই। ত্রিপুরা সাধনায় আমি জ্ঞানশক্তিরই সাধনা করিয়াছি। সেই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি মা আমার জ্ঞান-পিপাসা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। বাল্যকালে পাথরের মাতৃমূর্তিকে দেখিয়া আমার যে স্তন্যপিপাসা জাগ্রত হইত, সাধক দশায় মা আমার সেই স্তন্যপিপাসা জ্ঞানের অমৃত প্রবাহে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মা আমাকে স্নেহামৃতে ডুবাইয়া দিয়াছেন, অমৃতময় করিয়াছেন।

ত্রিপুরা সাধনা অধ্যায়ে মহাচক্র পূজায় বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সৌর, বৈষ্ণব, শৈব এবং শক্তি দর্শনের কথা রহিয়াছে। মহারত্নেশ্বরে - ‘‘বৌদ্ধং ব্রাহ্মং তথা সৌরং শৈবং বৈষ্ণব মেব চ। শাক্তং ষষ্ঠন্তু বিজ্ঞেয়ং চক্রং ষড়্ দর্শনাত্মম্॥’’ রুদ্রযামলে - ‘‘চতুরস্রস্য বৌদ্ধভেদং ব্রহ্মং বৈ ষোড়শচ্ছদং বৈষ্ণবং শৈবভেদঞ্চ মহস্রং সৌরমুচ্যতে। অষ্ট্যস্রং দ্বিদশারন্তু মধ্যং শাক্তং সমীরিতম্। ইত্যুক্ত স্থানে তত্তদ্দর্শনং পূজনং॥’’ অর্থাৎ বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই ছয় চক্র ষড়দর্শনের স্বরূপ জানিবে। (রুঃ যা) – ‘‘চতুর্দল বৌদ্ধ চক্র, ষোড়শদল ব্রাহ্মচক্র, চতুর্দশার বৈষ্ণবচক্র এবং শৈবচক্র, অষ্টদল সৌরচক্র এবং মধ্যভাগ শক্তিচক্র দ্বাদশদল বলিয়া কথিত আছে। এইরূপে চক্র নির্ণয় করিয়া তত্তৎ চক্রে তত্তৎ দর্শনের পূজা করিবে।’’ সবই যথাযথ স্থানে করা হইয়াছে।

ক্রমবিকাশ গ্রন্থে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিকেন্দ্র এবং সেই সেই কেন্দ্র হইতে উদ্ভব দর্শন, সমাজবাদ, ধর্মবাদ এবং মানুষের মনোবিকাশ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সব কেন্দ্র হইতে যে সব প্রধান প্রধান নাড়ীগুলি নির্গত হইয়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে সেইগুলির প্রায় সবই গুরুপাদুকাস্থিত শক্তিপীঠ বা ‘‘অবলালয়’’ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই অবলালয় পীঠই যে ত্রিপুরা যন্ত্রের ‘‘বৈন্দবী চক্র’’ এই কথা এই ত্রিপুরা অধ্যায়ে অনেক স্থানেই বলা হইয়াছে। এই বৈন্দবীচক্রই মা ত্রিপুরা দেবী স্বয়ং। মহাদেবীর অঙ্গীভূত শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, বৌদ্ধ আদি দর্শনাদির মূল স্থান ওইখানেই বিদ্যমান। সাধক-জীবনে যে সিদ্ধির বিকাশ হয় সেইগুলিও মায়েরই রূপের বিভূতি।

প্রত্যেক স্তরেরই কর্মবাদ এবং জ্ঞানবাদ বিদ্যমান। এসব বিষয়ে ক্রমবিকাশে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। শক্তিস্তরের জ্ঞানবাদই শক্তিদর্শন। শক্তিস্তরের কর্মবাদই শক্তিবাদ দর্শন। আমরা এইজন্যই আমাদের দার্শনিক গ্রন্থাবলীকে শক্তিদর্শন নাম না দিয়া ‘‘শক্তিবাদ দর্শন’’ নাম দিয়াছি। আমরা জ্ঞান এবং কর্মবাদকে মিলাইয়া সমাজরক্ষার ভিত্তি দিতে চাই। বুদ্ধিই গণেশ। বৌদ্ধবাদ মানে গণেশবাদ এবং গণবাদ। ভারতের বৌদ্ধরা অহিংসাবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অহিংসাবাদ হইতেছে সৌরবাদ বা সূর্যস্তরের কর্মবাদ। বৌদ্ধবাদ এবং গণবাদ (কম্যুনিজম) প্রায় এক স্তরের চিন্তাধারা। বৈষ্ণববাদই বৈষ্ণব দর্শনের কর্ম অংশ। আমরা এই বিষ্ণুস্তরকেই সূর্যস্তর ও বিষ্ণুস্তরের মধ্যে দেখাইয়াছি। গান্ধীবাদী মূর্খরা এই মতবাদকে মুখ্য বস্তু বলিয়া মানিয়াই যবনতোষণ, ভারত ভাগ, চীনতোষণ ও ভারতের সর্বনাশকে জীবনের ব্রতরূপে মানিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে ভারত ধ্বংস হইবে অথবা ভারতের বুকে বৌদ্ধবাদের ধ্বংসের মত গান্ধীবাদ আপনিই ধ্বংস হইয়া নিজে নিজে নির্মূল হইবে, ইহা আমরা জানি না। মূর্খদের মতে ভারতের সর্বনাশকারী নেতারাই নাকি ভারতের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য নেতা। ভারতের মধ্যে সব ভাষা হইতে দুর্বল ভাষাই ইহাদের মতে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রভাষা। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা তুলিলে এরা সব কূপমণ্ডুকের মত কূপের জলের তুলনায় সমুদ্রকে ছোট মনে করে। শৈবদর্শনই শিবস্তরের দার্শনিকতা। ভারতের ঋষি ও যোগীরা যতদিন ভারতের রাজা ও নেতাগণকে উপদেশ দিতেন ততদিনই ভারতের জন্য শক্তিমান যুগ ছিল। অহিংসবাদী বড় বড় মূর্খ নেতাগণ ভারতের এই তপস্বীর ধারাকে

নিত্য গালাগালি করিয়া, পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলিকে কালো করাকেই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি মনে করেন। তাঁহাদের আরও বড় গুণ, শত্রুকে মিত্র মনে করা এবং মিত্রকে শত্রু করিয়া দেওয়ারূপ দুষ্কার্য, ইহার অন্যতম। বিষ্ণুস্তরের সাধু এবং শিবস্তরের সাধুদের চরিত্র একরূপ নহে। ভারতের অনেক দুর্ভাগ্য যে সমাজ সূর্য ও বিষ্ণুস্তরের সাধুগণকে শিবস্তরের অগ্নিপ্রতিম সাধুগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করে। যাহা হউক, দার্শনিকতা ও মতবাদ যদি পাশাপাশি না থাকে, তবে সব দর্শনই ফাঁকা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় অধ্যাত্মধর্মের সবই শক্তিশালী; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ভারতের বুকে দেখিতে পাইবে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া দুর্বলবাদের তাণ্ডব নৃত্য। যাহা হউক, যথোক্ত স্থানে সব আবরণ দেবতারই পূজা হইয়াছে। এবার সাধক মায়ের আবার ধ্যান করিয়া বাহ্য পূজায় মন দিন এবং মায়ের চরণে প্রার্থনা করুন; ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও শাক্তধর্ম রক্ষার জন্য যেন ভারতে স্থায়ীভাবে শক্তিবাদের যুগ আসে। শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দস্বামীর অতি স্নেহের সন্তান সত্যানন্দের চক্ষে, আজ ভারতের বুকে অনন্ত ও সীমাহীন দুর্দিন ও দুর্দশা দেখিয়া অশ্রুধারা কেন দেখা দিবে? সাধক! তুমি পূর্ববৎ শক্ত হও এবং শক্তিবাদের অনুকূলে কর্ম ও সাধনা করিয়া চল।

পুনঃ ধ্যান॥ ধ্যান পুষ্পটি বৈন্দবী চক্রে দিবে॥ (এবং) উপচার পূজা করিবে॥

পূজা অন্তে অর্ঘ্যজলে ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বানন্দময়বৈন্দব চক্রে পরব্রহ্ম স্বরূপিণী পরাপর শক্তি শ্রীমহাত্রিপুর সুন্দরী সমস্ত চক্রনায়িকা সম্বিত্তিরূপ চক্র নায়িকাধিষ্ঠিতে ত্রৈলোক্যমোহন সর্বাশা-পরিপূরক সর্ব সংক্ষোভকারক-সর্বসৌভাগ্যদায়ক-সর্বার্থসাধক-সর্বরক্ষাকর-সর্বরোগহর সর্বসিদ্ধিপ্রদ, সর্বানন্দময় শ্রীচক্র সমুন্মীলিত সমস্ত প্রকট-গুপ্ত-গুপ্ততর-সংপ্রদায় কুলকৌলিনীনিগর্ভ রহস্যাতিরহস্য পরাপর রহস্য, সমস্ত যোগিনী পরিবৃত শ্রীত্রিপুরা-ত্রিপুরেশী, ত্রিপুর সুন্দরী ত্রিপুরবাসিনী-ত্রিপুরা-ত্রিপুরমালিনী-ত্রিপুর সিদ্ধা ত্রিপুরাম্বা তত্তচক্রনায়িকাবন্দিত চরণ কমল শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী নিত্যাদেবী-সর্বচক্রেশ্বরী সর্বমন্ত্রেশ্বরী সর্ববিদ্যেশ্বরী সর্বপীঠেশ্বরী সর্বকামেশ্বরী সর্বতত্ত্বেশ্বরী সর্ববীরেশ্বরী ত্রৈলোক্যমোহিনী জগদুৎপত্তিমাতৃকা সর্বচক্রাময়ী-তচ্চক্রনায়িকাসহিতাঃ সমুদ্রা সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী পরাপরয়া সপর্যয়া পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু॥ বিশেষার্ঘ্যোদক অক্ষত কুসুমৈঃ প্রধানদেব্যা বামহস্তে সমর্পণম্॥ তর্পণান্তে এই মন্ত্রেই পুষ্পাঞ্জলি দিবে॥

নবমুদ্রা প্রদর্শন॥ তর্পণ ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদি। পুষ্পাঞ্জলি॥ বলিদান॥ স্ববামে মণ্ডল অঙ্কন॥ ওঁ ব্যাপক মণ্ডলায় নমঃ॥ বলিদ্রব্য স্থাপন॥ অন্নজলাদি ও বলি দেওয়া চলিবে॥ বলিপূজা॥ বলিদান মন্ত্র তিনবার পাঠ্য॥ ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদত্যঃ হূং স্বাহা॥ সামান্যার্ঘ্য জলে বলিদান করিয়া তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন॥

ঈশান, বায়ু, নৈর্ঋত ও অগ্নি কোণে মণ্ডল অঙ্কন করিয়া চারটি বলি স্থাপন করিবে। (১) ওঁ বাং বটুকেভ্যো নমঃ। (২) ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। (৩) ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ। (৪) ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ॥ উপচারসহ পূজা করিবে॥

(১) ওঁ এহ্যেহি দেবীপুত্র বটুনাথ কপিল জটাভারভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ববিঘ্নাশয় সর্বোপচার সহিত বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা॥ বামাঙ্গুষ্ঠ অনামা সংযোগে তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন॥ (২)

ওঁ ঊর্দ্ধ্বং ব্রহ্মগুতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিষ্কলে বা পাতালে বা, তলে বা পবন সলিলয়ো র্যত্র স্থিতা বা। ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপ দীপাদিকেন, প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্র বন্দ্যাঃ। ওঁ যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্বযোগিনীভ্যঃ হূঁ ফট্ স্বাহা॥ (৩) বামহস্তাঙ্গুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমানামাভির্যোন্যাকারেন মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ॥ ওঁ ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রস্থান ক্ষেত্রপাল ধূপাদি সহিত বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা॥ (৪) বামহস্তাঙ্গুষ্ঠ তর্জনীং সরলং কৃত্বা মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ॥ ওঁ গাং গীং গূং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা॥

এইভাবে বলিদান করিয়া দেবীকে আচমনীয়াদি প্রদান করিবে এবং সুগন্ধি তাম্বুল প্রদান করিবে।

সকল কামনাসিদ্ধি আরাত্রিক॥ মন্ত্র - ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ গ্লূং স্লূং ম্লূং প্লূং ল্লূং হ্রীঁ শ্রীঁ॥ এই মন্ত্র দ্বারা পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত নয়বার নীরাজন করিবে॥

আরাত্রিক মতঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।
সৌবর্ণে রাজতে কাংস্যে স্থানকে পরমেশ্বরি॥
কুঙ্কুমেন লিখেদ্যন্ত্রং নবকোণং মনোহরম্।
চন্দ্ররূপং চরুং কৃত্বা তন্মধ্যে মস্তকে শিবে॥
দীপমেকং বিনিক্ষিপ্য বসুকোণেঽষ্ট দীপকান্।
যবগোধূমমুদ্গাদিরচিতান্ শর্করাযুতান্॥
চষকাহিত শোভাভিঃ শোভিতান্ ঘৃত পূরিতান্।
অভিমন্ত্র্য মহেশানি রত্নেশ্বর্য্যাস্ততঃ পরম্॥
শ্রীবীজং পরাবীজং সংলিখ্য বরবর্ণিনি।
গসৌ চ মপলাঃ পশ্চাদিন্দ্রস্থাঃ ক্রমতঃ প্রিয়ে।
বামকর্ণ সমাযুক্তা নাদবিন্দু সমন্বিতাঃ॥
বীজপঞ্চকমেতত্তু পঞ্চরত্নানি সুন্দরি।
পূর্ব্ব বীজ বিলোমেন রত্নেশীয়ং নবাক্ষরী॥

আরাত্রিকান্তে প্রণাম॥

ওঁ সমস্ত চক্রচক্রেশি শুভে দেবি নবাত্মিকে।
আরাত্রিকং মিদং দেবি গৃহাণ্ মম সিদ্ধয়ে॥
সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ইত্যাদি।

উপাসনা॥ জপ॥ পূজা শেষ॥

মুদ্রা॥ ত্রিপুরা উপাসনায় কয়েকটি বিশেষ মুদ্রার প্রয়োগ হইয়া থাকে। সে সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য লইয়া বা চেষ্টা করিয়া ঐগুলি আয়ত্ত করিবে।

১। হস্তদ্বয় পরিবর্তিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে সরল ও সমভাবে স্থাপন করিবে। তর্জনীদ্বয়কে অনামিকাদ্বয়ের মধ্যগত করিয়া কুটিলভাবে রাখিয়া কনিষ্ঠাদ্বয়কে স্ব স্ব স্থানে রাখিবে। ইহার নাম **ত্রিখণ্ডা মুদ্রা**। ইহা ত্রিপুরা দেবীর ধ্যানকার্যে ব্যবহার হয়।

২। **সর্বসংক্ষোভকারিণী মুদ্রা**॥ উভয় হস্তের মধ্যমাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয়কে উভয় হস্তের মধ্যমাদ্বয়দ্বারা আবদ্ধ করিবে এবং তর্জনীদ্বয়কে দণ্ডাকার

করিয়া মধ্যমাদ্বয়কে দণ্ডাকার করিয়া মধ্যমাদ্বয়ের উপরিভাগে অনামিকাদ্বয় স্থাপন করিবে।

৩। পূর্বোক্ত মুদ্রাতে মধ্যমাকে সরলভাবে স্থাপিত করিলে **সর্ববিদ্রাবিনী মুদ্রা** হয়।

৪। **আকর্ষণী মুদ্রা**॥ মধ্যমা এবং তর্জনীকে অঙ্কুশাকার, কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমভাবে রাখিবে, পরে মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকার উপরিভাগে কনিষ্ঠা যোজিত করিবে।

৫। **সর্ব বশ্যকারী মুদ্রা**॥ হস্তদ্বয় পুটিত করিয়া তর্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিবে এবং মধ্যমা অনামিকাও এই অঙ্গুলীত্রয় বিপরীত ভাবে অর্থাৎ বামহস্তের মধ্যমাদি অঙ্গুলীত্রয় বামহস্তের তর্জনীর অধোভাগে এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীত্রয়ের অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন করিয়া অঙ্গুলী সকল নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করিলে **সর্ববশ্যকারী মুদ্রা** হয়।

৬। **উন্মাদিনী মুদ্রা**॥ করদ্বয় সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয়কে মধ্যমার মধ্যভাগে সংযুক্ত করিবে এবং অনামিকাদ্বয়কে সরলভাবে রাখিয়া তাহার উপরিভাগে তর্জনীদ্বয় স্থাপন করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দণ্ডাকার রাখিয়া মধ্যমার নখপ্রদেশে স্থাপিত করিলেই **উন্মাদিনী মুদ্রা** হইবে।

৭। **মহাঙ্কুশ মুদ্রা**॥ উন্মাদিনী মুদ্রাতে অনামিকাদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিয়া অধোভাগে স্থাপনপূর্বক তাহাতে তর্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিয়া নিয়োজিত করিলে মহাঙ্কুশ মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা সর্বকামার্থ সাধন করিতে পারে।

৮। **বীজমুদ্রা**॥ হস্তদ্বয় পরিবর্তন করিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে রাখিবে, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় একত্র মিলিত করিবে। মধ্যমাদ্বয়ের নিম্নভাগ কনিষ্ঠা দ্বারা চাপিবে। সর্বাঙ্গুলীর অধোভাগে অনামিকাদ্বয়কে কুটিলভাবে সেই মধ্যমাতে সংযুক্ত করিলে **বীজমুদ্রা** হইবে। এই মুদ্রা প্রদর্শন করিলে অচিরে সর্বসিদ্ধি বর্ধন করে।

৯। **খেচরী**॥ বামহস্ত দক্ষিণে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে স্থাপন করিয়া হস্তদ্বয় পরিবর্তন করিবে, পরে বামহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাতে সংযুক্ত করিয়া উভয় তর্জনীদ্বারা উভয় মধ্যমার ঊর্ধ্বভাগ আক্রমণ করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সরলভাবে স্থাপিত করিবে। ইহার নাম **খেচরী মুদ্রা**।

১০। মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জনীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করিয়া সমুদয় অঙ্গুলী একত্র সংযুক্ত করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অঙ্গুলী সমুদয়কে পীড়িত করিবে। এই মুদ্রার নাম **যোনিমুদ্রা**। ইহাকে **পরমমুদ্রাও** বলে।

১১। বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জনী অঙ্গুলী সরল করতঃ কর্ণপ্রদেশে ভ্রামিত করিলে **সৌভাগ্যদণ্ডিনী মুদ্রা** হইবে। এই মুদ্রা পূজাকালে প্রদর্শন করিলে সর্বসৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়।

ত্রিপুরাদেবীর সাধনায় মুদ্রা সম্বন্ধে বলা হইল। যাঁহারা মনে করেন এ সব মুদ্রা শিক্ষা করিলেই বিশ্বকে বশীভূত করা চলিবে, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত নহি। পূজার বিধি অনুসারে মুদ্রাদির প্রয়োগের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। আমরা পূজার বিধিতে উহাদের প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না। অন্যের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে অনেক মানসিক শক্তি আয়ত্ত করিতে হয়। মনের সেই সব স্থিতিগুলিই আসল মুদ্রা। সেই সঙ্গে বাহ্য মুদ্রা অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। আমরা মনের সেই সব স্থিতিগুলিকে ব্যাখ্যা

করিলাম না। কারণ, এ সব বাহ্য বিভূতি লইয়া যাঁহারা দিন কাটান তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞান ও শান্তিলাভ অসম্ভব।

সিদ্ধির লক্ষণ

ত্রিপুরা সাধনা অধ্যায়ে সিদ্ধি বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। উত্তম, মধ্যম এবং অধম সিদ্ধির লক্ষণ বিষয়ে দুই একটা কথা বলিয়া ত্রিপুরা অধ্যায় শেষ করিব।

উত্তম সিদ্ধি। মনে কোনপ্রকার চাপ না রাখিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর প্রাপ্তি মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। সাধক যাহা ইচ্ছা করেন উহাই প্রাপ্তি হয়। মৃত্যু নিবারণ, দেবতা দর্শন, বিনা ক্লেশে প্রয়োগ সিদ্ধি করণও মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। মন্ত্রজপে মনের আরাম ও শান্তি এবং জ্ঞানের বিকাশ হইলে এ সব সিদ্ধি আপনিই আগত হয়।

মধ্যম সিদ্ধিতে মনের আরাম ও শান্তি কম থাকে। অনুভূতির আরামও কমিয়া যায়। পরকায় প্রবেশ, পরপুর প্রবেশ, শূন্যমার্গ বিচরণ; সর্বত্র অবাধ গতি, খেচরী দেবীগণের সহিত মিলন ও কথা শ্রবণ, ভূচ্ছিদ্র দর্শন, পার্থিব তত্ত্বজ্ঞান, বাহনভূষণাদি বহুদ্রব্য লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজা ও রাজপরিবার বর্গের বশীকরণ, সাধ্যস্থানে চমৎকার কার্য প্রদর্শন, দৃষ্টিপাতদ্বারা রোগনাশ, বিষ নিবারণ, চতুর্বিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা, বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, মুক্তিকামনা, ত্যাগশীলতা, সর্ববশীকরণ ক্ষমতা, অষ্টাদশ যোগের অভ্যাস, সর্বভূতে দয়া, ভোগেচ্ছা ত্যাগ, সর্বজ্ঞতা গুণের প্রস্ফূর্তি, এই সব মধ্যবিধ সিদ্ধির লক্ষণ।

অধম সিদ্ধির লক্ষণ। কীর্তি, বাহন, ভূষণাদি লাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারে সর্বজন বাৎসল্য, লোক বশীকরণশক্তি, প্রভূত ঐশ্বর্য, ধনসম্পত্তি, পুত্রদারাসম্পদ, এ সব অধম সিদ্ধির লক্ষণ। অধম সিদ্ধিতে মনের শান্তি খুবই কমিয়া যায়।

যাঁহারা উচ্চ স্তরের মন্ত্রসিদ্ধ তাঁহারা সাক্ষাৎ শিবতুল্য। তাঁহারা উত্তম লক্ষণসম্পন্ন সিদ্ধ হইতেও শ্রেষ্ঠ। কেবল মন্ত্র জপই যথেষ্ট নহে; অনুভূতিতে গণেশ ,সূর্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তিস্তর না ফুটিলে কোন মন্ত্রসিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধি নহে। শিবস্তরের পঞ্চতন্মাত্রার অনুভূতিসম্পন্ন মহাত্মাগণ নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ শিবতুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে ‘‘পেটকোওয়াস্তে’’ মন্ত্রযোগের ব্যবসা করেন, মিথ্যা ও ছলনার আড়ালে এঁরাও দুই পয়সা উপার্জন করিতেছেন, দেখা যায়। যাঁহারা উন্নত জ্ঞান লক্ষ্যে পরিশ্রম ও উপার্জনসহ সাধনা করেন এবং সকাম জপ কর্ম করিয়া শক্তিক্ষয় করেন না, তাঁহারা জীবনে এক সময় শান্তি ও জ্ঞানের সন্ধান পাইবেন।

মহাবিদ্যার সাধনাই উন্নত স্তরের শক্তিসাধনা

কালী, তারা ও ত্রিপুরা সাধনার বিষয়ে মোটামুটি বলা হইল। ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশজন মহাবিদ্যার মধ্যে আমরা কালী, তারা ও ত্রিপুরা সাধনার কথা বলিলাম। এই ইচ্ছা ক্রিয়া এবং জ্ঞানরূপ মহাবিদ্যার সাধনা আমাদের গুরুপরম্পরার ক্রমসাধনায় স্থান পাইয়াছে। ক্রমসাধনা এখানেই শেষ হয় নাই। সে সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব। মহাবিদ্যাগণের মধ্যে সব সাধনায় মন দিবার

সময় আমার হয় নাই। যদি স্থযোগ জীবনে আসে তবে সব সাধনা বিষয়েই আমি সময়ান্তরে বলিব। আমার জীবনে বগলা ও ছিন্নমস্তার সাধনার স্থযোগ আসিয়াছিল। কাজেই বগলা ও ছিন্নমস্তা সাধনা বিষয়ে আমি কিছু ব্যক্ত করিব। এ সঙ্গে ধূমাবতী সম্বন্ধেও কিছু বলিতে হইবে।

১৯৬২ সনের ৮ই নভেম্বর কলিকাতা ''আকাশবাণীতে'' আমার প্রদত্ত ''শ্রীবগলা স্তোত্রম্'' রেডিওতে দেওয়া হইয়াছিল। ঐ তারিখের প্রায় দুই মাস পূর্বে আমাকে বগলামুখী স্তোত্র রেডিওতে দিবার জন্য অনুরোধ আসে। অক্টোবরের শেষের দিকে স্তোত্রটি রেকর্ড করা হয়। তখন চীন ঘোরতর ভাবে ভারতের সীমায় প্রবেশ করিয়া গিয়াছে। বগলামুখীর সাধনা সম্বন্ধে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি একটি ছোট বক্তৃতাও দিয়াছিলাম। তাহাতে বলিয়াছিলাম ''শত্রুকে শত্রু মনে করিতে হইবে। নিজেদের সমস্ত শক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং শ্রীবগলা মায়ের সাধনা করিতে হইবে।'' এই বিজ্ঞানে শত্রুকে আক্রমণ না করিলে, শত্রুকে পরাজয় বিষয়ে বগলা সাধনা পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় না। উক্ত বৎসর দুর্গাপূজার সময়ে শক্তিবাদ মঠের সমবেত পূজায় বলিলাম, ''চীনকে ঘিরিয়া চারিদিক হইতে ভীষণ আক্রমণ ও যুদ্ধ চলিয়াছে। রুশও চীনের বিপক্ষেই আছে। কিন্তু জহরলাল চীনকে বাঁচাইয়া দিবেন। এ সময় ভারতের কর্ত্তব্য হইবে তীব্বতকে মুক্ত করা।'' দুর্গাপূজার পরই কালীপূজার সময় আমার বুকে হতাশার চরম চাপ আসিয়াছে। পূজা শেষে আমি সমবেত পূজায় যোগদানকারী সকলকে বলিলাম ''মা লাদাক এবং নেফা রণক্ষেত্রে জোর দিয়াছেন, ভারত এবার বাঁচিয়া গেল।'' বগলা ধ্যান সাধনা ও স্তোত্র আমাকে বল দিয়াছিল। ইহার ফলে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলাম। কিছুদিন মধ্যেই নেফা অঞ্চলে ভারতের ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হইয়া গেল। তখনও আমার মনে অটুট বিশ্বাস ছিল। ইহার পর স্থলবাহিনীর সেনাপতি পদে জয়ন্তনাথ চৌধুরীকে নিয়োগ করা হইয়াছিল। চীন, জানি না কেন সরিয়া গেল। চীনের সঙ্গে যুদ্ধনীতিতে ভারত চীনকে ঠিক ঠিক শত্রু মনে করে নাই কারণ রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধ ছিন্ন করা হয় নাই। ২৮শে নভেম্বর রাত্রি আটটায় আমার যে স্তোত্রটি দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে দেখা গেল ''শত্রুকে শত্রু মনে করা প্রয়োজন'' প্রভৃতি কথাগুলি রেডিও হইতে বাদ পড়িয়াছে। বুঝিলাম, হতভাগ্য মূর্খদের রাজ্যে অবস্থান সত্যই ভয়ঙ্কর পাপ, কিন্তু প্রতিকার কি?

যখন স্তোত্রটি রেকর্ড করা হয় তখন চীন ভয়ঙ্কর আক্রমণ করিয়াছে। রেডিও কর্তৃপক্ষ হইতে এক মহিলা রেকর্ড শেষে আমার নিকট আসেন, প্রণাম করেন, এবং বলেন, স্তোত্রটি এবং বক্তৃতাটি অত্যন্ত সময় উপযোগী হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, আমি আজই ইহা রেডিওতে দিয়া দিই। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা, ইচ্ছা থাকিলেও দিতে পারিব না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমার মত একজন সাধারণ সাধকের সাধনার শক্তিতেই কি ভারত বাঁচিয়া গিয়াছিল? উত্তর - আমার মনে হয় আরও সাধক হয়তো বগলা সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্তোত্রটি রেডিওতে আনিবার মূলে দৈব বিধানই প্রধান কারণ। এ সঙ্গে আমি আরও বলিতে পারি, ভারত যুদ্ধ করিয়া চীনকে ঠেকায় নাই, চীনা সেনার শরীরে ভারতের একটি বুলেটও আঘাত করে নাই। চীনের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধ

ছিন্ন করিয়া যুদ্ধ করিলে এই যুদ্ধের ফল ভালই হইত। জানিয়া রাখিও, ভারতের দুর্বলবাদী নেতারাই ভারতের শত্রু; ভারতের একমাত্র মিত্র ভারতের তপঃশক্তি সম্পন্ন শক্তি সাধকের ভক্তিবল। ভারতের এখনই কর্ত্তব্য পাকিস্তানের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধ ছিন্ন করা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অখণ্ড ভারত করা। বগলা শক্তিসাধক নিশ্চয়ই রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের মত ভয়ঙ্কর উগ্র তপস্বী ও শক্তিসাধক হইবেন। তিনি শত্রুর প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর হইবেন। বগলা সাধকের ইহাই প্রধান লক্ষণ জানিবেন। জ্যোতিষের মতে মঙ্গল হইতেছেন রণের গ্রহ। মঙ্গলের প্রতিকার শক্তি হইতেছেন ‘‘বগলামুখী’’। মঙ্গল দৈব স্তর। বগলা শক্তি স্তর, বগলা বৈরী জিহ্বা ধারণ করিয়াছেন এবং বৈরীর মস্তকে মুগুরঘাত করিতেছেন। বৈরীকে মোটেই কথা বলিতে বা প্রপাগাণ্ডা করিতে দিবে না এবং ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে শত্রুকে চূর্ণ করিবে। ভারত আজ শত্রুবেষ্টিত সমস্ত ক্ষেত্রে। শত্রু বিষয়ে, এই বগলা সাধনা নীতির অপলাপ করিতেছে; ভারতের আজ ভয়ঙ্কর দুর্দিন। ইহার কারণ, নেতারা অত্যন্ত মূর্খ, দাম্ভিক মিথ্যাবাদী; ইহারা সব রকমে শক্তিহীন।

ছিন্নমস্তার সাধনায় সিদ্ধ সাধকের লক্ষণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ছিন্নমস্তা হইতেছেন, রাহু গ্রহের প্রতিষেধক মহাশক্তি। এই মহাশক্তি ছিন্নমস্তার প্রভাবে রাহু হীনবল হয়। পৃথিবীতে রাহু হইতেছেন লিঙ্গকাটা ম্লেচ্ছবাদের প্রতিভূ উপদেবতা। রাহু অত্যন্ত ম্লেচ্ছ এবং মলিন গ্রহ। ভারত ভাগ হইয়া ম্লেচ্ছ রাজ্য হইবার মূলে রাহু গ্রহের প্রভাব আছে। ভারত ভাগের প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে গ্রহদের প্রভাবে ভারত ভাগ হইবে, এ কথার ভবিষ্যৎবাণী বিখ্যাত জ্যোতিষী চীরো (কীরো) করিয়াছিলেন। চুনারের বিখ্যাত হস্তরেখা বিশারদ মিঃ হার্ডলেস বিলাতে গিয়াছিলেন। সে সময় তিনি নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং ভারত সম্বন্ধেও জানিতে চাহিয়াছিলেন। হার্ডলেসের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই; কিন্তু ভারত সম্বন্ধে চীরো (কীরো) বলিয়াছিলেন, ‘‘রাহুর প্রভাবে ভারত ভাগ হইবে। ভারতের অধিপতি গ্রহ হইতেছেন শনি। শনি (ভারত) রাহুকে মিত্র মনে করিবে এবং রাহুবাদী লিঙ্গকাটা জনতা ভারতকে ভাগ করিয়া ভারতের সর্বনাশ করিবে।’’ মিঃ হার্ডলেসের নিকট কথিত চীরোর (কীরোর) ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। রাহু ম্লেচ্ছভাষারও অধিপতি। ভবিষ্যৎ পুরাণে আমি ম্লেচ্ছবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত কথা পড়িয়াছি। উক্ত পুরাণের মতে, মহম্মদের নাম দেওয়া হইয়াছে, ‘‘মহামদঃ’’। মক্কার শিবের নাম হইতেছে ‘‘মরুস্থান নিবাসী শিব’’। মহামদঃ এই শিবকে গঙ্গাজলে ও বিল্বপত্রে অর্চনা করিতেন, লিখিত আছে। মহারাজ যযাতির দুই পুত্রকে ম্লেচ্ছ ও যবন করিয়া ভারতের পশ্চিমে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। (শঃ ৬। গীতা অঃ ১৫ দ্রঃ)। তাঁহারা শিবের সাধনা করিয়া বরলাভ করেন, যাহার ফলে ভারতের নেতা ও রাজারা নপুংসক নীতি গ্রহণ করিবেন এবং ভারত ম্লেচ্ছ সম্রাটদের অধীন হইবে। ভারতের ধর্ম ও সমাজ এবং নারীদের চরম অপমান হইবে। এইরূপ পরিস্থিতির আরম্ভ ও শেষ বিষয়েও সন তারিখ সব কথাই শাস্ত্রে দেওয়া আছে। প্রতিকারের কথাও বলা আছে। এ সম্বন্ধে যোগিনী তন্ত্রেও বহু কথা আছে। ভারতের নেতা ও রাজাদের দুর্বল নীতির যুগ এখনও চলিবে। এই গণস্বাধীনতার যুগে শতকরা

৮২ জন হিন্দুর দেশ ভারতকে, শতকরা ১৮ জন যবনবাদী বর্বর ভাগ করে এবং বিভক্ত ভারতেও দুর্বলবাদী নেতাগণ ৬ কোটি যবনকে ৩৫ কোটি হিন্দুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ভারতকে স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করে। হিন্দুর ঘরে ঘরে আজ ভ্রূণ হত্যার দুষ্কার্য ভারতের নেতাগণের আদেশেই চলিয়াছে। যে পাপের উদ্ধার গঙ্গাস্নানেও হয় না বলিয়া শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। ম্লেচ্ছভাষা ঊর্দূর কন্যা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য ভারতের দিকে দিকে মনোমালিন্য ও গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এ সবের প্রতিকারের জন্য উগ্রতপা মহাত্মাগণ ছিন্নমস্তার সাধনায় আত্মনিয়োগ ভিন্ন অন্য কি করিতে পারেন? যবন এবং যবনের বন্ধু কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট ভারতের সর্বনাশ করিয়াছে এবং আরও করিবে।

যযাতির সন্তানগণের অনুকূলে শিবের বরদান হইবার পর কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণ একটি দুই বৎসরের কুমারী বালিকাকে সরস্বতী রূপে পূজা করেন। ক্রন্দনপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় মা সরস্বতী বলেন - ''ম্লেচ্ছভাষার জন্য আর তোমরা ক্রন্দন করিও না, শিবের বর অকাট্য, যবনের অত্যাচারে ভারত জর্জরিত হইবে, নারীর চরম অপমান হইবে। সংস্কৃত ভাষা সর্বত্র নিন্দিত হইবে। ভারতের নেতা ও রাজাগণ যবনদের ব্যাপারে সর্বত্র 'শব নীতি' (নপুংসক নীতি) গ্রহণ করিবেন। ভাষার জন্য তোমরা বিচলিত হইও না। আমি যবনভাষার মিশ্রণে ভারতের ভাষা প্রস্তুত করিব এবং সেই ভাষার অনুকূলে আর্যজাতির এত মোহ দিব যে তাহারা সংস্কৃত হইতেও যবন ভাষাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবে। উহার জন্য মারামারি কাটাকাটিও করিবে।'' সংস্কৃতের মত মহান ভাষা থাকিতে ভারত আজ হিন্দীর জন্য কাটাকাটি করে, ইহা যে সত্যই বিস্ময়কর ইহাতে সন্দেহ কি থাকিতে পারে? ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ ধর্ম, ম্লেচ্ছ মোহ, সবই রাহু গ্রহের ফল। ভারতের হিন্দু জনতা ও নেতার ম্লেচ্ছ মোহের ভয়ঙ্কর যুগ এখনও ৫০।৬০ বৎসর থাকিবে। যবন-মোহ যতই ভীষণ হউক না কেন অনেক ধর্মনিষ্ঠ মনুষ্য ভারতে থাকিবেন যাঁহারা শক্তিবাদীয় ভারতের জন্য চিন্তা করিবেন। তাঁহাদের প্রভাবে এবং উগ্রতপা শক্তিধর শক্তিসাধকগণের ছিন্নমস্তার সাধনায় আত্মনিয়োগের ফলে যবনবাদ শক্তিহীন হইবে।

ছিন্নমস্তার পদতলে বিপরীত ভাবে সম্ভোগরত কামদেব এবং রতি বিদ্যমান। পুরুষের ভোগস্পৃহার নাম 'কাম', স্ত্রীর ভোগস্পৃহার নাম 'রতি'। বিপরীত মিলন মানে ভোগে ক্ষয়হীন মিলন জীবন ও রতি প্রভাবকে পদদলিত করিয়া সাধক জীবন অথবা ব্রহ্মচর্যময় সাধক জীবন। কে এমন শক্তিসাধক আছেন, যিনি যৌনমিলনে ক্ষয়হীন? অথবা যৌনমিলনের প্রভাব অতিক্রম করিয়া পূর্ণব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত?

ধ্যানে ''দেবীকে কোটি সূর্যের মত তেজপুঞ্জ সমন্বিতা'' বলা হইয়াছে। সাধক! অসুরের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে বা দেখিলে তোমার চোখে মুখে ও সর্বাঙ্গে অগ্নিকণা দেখা দেয় কি? যবনরা যখন ভারতের সর্বনাশ করিতে তৎপর, সতীর সর্বনাশ করিতে সঙ্ঘবদ্ধ, সেই সব কথা শ্রবণ করিয়া বা ভাবিয়া তুমি তেজের ছটায় অগ্নিরূপ ধারণ কর কি?

দেবীর সঙ্গিনী দুইটি মহাশক্তি ধারিণী শক্তি আছেন। তাঁহাদের নাম, ধ্যানের মতে, ডাকিনী এবং বর্ণিনী। ইঁহারা উভয়েই মায়ের দক্ষিণে ও বামে অবস্থিত। সাধককে আবার জিজ্ঞাসা করি, এমন শক্তিধর দুইটি সাথী বা সঙ্গিনী তোমার আছেন কি? যাঁহারা তোমারই মত উগ্র তপস্বী বা তপস্বিনী, তাঁহারা কি কোটি সূর্যের মত অসুরের বিরুদ্ধে তেজপুঞ্জ সমন্বিত?

ছিন্নমস্তা সাধকের আরও লক্ষণ আছে। দেবী (ধ্যানের মধ্যেই) নিজের রক্ত নিজে পান করিতেছেন। অসুর ও যবন প্লাবিত ভারতে এমন কোন মহান শক্তিসাধক আছেন কি যিনি শরীর রক্ষার জন্য অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের রক্তের উপর নির্ভরশীল? সাধক! যবনের অত্যাচার এবং ব্যাপক অনাচার ও প্রতিকারহীন শক্তিধর নেতা বা রাজার মূর্খতাপূর্ণ দুর্বলতা ও নিস্তেজতা দেখিয়া মনে কখনও কি এ কথা জাগে নাই যে নিজের রক্ত ও মাংস নিজে ছিন্ন করিয়া পানাহার করি? যদি তোমার মনে এইরূপ ভয়ঙ্কর প্রতিকারস্পৃহা হয়, তবে তুমি ছিন্নমস্তার সাধনা কর। অসুরের দলকে এবং অসুরের পদে তৈল মর্দনকারী পাপিষ্ঠগণকে শক্তি অনুসারে তিরস্কার কর, নিজের ভয়ঙ্কর আত্মপীড়নের অভিব্যক্তি সমাজকে জানাও, বিশ্বকে জানাও এবং সেই সঙ্গে ছিন্নমস্তার ধ্যান পাঠ কর ও ছিন্নমস্তার মন্ত্র মনে মনে স্মরণ কর। যবনবাদ নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। সাধক, তুমি চাঁদা বা ভিক্ষা বা দীনতার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা পরিচালনার ব্যূহ অতিক্রম করিয়াছ কি? ওই ভাবে নিজের জীবন পরিচালনার পক্ষে তোমার অন্ততঃ দুইটি সহায়কারী বা দুইটি সহায়কারিণীর অন্নবস্ত্র ও জীবনযাত্রার জন্য তুমি নিজের রক্ত দানের ব্যবস্থা করিয়াছ কি?

যে সব শক্তিসাধকের চরিত্রে উপরিউক্ত লক্ষণগুলি বিদ্যমান তাঁহাদের সাধনার বলে ভারত ম্লেচ্ছ মোহ অতিক্রম করিবে। ভারতকে বলিয়া রাখি, কংগ্রেসরূপ নরক পুরুষদের রাজত্বকালে ভারত আজ চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। এই ধ্বংসকালের চরম কাল ১৯৪৭ হইতে আজ ১৯৬৫ সনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের আরও সর্বনাশ নিকটবর্তী।

যযাতির বংশধর দ্বয়ের মানস পুত্র (দীক্ষিত পুত্র) গণের নাম ম্লেচ্ছজাতি। ভবিষ্যৎ পুরাণে ইহাদিগকে "বিষ্ণুর কর্দম পুত্র" বলা হইয়াছে। আমাদের ক্রমবিকাশের ভাষায় ইহাদিগকে অপুষ্ট বিষ্ণু স্তরের চিন্তার প্রভাবে গঠিত জনতা বলা যায়। ইহারা লিঙ্গকাটা জনতা। রাহু মস্তককাটা ছায়াগ্রহ। ছিন্নমস্তা তেজপুঞ্জে পরিপূর্ণা মহাশক্তি। ইনি সমাজের চরম পতনে এতই বিক্ষুব্ধ যে সমাজের অন্নকে তুচ্ছ মনে করিয়া নিজের রক্তপানে শরীর ও অনুগতের রক্ষায় তৎপরা।

আজ শিবের মত শক্তিধর ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ সাধক ভারতে কে বিদ্যমান যে ছিন্নমস্তার সাধনার বলে এবং তপঃলব্ধ কর্মবিজ্ঞানের প্রভাবে ভারতকে রক্ষা করিবেন? কোথায় শিবাজীগুরু রামদাসের মত শক্তিসাধক? তোমরা ভারতের যে কোন স্থানেই থাক না কেন, নিজের সাধনা করিয়া যাও, প্রচার করিয়া যাও, যবনের দাস ও যবনের দলকে তিরস্কার কর। শুধু সাধনায় কার্যসিদ্ধি হয় না, প্রচার চাই, কার্য চাই। ভারত ভাগের

কংগ্রেসনেতা ছিলেন নেহেরুজী। ইনি নিজেই বলিয়াছেন, ''By Culture (সংস্কারে) তিনি একজন মুসলমান।''

''রাহু এবং কেতু'' গ্রহ জগতে দুইটি বলবান পাপগ্রহ, একই গ্রহের মস্তকের নাম 'রাহু' এবং ইহার মস্তকহীন শরীরের নাম 'কেতু'। পাঠক জানিয়া রাখুন ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি ''রাহু কেতু রাজ্যই'' আজ পাকিস্তান। লিঙ্গের মাথাকাটা জনতা, তা তাঁহারা পাকিস্তানেই থাকুন বা হিন্দুস্থানে থাকুন ভারতের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদজনকভাবেই অবস্থান করিতেছেন। ম্লেচ্ছ ভাষার মিশ্রণে হিন্দীমোহগ্রস্তগণও রাহুগ্রস্ত ভারতীয় হিন্দুজনতাকেই জানিবেন। ভারত হিতৈষী উন্নত স্তরের শক্তিসাধক যাঁহারা ভারতে বা বিশ্বে আছেন তাঁহারা ''ছিন্নমস্তার ধ্যান'' পাঠ করুন এবং ছিন্নমস্তার মন্ত্র জপ করুন। ম্লেচ্ছ জনতা এবং উহাদের জন্য দরদী ভারতীয়গণ যে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এ কথা নির্ভয়ে বলিতে থাকুন। এই বলায় যদি ফাঁক থাকে তবে ''ছিন্নমস্তা'' সাধনা ব্যর্থ হইবে। কালী, ছিন্নমস্তা এবং ধূমাবতীর আশ্রয়ে সাধক শক্তিসাধনায় আত্মনিয়োগ করুন, যদি মায়ের কৃপা হয় তবে ভারত বাঁচিয়া যাইবে। ভারতের অধঃপতনের কথা ভাবিতে আমি শঙ্কিত হই। মনে হয়, ভারতের নেতারা বুঝি সকলেই যবনদের বাড়ির দারোয়ান। ভারতের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত মান ইজ্জত যেন কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে দুর্নীতিপরায়ণ ও ভারতের শত্রু যবন রক্ষা ও যবন পালনে এবং যবনকে শক্তিশালী করিবার কার্যে নিয়োজিত।

শুধু ছিন্নমস্তার সাধনার কথা বলিলে খণ্ডিত ভারতের সব কথা বলা হইল না। ছিন্নমস্তার সঙ্গে ধূমাবতীর সাধনার কথাও কিছুটা বলা প্রয়োজন। রাহুর প্রভাবে ভারত ভাগ হইয়া দুইটি পাকিস্তান হইয়াছে। ভারতের জন্য ইহারা দুষ্টগ্রহ রাহু এবং কেতু। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, ''ধূমাবতী শত্রুক্ষয়কর সাধনা''। এখানেও দেখা যায়, যদি শত্রুকে শত্রু মনে না করিয়া মিত্র মনে করা হয়, তবে ধূমাবতীর সাধনা কাজ দিবে না। দেবী সূর্প চালনা করিতেছেন। সূর্প মানে কুলা। ইহা বায়ু চালনা কার্যে ব্যবহৃত হয়। শত্রুর শত্রুভাব পাঙ্খা চালনা করিয়া জাগ্রত রাখিবে অর্থাৎ সর্বদা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচার করিবে। প্রচার করিয়া শত্রুর শত্রুতা বৃদ্ধি করিবে এবং নানা ভাবে প্রচুর শক্তি অর্জন করিয়া আক্রমণান্তে তাহাকে বিধ্বস্ত করিবে। তাহাকে কোনও প্রকারের দয়ামায়া করিবে না। ক্ষুধার্ত মানবের মত শত্রুকে (মায়ের ধ্যান দ্রষ্টব্য) বিধিমত চিন্তা করিয়া হিংস্রভাবে আক্রমণ করিবে এবং ধূমাবতী মন্ত্র জপ করিবে। ইহার ফলে, শত্রুর ক্ষয় অবশ্যই হইবে। হিন্দু জাতির এত অধঃপতন যে এমন মহাবিদ্যার পূজা ও সাধনা, যাহা কিছু হয়, সবই প্রায় ব্যক্তিগত গ্রহশান্তির অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগকালে ইঁহাদের সাধনা এখন সমাজ হইতে লুপ্তপ্রায়। তাহা হইলেও আমাদের মনে হয়, উচ্চস্তরের সাধকদের চেষ্টা না থাকিলে, প্রায় সহস্র বৎসরের দুর্যোগের মধ্যে ভারত তাহার অধ্যাত্ম শক্তি রক্ষা করিতে পারিত না।

যবনের অত্যাচার এবং যবনের পদে তৈল মর্দনকারী পাপিষ্ঠদের দুষ্কার্য হইতে সতী এবং ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য আরও দুইটি আদেশ তন্ত্রশাস্ত্রে পার্বতীর প্রশ্নে শিবের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। (১) কুমারী পূজা করা এবং (২) দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিব

দর্শন করা। এই পুণ্যের প্রভাবে অধ্যাত্মবাদী ভারত রক্ষা পাইবে। সাধক পূজার আরম্ভ কালে, দুইটি ভূত বলি দিবে। একটি হইবে মক্কেশ্বর ভূতের নামে এবং অন্যটি হইবে সমস্ত স্তরের ভূতের উদ্দেশ্যে। মক্কেশ্বর ভূতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিবে : ‘‘তুমি আমাদের পূজায় সন্তুষ্ট হও এবং ভারত ছাড়।’’ এইভাবে ভূতগণের পূজা করিয়া কুমারী পূজা করিবে। বহু শত বৎসরের উৎপীড়নের পর এখন যবন বল নিস্তেজ হওয়ার সময় আগতপ্রায়। যবনের পদে তৈল মর্দনকারী পাপিষ্ঠগণ নিস্তেজ হইলেই যবনবাদ নিস্তেজ হইবে। এখন যবন পোষণকারীদের বক্তৃতায় বা ছলনায় শক্তিসাধক বিচলিত না হইয়া নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান করিয়া চল এবং যাহা বলিবার তাহাও বলিয়া চল। মহাশক্তির পূজা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে না।

আমার বাল্যকালে আমি ‘‘কমলা মূর্তি’’ দেখিতে পাইতাম এ কথা বলিয়াছি। আমি জানিতাম না ইনি ‘‘মা কমলা’’। এখন বুঝিলাম, ইনি দশমহাবিদ্যার একজন মহাশক্তি। মা কমলার পায়ে অনেক প্রণাম জানাই এবং মায়ের স্নেহ ও আশীর্বাদ কামনা করি।

দশমহাবিদ্যার সাধনা বিষয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করিলাম। মায়ের আশীর্বাদ হইলে অন্য সংস্করণে এই বিষয়ে বলিব। এবার সাধনার শেষ তিনটি দীক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার জন্য দশমহাবিদ্যা প্রসঙ্গটি এখানেই স্থগিত রাখিলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

আমার ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা

মহা সাম্রাজ্য দীক্ষা - শক্তি সাধনা অধ্যায়ে কালী, তারা ও ত্রিপুরা সাধনার কথা বলিয়াছি। কালী দীক্ষার নাম শক্তি ও পূর্ণ দীক্ষা, তারা দীক্ষার নাম ক্রম দীক্ষা এবং ত্রিপুরা দীক্ষার নাম সাম্রাজ্য দীক্ষা। ত্রিপুরা দীক্ষার পর মহা সাম্রাজ্য দীক্ষা হইয়া থাকে। মহাসাম্রাজ্য দীক্ষার সাধনার বিষয় হইতেছে অর্ধনারীশ্বর। ''নারী'' মানে মহা প্রকৃতি বা পরমা প্রকৃতি। ঈশ্বর মানে পরম পুরুষ বা বিশুদ্ধ চেতনা। ঈশ্বরত্বেরই দুইটা দিক, একদিকে মহাপ্রকৃতির সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য, অন্যদিকে বিশুদ্ধ চেতনা বা নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব। পৌরাণিক দৃষ্টিতে অর্ধনারীশ্বর মানে ''শিব পার্বতী''। তাত্ত্বিক ভাষায় ইহার নাম ''পুরুষ প্রকৃতি''। ইহারই অন্য নাম ''ঈশ্বরতত্ত্ব''। পরম পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতিই ''ঈশ্বরতত্ত্ব''। বেদান্তের ভাষায় ''মায়া উপহিত চৈতন্য''। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই ঈশ্বরের মহা সাম্রাজ্য। ঈশ্বরতত্ত্বকে অনুভব করাই মহান সাম্রাজ্য লাভ। সাধু মহাত্মাগণকে এই জন্যই ''মহারাজ'' বলিবার প্রথা। বর্তমান সময় মহা সাম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত যোগী দুর্লভ হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর সস্তায় সন্ন্যাসী করিবার নিয়ম প্রবর্তন করেন, ইহার ফলে গেরুয়া পরিধান করিয়াই সাধুরা ''মহারাজ'' হন। এত সব দীক্ষা ও সাধনার কথাটা এখন গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরাও যুগের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সাধনার সব কথাই সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া দিলাম॥

মহা সাম্রাজ্য দীক্ষার মন্ত্র - ওঁ স্ত্রীঁ।

অর্ধনারীশ্বর এই মন্ত্রের দেবতা।

অজপা মন্ত্র (শব্দজপা) 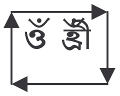

অর্থাৎ শ্বাস বাহিরে যাইবার কালে ওঁ স্মরণ কর। ইহার মানে সৃষ্টি শেষ হইয়া গেল, তবে সৃষ্টি শেষ হইয়া যাইবার মধ্যেই আবার সৃষ্টির পূর্ববেগ স্মরণ কর। ইহার পর ইহার ইঙ্গিত তীরটি স্ত্রীঁ কারের দিকে বেগসম্পন্ন। এই গুপ্ত বেগটি শেষ হইবার পর আবার সৃষ্টি বা প্রকৃতি-ক্রিয়া স্পষ্ট হইল, ইহাই স্ত্রীঁ কার; এ সময় শ্বাসটি বাহিরে আসিতেছে দেখ। এই বহির্মুখী শ্বাসটিই স্ত্রীঁ কারের সঙ্গে নিম্নমুখী তীর চিহ্নে চিহ্নিত করা হইয়াছে। সৃষ্টি পূর্ণরূপে পরিণত হইবার পর আবার সৃষ্টিরূপা প্রকৃতি ব্রহ্মমুখী বা প্রলয়মুখী হইবার পূর্বাবস্থায় আসিতেছে। এই কথারই ইঙ্গিতটি স্ত্রীঁ কারের নিম্নস্থিত ওঁ কারের দিকে গতিসম্পন্ন একটি তীর। বহির্মুখী শ্বাস + সাম্য অবস্থা + আবার অন্তরমুখী শ্বাস + সাম্যাবস্থা। এই চারটি অবস্থা একটা শ্বাসে প্রশ্বাসে নিহিত আছে। শক্তিবাদ ভাষ্য

গীতায় প্রাণক্রিয়া দেখুন। এই গ্রন্থে রাজযোগ অংশে প্রাণায়াম দেখুন। বহুদিন ধীর অভ্যাস ভিন্ন ইহার মর্ম স্পষ্ট হইবে না।

অর্ধনারীশ্বরের ধ্যান

ওঁ উদাদ্ভানু স্ফুরিত তড়িদাকারমর্দ্ধাম্বিকেশ।
পাশাভীতিং বরদ পরশুং সং দধানং করাব্জৈ॥
দিব্য কল্পৈর্ণব মণিময়ৈঃ শোভিতং বিল্বমূলং।
সৌম্যাগ্নয়ং বাপুবর তুনশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্॥

পূজামন্ত্র - ওঁ রং ক্ষং মং রং বং ওঁ ঊং অর্ধনারীশ্বরায় শিবায় নমঃ॥

প্রণামমন্ত্র - ওঁ নীল প্রবাল রুচিরং বিলসং ত্রিনেত্রং পাশাকর্ণোৎপল কপালক শূল হস্তং। অর্দ্ধাম্বিকেশং মনীশং প্রবিভক্ত ভূষং, বালেন্দু বদ্ধ মুকুটং প্রণমামি রূপং॥

ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র ব্যাখ্যা না করিয়া আচার্য শঙ্কর কৃত অর্দ্ধনারীশ্বর স্তোত্রটির অর্থ ও নোট দিলাম। ইহা দ্বারাই অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

অর্ধনারীশ্বর স্তোত্রম্

ওঁ কস্তূরিকা চন্দন লেপনায়ৈ, শ্মশান ভস্মাঙ্গ বিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণি কুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ১
মন্দার মালা পরিশোভিতায়ৈ কপাল মালা পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ২
চলৎ কণৎ কঙ্কণ নূপুরায়ৈ বিভ্রাট্ক্ষণা ভাস্বর নূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ৩
বিলোল নীলোৎপল লোচনায়ৈ বিকাশি পঙ্কেরুহ লোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষ মেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ৪
প্রপন্ন ভক্তে স্থখদাশ্রয়ায়ৈ ত্রৈলোক্য সংহারক তাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃত স্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ৫
চাম্পেয় গৌরার্দ্ধ শরীরকায়ৈ কর্পূরগৌরার্দ্ধ শরীর কায়।
ধম্বিল্ল বত্যৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ৬
অম্ভোধর শ্যামল কুন্তলায়ৈ বিভূতি ভূষাঙ্গ জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেক পিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ৭
সদাশিবানাং পরিশোভিতায়ৈ সদা শিবানাং পরিশোভিতায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ৮

যাঁহার অর্ধাঙ্গ গৌরীদেহে কস্তুরীচন্দন বিলেপিত, অপরার্ধ হর দেহে শ্মশান ভস্মের বিলেপন। অর্ধাঙ্গের কর্ণে মনোহর কুণ্ডল শোভিত, অপরার্ধে সর্পকুণ্ডল শোভা সম্পাদন করিতেছে, সেই শিবা (দুর্গা) এবং শিবকে প্রণাম॥ ১॥

শক্তিবাদ ভাষ্য - গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তিস্তরের অনুভূতির বিস্তারিত আলোচনা পাঠক ক্রমবিকাশে দেখুন। উন্নত অনুভূতির এ সব স্তরগুলিকে শক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জানিতে হইবে। দার্শনিক ভাষায় বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়া, এ সব স্তরগুলিও শক্তিরই বিভিন্ন স্তর। সাধকের নিজের চরিত্র, বাক্য, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা,

বিজ্ঞান সবই শক্তিরই নানা রূপ। সমাজে এ সবের প্রতিষ্ঠা শক্তি কৈন্দ্রিক হওয়া চাই এবং শক্তির এ সব রূপই আকর্ষণীয় পবিত্রতা এবং মন মাতানো কস্তূরিকাগন্ধে চর্চিত থাকিবে। শক্তির কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই শক্তিহীন থাকিবে না। ইহাই সাধকের শক্তিসাধনার অর্ধাঙ্গ। আজ যে ভারতে বিশ্বব্যাপী শত্রু গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার মূলে রহিয়াছে অহিংসাবাদী ভণ্ডদের দ্বারা নেতৃত্বে শক্তিহীনতার সাধনা বা কর্মনীতি। বিশ্ব জুড়িয়া ভারতের কস্তুরী ও চন্দন সুলভ পবিত্রতার কথা নাই, অর্থাৎ যশ ও সুগন্ধিও নাই।

আমার সাধকদশার একটা বিশেষ ঘটনার কথা বলা যাইতেছে। ভারতধর্ম মহামণ্ডলের বিবেকানন্দ স্বামীজী চুনার পাহাড়ে, আনন্দমঠে কয়েক মাস ছিলেন, একথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি। তিনি প্রায় প্রতিদিন গুরুদেবের সম্মুখে সংস্কৃত ভাষায় (বঙ্গ অক্ষরে ছাপা) পুরাণ পাঠ করিতেন। মাঝে মাঝে আমিও অল্প সময়ের জন্য শ্রোতা হইতাম। কোন এক রাজার কোন বিষয়ের সমস্যা দেখা দেয়। রাজা সভায় আগত এক মুনিকে নিজের সমস্যার কথা বলিলেন এবং সমাধান জানিতে চাহেন। সমস্যার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, ঋষিরা সমাধানের কথা যে বলিবেন উহা আমি জানি। বিবেকানন্দজী বলিলেন, আগে ব্রহ্মচারীজীর কথা শুনিব, পরে পাঠ করিব। আমি সমাধানটি বলিয়া দিলাম। পাঠে দেখা গেল, মহর্ষিও সে কথা বলিলেন। আমি আরও বলিলাম, প্রাচীন রাজাদের যে কোন সমস্যার সব সমাধানই জানি এবং আমি বলিয়াও দিতে পারি। সমাধানের বিজ্ঞান আছে। বিবেকানন্দজী এইভাবে বহু সমাধানের কথা শুনিয়া খুবই বিস্মিত হইলেন। আসল কথা, সাধকের শক্তিসাধনের মধ্যেই মানবের সমস্ত প্রকার সমাধানের সূত্র বিদ্যমান। শক্তিসাধনা অসুরবাদ ও দুর্বলবাদকে প্রশ্রয় দিবার নীতি মানে না। সাধনা না করিয়াই গুরু সাজিলে, সমাধান বিপর্যয়ের পর্যায়ে আসিতে বাধ্য।

মহম্মদ প্রবর্তিত মক্কাবাদকে যদি ভারত আপনার করিতে চায় তবে ভারতকে বেদবাদ ও শক্তিবাদ বিসর্জন দিতে হইবে এবং ভারতের নিশ্চয়ই সর্বনাশ হইবে। যে জাতি বেদ, গীতা, চণ্ডী বা শক্তিবাদের মত শক্তিশালী মতবাদ হারায়, সে তো মৃত জাত। তার মৃত্যু যদি এখনও দেখিতে না পাও অচিরেই দেখিতে পাইবে।

শ্লোকের মধ্যে শিবের বর্ণনায় কেবলই ত্যাগ এবং উদাসীনতার রূপবর্ণনা রহিয়াছে। শক্তিসাধনে সমাজকে সর্ববিষয়ে শক্তিবাদীয় নীতিতে গড়িয়া তুলিতে উপদেশ দিবেন (চণ্ডীর মেধস মুনি সুরথ এবং বৈশ্যকে যেমন উপদেশ করিয়াছিলেন)। কিন্তু নিজের বিষয়ে অসাধারণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ত্যাগ ও উদাসীনতায় নির্লিপ্ত হইবেন। ধ্যান ও স্তোত্রটির মধ্যে শক্তির স্বভাব এবং শিব তুল্য যোগীর স্বভাব বিচিত্রিত করা হইয়াছে। ভারতে যত অধঃপতন উহার মূলে ছিল দুর্বলবাদীয় নীতির প্রভাব। শক্তিমান ও যোগীর চিন্তার প্রভাবেই ভারত বার বার দাঁড়াইয়াছে। দুর্বলবাদের সাধু বা সাধুমাতার চরণতলে মস্তক রগড়াইয়া ধর্ম ফলাইতে, আজ এই ধর্মহীন ভারত রাষ্ট্রে খুব কম নেতার কথা শোনা যায় না। ইহাও কিন্তু ভারতের সর্বনাশের লক্ষণ। এঁরা যেমন চেলা, ইঁহারা তেমন গুরুরই চরণ ধরেন।

যাঁহার অর্ধাংশ গলে পারিজাত মালা পরিশোভিত, অপরার্ধে শবমস্তকাস্থি পরিশোভিত, অর্ধাঙ্গে দিব্য অম্বর এবং অপরার্ধ দিগম্বর, সেই শিবা এবং শিবকে প্রণাম॥ ২॥

যাঁহার অর্ধাঙ্গ চরণে চঞ্চল ও শব্দমান নূপুর শোভিত, অপরার্ধ ভাগে সর্পের ফণা চরণের নূপুররূপে হইয়াছে, অর্ধাঙ্গ হস্তে স্বর্ণ বাজু, অপরার্ধে সর্পের বাজু। সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম॥ ৩॥

মুখমণ্ডলের অর্ধাংশে যাঁহার চঞ্চল নীল পদ্মের ন্যায় ত্রিনেত্র, অপরার্ধে বিকশিত পদ্মের ন্যায় নয়ন, সেই ত্রিনয়না এবং অযুগ্মনেত্র (ত্রিনয়ন) শিবা এবং শিবকে প্রণাম॥ ৪॥

যিনি অর্ধাঙ্গে আশ্রিত সিংহপৃষ্ঠে সুখাসীনা, অপরার্ধে ত্রৈলোক্য সংহারনিমিত্ত তাণ্ডবনৃত্যপরায়ণ, অর্ধাঙ্গে কামের রচয়িত্রী, অপরার্ধে কামের সংহর্তা, সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম॥ ৫॥

শক্তিবাদ ভাষ্য - অসুরহিংসক সিংহ শক্তি অংশের বাহন। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী অসুর সংহারকের আনন্দে আত্মহারা। প্রকৃতি যদি পুরুষকে আকর্ষণ করিতে না পারে তবে সৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া যায়। আবার পুরুষ যদি উদাসীন না থাকেন তবে সৃষ্টি লয় হয় না। একবার সৃষ্টি একবার প্রলয়, ইহাই ঈশ্বরীয় লীলা এবং ইহাই অর্ধনারীশ্বর। সৃষ্টির অংশে পালন অত্যন্ত বড় কথা, যেখানে পালন সেখানেই অসুর ধ্বংস অনিবার্য। শক্তির বাহনে অসুরহিংসক সিংহ রহিয়াছে, ইহা শিবের আনন্দের কারণ। এই জন্য শিবের তাণ্ডব নৃত্যে আনন্দরস। শক্তি সুর অসুর উভয়েরই স্রষ্টা হইলেও তিনি অসুরবাদ সহ্য করেন না। শিব বা পরম পুরুষ ইহা দর্শনে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত। নেতা বা রাজারা যদি অসুরকে ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প থাকেন তবে সাধু এবং যোগীরা আত্মলয়ের সাধনায় নিবিষ্ট থাকেন, যদি সৃষ্টিতে ঈশ্বরত্বের মহিমা না থাকে তবে সৃষ্টি তো পশুত্বেরই বিকাশের স্তরে আসিয়া যাইবে। পুরুষরূপী শিবের বা চেতনার তাহাতে আনন্দ নাই।

যাঁহার দেহার্ধ চম্পক কুসুমের ন্যায় গৌরবর্ণ, অপরার্ধ কর্পূরবৎ শুভ্র, অর্ধভাগে কেশপাশে করবী ধারণ করিয়াছেন, অপরার্ধে জটা-প্রলম্বিত, সেই শিবা এবং শিবকে প্রণাম॥ ৬॥

শক্তিবাদ ভাষ্য - হ্রীঁ মন্ত্র চৈতন্য হইলে চম্পক পুষ্পের রঙ বিশিষ্ট অনুভূতির প্রভাব হয়। ওঁ মন্ত্র জাগ্রত হইলে কর্পূর গৌরবর্ণ অনুভূতি উদ্ভাসিত হয়। সাধক জানেন 'ওঁ হ্রীঁ'-ই অর্ধনারীশ্বরের জপমন্ত্র। হ্রীঁ = ঃ (কৃষ্ণবর্ণ) + ঋ (রক্তবর্ণ) + ঈ (ধূম্রবর্ণ) + ং (স্ফটিকবর্ণ)। এই সব বর্ণ মিলিয়া চম্পক-গৌরবর্ণ হইল। (দ্রষ্টব্য ক্রমবিকাশ ৩য় খণ্ড)। ওঁ = অ (অরুণ বর্ণ) + উ (শ্বেতবর্ণ) + ং (স্ফটিকবর্ণ) = কর্পূর গৌরবর্ণ।

যাঁহার মস্তকের অর্ধাংশে নবীন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম, অপরার্ধে জটা বিভূতি শোভিত, সেই জগজ্জননী এবং জগতের একমাত্র পিতা শিবা ও শিবকে প্রণাম॥ ৭॥

শক্তিবাদ ভাষ্য - কৃষ্ণবর্ণ অনুভূতি মানে অব্যক্তের অনুভূতি। কেশে করবী পুষ্প ধারণ মানে স্বামীকে সংসার বা সৃষ্টিতে আকর্ষণ করিবার সাজে সজ্জিতা। অব্যক্ত হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ। (ক্রমবিকাশ দ্রষ্টব্য)। জটাধর মানে ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মার লক্ষণে

সজ্জিত। শিব ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী। শক্তি সৃষ্টির আনন্দে আনন্দিতা ও উৎফুল্লা। এই ভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া চলিয়াছে এবং ইহাই ঈশ্বরলীলা।

শিবাগণ যাঁহার ভূষণরূপে বিরাজমান এবং যিনি মঙ্গলের ভূষণস্বরূপ অথবা মঙ্গলই যাঁহার ভূষণ এবং যিনি মঙ্গলব্যাপ্ত, সেই শিব শিবান্বিত মূর্তিকে বার বার প্রণাম॥ ৮॥

শক্তিবাদ ভাষ্য - যেখানেই শৃগালের লীলাখেলা সেখানেই রণক্ষেত্র ও শ্মশানক্ষেত্র। বীরের রণক্ষেত্র এবং সাধকের শ্মশানই শক্তি সাধনার কেন্দ্র।

নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই শিব এবং শক্তিতত্ত্বই শিবা দুর্গা বা পার্বতী, কালী তারা ও ত্রিপুরা সাধনায় আমরা শক্তিতত্ত্বেরই সাধনা করিয়াছি। আমরা এখন ধীরে ধীরে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের সাধনায় আত্মনিয়োগের পথে অগ্রসর। অর্ধনারীশ্বর সাধনায় এখন শক্তিকে অর্ধাংশ এবং শিবরূপী ব্রহ্মকে অর্ধাংশ বলা হইতেছে। ক্রমেই শক্তিতত্ত্ব ক্ষীণ হইতেছে এবং ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। কালী সাধনায় পীঠন্যাসের শেষ অংশে "ওঁ হেসৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ" বলা হইয়াছে। তারা সাধনার পীঠন্যাসেও শিবকে "মহাপ্রেত পদ্মাসন" বলা হইয়াছে। ত্রিপুরা সাধনার পীঠন্যাসেও শিবকে "মহাপ্রেত পদ্মাসন" বলা হইয়াছে। শক্তি সাধনায়, শিব শবরূপ; মহাপ্রেত এবং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতীক। এখানে অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বে দেখা যায় শক্তির অর্ধ অঙ্গ শিবের অঙ্গে বিলীন হইয়াছে। কালী তারা ত্রিপুরা সাধনায় শিব ছিলেন শবরূপ নির্গুণ চেতনা। সাধনার মধ্যে শিবকে যেন খুঁজিয়াই পাওয়া যাইতেছিল না। মহামায়া মহাশক্তি যেন সবটা জুড়িয়া বসিয়াছিলেন, শিবের যেন পাত্তাই পাওয়া যাইতেছিল না। অর্ধনারীশ্বর সাধনায় দেখা যায়, শক্তি যেন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপে আত্মরূপ বিলাইয়া দিতেছেন। সাধক যাহাতে দুর্বলবাদীয় ধর্মের আশ্রয় লইয়া সমাজকে অসুরবাদের পদতলে বিক্রয় না করেন এজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বে প্রকাশ পাইয়াছে। অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বটির পূজার দিন, শাস্ত্রে চৈত্রমাসের নীলপূজার মহানিশাতে ধার্য্য আছে। ইহা কালকরের পূজা। ইহা সন্ন্যাস সাধনার অঙ্গ। গৃহীরাও নরনারী নির্বিশেষে একমাস, পনরদিন, দশদিন, সাতদিন বা একদিন মহাকালের সন্ন্যাসধর্ম পালন করেন এবং জগজ্জননী ও জগৎপিতার পূজায় সমবেত হন। বঙ্গদেশে চড়কসন্ন্যাস জাতীয় উৎসব। শক্তিবাদ মঠে আমরা ঐদিন প্রদোষকালে অর্ধনারীশ্বরের পূজার সময় স্থির করিয়াছি। সাধকগণ ইচ্ছা করিলে মহানিশায়ও অর্ধনারীশ্বরের পূজা করিতে পারিবেন।

অর্ধনারীশ্বর স্তোত্রে অর্ধাঙ্গ চম্পক-গৌরবর্ণ এবং অন্য অর্ধাঙ্গ কর্পূর-গৌর বলা হইয়াছে। ইহা হ্রীঁ এবং ওঁ তত্ত্বের স্বরূপ, ইহা আমরা বলিয়াছি। অজপা বিজ্ঞানে সর্বদা এই অনুভূতি দুইটিকে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে স্মরণ করিতে হয়। ইহাই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অর্ধনারীশ্বর ধ্যান ও স্মরণ। নিশ্চিন্ত মনে ও পূর্ণ আরামে মন্ত্র স্মরণ না হইলে, সেটা কাল্পনিক ধ্যান হয়। উন্নত স্তরের সাধকগণ কখনও কাল্পনিক ধ্যান করেন না। অর্ধনারীশ্বর স্মরণের আরও অনেক বিধান আছে। সাধক উহার যে কোন একটিকে অবলম্বন করিবেন।

মূলাধার হইতে শ্বাসটা সহস্রার গর্ভস্থিত গুরুপাদুকায় চলিয়া বিলীন হয়, ইহাই ওঁ স্মরণ এবং সহস্রার গর্ভস্থিত গুরুপাদুকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাসটা মূলাধার পর্যন্ত নামিয়া আসে, অজপা বিধানে ইহাই স্ত্রীঁ স্মরণ বিজ্ঞান।

"ওঁ" মন্ত্রানুভূতি বিজ্ঞান এবং "স্ত্রীঁ" মন্ত্রানুভূতি বিজ্ঞানের সঙ্গে মূলাধার হইতে সহস্রার স্মরণ এবং সহস্রার হইতে মূলাধার স্মরণ যেন মিলাইবেন না। ইহা দ্বারা মনে চাপ পড়িবে এবং শান্তির ক্ষতি হইবে।

অর্ধনারীশ্বর ধ্যানের আরও একটি বিধান বলা যাইতেছে। আমাদের গুরুপরম্পরাতে এই বিধানটি বেশী প্রচলিত। ত্রিপুরা সাধনায় "কামকলা ধ্যান" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কামকলা ধ্যানই ত্রিপুরা ধ্যান এবং কামকলা ধ্যানই অর্ধনারীশ্বর ধ্যান। এ সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর আনন্দ লহরী স্তোত্রে সব কথাই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কামকলা ধ্যান সম্বন্ধে বিস্তারিত ত্রিপুরা সাধনায় বলা হইয়াছে। কামকলা ও 'নাদ বিন্দু' ধ্যান কি ভাবে মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকা পীঠে করিতে হয়, সে সম্বন্ধে ত্রিপুরা অধ্যায়ে দেখুন। কামকলা রূপের মধ্যস্থলে নাদ বিন্দু ধ্যান করিতে হয়। অর্ধচন্দ্রাকার নাদের দুইটি প্রান্তই মায়ের দুইটি স্তনের প্রতীক। ব্রহ্মচারীগণ এই দুই বিন্দুর ধ্যানরস পান করিয়াই কৌমার্য জীবন গ্রহণ করিবার শক্তি অর্জন করেন। কথিত আছে, গণেশ এবং কার্তিক মায়ের ঐ স্তনরস পান করিয়াই কৌমার্য জীবনের রস পাইয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর বলেন, ঐ বিন্দুদ্বয়ের ধ্যান করিয়াই কবিগণ বিশ্ববিখ্যাত কবি হন। মহাত্মারা ঐ স্তন বিন্দুদ্বয় ধ্যান দ্বারাই ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের রস আহরণ করিয়া সংসার আকর্ষণ অতিক্রম করেন বা ব্রহ্মচর্য লাভ করেন। কামকলা ধ্যানরস পুষ্ট সাধকই অনন্ত ঐশ্বর্যের ও ধন সম্পদের সেবা প্রাপ্ত হন। নাদবিন্দু ধ্যানদ্বারা সাধক যদি লৌকিক ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন তবে জানিতে হইবে উহা গৌরার্ধের প্রভাব। আবার নাদ বিন্দু ধ্যান যখন লৌকিক ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দ রসে সাধককে নিমগ্ন করে, তখন সেই কামকলা এবং নাদবিন্দু ধ্যানই শিবনাথের ধ্যান। একই ধ্যান সাধককে লৌকিক ঐশ্বর্য দান করে বলিয়া উহাই গৌরী এবং অলৌকিক ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মচর্য রস ঐ ধ্যান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই উহা শিবধ্যান। ইহাই অর্ধনারীশ্বর ধ্যানের গুপ্ত রহস্য। লৌকিক প্রতিষ্ঠা দান করেন বলিয়া কামকলা "স্ত্রীঁ" স্বরূপ এবং অলৌকিক ব্রহ্মানন্দ দান করেন বলিয়া, ঐ কামকলা এবং নাদবিন্দু সাধনাই "ওঁকার" সাধনা ও ব্রহ্মানন্দ সাধনা। কামকলা সাধনা করিয়া কোন সাধকই দরিদ্র থাকেন না এবং কামকলা সাধনায় সিদ্ধ হইলে, ব্রহ্মানন্দেরও অভাব থাকে না। অর্ধনারীশ্বর সাধনার ইহাই মর্মকথা। অর্ধনারীশ্বর স্তোত্রটির সব কথার আমরা ব্যাখ্যা করিলাম না।

আচার্য শঙ্কর ঠিকই বলিয়াছেন, অর্ধনারীশ্বর ধ্যানে, মায়ের রূপের এত প্রভাব যে শিবের কোন প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। শিবধ্যান প্রধান হইয়া অনুভূতি গভীর হইলে মাতৃরূপের বৈশিষ্ট্য আর পরিলক্ষিত হয় না। গুরুপাদুকা ধ্যানের বিভিন্ন অংশকে স্পষ্ট করিয়া কয়েকটি নির্দেশ আমরা 'পুরুষোত্তম সাধনা' অধ্যায়ে বলিব। অর্ধনারীশ্বর ধ্যানে, পার্বতীর রূপ বর্ণনায়, রাজকন্যা গৌরীকে সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যে সজ্জিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আবার শিবকে সর্বপ্রকারে ত্যাগী ও অনাসক্ত বলা হইয়াছে। একাধারে

শক্তিসাধনা ও ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনার সমস্ত নীতিই অর্ধনারীশ্বর রূপে স্থান পাইয়াছে। কে বলে হিন্দু ধর্ম কেবল ত্যাগেরই ধর্ম? হিন্দু ধর্ম অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। আবার হিন্দুধর্ম অনন্ত জ্ঞান শান্তি ত্যাগ এবং অনাসক্তির উৎস। হিন্দুধর্মের সংসারীরা অনন্ত শক্তি, ঐশ্বর্য এবং শক্তিবাদিতা আহরণ করিবেন এবং সন্ন্যাসী ত্যাগী এবং যোগীরা শিবের মতন জ্ঞানী ও অনাসক্ত হইবেন। ইহাই হইতেছে ভারতের মঙ্গলের চাবি। অহিংসবাদী মূর্খরা ভারতকে এই নীতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহার ফলে, আজ স্বাধীনতার নামে, ভারত আজ দীনহীন হইয়াছে এবং স্বাধীনতার মাকাল ফল ভোগ করিতেছে। শিব অনন্ত ঐশ্বর্য ও মহাশক্তিরূপিনী গৌরীকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন; আবার পার্বতী অনন্ত জ্ঞান তপস্যা ও অনাসক্ত শিবকে অর্ধাঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। ইহাই হিন্দু ধর্ম, ইহাই ভারত ধর্ম, ইহাই অধ্যাত্ম ধর্মের মূলরূপ। শিব আমাদের ধর্ম প্রবর্তক প্রথম গুরু। পার্বতী আমাদের ধর্মের মূল ঐশ্বর্যশক্তির কেন্দ্র। পাঠক দুর্গা পূজা মহাবিদ্যা ও দশমূর্তির কথা স্মরণ কর। মা গৌরী আমার দশহস্তে মহিষাসুর বিমর্দিত করিতেছেন আর অহিংসবাদী ভণ্ডের দল যবনের পদে তৈল মর্দন ভিন্ন কি করিয়াছে? ইহা কি ভারতের রূপ? ইহা ভারতের লাঞ্ছনার চরম কুৎসিত অভিব্যক্তি জানিয়া রাখিও।

যতটা বলা হইল সাধকদের জন্য এই সামান্য আভাসই যথেষ্ট। ক্রমবিকাশের পথে, এই গ্রন্থের ভূতশুদ্ধি অংশে হং সঃ মন্ত্রের প্রচুর আলোচনা করা হইয়াছে। ক্রমবিকাশ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে চিত্রাদি সহ ‘‘কামকলা ও নাদবিন্দু’’ ধ্যান বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। এবার আমরা অজপা জপের অন্তিম প্রান্ত সম্বন্ধে বলিব।

হংসপীঠ। ‘‘কামকলার’’ ঊর্ধ্বতম প্রান্তের নাম হংসপীঠ। ‘‘গুরুপাদুকা’’ স্তোত্রে এই পীঠের নাম ‘‘দ্বন্দ্বমিন্দু’’ বা ‘‘আদি হংসঃ পীঠ’’। পুরুষ তত্ত্বও আছেন এবং প্রকৃতি তত্ত্বও আছেন। ইহার নাম অর্ধনারীশ্বর এবং ইহাই ‘‘ওঁ হ্রীঁ’’। পুরুষ এবং শক্তিতত্ত্ব ওতপ্রোত জড়িত, ইহার নাম ‘‘হংসঃ’’ তত্ত্ব। এই হংসঃ পীঠই গুরুপাদুকার শেষ প্রান্ত। শ্বাস প্রশ্বাসের ইহাই শেষ প্রান্ত। এই ‘‘হংস’’ই শ্বাস প্রশ্বাসে গমনাগমন করেন, এই জন্য ইনি ‘‘গমাগমস্থং’’। আবার এই ‘‘হংসঃ’’ই স্থির অবস্থায় গুরুপাদুকার অন্তিম লয় স্থানে অবস্থান করেন, এই জন্য ইনি ‘‘গমনাদিশূন্যং’’। ইতিপূর্বে ‘‘অজপা জপসমর্পণ’’ অংশে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। মহাসাম্রাজ্য দীক্ষার পর, যোগদীক্ষার অজপা মন্ত্র জপে আর ‘‘ওঁ হ্রীঁ’’ অবলম্বনের প্রয়োজন নাই, তখন সাধক ‘‘হংসঃ’’মন্ত্রে অজপা জপ করিবেন। এই ‘‘হংসঃ’’ অজপাই শেষ সন্ন্যাস অজপা। শক্তিতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের শেষ অনুভূতি না প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত এই অজপাই অবলম্বনীয়। অজপা মন্ত্রের আরও সূক্ষ্মতম সাধনা ও মন্ত্র আছে। আমরা সেই সম্বন্ধেও আভাস দিব। যতক্ষণ সোমরসের সন্ধান পাওয়া যায় না, ততক্ষণ ওঁ হ্রীঁ বা অর্ধনারীশ্বর অজপাই ভাল অবলম্বন। সোমরসই হংসঃ পীঠ।

‘‘হংকারঃ শিবরূপেণ সঃকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
হংসোহংসেতি যো মন্ত্রো জীবো জপতি সর্বদা॥
হংকারো নির্গমে প্রোক্ত সঃকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ সঃকারঃ শক্তিরুচ্যতে।

সোঽহং হংসঃ পদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা॥''

''হংকারকে শিব জানিবে এবং সঃকারকে শক্তি জানিতে হইবে। হংকারে প্রশ্বাস বাহিরে যাইতেছে, সঃকারকে শক্তি নিঃশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। হংসঃ এই মন্ত্রের বা ইহার পরিবর্তন করিলে সোঽহং হয়। এই উভয় শব্দ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক মন্ত্র। সুতরাং পরমব্রহ্ম বা পরমশিব ও ব্রহ্মশক্তি বা পরমা প্রকৃতি সমন্বয়ভূত সূক্ষ্মভাবে অর্ধনারীশ্বরেরেই স্বরূপ। হংসঃ শক্তি বা প্রকৃতিপ্রধান এবং সোঽহং পুরুষপ্রধান। প্রাণবায়ু সতত এই মন্ত্র জপ করিতেছে।'' সাধক প্রাণের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া ইহা সদা দর্শন কর। ইহাই অজপা জপের গুপ্ত রহস্য। সাধনা অধ্যায়ে অজপা জপ সমর্পণ অংশে হংসঃ ধ্যান ও আত্মলিঙ্গ ধ্যান বিষয়ে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। ''হং'' এবং ''সঃ'' স্তর শেষ হইয়া অন্তিমে শুধু ''ওঁ'' থাকিবেন। এই ওঁ-ই নির্গুণ ব্রহ্ম। অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বের ইহাই অন্তিম রূপ। ইনিই হইতেছেন ''ওঁ আরাধয়ামি মণিসন্নিভ মাত্ম লিঙ্গং মায়াপুরী হৃদয়পঙ্কজ সন্নিবিষ্ট॥ শ্রদ্ধানদী বিমলং চিত্ত জলাবগাহং নিত্যং সমাধি কুসুমৈব পুনর্ভবায়॥'' ''আমি মণিসন্নিভ আত্মলিঙ্গকে আরাধনা করি। তিনি মায়াপুরীস্থিত (সহস্রার কমল) হৃদয়কমলে সদা নিবিষ্ট আছেন। শ্রদ্ধানদীরূপ বিমল জলে আমি অবগাহন করিতেছি এবং সর্বদা সমাধিকুসুমে তাঁহাকে পূজা করিতেছি। যাহার ফলে আমার আর পুনর্জন্ম হইবে না।'' বৌদ্ধ সাধনায় ''ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'' (হে সহস্রার পদ্ম মধ্যস্থ মণি। আপনি নিরালা ঈশ্বর।) মন্ত্রের প্রচলন আছে, ইহাও অর্ধনারীশ্বর সাধনার শেষ স্তরের কথা। তাঁহাদের সাধনাও মহাকাল বা মহাকালীর সাধনা হইতেই আরম্ভ হইত এবং চরমে ''ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'' সাধনায় শেষ হইত। ভারতের অদূরদর্শী পাপী নেতারা ভারতকে যবনের রাজ্য করিবার লক্ষ্যে ধর্মহীন রাষ্ট্র করিয়াছেন এবং তিব্বতকে লালচীনের হাতে সমর্পণ করিয়া মহাকাল ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

মস্তিষ্ক মধ্যস্থ গুরুপাদুকা কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদ সাধনার সব ধ্যান করা প্রয়োজন। কালী ও তারা সাধনাকালে সহস্রার মধ্যস্থিত গুরুপাদুকার দ্বাদশদল হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুপাদুকার শেষ প্রান্ত দ্বন্দ্বমিন্দু পর্যন্ত সবগুলি স্তরের কথা নিত্য চিন্তা করিবেন এবং মোটামুটি ভাবে সামগ্রিক ধ্যানটি আয়ত্ত করিবেন। ইহা মোটামুটি আয়ত্ত হইবার পর সাধক দ্বাদশদলে দ্বাদশটি বর্ণধ্যানে মন দিবেন। দ্বাদশ দলে বর্ণধ্যান সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম যে সাধক বহুদিন মাত্র একটি বর্ণকে নিবিষ্ট মনে ধ্যান করিবেন। একটি বর্ণে মন নিবিষ্ট হইলে ক্রমে অন্যান্য বর্ণেও মন নিবিষ্ট হইতে থাকিবে এবং পাদুকার অন্যান্য অংশেও মন নিবিষ্ট হইবার শক্তিও আয়ত্তে আসিবে।

মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত গুরুপাদুকা কেন্দ্র হইতেছে সর্বপ্রকার জ্ঞানশক্তি ও বিভূতির কেন্দ্র। সাধকের কোন জ্ঞান বা কোন শক্তি বা কোন বিভূতিই বাহির হইতে আসে না। সবের মূলে রহিয়াছে গুরুপাদুকা কেন্দ্র ধ্যান। যাহা হউক, ত্রিপুরা দীক্ষার প্রথম দীক্ষার পর সাধক গুরুপাদুকাস্থিত ''কন্দলিত কর্ণিকাপুট'' ধ্যানে মন দিবেন। ত্রিপুরার দ্বিতীয় দীক্ষাকালে ''অ ক থ'' রেখায় বিশেষ ভাবে ধ্যান জমাইবেন। তৃতীয় দীক্ষায় ''হ ল ক্ষ বিন্দু হইতে উত্থিত ত্রিশিখা'' ধ্যানে মন বিলীন করিয়া আনন্দ রস পাইতে সচেষ্ট হইবেন। চতুর্থ দীক্ষায় গুরুপাদুকা মধ্যস্থিত ''নাদ বিন্দু'' ধ্যানে নিবিষ্ট হইতে চেষ্টা

করিবেন। নাদবিন্দুই যে ব্রহ্মচর্য বা কৌমার্য রসপীঠ একথা বলা হইয়াছে। ৫ম দীক্ষায় গুরুপাদুকার শেষ প্রান্ত "দ্বন্দ্বমিন্দু পীঠে বা সোমরসকেন্দ্রে" শান্তি ও জ্ঞানরসে প্লাবিত করিতে চেষ্টা করিবেন। সোমরস ধারায় অভিষিক্ত হইবার পর সাধক "কামকলা ধ্যানে" মন দিবেন। অ ক থ রেখা, হ ল ক্ষ হইতে উত্থিত শিখাত্রয়, দ্বন্দ্বমিন্দু ও নাদ বিন্দু এই সব মিলাইয়া যে একটি ধ্যান, উহার নাম "কামকলা ধ্যান"। এই কামকলা ধ্যানই ত্রিপুরা সাধনার মূল কথা। এই কামকলার ধ্যানেই প্রকৃতিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব মিশ্রিত থাকে। কামকলা ধ্যানেই মাতৃরস + পিতৃরসই অর্ধনারীশ্বর ধ্যান। এ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে অনেক বলা হইয়াছে। মাতৃ ও পিতৃরসই মিলাইয়া গিয়া "আত্মলিঙ্গ" ধ্যান। 'ওঁ মণিপদ্মে হূঁ' ধ্যান। অর্ধনারীশ্বর ধ্যানের ইহাই শেষ প্রান্ত। সবটা গুরুপাদুকাই "আত্মলিঙ্গ"। ইহার মধ্যেই ক্রমবিকাশ বর্ণিত শূন্যবোধ, পূর্ণবোধ, সুখবোধ, শান্তিবোধ, মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ততত্ত্ব, সব রহিয়াছে।

কালী ও তারা সাধনাকালে গুরুপাদুকাস্থিত দ্বাদশদলে ধ্যান নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন। ত্রিপুরা সাধনার প্রথম স্তরে "কন্দলিত কর্ণিকা", দ্বিতীয় স্তরে অ ক থ রেখা ধ্যান, তৃতীয় স্তরে "ত্রিশিখা ধ্যান", চতুর্থ স্তরে "নাদ বিন্দু ধ্যান", পঞ্চম স্তরে "দ্বন্দ্বমিন্দু" বা "হংসঃ" পীঠ ধ্যান কর্তব্য। "হংসঃ" পীঠে সোমরস প্লাবন অনুভূতি সর্বদা আয়ত্তে আসিলে জানিতে হইবে, অর্ধনারীশ্বর দীক্ষার সময় আসিয়াছে। অর্ধনারীশ্বর যোগে "ওঁ স্ত্রীঁ"ই অজপা। "কামকলা ধ্যান" ত্রিপুরা সাধনার শেষ প্রান্ত, এবং অর্ধনারীশ্বর ধ্যানের আরম্ভ। এইভাবে অগ্রসর হইবার পর "সোমরস" প্লাবনে, দিন রাত সাধকের "অহং" জ্বালা ধুইয়া যাইতে থাকিবে। অহং ক্ষীণ হইলেই "হংসঃ" অজপার সময় আসিয়াছে, জানিতে হইবে। শেষ শক্তিতত্ত্ব ও নির্গুণ চেতনাতত্ত্বের অনুভূতির পূর্ব পর্যন্ত সোমরস প্লাবন এবং "হংসঃ" অজপাই অবলম্বন থাকিবে। যথাসময়ে আবার বলিব।

যোগদীক্ষা

যোগদীক্ষা এবং পুরুষোত্তম দীক্ষা একই তত্ত্বের সাধনা। একে একে যোগদীক্ষার মন্ত্রগুলি এবং গুরুপ্রদত্ত সংক্ষেপে নির্দেশগুলি বলা যাইতেছে। যোগদীক্ষার মোট পাঁচটি দীক্ষা হইয়া থাকে।

যোগদীক্ষাভিষেক মন্ত্র - "ওঁ হৌঁ ওঁ"

দেবতা "যোগেশ্বর" বা "এক জটেশ্বর" পঞ্চানন মহাদেব।

১। তৎপুরুষ মন্ত্র - (অর্থাৎ তৎ বা সেই পরমাত্মাই পুরুষ বা পুরুষোত্তম) "ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ"॥

এই মন্ত্র গায়ত্রী সম্ভব, হরিদ্বর্ণ, বশ্যকারক, কলা চতুষ্টয় যুক্ত ও চতুর্বিংশতি বর্ণাত্মক।

এই অন্তিমমন্ত্র যোগাত্মক। যথাক্রম প্রদত্ত মন্ত্র পঞ্চক সহ হঠযোগ নির্দিষ্ট মুদ্রাদির অনুশীলন প্রয়োজন॥ (ইহাই গুরুনির্দেশ)

শক্তিবাদ ভাষ্য ॥ যোগদীক্ষা বুঝিতে হইলে যোগদর্শন আলোচনা করা কর্তব্য। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" অর্থাৎ "চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ"। "বৃত্তি এবং বৃত্তিনিরোধ"

দুইই প্রকৃতির কার্য। প্রকৃতির কার্য যে স্তরে শেষ হয়, সেই স্তরটির নামই যোগ। যোগসূত্রেই আছে, ঐ যোগস্তর প্রাপ্ত হইলে, যে কোন বৃত্তিই যে আত্মার স্বরূপ, ইহা বুঝিতে আর চেষ্টা করিতে হয় না। যাঁহারা যোগসূত্র আলোচনা করিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই যোগস্তর বুঝা বেশ কঠিন। শক্তিদীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দীক্ষা এবং অনেক সাধনার মধ্য দিয়া সাধক এখন যোগদীক্ষায় আসিয়াছেন। অনেক প্রকার অনুভূতির মধ্য দিয়া সাধক অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। এবার সাধকের দার্শনিক বিচারে সে সব অনুভূতিগুলি এবং অন্তর জগতের বিক্ষেপ, আবরণ, বিক্ষোভের কারণ ও আকর্ষণগুলি সবই বিচার করিয়া দেখিবার সময়।

এখানে দেবতাকে যোগেশ্বর এবং একজটেশ্বর মহাদেব বলা হইয়াছে। যোগ যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যোগেশ্বর। আদি গুরু মহাদেব নিশ্চয়ই যোগেশ্বর। যোগস্তর প্রাপ্ত যে কোন মহাপুরুষও যোগেশ্বর শিবতুল্য।

একজটেশ্বর মানে পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্যপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ। কথিত আছে, শিব যোগসিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। প্রারব্ধ কারণে পার্বতীকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জীবনও শিবের পক্ষে সাংসারিক জীবন ছিল না। অসুর নিধন কার্যে গণেশ ও কার্তিকের জন্ম হইয়াছিল মাত্র। তাঁহারা অর্ধনারীশ্বর ব্রহ্মনিষ্ঠই ছিলেন। এমন সাধক সাধিকার জীবন হইবার মূলে যে অন্য জন্মের প্রভাব ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যোগদীক্ষায় দেখা যাইতেছে, শিব আবার একজটেশ্বর এবং একক মহাত্মা। পার্বতীর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই শিবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই নারী স্বাধীনতার যুগে প্রশ্ন হইতে পারে, শিবের অস্তিত্ব পার্বতীতে কি বিলীন হইতে পারিত নাকি? সাধক যদি শক্তিমান না হন, তবে সাধক যে কোন সময়ই বৌ লইয়া সংসারধর্মে প্রবেশ করিবেন এবং সন্ন্যাস অসম্ভব হইবে। সাধক শিবতুল্য শক্তিমান হইলে উভয়েই পূর্ণ সন্ন্যাসী জানিবেন। সতী বা প্রকৃতি যখন পুরুষকে আর সৃষ্টিতে টানিতে পারিলেন না, তখন তিনিও সন্ন্যাসী। সতী নারীর ইহাই সন্ন্যাস।

পঞ্চানন মহাদেব। শিবের পঞ্চমুখের কথা ক্রমবিকাশ ২য় ভাগে দেখুন। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্রবোধের স্তরে যোগীর বাহ্য বিষয় ভোগে কোনই আকর্ষণ থাকে না। এইজন্যই সাধক এই স্তরে পঞ্চমুখ শিবস্বরূপ। অর্থাৎ পূর্ণরূপে সন্ন্যাসী। এখানে প্রারব্ধ বা অন্য জন্মেরও প্রভাব নাই। শিবস্তরে অন্য জন্মের প্রভাবেরও বল থাকে না। প্রারব্ধ শক্তিস্তরে বা বিষ্ণুস্তরে আসিতে পারে, শিবস্তরে নহে।

তৎপুরুষ মানে পুরুষোত্তম। পরাপ্রকৃতি বা অনাদিশক্তি বা অষ্ট প্রকার গতির কথা ক্রমবিকাশে দেখুন। এই আটটি শক্তির সমষ্টিভূত আদ্যাশক্তির সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা মিলিয়া পুরুষোত্তম স্তর। আদ্যাশক্তিই যে অনাদি চেতনা, ইহা ক্রমবিকাশে বলা হইয়াছে।

আদিগুরু মহাদেবই পুরুষোত্তম। দীক্ষার নির্দেশে ইহাই গুরুর আদেশ।

মন্ত্রটিকে 'হরিদ্বর্ণ' বলা হইয়াছে। হরিৎ বর্ণ বা পীতবর্ণবোধই ক্ষিতি-তন্মাত্রার বোধরূপ। ইহা ক্রমবিকাশে বলা হইয়াছে। একটি তন্মাত্রবোধ ফুটিলে অন্য চারটি বোধক্ষেত্র বেশীদূরে থাকে না।

তৎপুরুষ মন্ত্রে ‘‘রুদ্রে’’র কথা আসিয়াছে। রুদ্রই হইতেছেন ঈশ্বর। বেদে ‘‘রুদ্রী’’ অধ্যায় আছে। শ্রাদ্ধাদিতে পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য ‘‘রুদ্রযজ্ঞ’’ করিতে হয়। ‘‘রুদ্রযজ্ঞে’’ বৃষ উৎসর্গ করিতে হয় বলিয়া ‘‘রুদ্রযজ্ঞ’’ শ্রাদ্ধ উঠিয়া গিয়াছে। আমরা বৃষের উৎসর্গহীন রুদ্রযজ্ঞের প্রবর্তন করিয়াছি। রুদ্রপূজাই শিবপূজা, রুদ্রীপাঠই বেদপাঠের প্রধান অংশ। কাশীর বিশ্বনাথের আরতি, পূজা ও যজ্ঞাদিতে রুদ্রীপাঠ হইয়া থাকে। যোগদীক্ষার পর প্রত্যেক সাধকের শিবের মতন ত্যাগজীবন (ব্রহ্মচর্য অধ্যায়ে বলা হইয়াছে), রুদ্রীপাঠ, রুদ্রযজ্ঞ এবং শিবের মতন তপঃজীবন গ্রহণ করা কর্তব্য। শিবের তিন প্রকার জীবনের কথা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ : (১) মদন ভস্মীভূত করিবার সময় পর্যন্ত শিবের তপঃজীবন, (২) প্রারব্ধজনিত কর্মপ্রবাহে শিবের অর্ধনারীশ্বর জীবন এবং (৩) শিবের পুনঃ সন্ন্যাস বা যোগেশ্বর জীবন। শিবের আদর্শে ২নং ধর্মজীবন বীরাচারী তান্ত্রিকদের মধ্যে, বৌদ্ধদের মধ্যে এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। আসল প্রারব্ধ উদ্দেশ্য এবং ধর্মজীবন নষ্ট হইয়া, ইহাতে শেষকালে যে ‘‘কামলীলা’’ই প্রবল হইয়া থাকে উহাতে সন্দেহ নাই। ১নং শিবজীবন যাপন করিতে হইলে যে পরিমাণ ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন উহা আয়ত্ত না করিলে প্রারব্ধ জীবন বুঝাই যায় না। পাদ্রী-পাদ্রীনী খ্রীষ্টানদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য বা আদর্শজীবনের আদর্শের কঠোরতা নাই। ইঁহারা সকলেই মোটা বেতনের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। হিন্দুদেরও দেশেবিদেশে ধর্মপ্রচারের সুবিধার জন্য ঐরূপ কর্ম প্রবর্তন করা কর্তব্য। যাঁহারা আদর্শ ও অনাদর্শ চক্করে সাধুব্যক্তিদের নিন্দা করিয়া সময় নষ্ট করেন, তাঁহারাও জানিয়া রাখুন, ভিক্ষু ভিক্ষুণী, নেড়া নেড়ী বা পাদরী পাদ্রীনীরা ধর্মপ্রচারকার্যে যে বিশাল রাষ্ট্রীয় কার্য করিয়াছেন উহার তুলনা নাই। তোমরা গৃহে বসিয়া কিছু না করিয়া সমালোচনা করিলে ধর্ম রক্ষিত হইবে না। মানুষের যাহা স্বাভাবিক চাওয়া, উহার উপর ভিত্তি করিয়া ধর্ম প্রচারের একটা শক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা ভারত সমাজ ও রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। শিবের আদর্শকে ধরিয়া টানাটানি না করিয়া রাষ্ট্রীয় ধর্মের ভিত্তিতে মোটা বেতনের কর্মব্যবস্থা, সমাজের বেশী অনুকূল হইবে। যাঁহারা মনে করেন, ধর্মহীন রাষ্ট্র চলিতে পারে, সমাজ তাঁহাদিগকে মালা পরাইবে কি জুতার শিক্ষা দিবে, সেটা বুঝিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। হে পণ্ডিতের দল! এত সব পঞ্চবার্ষিকী তোমরা করিলে, একটা ধর্মের পঞ্চবার্ষিকী কর না? এত সব স্মৃতিভাণ্ডার খুলিলে এবার একটা ধর্মপ্রচারের মহাভাণ্ডার খোল না? সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার ভিত্তিতে ধর্মকর্মীরা কর্মে নামুক। সংস্কৃত হইতেও কি হিন্দী মহাপণ্ডিতের ভাষা?

শিবের ১নং ধর্মজীবন, ২নং ধর্মজীবন এবং ৩নং ধর্মজীবনের কে কতটা আয়ত্ত করিয়াছেন, সে সব গবেষণা করিয়া লাভ নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, সমাজকল্যাণে আদি ধর্মগুরু শিবের যে দান বা শিব-পার্বতীর যে দান বা সন্ন্যাসী যোগেশ্বর শিবের যে দান উহার তুলনা নাই। ‘‘মাতা চ পার্বতীদেবী পিতা দেবমহেশ্বরঃ। বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥’’ এই মূলকথা ভিত্তি করিয়া ধর্মপ্রচারের সূত্র স্থাপনা কর। ভারতের মঙ্গল হইবে, বিশ্বের মঙ্গল হইবে। অহিংসা ও পঞ্চশীলের ভণ্ডামি গাহিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণকে দুর্দশায় ডুবাইয়া তাঁহাদের রক্তে অর্জিত সিংহাসনে

বসিয়া মিথ্যা, ভণ্ডামি ও যবনতোষণের লীলা করিয়া আর কত ধাপ্পা দিবে? জানিয়া রাখিও, বিশ্ব তোমাদের মাথায় জুতা মারিতে ছাড়িবে না।

নিত্যপূজার শিবপূজাকালে এই তৎপুরুষ শিবেরই পূজা হইয়া থাকে। মঠে, মন্দিরে এবং সর্বত্র ''তৎপুরুষ'' শিবের পূজাই শিবপূজা। অন্যান্য শিবের পূজার জন্য শিবরাত্রির দিন নির্দিষ্ট আছে।

যোগদীক্ষার দ্বিতীয়ক্রম

২। অঘোর মন্ত্র। (অর্থাৎ আচারহীন বা মোক্ষাত্মক সেই রুদ্ররূপ লয়মূর্তি পরমাত্মা)

ওঁ অঘোরেভ্য ইথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোর তরেভ্যশ্চ।
সর্বতঃ সর্বসর্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্র রূপেভ্যঃ॥

ইহা অথর্ব বেদোক্ত, একত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক, অষ্টকলাযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, অঘাপহ ও আভিচারিক।

আমি নিত্য প্রাতঃস্মরণে গুরুস্তোত্র পাঠ করিতাম। গুরুদেব একদিন বলিলেন, ''অত সব তত্ত্বকথার গুরুস্তোত্র অবলম্বনে ব্রহ্মবিদ্যার পথ সুগম হয় না। তুমি নমস্তুভ্যং ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করিবে।'' যথা -

''ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিনে।
ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশায় সংসার দুঃখ তারিণে॥ ১
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায় অজ্ঞান হারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্য দায়িনে॥ ২
শিবতত্ত্ব প্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিনে।
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং সাধকাভয় দায়িনে॥ ৩
অনাচারাচার ভাব বোধায় ভাব হেতবে।
ভাবাভাব বিনির্ম্মুক্তঃ মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ॥ ৪
নমোঽস্তু সাম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাব প্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দ স্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ॥ ৫
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দ রূপিনে।
কামরূপায় কামায় কামকেলি কলাত্মনে॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচার স্বরূপিনে॥
আরক্ত নিজতচ্ছক্তিঃ বাম-ভাগ বিভূতয়ে।
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ॥ ৬''

শক্তিবাদ ভাষ্য। (১) এখানে গুরুকে আদিগুরু শিবরূপ বলা হইয়াছে। সব মন্ত্রের মূল যে আদিগুরু শিব এ কথা সত্য আবার মন্ত্রদাতা গুরুকেই যে শিব বলা হইয়াছে ইহাতেও কোন দ্বিমত নাই। গুরুকে আদিগুরু শিব বল বা আদিগুরু শিবকে ও গুরুকে এক জানো দুই-ই এক কথা। আমাদের মতে, আদিগুরু শিব হইতে গুরুর যে ধারা চলিয়াছে ঐ ধারাই গুরু। (২) এখানে গুরুকে বীর বলা হইয়াছে। বীর মানে ক্ষয়হীন ব্রহ্মচারী এবং নির্ভীক ও সাম্যপুরুষ। (৩) শিবতত্ত্বকে গুরুই ক্রমশঃ প্রবোধিত করেন।

শিবের পঞ্চমুখই পঞ্চতন্মাত্রার বোধ। ইহাই শিবতত্ত্ব। ধীরে ধীরে অনুভূতিতে এ সব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তন্মাত্রবোধ পর্যন্ত বিকশিত হইয়াছে, এরূপ ত্যাগী সাধক, তপস্বী ও যোগীগুরু কোথায়? কিন্তু আদিগুরু শিবকে গুরু মানিলে এ সমস্যা থাকে না। তৎপুরুষ মন্ত্রে ''ক্ষিতিবোধ'', অঘোর মন্ত্রে ''স্পর্শবোধ'', সদ্যোজাত মন্ত্রে ''রসবোধ'', বামদেব মন্ত্রে ''রূপবোধ'', ঈশান মন্ত্রে ''শব্দ তন্মাত্রা বোধে''র কথা বিদ্যমান। এ সব বোধের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানের পথ বিদ্যমান। তন্মাত্রবোধের মধ্য দিয়াই বিষয়জগতে বিচরণের বীরত্ব বিদ্যমান, আবার তন্মাত্রবোধের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। গণেশ সূর্য বিষ্ণুস্তরের অনুভূতি এবং বেদান্ত পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে না। অহং তত্ত্ব ভেদ হইবার পর তন্মাত্রবোধ স্তর ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, তন্মাত্রবোধ স্তর অতিক্রম হইবার পর ব্রহ্মজ্ঞানের পথ প্রকাশিত হয়। সাধককে অভয় দানের কথা আছে। সাধক ভোগ, মোহ এবং অহং পীড়িত সাধারণ জীব। সাধক যদি সিদ্ধগুরুর ধারা স্মরণ করিয়া যোগী গুরুর আশ্রয় লইতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই অভয় প্রাপ্ত হইবেন। (৪) আচার বলিতে কি বুঝায়? তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল আচরণই আচার এবং উহার প্রতিকূল আচরণই অনাচার। (৫) ''দিব্যভাবের প্রকাশ'' এবং ''বিভবায়'' কথার লক্ষ্য বুঝিলে স্তোত্রের এই অংশ বুঝিতে অসুবিধা হয় না। পশুভাব সাধারণ ভোগী জীব, বীরভাব ভোগের মধ্যে বীরত্বের চেষ্টা, দিব্যভাব ব্রহ্মজ্ঞানমূলক মহান জীবন। (৬) স্তোত্রের এই অংশে অর্ধনারীশ্বর তত্ত্বের সব কথাই বিদ্যমান। স্তোত্রটি ব্রহ্মপথে প্রচুর উপাদান আমাকে দিয়াছে। নিত্য প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রে গুরুকে আমি যেভাবে স্মরণ করি, যেভাবে আমি গুরুকে দর্শন করি, উহা ব্যাখ্যা করিলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। গুরু আমার মহামন্ত্র, গুরু আমার শিব, গুরু আমার ব্রহ্মজ্ঞান, গুরু আমার সর্ব দুঃখ সংহারক, তিনি সৌম্য, তিনি দিব্য, তিনি বীর, তিনি শক্তিনাথ, কুলনাথ, তিনি ব্রহ্মতত্ত্বের ধারা, তিনি শিবতত্ত্বের স্বরূপ। তিনি অর্ধনারীশ্বর, তিনি আমার আচার, অনাচারবোধ দিব্যাচার এবং আমার জ্ঞানের প্রধান আশ্রয়। তিনি আমার প্রথম মন্ত্রদাতা এবং পুরুষোত্তম স্তরের সক্রিয় ব্রহ্মশক্তি এবং নিষ্ক্রিয় চেতনা।

শিবরাত্রির পূজার সময় দ্বিতীয় প্রহরে ''অঘোর শিবের'' পূজা হয়। ''অঘোর মন্ত্রের'' ইহাই সাধনার শ্রেষ্ঠ সময়। তিনি ''ঘোর'' কি ''অঘোর'' অথবা ''ঘোরাঘোর'' ইহা বিচারের বিষয় নহেন। ''অঘোর তত্ত্ব'' সাধনা এবং অনুভূতির বিষয়। অঘোরাচারী সন্ন্যাসী এবং সাধক সম্প্রদায় আছে। শুনিয়াছি, ইঁহারা নাকি পানাহার বিষয়েও ''অঘোর'' আচারী। আমরা দিব্যাচারী সাধক। সাধনা, পূজা এবং অনুভূতির মধ্য দিয়াই আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হয়। বাহ্য আচারের বাড়াবাড়ি আমাদের নাই।

যোগদীক্ষান্তর্গত তৃতীয় ক্রম

৩। সদ্যোজাত মন্ত্র।

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবে অনাদি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ॥

ইহা যজুর্বেদীয়, শান্তিকর, সদ্যোজাত, অষ্টকলাসংযুক্ত পঞ্চত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক ও শ্বেতবর্ণ।

শিবের এই রূপটি প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম সদ্যোজাত। ইহা রসতন্মাত্রবোধের স্বরূপ।

যোগদীক্ষান্তর্গত চতুর্থ ক্রম

৪। বামদেব মন্ত্র।

"ওঁ বামদেবায় নমঃ, জ্যেষ্ঠায় নমঃ, রুদ্রায় নমঃ, কালায় নমঃ, কালাধিকরণায় নমঃ, বল বিকরণায় নমঃ, বল প্রথমনায় নমঃ, সর্বভূত দমনায় নমঃ, মনোন্মানায় নমঃ॥"

এই মন্ত্র সামবেদ-সম্ভূত, লোহিত বর্ণ, কালপ্রকৃতি, ত্রয়োদশ কলান্বিত প্রথম পাদে জগতোদ্ধার কারণ এবং জগতের বৃদ্ধিতে সংহার কারণ॥

বামদেব মন্ত্রটি লোহিত বর্ণ বোধের স্বরূপ। ইহা তেজ বা রূপ তন্মাত্রার বোধ। শিবরাত্রি পূজায় তৃতীয় প্রহরে বামদেব শিবের সাধনার শ্রেষ্ঠ সময়। অহংহীন তন্মাত্রবোধ স্তর কোন সাধারণ সাধকে প্রকাশিত হইতে পারে না। তবে যে কোন সাধক শিবরাত্রি পূজাকালে এ সব মন্ত্রের প্রচুর জপ ও শিবপূজার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক শক্তি ও শান্তির ধারা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যোগদীক্ষান্তর্গত পঞ্চম ক্রম

৫। ঈশান মন্ত্র। "ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্মণো অধিপতির্ব্রহ্মা শিবমেঽস্তু সদাশিব ওঁ॥"

ইহা ওঁকার বীজোদ্ভব। শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশ, পঞ্চকলাসংযুক্ত অষ্টত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক মেধাবৃদ্ধিকর ও সর্বার্থসাধক।

আকাশ বা শব্দতন্মাত্রার বোধই শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশ বোধ।

শিবরাত্রি পূজার প্রথম প্রহরেই ঈশানের পূজা হইয়া থাকে।

শিবরাত্রি পূজার প্রথম প্রহরে "ঈশান", দ্বিতীয় প্রহরে "অঘোর", তৃতীয় প্রহরে "বামদেব" এবং চতুর্থ প্রহরে "সদ্যোজাতের" পূজা, জপ ও উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

যোগদীক্ষার স্তরের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া লাভ নাই। ব্রহ্মজ্ঞান পথে শিব চার প্রকারের যোগীলক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র ও অধিমাত্রতম। যিনি যেমন যোগী, তিনি এ সব লক্ষণে নিজেকে মিলাইয়া সব বুঝিতে পারিবেন। অনেকে আছেন, গুরুর নিন্দাও করেন, আবার পায়েও পড়েন, তাহাদেরও লক্ষণ শিবই বলিয়াছেন।

মৃদু সাধক লক্ষণ॥ যিনি মন্দোৎসাহী, উচ্চ প্রতিভা বিহীন, শারীরিক পীড়াগ্রস্ত, গুরুদূষক, লোভী, পাপাসক্ত, বহুভোজনশীল, স্ত্রীজিত, চপল, পরিশ্রম কাতর, রুগ্ন, পরাধীন, নিষ্ঠুর, মন্দাচার, মন্দবীর্য।

মধ্যসাধক লক্ষণ॥ সমবুদ্ধি, পরিমিত বুদ্ধি, প্রিয়বাদী, কোন কার্যে বিশেষভাবে লিপ্ত নহেন।

অধিমাত্র সাধক॥ স্থির বুদ্ধি, মহাশয়, দয়াশীল, ক্ষমাবান, সত্যনিষ্ঠ, শৌর্যশালী, লয়যোগশ্রদ্ধাযুক্ত, গুরুপাদপদ্ম পূজাপরায়ণ, সতত যোগাভ্যাসে নিরত।

অধিমাত্রতম॥ মহাবীর্য্য, মহোৎসাহ সম্পন্ন, মনোজ্ঞ, শৌর্যশালী, শাস্ত্রবিদ, অভ্যাসী, মোহশূন্য, ব্যস্ততাহীন, নবযৌবন সম্পন্ন, মিতাহারী, বিজিতেন্দ্রিয়, নির্ভীক, বিশুদ্ধাচার, সুদক্ষ, দাতা, সকলের প্রতি অনুকূল, সর্ববিষয়ে অধিকারী, স্থির চিত্ত, ধীমান, যথেচ্ছ স্থানাবস্থিত, ক্ষমাগুণ সম্পন্ন, সুশীল, ধর্মনিষ্ঠ, গুপ্তচেষ্টা, প্রিয়ম্বদ, শান্ত, বিশ্বাস সম্পন্ন, দেবগুরুপূজা পরায়ণ, জনসঙ্গ বিরত, মহাব্যাধিপরিশূন্য, সর্ববিষয়ে সকলের অগ্রণী এবং ব্রতজ্ঞ। এইরূপ ব্যক্তি অধিমাত্রতম সাধক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অধিমাত্রতম লক্ষণ সম্পন্ন সাধক নহেন তাঁহারা তন্মাত্রবোধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেন না। ব্রহ্মজ্ঞান পথে অল্প বুদ্ধিমান এবং বোকার প্রবেশ সম্ভব নহে, অধ্যাত্মধর্ম রক্ষার অনুকূল কোন বিপ্লব পরিকল্পনাও ইঁহাদের দ্বারা সম্ভব নহে। ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য এবং শঙ্করের মত অধিমাত্রতম যোগী লক্ষণ সম্পন্ন সাধক দুর্লভ। সাধু বা সাধক দেখিয়াই মস্ত বড় সিদ্ধ ভাবিয়া লাভ নাই। বিকাশের লক্ষণ থাকা চাই।

শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশই তন্মাত্র তত্ত্বের শেষ বোধ, এসব কথার বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে দেখুন। আকাশ তন্মাত্রাই মহত্তত্ত্ব। শিবের অনুভূতি এখানেই শেষ হয় নাই। ইহার পর অব্যক্ততত্ত্ব। অব্যক্তের পর পারে পুরুষোত্তম স্তর। পুরুষোত্তম স্তরে অষ্ট মূলশক্তি, অষ্ট মূলশক্তির সমষ্টিভূত আদ্যাশক্তি এবং আদ্যাশক্তির নিষ্ক্রিয় স্তর মিলিয়া পুরুষোত্তম স্তর। ইনিই শিব। গুরু স্তোত্রে ঠিকই বলা হইয়াছে, "শিব তত্ত্ব প্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিনে।" অহংহীন শিবতত্ত্ব অর্থাৎ তন্মাত্র বোধের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে, শুদ্ধ স্ফটিক সংকাশ তত্ত্বের প্রকাশ হইবে, আকাশ তন্মাত্রই মহত্তত্ত্ব। মহতের পর অব্যক্ত এবং অব্যক্তের পর পুরুষোত্তম। ইনিই "তৎপুরুষ"। "তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি" অর্থাৎ তৎপুরুষই আদিগুরু মহাদেব, তাঁহাকে ধ্যান করি। "তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ" তিনি আমাদিগকে "রুদ্রে" লইয়া চলুন। বেদের রুদ্রই ঈশ্বরবাচক মহানতত্ত্ব। এই ঈশ্বর সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই স্তরে সদা বিদ্যমান। অর্থাৎ অনাদি ক্রিয়া ও অনাদি চেতনা একই স্তরের দুইটি অনুভূতি।

অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল যোগদীক্ষা অংশ আলোচনা করিলাম। সাধকগণ জ্ঞানী হইবার চেষ্টা না করিয়া পূজা, যজ্ঞ, জপ ও বিশেষ বিশেষ দিনে নৈমিত্তিক ও সমবেত পূজার অনুষ্ঠান করুন, তাহাতেও প্রচুর শক্তি এবং শান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

আচার্য শঙ্কর ও যোগদীক্ষা

শক্তিসাধনা অধ্যায়ে এবং গ্রন্থের বহুস্থানে আচার্য শঙ্করের কথা আমরা বলিয়াছি। আচার্য শঙ্কর ছিলেন গৌর পাদ স্বামীর অনুশিষ্য। অর্থাৎ গৌরপাদ স্বামীর শিষ্য গোবিন্দ পাদ এবং গোবিন্দ পাদের শিষ্য আচার্য শঙ্কর। গৌরপাদ স্বামী হইতে শক্তিবাদ প্রবর্তক

সত্যানন্দ স্বামীর স্থান ১৪২ সংখ্যায় অবস্থিত। সময়ের ব্যবধান প্রায় ১৮০০ বৎসর। আচার্য শঙ্করের পূর্বে ব্যাস দেব ভারতের এক ভয়ঙ্কর ধর্ম বিপ্লবকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আচার্য শঙ্কর সেই ব্যাসদেবের চিন্তাভিত্তিতেই বেদবাদীয় সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যাসের পর বেদবাদী ভারত পূজারীবাদীয় ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। সেই যুগে "তোর ধর্মে ও বেদে অধিকার নাই, তুই অছুঁত", এই নীতিই ধর্মের নীতি ছিল এবং আর্য ধর্মের প্রসারতা সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ধর্মের এই সংকোচ অংশে আঘাত দেন। বুদ্ধের পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণ ধর্মের মধ্যে দুইটি ভয়ঙ্কর মূর্খতা প্রবেশ করান - (১) বেদবাদের উচ্ছেদ, (২) শক্তিবাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া সমাজকে অহিংসবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দান। অসুরবাদ যে কি ভয়ঙ্কর নোংরা বস্তু, ইহার সঙ্গে কি ভাবে টক্কর দিতে হইবে, সবই যেন ভারত ভুলিয়া গিয়াছিল। আচার্য শঙ্করের ধর্মসংস্কারের পরও অসুরবাদকে বিশ্বাস ও প্রশ্রয় দিবার নীতি ভারতের চিন্তা জগতে বেশ ভালভাবেই স্থান পাইয়াছিল। যাহার ফলে, মক্কাবাদী বর্বরগণ ভারতের রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজকে ভাঙ্গিবার সুযোগ লাভ করে। ইংরেজ আসিবার পর, ভারত রক্ষা পায়। ইংরেজের যাইবার পর, ভারত আবার মূর্খ নেতাদের নেতৃত্বে ভয়ঙ্কর ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। শক্তিবাদ যে ইহার একমাত্র রক্ষক ও প্রতিকার, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মতবাদ হয় তো অলৌকিক জগতের দেবতা, ঋষি এবং গুরুগণের পরিকল্পনা। আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত ধর্ম যে ব্রহ্মণ্যবাদমূলক, ইহা সত্য কথা। ইহাতে যদি শক্তিবাদমূলক চিন্তাধারা স্থান পাইত তবে ভারতে এতদিন ধরিয়া মক্কাবাদ থাকিতে পারিত না। ইংরেজ যখন ভারত ত্যাগ করে তখনও ভারতের বুকে প্রায় ৪ শতাধিক স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু কোন রাষ্ট্রই মক্কাবাদীগণকে বেদবাদী করিবার কোনই ব্যবস্থা করে নাই। ইংরেজ রাজত্বকালে, হিন্দুগণকে খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা যে কিছু কম হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত ব্রহ্মণ্যবাদ নিশ্চয়ই শক্তিবাদমূলক, কিন্তু উহা ঠিক ঠিক শক্তিবাদ নহে। আচার্য শঙ্করের সাধনা এবং শক্তিবাদ প্রবর্তক সত্যানন্দের সাধনা একই গুরুধারার সাধনা হইলেও মতবাদের ভিত্তি এক নহে। আচার্য দেবের যোগসাধনা হুবহু আনন্দমঠেরই সাধনা।

যোগদীক্ষার উপাস্য শিব। আচার্য শঙ্কর কর্তৃক শিবস্তোত্রের অভাব নাই। শিব সাধনার শেষ অধ্যায় "ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা"। আচার্য শঙ্করের সমস্ত জ্ঞানধারা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক। শক্তিবাদ এবং ব্রহ্মবাদের কি ভেদ, উহা এই গ্রন্থে মীমাংসা হইবে না। দুইটি মতবাদে হয় তো কোন ভেদ নাই। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দুইএর মধ্যে কার্যক্রমের বেশ ভেদ আছে। শক্তিবাদ ভারতের বুক হইতে দুর্বলবাদ এবং অসুরবাদ ভাঙ্গিয়া দিবে এবং ভারতের সর্বপ্রকার কর্ম ও চিন্তাধারাকে একমুখী করিবে। ভারতের এই শক্তিবাদ ধর্ম সমস্ত বিশ্বে প্রচারিত ও স্থাপিত হইয়া বিশ্বকে সুখ, শান্তি ও জ্ঞান দিবে, মানুষকে মহান করিবে; ইহা আমি নিশ্চয়ই করিয়াই বলিতে পারি।

গুরুদেব যোগদীক্ষা কালে যে নোটটি লিখিয়া দিয়াছিলেন, উহাতে লেখা আছে "এই অন্তিম মন্ত্র লয় যোগাত্মক, যথা ক্রম প্রদত্ত মন্ত্র পঞ্চকসহ হঠযোগ নির্দিষ্ট মুদ্রাদির অনুশীলন প্রয়োজন।" আমরা মন্ত্র পঞ্চক সম্বন্ধে বলিয়াছি। যোগদীক্ষার ক্রিয়াদির প্রায়

সব কথাই ‘‘সাধনা ও অনুভূতি’’ অংশে বলা হইয়াছে। যোগের সমস্ত ক্রিয়ার উপদেশ আচার্য শঙ্কর যেরূপভাবে পাইয়াছিলেন, উহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত যোগতারাবলীতে স্থান পাইয়াছে। আমরা যোগতারাবলীর সামান্য অংশ এখানে দিলাম। অনুসন্ধিৎসু সাধক ইহার অবশিষ্ট অংশ শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে দেখুন এবং আমার সাধনা ও অনুভূতির অংশের সঙ্গে মিলাইয়াও দেখিতে পারেন। গুরুদেবনির্দিষ্ট হঠযোগাদির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর উহা যেরূপ ভাবে পাইয়াছিলেন, উহার সবটাই এই যোগতারাবলীতে বিদ্যমান।

শঙ্করের যোগতারাবলী

ওঁ বন্দে গুরূণাং চরণারবিন্দে সন্দর্শিতং আত্মসুখাববোধে!
জনস্য যে মাঙ্গলিকায়মানে সংসার হলাহল মোহশান্ত্যৈ॥ ১॥

সংসাররূপ হলাহল জনিত মোহের শান্তির নিমিত্ত যে পাদপদ্মদ্বয় বিষবৈদ্যের মত আচরণ করেন, মানবের আত্মসুখবোধ সন্দর্শক, সেই গুরু চরণারবিন্দদ্বয়কে প্রণাম করি॥ ১॥

শক্তিবাদ ভাষ্য। এখানে শঙ্কর ‘‘গুরূণাং’’, বহুবচনশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ আদি গুরু শিব হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দপাদ পর্যন্ত গুরুগণের এই ধারাকেই তিনি গুরু বলিতেছেন। আমিও গুরুধারাকেই আচার্য দেবের স্বরে স্বর মিলাইয়া প্রণাম করিতেছি। যোগতারাবলীতে মোট **২৯টি** শ্লোক আছে। এই প্রবন্ধে সেই সবগুলি যোগক্রিয়ার কথাই আছে। কাজেই সবগুলি শ্লোক না দিয়া কয়েকটি মাত্র শ্লোক প্রকাশ করিলাম। যাঁহারা ইহা বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহারা শঙ্করবিজয় গ্রন্থে দেখুন।

সদাশিবোক্তানি সপাদ লক্ষ লয়াবধানানি চ সন্তি লোকে।
নাদানু সন্ধান সমাধিমেকং, মন্য মহে মান্য তমং লয়া নাম্॥ ২॥

‘‘সদাশিবোক্ত লয়যোগের এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ক্রিয়া বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে আমি নাদানুসন্ধান সমাধিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি।’’

শক্তিবাদ ভাষ্য। আমি যে যোগধারা গুরুপরম্পরাতে লাভ করিয়াছি, এই যোগধারার নাম আনন্দমঠের যোগধারা। এ গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে আনন্দমঠের পরিচয়ে ‘‘নাদস্যশ্রবণং তীর্থং’’ ইত্যাদি দেখুন। আচার্য শঙ্কর ছিলেন আনন্দমঠের যোগধারার শিষ্য, কাজেই ইহা স্বাভাবিক যে তিনি নাদানুসন্ধানকেই শ্রেষ্ঠ যোগ বলিবেন। বাস্তবিক ‘নাদ’ তুল্য যোগ নাই। সদাশিব প্রোক্ত সাধনাই যে তান্ত্রিক সাধনা, ইহা কে না জানে? কাজেই আমার মতন শঙ্করও যে দিব্যাচারী তান্ত্রিকপন্থী যোগী ছিলেন, ইহাতে সংশয় করা চলে না। এই যোগতারাবলীতে আমার প্রিয় গুরু, আচার্য শঙ্কর যে সব যোগসাধনার কথা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ‘‘আমার সাধনা ও অনুভূতি’’ **১১শ** অধ্যায়ে দেখুন।

সরেবপুরৈরনিলস্য কুম্ভৈঃ সর্বাসু নাড়ীষু বিশোধিতাসু।
অনাহতাদম্বুহাদুতেতি, স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধঃ॥ ৩॥

বায়ুর পূরক, কুম্ভক ও রেচকদ্বারা নাড়ীসমূহ বিশোধিত হইলে অনাহত পদ্ম হইতে আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং উদিত হয়॥ ৩॥

নাদানুসন্ধান! নমোঽস্তু তুভ্যং, ত্বাং মন্মহে তত্ত্বপদং লয়ানাম্।
ভবৎ প্রসাদাৎ পবনেন সাকং, বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে॥ ৪॥

হে নাদানুসন্ধান! তোমাকে নমস্কার। আমি লয় সমূহের মধ্যে তোমাকেই তত্ত্বপদ মনে করি। অন্য কথা কি, তোমার অনুকম্পা ঘটিলে, আমার অন্তঃকরণ প্রাণপবনের সহিত বিষ্ণুপদে উপনীত হইতে পারে॥ ৪॥

আমার ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার শেষদীক্ষা
মহাপূর্ণ দীক্ষা

মন্ত্র। ওঁ হেসৌ ওঁ। ওঁ হৌ ওঁ॥

ব্রহ্মমন্ত্র। "ওঁ সচ্চিদেকং অহং ব্রহ্ম"।

মন্ত্র ও দীক্ষার সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। অন্তিম বীজমন্ত্র দুইটি ওঁ দ্বারা পুটিত আছে। হেসৌ বীজ মন্ত্রটি শক্তিবাচক। "হৌ" মন্ত্রটি পুরুষ বা চেতনা বা নির্গুণ ব্রহ্মবাচক। "স" মন্ত্রই শক্তিবাচক। কিন্তু অনুভূতিতে শক্তিকে ব্রহ্মহীন করিয়া অনুভব করা যায় না। শক্তি যতই বিশুদ্ধরূপে অনুভূত হউন না কেন, চেতনা সেই অনুভূতির সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে জড়িত থাকিবেনই। এজন্যই "হ্ স" মিলিতভাবে শক্তিমন্ত্র উপদিষ্ট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ চেতনা বা নির্গুণ ব্রহ্মই "হ" মন্ত্রের লক্ষ্য। মন্ত্র দুইটি ওঁ মন্ত্রে পুটিত আছে। অর্থাৎ বীজমন্ত্র দুইটির পূর্বে ও পরে ব্রহ্মবাচক "ওঁ"কার অবস্থিত। সাধারণতঃ ওঁকারই ব্রহ্মবাচক। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম ও পরা আদ্যাশক্তিকে বিশুদ্ধ অনুভূতির মন্ত্র "হ্ স" এবং "হ"।

জ্ঞানশক্তির ৪টি প্রধান বীজ মন্ত্রের কথা আমরা ত্রিপুরা মন্ত্রের দীপনী মন্ত্রে বলিয়াছি। এই বীজ মন্ত্রগুলি হইতেছ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ। এই চারটি বীজমন্ত্র ভিন্ন আরও একটি জ্ঞানশক্তির বীজমন্ত্র আছে, সেই বীজমন্ত্রটি হইতেছে "সৌঃ"। ঃ = হ্ অর্থাৎ বিসর্গ এবং অর্ধ হ কার একই কথা। মন্ত্রবিজ্ঞান, ক্রমবিকাশ তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সৌঃ শেষ জ্ঞান বা বোধশক্তি। যেখানে বোধ বা যেখানেই অনুভূতি, সেইখানে কোন না কোন রূপে জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, জানিতে হইবে। যে জ্ঞানশক্তি বিশুদ্ধ চেতনাবোধের নিকটতম জ্ঞানশক্তি, উহার নাম সৌঃ। আমাদের গুরু ধারার ইহাই নিয়ম যে এই অন্তিম জ্ঞানশক্তি এবং অন্তিম চেতনাতত্ত্বের প্রতিভূ "হৌ" এর দীক্ষা হইবার পর বার বৎসরকাল এই শেষ তত্ত্বের অনুশীলন হইবার পর; সাধককে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধসাধক মানা হয় এবং তাঁহাকে 'সরস্বতী' বলা হয় এবং তিনিও পত্রাদির শিরোমানাতে "ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ" লিখিয়া থাকেন। এই অন্তিম দীক্ষার পর যিনি "বিরজা হোম" করিয়া শিখাসূত্র বিসর্জন দেন তাঁহাকেও সরস্বতী বলা হয়। এ সব কথা আমি পূর্বে অন্যত্র বলিয়াছি। বিরজা হোমের পর গুরুদেব শিষ্যকে পুনঃ এই "ওঁ হেসৌ ওঁ ওঁ হৌ ওঁ" মন্ত্রের দীক্ষা পুনরায় দেন এবং তাঁহাকে "হংসঃ সোঽহম্" স্মরণ করিয়া অজপা জপ

করিতে বলা হয়। আমরা ২১৬০০ অজপা জপ সমর্পণের কথা প্রাতঃকৃত্য অংশে বিস্তারিত বলিয়াছি। "বিরজা হোমের" পর, সাধক নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমহংসঃ হইয়া যান। বিরজঃ মানে "বিগত রজঃ"। অর্থাৎ রজঃ বা ক্রিয়া বা স্পন্দন বা বোধশক্তি যে সাধকে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি বিরজঃ, অর্থাৎ বিরজঃ হোমের পর সাধক সিদ্ধ হন বা "নির্গুণ ব্রহ্ম" হন। "নির্গুণ ব্রহ্ম"ই "নিশ্চল ব্রহ্ম"। কিন্তু সাধককে চলাফেরা করিতে হয়, কাজেই গুরু তাঁহাকে আবার দীক্ষা দান করিয়া যেন নিশ্চল সিদ্ধ সাধককে সচল করিয়া দেন।

আমরা পূর্বেও একথা বলিয়াছি, অন্তিম দীক্ষার পর বারো বৎসর কাল এই দীক্ষার তত্ত্বটিকে রাজযোগ অবলম্বনে অনুশীলন করিবার পর সিদ্ধ সাধককে "সরস্বতী" বলা হয়। বারো বৎসর একটা কথার কথামাত্র। আসল কথা, অন্তিম দীক্ষার পর সাধক সমস্ত জীবন শ্বাসপ্রশ্বাসের শেষ ক্রিয়াকাল পর্যন্ত "বিরজঃ" সাধনা অবলম্বনে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইবার পথ ধরিয়া থাকিবেন এবং শেষ রজঃ বা জ্ঞান বা বোধক্রিয়ার শেষ স্তরে জীবনদীপ নির্বাণের অপেক্ষা করিতে থাকিবেন।

কালী, তারা, দুর্গা বা যে কোন শক্তিপূজার "পীঠ ন্যাসের" শেষ মন্ত্রটিতে "হেসৌঃ" বীজ মন্ত্রটির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। "পীঠন্যাস" মানে যে পীঠে বা স্থানে বা কেন্দ্রে শক্তিতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব অবস্থিত, উহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অনুষ্ঠান। ব্রহ্মজ্ঞান বা মহাশক্তির অবস্থান সর্বত্র! কিন্তু সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হন না বা সকলেই ব্রহ্মদর্শন করিবার শক্তি রাখেন না; যে সূক্ষ্মতম বোধকেন্দ্রে শক্তি বা ব্রহ্মতত্ত্বের বিকাশ হয়, সাধকের বোধশক্তি সেই স্তরে প্রতিষ্ঠা না প্রাপ্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কেহই ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন। "পীঠন্যাস এবং পীঠমনু ন্যাস তত্ত্ব" শক্তিপূজা বিধিতে আলোচনা করিয়া সাধক বুঝিতে চেষ্টা করুন ব্রহ্মজ্ঞানের পথে সাধককে ধীরে ধীরে কিভাবে সূক্ষ্মতম বোধকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। সেই বোধকেন্দ্রেই শক্তিতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের বিকাশ জানিবেন।

অর্ধনারীশ্বর যোগ সাধনায় অজপা মন্ত্র "ওঁ হ্রীঁ"। কাম কলা ধ্যান ও নাদবিন্দুধ্যানের সঙ্গে অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব কিভাবে সম্বন্ধ রাখে, এ কথা আমরা বলিয়াছি। অর্ধনারীশ্বর সাধনায় ব্রহ্মতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব জ্ঞান, যতটা সূক্ষ্ম স্তরে ছিল, 'হংস' পীঠকেন্দ্রে অর্থাৎ গুরুপাদুকা ধ্যানের শেষপ্রান্তে বা সোমচক্রপীঠে সেই অজপা পীঠ আরও সূক্ষ্মস্তরে বিরাজিত। এবার অন্তিম দীক্ষায় "হেসৌ" এবং "হৌ" বীজ মন্ত্র দুইটির কথা আসিয়াছে। ইহাদের লক্ষ্য আরও সূক্ষ্ম বোধস্তরে, জানিতে হইবে। "ওঁ হ্রীঁ" বা অর্ধ নারীশ্বর "তত্ত্ববোধ কেন্দ্র" গুরুপাদুকা কেন্দ্রের মধ্যস্তরে। "হংসঃ" পীঠ গুরুপাদুকার শেষ, লয়বিন্দুতে বিদ্যমান। এই "হংসঃ" মন্ত্রের "ং" বা "নাদ" হইতেছে মহত্তত্ত্ব বা আকাশ তন্মাত্রাবোধ। "সঃ" এবং "হ" মন্ত্রের লক্ষ্য "শক্তিতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব"। সাধক "ক্রমবিকাশে" মস্তিষ্ক চিত্রের ৪নং কেন্দ্র দেখুন। এই ৪নং কেন্দ্র হইতেছে গুরুপাদুকার শেষপ্রান্ত "দ্বন্দ্ব মিন্দু" বা "সোমচক্র" বা "শিখাত্রয় লয় স্থান", বহুদিন সোমচক্রের শান্তি ও অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইবার পর, সাধকের "অহং" তত্ত্ব গলিয়া যায় বা অস্তিত্বহীন হয়। এবং সাধকের পঞ্চতন্মাত্রাবোধের স্তরে "বোধবিকাশ" হয়।

পঞ্চতন্মাত্রাবোধের শেষপ্রান্তে ‘‘আকাশ তন্মাত্রা’’ বা ‘‘মহত্তত্ত্ব’’। মস্তিষ্কচিত্রে ইহার কেন্দ্র হইতেছে ৫নং কেন্দ্র। এখানে বলা প্রয়োজন, ‘‘সোমধারার’’ মধ্য দিয়াই পথ। সোমধারায় ‘‘অহং’’ অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যাওয়াই সাধনা। এই সাধনা শেষ হইলে, আপনিই একটি একটি করিয়া তন্মাত্রাবোধ বিকশিত হইতে থাকিবে। এবং ‘‘মহত্তত্ত্ব’’ উদ্ভাসিত হইবে। পূর্ণবোধই মহত্তত্ত্ব। এই পূর্ণবোধ শেষ হইয়া অব্যক্ত স্তর। বিস্তারিত ক্রমবিকাশে বলা হইয়াছে। মস্তিষ্কচিত্রে ৫নং মহত্তত্ত্ব স্থান। ৬ নং অব্যক্ত কেন্দ্র।

আমরা ক্রমবিকাশে দেখাইয়াছি, অব্যক্ত হইতেই শক্তিস্তর আরম্ভ। অব্যক্তের মধ্যেও যে ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান, ইহা আমরা ক্রমবিকাশে স্পষ্ট করিয়াছি এবং মহাবিদ্যার ধ্যান ব্যাখ্যায়ও সেই সবের আভাষ বলিয়াছি। শক্তিস্তরই যে পুরুষোত্তম স্তর, ইহা আমাদের পাঠক ভালভাবেই জানেন। এই স্তরে অষ্ট পরাশক্তির ক্রিয়া এবং সমস্ত শক্তির সমষ্টিভূত আদ্যাশক্তির কথা আমাদের পাঠক ক্রমবিকাশেও জানিয়াছেন। অন্তিম দীক্ষার বীজমন্ত্র ‘‘হেসৌ’’ এবং ‘‘হৌ’’ এর যে লক্ষ্য শক্তিস্তরের শেষ স্তর বা পুরুষোত্তম স্তরের কথা, ইহা আমরা এই অধ্যায়েও বলিয়াছি।

‘‘হংস’’ মন্ত্রের ং ই যে ওঁকারের প্রতীক ইহাতে সন্দেহ নাই। এই ওঁকারকে সরাইয়া দিলে মোটামুটি ‘‘হ স’’ই থাকে। ইহাই ‘‘হেসৌ’’ বীজমন্ত্রের লক্ষ্য। এই মন্ত্রে অনাদিশক্তি এবং চেতনার মিশ্রণ আছে। ‘‘হৌ’’ মন্ত্রে দেখা যায় শক্তি অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে কেবল বিশুদ্ধ চেতনাকে মানা হইয়াছে। শক্তিহীন শরীর চলে না, সৃষ্টি স্থিতি লয়ও চলে না। অনেক মহাত্মা ‘‘বিরজা’’ হোমের পরই গঙ্গাযাত্রী বিধানে শরীর গঙ্গায় ত্যাগ করেন, কেহবা অগ্নিতে শরীরকে ভস্মীভূত করেন। কেহ কেহ প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করিবার জন্য কিছুদিন শরীর রক্ষা করিয়া, শরীর বিসর্জন দেন। আচার্য শঙ্কর, উত্তরাখণ্ডের কোন পর্বত হইতে পতিত হইয়া শরীর ছাড়িয়া ছিলেন; ইহা আমি গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি। শঙ্করের দেহত্যাগের স্থানটিতে একটি কূপ খনন করিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে ‘‘সরস্বতী কূপ’’। কোন কোন মহাত্মা শরীরের অন্তিম পরিণতি নিকটবর্তী জানিয়া গঙ্গাযাত্রী বিধানে ‘‘বিরজা’’ হোম করেন এবং গঙ্গার ধারে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহারা আর বিরজার পর দ্বিতীয়বার দীক্ষা গ্রহণ করেন না। অনেক ধার্মিক গৃহীকেও এইভাবে নিজের অন্তিম সময় জানিয়া, নিজের শ্রাদ্ধ তর্পণ নিজে সম্পন্ন করিয়া, শেষ শ্বাস পর্যন্ত গঙ্গাতটে অবস্থান করিতে দেখা যায়। ‘রজঃ’কে বা শক্তিকে যদি বাদ দেওয়া হয় তবে ‘‘হৌ’’ মন্ত্র থাকেন। ইহার লক্ষ্য ‘‘নির্গুণ চেতনা’’। নির্গুণ চেতনাকে অবলম্বন করিলে শরীর রাখার কোন মানে হয় না। এইজন্যই বিরজার পর আবার ‘‘ওঁ হেসৌ ওঁ’’ এবং ‘‘ওঁ হৌ ওঁ’’ দীক্ষার বিধান।

গুরুদেব আমাকে প্রথম দীক্ষা দিলেন ‘‘ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’’। এবং শেষ দীক্ষায় ব্রহ্মমন্ত্র দিলেন ‘‘ওঁ সচ্চিদেকং অহংব্রহ্ম’’। ‘‘সৎ = শক্তি’’, ‘‘চিৎ = চেতনা’’, ‘‘একং = আনন্দং’’। অর্থাৎ ‘‘সৎ চিৎ আনন্দং ব্রহ্ম’’ এবং ‘‘সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’’ তত্ত্বত এক হইলেও বিচার করিলে ভেদ আছে। ‘‘সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম’’ হইতে সৃষ্টির আরম্ভ; কিন্তু সাধক যখন সিদ্ধ হন তখন তিনি ‘‘সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’’ স্তরে আসেন। এবং সৃষ্টির শেষ স্তরে আসেন।

সচ্চিদেকং ব্রহ্ম = সৃষ্টির বেগহীন ব্রহ্মতত্ত্ব। সচ্চিদেকং ব্রহ্ম বা ''সচ্চিদেকমহং ব্রহ্ম'' মানে সৃষ্টির বেগহীন ব্রহ্ম। ''সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম'' মানে ব্রহ্মতত্ত্বে আনন্দ বা সৃষ্টির বেগ বিদ্যমান। সচ্চিদেকং ব্রহ্ম মানে, সাধক সৃষ্টির স্তর অতিক্রম করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের স্তরে আসিয়াছেন। হৌ এবং হেসৌ মন্ত্র দুইটিই ওঁকার বা প্রণব পুটিত করা হইয়াছে। ওঁকার বা প্রণব হইতেছে, সেতুমন্ত্র। সেতু মানেই, নিম্ন হইতে শেষ স্তর পর্যন্ত সমস্ত স্তরে উঠা নামার সিড়ি। সিদ্ধ স্তরে, সাধক বিকাশের সমস্ত স্তরে এবং বিবর্তনের সমস্ত স্তরে, বিচরণ করিতে শক্তি অর্জন করেন। এ সম্বন্ধে আমরা আর বেশী বলিতে চাই না। উঠা নামার সিড়ি থাকিলেও সাধক যে এই অন্তিম দীক্ষায় অর্ধনারীশ্বর স্তরে বা হংস পীঠস্তরে নহেন, ইহা বলিয়া দেওয়াই প্রয়োজন। সাধককে সিদ্ধির চরমস্তরে আনিবার জন্য আদি গুরু শিব যেভাবে মন্ত্র ও অনুভূতির ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন আমরা সেইসব কথা যথাশক্তি বলিবার চেষ্টা করিলাম।

শিব কোন মানব বা দেবতা বা ঈশ্বরীয় বিভূতি, ইহার বিচার করিবার শক্তি আমার নাই। শিবের জন্মমৃত্যু নাই। সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্বকেই শিবরূপে দাঁড় করাইয়া মানবের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও সমস্ত সভ্যতার ভিত্তিকে নিখুঁত এবং দৃঢ় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কিনা, ইহাও আমি জানি না; শিব আমার গুরুধারার, আদি গুরু। তিনি অনন্তজ্ঞান এবং অনন্ত শক্তি এবং সমস্তপ্রকার যোগ বিভূতি সম্পন্ন মহাত্মা। উপাস্য তত্ত্বের মধ্যে এমন সর্বসিদ্ধিদাতা এবং সর্বগুণসম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ ফলদাতা জাগ্রত দেবতা আর একটিও নাই। শিবকে আমি জন্মমৃত্যু হীন এক অসাধারণ গুরুরূপেই বিশ্বাস করি। তাঁহার জীবনের জন্ম এবং শিক্ষার অংশ অজ্ঞাত। ''মদন'' ভস্মীভূত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন কঠোর তপস্বী এবং যোগী। ''মদন ভস্মীভূত'' হইবার পর পার্বতীকে আমরা তাঁহার পার্শ্বে মাতৃরূপে পাইয়াছি। মদনভস্মে ইহা বুঝা গেল, তিনি সাধারণ জীব নহেন, এবং তাঁহাতে কাম বা মদন প্রভাব নাই। মদন প্রভাবহীন ভালবাসা এবং মিলনজীবনেও তিনি ক্ষয়হীন ও পূর্ণব্রহ্মচর্য জীবনেই ছিলেন। দেবতাদের কার্যে অসুর নিধনের জন্য এই সিদ্ধযোগী এবং যোগিনী কার্তিক ও গণেশ উৎপন্ন করেন। তাঁহাদের জীবনের এই অংশও বিস্ময়কর। ইহার পর, শিব পার্বতী অর্ধনারীশ্বররূপে আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পথে এক নূতন ধারায় যোগজীবনে প্রবেশ করেন। মদন ভস্মীভূত হইবার পূর্বেকার যোগজীবন, পার্বতীর সঙ্গে মিলনের পর, ক্ষয়হীন মিলন ও গভীরভাবে মিলনসম্পন্ন ক্ষয়হীন ব্রহ্মচর্য জীবন। পরে অসুরনাশক গণেশ ও কার্তিক দেবতার পিতৃ ও মাতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত জীবন। এই জীবনে তিনি সমাজকল্যাণে যেরূপ কর্তব্য ও দায়িত্বসম্পন্ন মহান শক্তিধরের জীবনযাপন করিয়াছিলেন, উহার তুলনা নাই। এই জীবনের পর, অর্ধনারীশ্বররূপে নরনারী মিলনে যোগজীবন যে কত বিস্ময়কর ঘটনা, উহার সীমা করা যায় না। শিবের এই অর্ধনারীশ্বর জীবনও শেষ হইল। ইহার পরিতুষ্টির তত্ত্বই ''ওঁ স্ত্রীঁ'' মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। 'হংস' পীঠ সাধনার আরম্ভে এই জীবনের শেষ হয়। ইহার পর শিব আবার একক হন এবং সিদ্ধসাধকের নিকট তিনি পূর্ণ সন্ন্যাসীরূপে আবার আত্মপ্রকাশ করেন। পূর্ণ সন্ন্যাস মন্ত্রই ''ওঁ হেসৌ ওঁ ওঁ হৌ ওঁ।'' এই অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে।

আমাদের আনন্দমঠ পরম্পরায় ‘‘ওঁ হ্রীঁ’’, ‘‘হংস’’ এবং ‘‘হেসৗ’’ ‘‘হৌ’’ সবই সন্ন্যাস মন্ত্র, কিন্তু সব মন্ত্রের অনুভূতি এক স্তরের নহে। আমাদের গুরু পরম্পরাতে এই ভাবেই সন্ন্যাস ক্রম এবং সন্ন্যাস মন্ত্রের দীক্ষার ক্রম সজ্জিত আছে। অন্য সাধক সম্প্রদায়ে ইহার কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা, সেই সব কথার আলোচনা করিবার আমার ইচ্ছা নাই। তপস্বী শিব, মদনদাহক শিব, অর্ধনারীশ্বর শিব, হংস শিব এবং পমরহংস বা শেষ সন্ন্যাস স্তরের শিব, সকলেই আমাদের পূজ্য এবং গুরু। শিবকে মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড মানিয়া বা গুরু পাদুকার মূর্তিমান বিগ্রহরূপে ধ্যান করিয়া বা বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি রূপে তন্ময় হইয়া, আমরা শিবের বা গুরুর বিকাশ ধারার কথা বলিয়াছি। তাঁহাকে মানব বল বা অতিমানব বল অথবা শিব পিণ্ডরূপ ও গুরুপাদুকারূপ বল, নাদবিন্দু বল, কলা, কলাতীত বল, বা কামকলা বল, সর্বভাবেই শিব আমার অতীব পূজনীয় প্রথম গুরু। ভারতে হিমালয় প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া শৈব ধর্ম উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। মুসলমানদের ভারতে রাজ্য স্থাপনার ফলে, ভারতীয় ধর্মের বিস্তৃতি ও প্রচার এবং শিক্ষা দীক্ষা স্তব্ধ হইয়া যায়। এই ধর্মের পুনঃপ্লাবন আনিতে হইবে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য। সমস্ত ভারত এবং সমস্ত বিশ্বে আবার ‘‘শিবশক্তিবাদ’’ ধর্মের প্রসার করিতে হইবে। তবেই মানবের মঙ্গল সম্ভব এবং মানবের আত্মবিকাশ, সমাজ ও রাষ্ট্র বিকাশের কল্যাণময় নীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ভারতের নবীন, প্রাচীন, সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়কেই আমরা ভারতীয় ধর্মপ্রসারে কর্ম ও চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করিতে বলি। যোগবাদ এবং দর্শনবাদই শিবশক্তিবাদের মূলকথা এবং ইহাই ভারতীয় সর্বসম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি। শিব তপস্যার মাধ্যমে যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বিশ্বমঙ্গলে উহাই দান করিয়া গিয়াছেন। গুরুর ধারায় আমি যাহা পাইয়াছি, বিশ্বকল্যাণে উহার সবই প্রকাশ করিলাম।

বেদ ব্রহ্মকে ‘সৎ চিৎ এবং আনন্দ’ বলিয়াছেন। সৎ মানে জড় বা দৃশ্য তত্ত্বের সূক্ষ্মতম অবস্থা, বা গতি রূপা শক্তি। চিৎ মানে চেতনা অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম। সৎ ও চিৎ সত্ত্বার ফাঁক থাকাই আনন্দ। এই ফাঁকের নাম ‘‘আনন্দ’’। এই ‘‘আনন্দ’’ তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্টি চলে। এই আনন্দের ফাঁকটুকু থাকে না বলিয়াই সৃষ্টির শেষ হয়। এই ‘‘আনন্দ’’ই অনাদি রজঃ। রজঃ হীন সিদ্ধযোগীই সৃষ্টিহীন মুক্ত মহাত্মা। বেদ নির্দিষ্ট ‘‘সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম’’ হইতেছে সৃষ্টিমূলক ব্রহ্মতত্ত্ব। তন্ত্রের ‘‘সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’’ মানে সিদ্ধসাধকের ফাঁকহীন ‘‘অন্তিম চেতনাতত্ত্বের’’ অনুভূতি। বেদ হইতেছে Theory, তন্ত্র হইতেছে Practice. Theory বিজ্ঞানে যাহা ‘‘সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম’’ Practice এ উহাই ‘‘সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’’; এই অনুভূতির পরও সাধকের জন্ম জন্মান্তরের প্রারব্ধ কর্মক্ষয় কাল পর্যন্ত শরীর থাকে অর্থাৎ ‘‘অহং’’ও থাকে। এই অহং জন্মান্তরের কারণ নহে। এই অহং ‘‘দগ্ধ বীজবৎ’’ অহং। একটি বীজকে জল ও মাটির সংযোগে রাখিলে, তাহা হইতে বৃক্ষ হয়; কিন্তু বীজটিকে ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া দিলে, তাহাকে দেখিতে বীজের মতন হইলেও, তাহা হইতে আর বৃক্ষ জন্মে না। কাজেই, সিদ্ধদশার, ব্রহ্মমন্ত্রে ‘‘সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’’ মন্ত্রের সঙ্গে ‘‘অহং’’ যোগ করা আছে। অর্থাৎ সিদ্ধদশায় সাধকের

শরীর যতদিন থাকে ততদিন তিনি ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন। সিদ্ধ যোগীর ''অহং'' তত্ত্বটিও ব্রহ্মেরই স্বরূপ জানিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সিদ্ধদশায় সাধক দগ্ধ বীজবৎ ''অহং'' দশায় শক্তিহীন, গতিহীন, বা কর্মহীন ''নিশ্চল ব্রহ্ম'' হইয়া যান তো? উহার উত্তর - ''না''। সিদ্ধ দশায় সাধক সীমাহীন কর্ম এবং জ্ঞান বিভূতিবান হন। এখানে আমি স্পষ্টই বলিয়া রাখি, ''যাঁহারা'' শিবের নির্দেশমত, ''অধিমাত্রতম'' যোগী লক্ষণ সম্পন্ন সাধক নহেন, তাঁহারা সিদ্ধ দশার স্তরে আসিবার মত যোগ্য সাধক হইতেই পারেন না। ব্রহ্ম সূত্র লেখক ব্যাস এবং ব্রহ্মবাদ প্রবর্তক শঙ্করাচার্যের সীমাহীন কর্মশক্তির কথা ভাবুন।

গুরুদেবের পাহাড়ের ''আনন্দশ্রম'' ছাড়িয়া ভৈরব গুহায় আশ্রয় লইবার পরও আমি মাঝে মাঝে পাহাড়ের আশ্রমে যাইতাম। গুরুদেব আশ্রমে থাকিলেও যাইতাম এবং না থাকিলেও যাইতাম। আমার অবস্থান কালীন পরিবেশের সঙ্গে, না থাকা কালীন পরিবেশের দৃশ্য দেখিয়া, আমিই স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম। আশ্রমের তাল এবং আম্র বৃক্ষগুলিতে সহস্র সহস্র টিয়াপাখীর বিরক্তিকর ''চেঁচামেচিতে'' আশ্রমের সাম্য পরিবেশ সর্বদা বিপন্ন থাকিত। ইহারা আশ্রমের ফলমূল ও তরকারী সবই নষ্ট করিত। ভাঁড়ার ঘরে যাইয়া দেখিতাম, ইন্দুরের দুর্গন্ধে ঐখানে তিষ্ঠানই যায় না। পাকা পাথরের দেওয়াল ও মেজের কোণে কোণে ইন্দুরের গর্ত। একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স ছিল, যাহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য রাখা হইত। সেই বাক্সটাকে ছিদ্র করিয়া ইন্দুরগণ সহজেই উহাতে প্রবেশের স্থায়ী পথ করিয়া লইয়াছিল। চাল, আটা, মশলা সবের মধ্যেই দেখিলাম, ইন্দুরের মল মূত্রের সংস্থান। আশ্রমের সাধুরা সেই সব খাদ্যই সিদ্ধ করেন বা রান্না করেন এবং আহার করেন। গুরুদেবও যখন ২।৪ দিনের জন্য আসেন, গুরুদেবকেও উহাই বাছিয়া সাজিয়া আহার্য প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্দিরে চণ্ডীমায়ের ঘট স্থাপনা ছিল। আমি ঘটটীকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতাম। আমার সাজানো গুছানোর রুচি দর্শন করিয়া গুরুদেব একটা তামানির্মিত মায়ের মুখ কাশী হইতে আনিয়া ছিলেন। আমি ঘটের উপরে রক্ষিত নারিকেলের সঙ্গে সেই মুখটি বাঁধিয়া দিয়া মাকে শাড়ী পরাইয়া দিতাম। হঠাৎ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না যে ইহা একটি ঘট। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিতাম, মায়ের সেই সাজগোছ সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। তখনও দুইজন সাধু আশ্রমে থাকিতেন। সাধুদের বিষয়ে, আমার গুরুদেব বলিতেন, 'সাধুরা সমাজগুরু এবং রাজগুরু। তাঁহাদের প্রত্যেক কর্মে এবং প্রত্যেক নীতি বিষয়ে, প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন; কর্মহীন অলস সাধুর বর্তমানও নাই ভবিষ্যৎও নাই।'

সাধনার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সব সাধনা এবং 'মন্ত্রতত্ত্ব' সম্বন্ধে আমি মোটামুটি সবই বলিয়া দিলাম। আনন্দমঠের সাধক পাইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবে এবং শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী আলোচনা করিবে। দীক্ষা না লইয়া কোন মন্ত্র বা ক্রিয়ারই অনুশীলন করিবে না। শিব আমাদের আদিগুরু, শিবই আমাদের বর্তমান গুরু, এই বিশ্বাসে একনিষ্ঠ থাকিয়া সাধনা করিয়া যাইবে। সিদ্ধসাধক বই পড়িয়া গুরু হইবার চেষ্টা না করিয়া শিবধারার সাধক হইবার চেষ্টা করিবে। আঠারো বৎসরের স্বরাজ ভারতের

ভয়াবহ সর্বনাশ আনিয়াছে। ইহার কারণ, নেতাদের জেলের চাবুক এবং পশ্চিমের কম্যুনিজম বইয়ের কাল্পনিক জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম এবং বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা নাই। তুমি ভারতের রাজাদের চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং মুনি ঋষিদের নির্দেশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়া অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিমান ভারতের কল্যাণের কথা ভাবিবে। সিদ্ধসাধক গ্রন্থ যদি তোমাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, তবেই জানিবে, তোমার এই মহাগ্রন্থের আলোচনা ব্যর্থ হয় নাই এবং তুমি শিবধারার আশীর্বাদ প্রাপ্তি করিয়া ভালভাবেই জীবন কাটাইবার পথ পাইবে।

এত বড় একটা লম্বা সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ ধর্ম চলিতে পারে না। এই জন্য বেদের গায়ত্রী, তন্ত্রের ব্রহ্ম স্তোত্রম্, উপনিষদের মহামন্ত্রম্ এবং বেদ, তন্ত্র, যোগ উপনিষদ এবং যোগশাস্ত্র নির্দিষ্ট ব্রহ্ম নাড়ীর ধ্যানকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিবাদ সমাজের উপাসনা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য ইহা এক সাধারণ উপাসনা

মহাপুরুষের আদেশ - (১) ব্রহ্ম নাড়ীতে আমাদের আত্মা অবস্থান করেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা শক্তি। ইনি জাগ্রত হইলে আমাদের জীবন শক্তিশালী হয়। ইঁহার ধ্যান করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং কালে গায়ত্রী ও ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ কর এবং সকলকে করাও।

(২) আমাদের ব্যষ্টিজীবন অত্যন্তই সংক্ষেপ। শরীর শত বৎসরও চলে না, কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম জীবন এবং সমাজজীবন অনন্ত ও অমর। হিন্দুদের সমাজজীবন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ধরিয়া বিদ্যমান্ রহিয়াছে। সমাজজীবনকে ভুলিয়া ব্যষ্টি জীবনে অধিক আকৃষ্ট হইবার ইহাই ফল হইয়াছিল যে আমরা সমাজজীবনে দুর্ব্বল ও পরাধীন হইয়া পড়িলাম; সুতরাং আমাদের ব্যষ্টিজীবন এবং অধ্যাত্মজীবনও পঙ্গু হইয়া পড়িল। সমাজজীবনকে পুনঃ শক্তিশালী করিয়া লও। সকলের মধ্যে এক উপাসনা প্রবর্তন কর।

গায়ত্রী - ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যম্
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

ব্রহ্ম স্তোত্রম্

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব-লোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্ব-রূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ, ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পম্॥ ২
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহাচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥ ৩
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপোঽবিনাশ্যঽনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগৎ ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪

তদেকং স্মরামঃ তদেকং ভজামঃ, তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানম্ নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫
পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্লুয়াৎ॥

মহামন্ত্রম্

ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥
ওঁ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম॥
ওঁ সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম॥ ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম॥
ওঁ সত্যং জ্ঞানং অমৃতং ব্রহ্ম॥ ওঁ সত্যং জ্ঞানং অভয়ং ব্রহ্ম॥
ওঁ অয়মাত্মা ব্রহ্ম॥ ওঁ প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম॥

যাঁহারা সর্বদা কিছু জপ করিতে চান, তাঁহারা ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান সহ ''ওঁ'' জপ করিবেন।

গায়ত্রীর অর্থ। এই মন্ত্রটিতে 'তৎ'ই (তিনি বা ব্রহ্ম) কর্তা।

ওঁ - ব্রহ্ম। ওঁ তৎ এবং সৎ একার্থ বাচক। ইহা এক ব্রহ্মের তিনটি নাম।

''তৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ'' - তিনি ভূঃ (ইচ্ছাশক্তি), ভুবঃ (ক্রিয়াশক্তি) এবং স্বঃ (জ্ঞান শক্তি) স্বরূপ।

(তৎ) সবিতুঃ দেবস্য বরেণ্যম্ ভর্গো - তিনি সবিতা (অর্থাৎ সূর্য্য দেবতার অথবা বিশ্বপ্রসবিনী শক্তির) দেবতার পূজনীয় তেজ।

ধীমহি - ধ্যান করি।

ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ - বুদ্ধি শক্তিতে তিনি নিজের শক্তিকে প্রেরণ করুন।

মোটামুটি অর্থ - তিনি ওঁ বা ব্রহ্ম স্বরূপ, তিনি ইচ্ছাশক্তি (জীবের মধ্যে বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সৃষ্টির বেগই ইচ্ছা শক্তি) স্বরূপ। তিনি ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ (যে শক্তিতে সমাজ পালন হয় ও অসুরবাদ ধ্বংস হয় উহার নাম ক্রিয়াশক্তি)। তিনি জ্ঞানশক্তি (যে শক্তি আমাদের অন্তরে থাকিয়া কোন কিছু জানিবার প্রবল প্রেরণা দেয় সেই শক্তির নাম জ্ঞানশক্তি) স্বরূপ। তিনি বিশ্ব সৃষ্টিকারিণী শক্তির মূল জ্যোতিঃ। তাঁহাকে ধ্যান করি। তিনি আমাদের ধী শক্তিতে নিজের শক্তি প্রেরণ করুন।

ব্রহ্মস্তুতির অর্থ। 'ওঁ' সমগ্র বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ 'সৎ' কে (ব্রহ্মকে) প্রণাম, বিশ্বরূপাত্মক 'চিৎ' কে (ব্রহ্মকে) প্রণাম। অদ্বৈততত্ত্ব ও মুক্তিদানকারী তাঁহাকে প্রণাম, নির্গুণ ব্যাপক ব্রহ্মকে প্রণাম॥ ১॥

তুমি একমাত্র শরণ্য (যাহার আশ্রয় লওয়া যায়), তুমি একমাত্র বরণীয় (পূজনীয়), তুমি জগতের একমাত্র কারণ ও বিশ্বরূপ। তুমিই একমাত্র জগৎ-কর্তা, জগৎ উদ্ধার কর্তা ও ধ্বংস কর্তা, তুমিই একমাত্র পরম (শ্রেষ্ঠ), নিষ্কল (যে তত্ত্বে ক্ষয় বা অংশ হয় না) এবং নির্ব্বিকল্প (বিকল্প রহিত) তত্ত্ব॥ ২॥

তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণেরও ভীষণ। প্রাণীদের গতি (প্রাণীগণের লক্ষ্য অর্থাৎ বিকাশের শেষ প্রান্ত), পাবনের পাবন (পবিত্রকারীদেরও পবিত্রকারী), তুমি সমস্ত পদের শ্রেষ্ঠপদ;

তুমি একমাত্র (সৃষ্টি স্থিতি লয়ের) নিয়ন্তা। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, রক্ষকদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ রক্ষক॥ ৩॥

হে প্রভো, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর; তুমি সর্বস্বরূপ হইলেও তোমাকে বোঝা যায় না এবং তুমি সর্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও সত্য স্বরূপ। তুমি অচিন্ত্য অক্ষর, ব্যাপক ও অব্যক্ত তত্ত্ব, তুমি জগৎ ভাসকাধীশ ও ক্ষয়উদয় রহিত॥ ৪॥

একমাত্র তোমাকে স্মরণ করি, একমাত্র তোমাকে পূজা করি। এবং জগতের সাক্ষী স্বরূপ একমাত্র তোমাকেই প্রণাম করি। তুমি একমাত্র সৎ, একমাত্র নিধান (আশ্রয় স্বরূপ), তুমি নিরালম্ব (যিনি কাহারও আশ্রয়ে অবস্থিত নহেন এবং সমস্তের আশ্রয়), তুমিই ঈশ্বর, তুমিই সংসার সাগরের পোত, তোমার শরণাগত হইতেছি॥ ৫॥

পাঁচটি রত্নস্বরূপ এই পরমাত্মা ব্রহ্মস্তোত্র, যিনি একান্ত মনে পাঠ করেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

মহামন্ত্রের অর্থ। ওঁ, তৎ, সৎ ব্রহ্মের তিনটি নাম, ইহারা ওঁকারেরই স্বরূপ। তিনি স্থূলের শান্তি, তিনি সূক্ষ্মের শান্তি, তিনি জ্ঞান জগতের শান্তি। তিনিই নিশ্চিত রূপে ব্রহ্মের রূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও অমৃত স্বরূপ॥ তিনি সত্য, জ্ঞান ও অভয় স্বরূপ॥ জীবের মধ্যে যিনি আত্মা তিনি ব্রহ্ম॥ তিনি প্রজ্ঞান (জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষ), আনন্দ ও ব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি ওঁ, তৎ এবং সৎ স্বরূপ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জন্মকুণ্ডলী

আমার জন্মকুণ্ডলী পিতা করাইয়া ছিলেন। উহা আমি ছিন্নদশায় পাইয়াছিলাম। সেই কুষ্ঠির জন্ম সময় গ্রহণ করিয়া রাজেন্দ্র সেনগুপ্ত নামক এক গৃহী সাধু এই কুণ্ডলী করিয়া দেন।

ওঁ আদিত্যাদি গ্রহাঃ সর্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।
দীর্ঘায়ুঃ প্রকুর্বন্তি যস্যেয়ং জন্মপত্রিকা॥

ব্রহ্মচারী সত্যানন্দজী

শকাব্দা ১৮২১ সন ১৩০৬ ইং তাং ১৩ জানুয়ারী ১৯০০ সাল ইং সময় ১২।৪৪ মিঃ রাত্রি	তাং ৩০শে পৌষ সময় রাত্রি ১৮।২৭।২৯ উদয় হইতে ৪৫।১১।৯ দং গতে শনিবার। আর্দ্রা নক্ষত্র। মিথুন রাশি

জাতাহ			পরাহ			পঞ্জিকা
৭	৫	২৫	১	৬	২৬	১৮২১ শক
১৩	৩৯	২২	১৪	৪২	২০	১৩০৬ বঙ্গাব্দ
৩৯	৩৫	২৭	৪০	২০	৯	৩০ পৌষ
৩৪	৯	২০	৫৬	৪২	৪৭	রবি স্ফুট ৭।৩০।০
৩৫	০	৩০	৬	০	১	চন্দ্র স্ফুট ৬।৯।৩৩

দিবা ২৬।৪৩। ৪০ রাত্রি ৩৩।১৬।২০ মিথুন ৫।২৯।১৫ গতে অস্ত ইং ৫।২৯।২ গতে অস্ত	মিথুন অস্তশেষ ০।০।৪৭ কর্কট ৫।৪০।২৮ সিং ৫।৩২।৪৯ কন্যা ৫।২৯।৪০ তুলা ১।৪৩।৪৭
	রাত্রি ১৮।২৭।২৯

গ্রহস্ফুট

র - ৯ ।০ ।৪৫ ।৫৫
চ - ২ ।১৯ ।৪ ।৪৪
ম - ৯ ।২ ।৩৩ ।৩৯
বুধ - ৮ ।১৩ ।৫৬ ।৫৮
বৃ - ৭ ।১২ ।৫৪ ।২১
শুক্র - ১০ ।০ ।১৮ ।৫
শ - ৮ ।৬ ।৬ ।৪৬
রা - ৭ ।৬ ।৫ ।১২
কে - ১ ।৬ ।৫ ।১২

কুষ্ঠি পরিচয়

(বৃষ) কেতু ৫	(মেষ) ০	(মীন) ০
মিথুন চং ৬		(কুম্ভ) শু ২৩
(কর্কট) ০	জন্মাঙ্ক	(মকর) রবি ২১ মং ২১
(সিংহ) ০	(তুলা) লং	(ধনু) শ ১৯, বু ২০
(কন্যা) ০		(বৃশ্চিক) বৃ ১৭, রা ১৮

ওঁ শুভমস্তু শকাব্দ ১৮২১ ।৮ ।২৯ ।৪৫ ।১১ ।৯ এতচ্ছতাব্দিয় সৌর পৌষস্য ত্রিংশত দিবসীয় শনের্বারান্তার্গত শুক্ল চতুর্দশ্যান্তিথৌ নক্তমান বিভাগিত অষ্টাদশ দণ্ডাভ্যন্তরে চন্দ্রস্য যামার্দ্ধে শনের্দ্দণ্ডে শুভ তুলালগ্নে, শুক্রস্য ক্ষেত্রে, রবেঃ হোরায়াং, শুক্রস্য দ্রেক্কাণে, বুধস্য নবাংশে, শনের্দ্বাদশাংশে শনেস্ত্রিশাংশে, আদ্রা নক্ষত্রাশ্রিত মিথুন রাশেশ্চন্দ্রে, বৈশ্য মতান্তরে শূদ্রবর্ণে, নরগণে শ্রীযুত সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী জাতবান। তস্য দীর্ঘায়ুর্ভুয়াদিতি।

কুষ্ঠির সাধারণ বল নির্ণয়

আদৌ রিষ্টাদি আয়ুবল - জাতকের নিজের কোনও রিষ্ট নাই। মাতৃস্থানে রবিমঙ্গল মাতৃস্থানের হানিকর। লগ্নাধিপতি শুক্র ত্রিকোণে, মিত্রক্ষেত্রে, রবি চন্দ্র শুভবলী, ইহাতেও চন্দ্র একে তো পূর্ণ তাতে সর্ব শুভদৃষ্ট, রিষ্টভঙ্গ যোগও বেশ আছে। তাই জাতকের আয়ুবল উত্তম হইবে।

নবতারকা নির্ণয়

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	অরি	সাধন	বধ	মিত্র	পরমমিত্র
		+		+		+		
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪	৫

কুষ্ঠির যোগবল

১। **নন্দাযোগ**॥ তিন ঘরে দুই দুই গ্রহ এবং তিন ঘরে এক এক গ্রহ জন্ম সময়ে থাকিলে এই যোগ হয়। ইহাতে দীর্ঘায়ু দেয় ও সদা আনন্দে রাখে। "যুগ্মে যুগ্মে ভবেৎ ত্রিহি, একৈককঞ্চ ত্রিষুস্থিত। নন্দাযোগঃ সবিজ্ঞায়ঃ চিরায়ুশ্চ সুখপ্রদ॥"

দৃষ্টি বিচার, সাধারণ ভাব ও গ্রহবল নির্ণয়

	গ্রহ	তনু, স্বাস্থ্য, স্বভাব, মস্তক	ধন, সঞ্চয়, লোকবল মুখ	কনিষ্ঠ সেবা সাহায্য বাহু	বন্ধু ভালবাসা হৃদয়	পুত্র, বিদ্যা বুদ্ধি উদর	শত্রু রোগ কটী	পত্নী গৃহসুখ ব্যবসার বুদ্ধি	মৃত্যু আয়ু গুহ্যজ্ঞান	ধর্ম যশ গুরু বাহ্যধর্ম	কর্ম সম্পদ মুক্তি পর্য্যন্ত	আয় আরোগ্য বিজয়	ব্যয় ক্ষতি রাজদণ্ড
ম	রবি	।	0	0	**র**	0	।	৴	।।	0	**১**	৴	।।
উ	চন্দ্র	।।	0	**১**	৴	।।	।	0	0	**চ**	0	।	৴
ম	মঙ্গল	।	0	0	**ম**	0	।	**১**	।।	0	**১**	**১**	।।
ম	বুধ	0	0	**বু**	0	।	৴	।।	0	**১**	৴	।।	।
ম	বৃহ	0	**বৃ**	0	।	৴	**১**	0	**১**	৴	0	।	0
উ	শুক্র	।।	।	0	0	**শু**	0	।	৴	।।	0	**১**	৴
ম	শনি	0	0	**শ**	0	**১**	৴	।।	0	**১**	৴	।।	**১**
ম	রাহু	৴	**রা**	**১**	0	৴	**১**	।।	**১**	।।	**১**	।।	।
ম	কেতু	0	0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
	ভাববল	সাধারণ	সাধারণ	উত্তম	অধম	উত্তম	উত্তম	মধ্যম	উত্তম	উত্তম	উত্তম	উত্তম	উত্তম

২। **রাজযোগ**॥ (১) নবমপতি দশ পতি চন্দ্রের সম সপ্তমে, শ্রেষ্ঠ রাজযোগ। (২) নবমপতির সঙ্গে ৪র্থ ও ৫ম পতির এক রাশির মিলন, শ্রেষ্ঠরাজযোগ। (৩) ৪র্থ ৫ম এবং দশমপতি সম্বন্ধ হইয়াও রাজযোগ হইয়াছে। এই রাজযোগে শ্রেষ্ঠ লোকপূজ্য ও বিদ্বান বুদ্ধিমান মানব হয়। ভোগ সম্মান যশ পায়, লোক প্রভুত্ব পায়, ভূসম্পদ দান করে। ত্যাগ পথে যাইলে মোক্ষও দিতে পারে। (৪) ৪র্থ-১০ম এবং নবম পতি সম্বন্ধ হইয়াও রাজযোগ হইয়াছে।

প্রমাণ॥ (১) কেন্দ্রেশান্য তমঃ কশ্চিৎ কোণেশান্য তরেণচেৎ।

(২) সম্বন্ধে আচরণ ঘোটো রাজ্যং যচ্ছতি নিশ্চিতম্।
ভাগ্য রাজ্যেশ্বরৌ যোগঃ যোগাহং প্রবলস্মৃত॥

(৩) পিতৃপুত্রগতি চেত্থং প্রবলৌ রাজ্য কারকৌ।
অতবাপি স্থিতৌ চাপি সম্বন্ধে চ চতুষ্টয়ে॥

(৪) সুখে কর্মধিপৌ মন্ত্রি নাথেন সংযুতৈঃ।
ধর্মেশ মাথবা যুক্তৌ জাতশ্চেদিহ রাজ্যভাক্॥

৩। **অধিযোগ**॥ চন্দ্রের ষষ্ঠে বৃহস্পতি বুধ বা শুক্র থাকিলে এই যোগ হয়। এই যোগে সেনাপতি করে। চন্দ্রের ষষ্ঠে ও সপ্তমে বৃহস্পতি বুধ এবং শুক্রের যে কোন দুইটি গ্রহ থাকিলেও অধিযোগ হয়। ইহার ফলে মন্ত্রী করে। চন্দ্রের ষষ্ঠে সপ্তমে এবং অষ্টমে বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র তিনটি থাকিলে অধিযোগ হয়। ইহার ফলে রাজা করে। এই কুষ্ঠিতে মন্ত্রী হইবার অধিযোগ আছে।

৪। **ধনসম্পদ দাতা যোগ**॥ ধনপতি কুজ আয়পতি রবিসহ মিলিয়া এক রাশিতে। সেই রাশি মঙ্গলের তুঙ্গ ক্ষেত্রে। ইহা ধনসম্পদ দাতা যোগ।

৫। **দশমপতি চন্দ্র নবমে**॥ ইহা ক্ষেত্র সিংহাসন নামক রাজযোগ। সদা পর সাহায্য দেয়, সেবাসুখ দেয়, কর্মক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও যশ দেয়।

৬। **নবমে শুভ চন্দ্র**॥ চন্দ্রের মত নির্মল জ্ঞানবান করে। ধার্মিক তৈর্থিক ও যশস্বী করে। মনের বল উত্তম হয়। তবে একা থাকিতে দেয় না। দশের নিকট প্রকাশ করে।

৭। **পঞ্চমে শুভ শুক্র**॥ সৎপুত্র সৎবুদ্ধি ও জ্ঞান দেয়। তাঁহার প্রায় সব কার্যই সফল হয়। অল্প পাঠে অধিক জ্ঞান হয়। বিনা নিমন্ত্রণে উত্তম আহার লাভ হয়। উদরের শক্তি উত্তম হয়।

৮। **লগ্নেশ ৫মে**। সম্মানিত করে।

৯। **কুজতুঙ্গ**। ভুরি ধনাত্মজো মৃগগতে কুজে ভূপোঽথবা তৎসমঃ।

বিরুদ্ধযোগ॥ (১) ধনে গুরু রাহু সঞ্চয়হীন করে। (২) তৃতীয় শনি কনিষ্ঠ ও সাহায্যকারীহীন করে। ক্রোধী ও দুঃসাহসী করে। (৩) সুখে পাপদ্বয় মাতৃসুখ ও হৃদয়সুখ এবং সংসারসুখ নাশ করে। ইহা বন্ধুহীন যোগ। (৪) অষ্টমে কেতু অর্শরোগ দেয়; কিন্তু বৃষরাশিস্থ বলিয়া শুভ করিবার কথা॥ এই সব বিরুদ্ধযোগগুলিরও ফলহানি করিবার যোগ রহিয়াছে; গুরু মিত্রক্ষেত্রে শনি গুরুক্ষেত্রে এবং কুজ তুঙ্গক্ষেত্রে থাকিবার দরুণ বিরুদ্ধ যোগগুলির ফলহানি করিবার কথা। (আমার অর্শরোগ হয় নাই, মায়ের কৃপায়।)

প্রবজ্যাযোগ॥ কর্মপতি ধর্মে, তাতে সেই স্থানে ধর্মপতি ও বুদ্ধিপতির পূর্ণ দৃষ্টিযোগ রহিয়াছে। ধর্মদাতা গুরুও ত্রিপাদ দেখিতেছেন। ধর্মস্থানের বল কুষ্ঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠবল। রবি ও মঙ্গল পাপদ্বয় ভিন্ন সমস্ত গ্রহ দৃষ্ট, এজন্য জাতকের প্রবজ্যাযোগ হইয়াছে। মঙ্গল দৃষ্টিবর্জিত, এজন্য কর্মযোগের সংস্রব কম হইবে। কেবল চন্দ্রের মন ও গুরুর জ্ঞানালোচনার প্রাধান্য হইবে। রবির দৃষ্টি নাই, এজন্য লুকাইয়া থাকিবার মতি অধিক হইবে। শুভযোগ বলে, ইন্দ্রিয়াতীতকে বোধ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন।

মোটবল॥ (১) কুষ্ঠিতে চন্দ্র ও বুধই অধিক বলবান। তাই তত্ত্ব প্রকাশে বুদ্ধি চালিত হইবে। জীবনে কেবল জ্ঞান, যোগ, তপস্যাই হইবে না, স্নেহভালবাসারও বিকাশ হইবে।

(২) লগ্নপতি শুক্র বুদ্ধিস্থানে। শুক্রের মত স্বভাব ও তত্ত্বজ্ঞান দিবে। উপদেশক ও লোকগুরু করিবে।

(৩) জাতক চন্দ্র ও বুধের মত স্বভাব, রমণীর মত দেহ ও মন লাভ করিবে। চিরকাল বালক স্বভাব, সরল, চঞ্চল, বন্ধনহীন হইয়া বিষয় রাজ্যে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ করিবে। তেজস্বী, সাহসী, সদা উৎসাহী, কর্মদক্ষ হইবে। ভোগসুখ, প্রভুত্বসুখ, ধন, ভূমি নারীর ভালবাসাও আসিবে। সেই রাজ্যে যাইলে তাহাতেও সুখী হইবেন। উহা না লইলেও পরমার্থ, পরম যশ ও পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৩৪ বৎসর বয়সের পর শনির দশায় একটু চিত্তের অবসাদ, উৎক্ষেপ আদি ঘটিতে পারে। ৫০ বৎসর বয়সের পর প্রায় ২০ বৎসর ধর্ম জীবনের কৃতার্থতার বয়স। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

নাক্ষত্রিকী দশা নির্ণয়

নক্ষত্রমান ৬২।৪৫।৩৩। ভুক্ত নক্ষত্র ৫।৩৬

অষ্টোত্তরী মহাদশা

চন্দ্রের দশা - ১৪।৭।১৫।০
মং ৮।০।০।০ কষ্ট
২২।৭।১৫।০
বু ১৭।০।০।০ শুভ
৩৯।৭।১৫।০
শনি ১০।০।০।০ কষ্ট
৪৯।৭।১৫।০
বৃহ ১৯।০।০।০ শুভ
৬৮।৭।১৫।০
রাহু ৬।০।০।০
৭২।৭।১৫।০
শুক্র ২১।০।০।০
৯৩।৭।১৫।০

বিংশোত্তরী মহাদশা

রাহু - ১৬।৪।২১।৫০ শোক
বৃহ - ১৬।০।০।০ ধর্মলাভ
৩২।৪।২১।৫০
শনি ১৯।০।০।০ কিঞ্চিৎ কষ্ট
৫১।৪।২১।৫০
বুধ ১৭।০।০।০ জ্ঞানলাভ
৬৮।৪।২১।৫০
+কে ৭।০।০।০ শরীরে কষ্ট মনে উদ্বেগ
৭৫।৪।২১।৫০
শুক্র ২০।০।০।০ শুভ
৯৫।৪।২১।৫০

বিংশোত্তরী অন্তর্দশা

শুক্লপক্ষে রাত্রি জন্ম, বিংশোত্তরীই ফল দেয়।

	বর্ষ মাস দিন দং	
রাহু প্রাপ্ত	১৬। ৪। ২১। ৫০	নানা শোক দুঃখ বিরোধ।
বৃহ	১৬। ০। ০। ০	ধর্ম জীবন, নানা দর্শনাদি।
	৩২। ৪। ২১	
শ শ	৩। ০। ০	মনে বিরক্তি, সুহৃদভেদ, স্থান ত্যাগ, ভ্রমণ,
	৩৫। ৪। ২৪	চিত্তের উৎক্ষেপ, ক্রোধ স্বভাব॥

শ বু	২। ৮। ৯	৩৮। ১। ৩	নানা শুভ, বিলাস, ভোগ, সম্মান, যশ।
শ কে	১। ১। ৯	৩৯। ২। ১২	সর্বত্র শুষ্ক ভাব, কেতুর সহ হঠাৎ ভাব চাঞ্চল্য।
শ শু	৩। ২। ০	৪২। ৪। ১২	সুখ দিনেও তমোমিশ্র মজের আক্রমণ।
শ র	০। ১১। ১২	৪৩। ৩। ২৪	শির অক্ষিপীড়া অযশ।
শ চ	১। ৭। ০	৪৪। ১০।২৪	বন্ধুবিয়োগ মনোকষ্ট মানহানি।
শ ম	১। ১। ৯	৪৬। ০। ৩	রোগ আঘাত ভয় বিরোধ।
শ রা	২। ১০। ৬	৪৮। ১০। ৯	চৌরাভিভয় ধনক্ষতি বিরক্তিভাব
শ বৃ	২। ৬। ১২	৫১। ৪। ১১	নষ্ট লাভ, আরোগ্য, বিজয়, শুভ আরম্ভ
বু বু	২। ৪। ২৭	৫৩। ৯। ১৮	সর্বত্র রাজসুখ, সম্পদলাভ, তত্ত্ব স্ফুরণ, মনে সুখ।
বু কে	০। ১১। ২৭	৫৪। ৯। ১৫	চিত্তের চঞ্চলতা, ভ্রমণ বা।
বু শু	২। ১০। ০	৫৭। ৭। ১৫	সর্বত্র রাজস সুখ, সম্পদ লাভ, তত্ত্ব স্ফুরণ, মনে সুখ।
বু র	০। ১০। ৬	৫৮। ৫। ২১	যশ, প্রতিষ্ঠা, ধর্ম বৃদ্ধি
বু চ	১। ৫। ০	৫৯। ১০। ২১	মনের প্রসন্নতা নানা সুখ লাভ
বু ম	০। ১১। ২৭	৬০। ১০। ১৮	সর্বত্র সাহস উৎসাহ কুশলতা
বু রা	২। ৬। ১৮	৬৩। ৫। ৬	প্রভুত্ব দিলেও ক্রোধ বৃদ্ধি

৬৩। ৫। ৬ :- (এই পর্যন্ত রাজেন্দ্রবাবু যেমন লিখিয়াছেন সেইরূপ দেওয়া হইল। ইহার পর তিনি আর কিছুই লিখেন নাই। কাজেই আমিও কিছুই লিখিলাম না।)

বু বৃ	২। ৩। ৬	৬৫। ৮। ১২	
বু শ	২। ৮। ৯	৬৮। ৪। ২১	
কে কে	০। ৫। ২৭	৬৮। ৯। ১৮	কেতুর মোট ৭ বৎসর শরীর বিষয়ে ভাল যাইবার কথা নয়। পূজা যজ্ঞ ও পবিত্রভাবে থাকা প্রয়োজন।

কে শু	১। ২। ০
	৬৭।১১। ১৮*
কে র	০। ৪। ৬
	৬৮। ৩। ২২
কে ম	০। ৪। ২৭
	৬৯। ৩। ১৯
কে রা	১। ০। ১৮
	৭০। ৪। ৭
কে বৃ	০। ১১। ৬
	৭১। ৩। ১১
কে শ	১। ১। ৯
	৭২। ৪। ২০
কে বু	০। ১১। ২৭
	৭৩। ৪। ১৭
শুক্রের দশা	২০। ০। ০
	৯৩। ৪। ১৭

যদি শুক্রের দশা এই জীবনে আসে তবে আমার জীবনেই ভারত ও অধ্যাত্ম ধর্মের প্রভাবময় শক্তিবাদ যুগ দেখিতে পাইব। জীবনে অনেক শক্তিই হারাইয়া ছিলাম, কিন্তু প্রয়োজনবোধে সব শক্তিই আবার ফিরিয়া পাইয়াছি। খুব আপন বলিয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহারাই ঈর্ষাবশে মূর্খতা করিয়া বহু ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিয়া নিজেদের মূর্খতা প্রমাণ করিয়াছে। মহাশক্তির অসীম স্নেহ যে কোন ক্ষতি সংশোদন করিতে আমার মোটেই সময় লাগে নাই। শরীরে, মনে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনবলে, স্নেহভালবাসা, যোগ তপস্যা ও জ্ঞানে, কোথাও তিনি কোনই অভাব রাখেন নাই।

আমার কুণ্ডলীর লগ্নেশ ৫মে। এবং পঞ্চমেশ তৃতীয়ে অবস্থান করিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে নিজের পরম মিত্রকে দেখিতেছেন। ইহার ফলে, আমাকে শক্তিশালী সাধক এবং শক্তিশালী মতবাদ প্রবর্তক করিয়াছে। অতীব বৃদ্ধ গ্রহ শনি পঞ্চমেশ। এইজন্য মতবাদ অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্থায়ী হইবে। চন্দ্র দশমেশ এবং শুভ চতুর্দশী তিথি হইবার দরুণ, মনকে অত্যন্ত উন্নত রাজতুল্য এবং শক্তিমান করিয়াছে। এই মন নবমে এবং নবমেশ তৃতীয়ে অর্থাৎ শক্তিপীঠে অবস্থান করিয়া নিজের গৃহ নবম এবং চন্দ্রকে পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া আমাকে কঠোর তপস্বী করিয়াছে। দশম রাজ্যস্থান, নবম তপস্যা স্থান, তৃতীয় শক্তি স্থান, পঞ্চম সাধনার স্থান, লগ্ন নিজের মস্তিষ্ক ও স্বভাবকেন্দ্র; এ সবের যোগ ও মিলনে একটা শক্তিশালী সংযোগ করিয়াছে। শুক্রের দশায় এ সব সংযোগগুলি পূর্ণ দিতে পারে।

* প্রকাশকের নিবেদন - এই কোষ্ঠীর ছকে কিছু ভুল আছে।

সাধারণতঃ মানুষ ৬টি দশা জীবিত থাকে। এই জন্যই আমিও ৬টি দশাই করিয়া রাখিলাম। ৬টি দশায় আয়ু দুই মতেই ৯০ এর ঊর্ধ্বে যায়। এ সবে কোনই মন্তব্য করিলাম না। তবে ইহা সত্যকথা যে বঙ্গদেশে আমার শরীর বেশ শক্ত থাকে না।

শক্তিবাদ ধর্মের মনোগ্রাম।

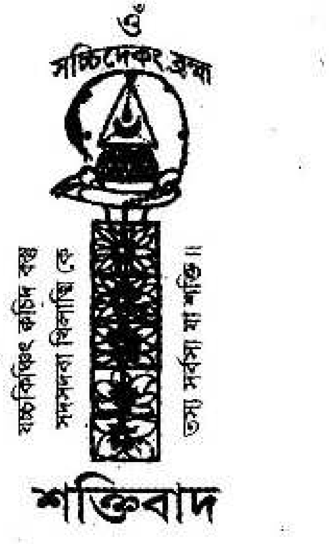

গ্রন্থের আরম্ভে শক্তিবাদের মনোগ্রাম দেওয়া আছে। গ্রন্থ শেষে ইহার সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইল। মনোগ্রাম ব্রহ্মনাড়ীর সহিত গ্রথিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র আছে। আজ্ঞার বা মস্তিষ্কমধ্যস্থ শিবপিণ্ড বিদ্যমান। শিবের সর্পকে সহস্রার হইতে মূলাধার পর্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্মনাড়ী বা অনন্ত নাগরূপে দেখানো হইয়াছে। চিত্রটার উপরে লেখা আছে "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।" নিম্নে আছে "শক্তিবাদ"। মধ্যস্থানের লেখাটি চণ্ডীর একটি মন্ত্র, উহার মানে "জড় ও চেতনা" দুইই শক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ। দুইয়ের অনুশীলনই শক্তিবাদ।